

সুরমা গাঙর পানি

রণবীর পুরকায়স্থ





রণবীর পুরস্কারস্থ

(জন্মঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, আসামের সাবেক কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লালখিরা গ্রামে। শৈশবের কিছুদিন চা বাগানে, কিছুদিন লোয়াইরপুয়া গ্রামে, তারপর শিলচর শহরে। শিক্ষাঃ- অভয়াচরণ ভট্টাচার্য পাঠশালা, কাছাড় হাইস্কুল, কাছাড় কলেজ থেকে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.কম.। কর্মজীবনঃ- ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র আধিকারিক হিসেবে কলকাতা থেকে অবসর। লেখক বর্তমানে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। লেখালেখিঃ- পাঁচটা গল্প গ্রন্থ, একটা উপন্যাস)

সুরমা গাঙর পানি

--- রণবীর পুরকায়স্থ

সাপিখুপির ভয়ডর নেই বৈতল ওঝার । মানুষকেও ভয় পায় না বৈতল । শত্রুর
মুখোমুখি সে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর ।

ছলচাতুরিতেও কম যায় না ।

ইচ্ছাধারী সাপ হয়ে দংশন করতে পারে । ওঝা হয়ে ঝাড়তে পারে ।

বইয়াখাউরির পাটনির পুত বৈতলের জলকেও ভয় নেই । জল দেখলে দুরন্ত হয়ে ওঠে মাছুয়ার
পরায়ণ ।

তখন বাল্যকাল

বাপ বলে,

--- হেই বৈতল, পানিত লাম ।

নেমে যায় বৈতল অগাধ জলে । জলের অতল থেকে তুলে আনে আধমণি বোয়াল । বাপ দেয়
সাবাশ । বলে,

--- অউ না অইলে মাইমলর পুত !

মাছশিকারি বাপকে দুচোখে দেখতে পারে না মা । ক্ষণরাগী মানুষটা যখন তখন রাগে ।
বাপের রাগ যে চণ্ডাল । খুনখারাবিও করে । লাশ গুম করে ফেলে দেয় জলের নিচে ।
মাকেও মারে । দন্ধে দন্ধে মারে । বলে,

--- মারমু, কিন্তু মারতাম নায় ।

কী যে বলে, কী তার অর্থ শিশুবৈতল কিছুই বোঝে না । ওরা মা বাপ । ওদের
নির্যাতন ওরাই বুঝে নেয় । আশঙ্কা আর ভয় মিলিয়ে একটা আতঙ্ক মায়ের মনে ।

বাপের রাগ আর মায়ের ভয়ের মাঝখানে কিছু একটা তো আছে, যা বৈতল বোঝে না ।
অকথিত বিড়ম্বনার ইতিহাস নিয়ে ওরা ঘাটাঘাটি করে না ।

দুজনে অতীত উদযাপন করে দুরকম ।

একজনের ক্রোধে , অন্যজনের উচাটনে ।

মাঝখানে বৈতল বাড়ে ফনফনিয় । বৈতলকে বাড়তে দেখে মা বলে,

--- তুই দেখি কেরাইয়া গাছের লাখান বাড়রে!

বৈতল রেগে গিয়ে বলে মাকে ,

--- আমি কিতা অত কালা নি ।

‘কেরাইয়ার ইত কালা পিত কালা পাত কালা’ ।

বৈতলের মা আদর করে সংশোধন করে তাকে মূর্তা গাছের সঙ্গে তুলনা করে, --- ‘গাছ
কালা তার ধলা ফুল’ ।

জঙ্গলের পাতালতা খুব চেনে তার মা । পেট খারাপ হলে হেলাইধগর পাতা সেদ্ধ করে
দেয় । সুকতানি রাঁধে কাঁচকলা কয়ফল দিয়ে । আইগগাজাল বা রুজন্ট পাতার স্বাদ ও গন্ধ
দুটোই থাকে ।

পেট তো ভাল হয়, মন ভাল হয় না কিছুতেই । শিশু বয়সটাই এমন মেঘলা মেঘলা
কাটে বৈতলের ।

বাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না বৈতল ।

বাপকে ভয় করে না । নির্ভয় হওয়ার , ডাকাবুকো হওয়ার পাঠ তো বৈতল বাপের কাছেই পায় ।

মাও যে কখনও অনুযোগ করে না । মা শুধু ভয়ে ভয়ে থাকে । অদ্ভুত বৈপরীত্য । চড়, থাপ্পড়, ছিংলার বাড়িকে ভয় করে না মা । বৈতলের ক্ষীণা জননীর ওসব শরীরসওয়া । দা, কুড়ুল , কুচা, সরিয়ে রাখে চোখের সামনে থেকে । বাপ বোঝে সব । তাই আরো হিংস্র হয় কথায় । বলে,

--- রক্ত বার করতাম নায় , বিনা রক্তে মারমু তরে ।

বাপের কথার ইশারা বোঝে মা । আরো সিঁটিয়ে যায় বৈতলের দুখিনি আই । মা বাপের এই নিত্যদিনের ঢলানি জিয়ানি আর ভাল লাগে না ।

বাচ্চা ছেলে বৈতল মাকে জড়িয়ে ধরে । সাহস যোগায় । বলে,

--- বাপ ত তরে আদরও করে বেটি ।

আদরের কথায়ই হয়ত মায়ের দুর্বল শরীর কাঁপতে থাকে ভর লাগা আই মনসার মতো । কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যায় চুনাপাথরের টিলা । বৈতলের মা আর সব পাটনি মাইমলের বৌ- বিদের মতো না । মায়ের বরণ কথামালি ফুলের মতো নরম সাদা । মা তাকে তার রং দেয়নি ।

মা বলেছে জন্মের পর তার রং এমন ছিল না । তার জন্মের আগে কালো রঙের এক কাফনা পেয়েছিল মা । বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল যত্ন করে । কাফনার ভিতর ছিল ধবধবে মুক্ত মানিক । তার ছাওয়াল । দেখার হাওরের রোদে জলে পুড়ে গেছে ওপর ওপর ।

মাতা পুত্রের সুখের কথা চালাচালির সময় সূর্যঠাকুর পশ্চিমপাটে রওয়ানা হওয়ার পর । উঠোনের রোদে মা তার দীর্ঘ কেশরাশি ছড়িয়ে বৈতলকে ডাকে পানের বাটা নিয়ে আসার জন্য । উৎসাহী পুত্র মাকে পান সাজিয়ে দেয় মুখে । গ্রামের বাড়িতে তাদের পান সুপারি কিনতে

হয় না । সুপারি গাছ বেয়ে ওঠে পান – লতা । পাহাড়ে উঠলেই খাসিয়া চুন । খুশির মেজাজে
মা মজার ডিটান শোনায়ে,

--- ক চাইন দেখি, একুউগাছো পান সুপারি একুউ গাছো চুন, কিতা ?

বৈতলের মা তার মুখের পানে মিষ্টি ঝাঁঝ মিশিয়ে শিশু বৈতলের মুখে দেয় । বলে,

---খা ।

ধাঁধাও ভাঙিয়ে দেয় । মার মুখ থেকে বারবার শুনে বৈতলের মুখস্থ । বৈতল জানে
সুপারি গাছ বেয়ে ওঠা পানপাতায় কাকের বিষ্ঠা লেগে ডিটানের চুন হয় । তবু মার মুখ থেকে
আবার শোনে চিবোনো পানের সুস্বাদ লোভে । মায়ের গাত্রবর্ণ নিয়েও গর্ব বৈতলের ।
মিছিমিছি পান সাজে বৈতল আর গায় ,

--- পান দিলাম, সুপারি দিলাম আর দিলাম চুন ।

মার সাদা রঙের হাতকে চুনের কৌটো ভেবে অলৌকিক চুন নিয়ে পানে ঘসে । আর মা
রাগে । বলে,

--- রং দিয়া কিতা করতে রে পুত, মনটারে সাদা রাখিছ ।

মন সাদা রাখার কথা বলে কিন্তু মা নিজে থাকে না ।

মা- বাপের সম্পর্কে পুত্রের সালাশি মার পছন্দ নয় । তখন সাদা রং আর সাদা থাকে
না । তিনদিনের বাসি কড়কড়া ভাতের মতো ফ্যাকশে হয়ে যায় । ফুল আর ফুল থাকে না ।
সৌরভ চলে যায় মুখ থেকে । পাথর হয়ে যায় বৈতলের আনন্দময়ী মা ।

পাথর মা চুপ করে চেয়ে থাকে তার চোখে । কী যে বলতে চায় কে জানে ? চেয়ে থাকতে
থাকতে ভুল বকে । বলে,

--- ভাত দে, জাল দে । ভাত দে, জাল দে ।

চুল মাথা ঝাঁকিয়ে বারবার একই কথা বলে ভৈরবী জননী । দূরে সরিয়ে দেয় বৈতলকে ।
বলে,

--- যা যা দূর যা , বেইমান বেটির পুত, দূর যা ।

দুই

তখন মা চলে যায় অনেক দূরে ।

মাকে কাছে ডাকতে পারে না । সত্যকে কোনো সমঝোতায় আনতে পারে না ।
খাওয়ার সময় ভাত দে, হাওরের জলে যাওয়ার সময় জাল দে , এছাড়া বাপ কোনো কথা বলে
না মার সঙ্গে । রুদ্ধ সম্পর্কের পাথর সরাতে পারে না বৈতল । অপরিচিত অসহায় মার দুঃখে
কাতর বৈতলও বাড়ি ছেড়ে চলে যায় অনেক দূর । কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হাত নিশপিশ
করে তার, মন উচাটন হয় । বাপ নয়, অন্য কিছু, অন্য কাউকে খোঁজে বৈতল । শাস্তি না
বিচার , কী চায় অসহায় সন্তান ।

সম্পর্কের জটিলতায় ডুবতে ডুবতে অসহায় বৈতল ভুসভুসিয়ে আকাশ দেখে । ভাবে,
এত সুন্দর , এত বিশাল এই হাওরের জল । এত সুখী চারপাশের সব গাছপালা, জলের স্তরে
স্তরে মাছেদের সুখী সংসার । শুধু তার মা আর বাপের মনে কেন এত কষ্ট ?

মায়ের সঞ্চয় দু-চার পয়সা ছিকির ভিতর নারকেল মালায় থাকে বড়ঘরের মাড়ইলএ ।
বৈতল ঠালি ভেঙে পয়সা নিয়ে বেরিয়ে যায় যদিকে দুচোখ যায় ।

জৈন্তেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে মাথা কোটে । কানা পয়সা দুই পয়সা এক আনা সব সম্বল
ছুড়ে দেয় বিগ্রহের গায়ে । বলে,

--- দে মিল করি দে ।

ধূলায় ধূসর ইজের আর ছিন্ন নিমা পরিহিত বৈতলকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়
পুরোহিত । পাগলার দাম বাড়ির সুখী বৌঝিরা এসেছে যে মানতের ডালা নিয়ে । লালপেড়ে
শাড়ির ঘোমটার উপর সাজানো ডালায় চাল ডাল ফল মূল ফুল ও নতুন গামছা কাপড় ।

সোনালেপা শরীরের গরিমাই আলাদা । পেছনে সিঁদুর মাখিয়ে জবাফুলের মালা পরিয়ে নিয়ে
যাচ্ছে ম্যাঁ ম্যাঁ ডাকের কালো নধর বলির পাঁঠা । কতদিন পাঁঠা খাসি খায়নি বৈতল ।
আড়গড়ার কাছে সিঁদুর টিপে সাজিয়ে রাখা তেল চকচকে রাম – দার চোখ বৈতলকে ডাকে ।
এক কোপে নামিয়ে ধড়টা নিয়ে চম্পট দিলে আর ধরে কে তাকে । ছিনা , গর্দান নিয়ে
বৈতলের এত লোভ নেই, মাথার তেলের বড়ায় তেল লাগে কম, মা রাঁধে ও ভাল । তবে
মাথার কথায় বৈতলের মাথাও ঘোরে । ব্রাহ্মণের মুণ্ডুটাও তার চাই । কালো রঙের কৈবর্ত বলে
তাকে হেনস্থা করবে চাল- কলার পুরোহিত । দেবতার কাছে নিবেদন করতে দেবে না তার
মায়ের মনোকষ্ট । রাগে তার বাচ্চা চোখ দুটো জলজল করে । প্রণামীর থালি থেকে
এক খাবলা খুচরো পয়সা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায় । আর তখনই ‘এই
সর’ বলে এক সোনালেপা হাত প্রণামীর থালায় ফেলে তামার দুয়ানি, টং । ক্রোধে বৈতল
তার সিঙি মাছের শরীরে তাকায় আর তাকায় বালিগড়া, দাঁড়কিনার মতো রূপোলি নারীশরীরে
, শরীরের আভরণে । কে শিখিয়ে দেয় জানে না, নিপুণ এক ঝটকায় সাদা শরীর থেকে
নামিয়ে নেয় এক বিছেহার । পুণ্যার্থী নারীপুরুষ কিছু বুঝে উঠার আগেই বৈতল
পালায় । সোনার হার যতক্ষণ হাতে ততক্ষণ বৈতল ঠিক করতে পারে না সোজা ছুটবে বা
এঁকেবেঁকে ছুটবে । তাই, কামিনী – বিলের জলে ঝপাং করে ছুঁড়ে ফেলে বড় বিদ্যায় তার
হাতে খড়ির প্রথম রোজগার । শিশু বৈতলের পিছনে লোক ছুটছে বাবুর বাড়ির । বৈতলকে
ধরা কি এত সোজা । বৈতল ছোটে সোজা , বৈতল ছোটে কোণাকুণি । দৌড়তে দৌড়তে
বৈতল দেখে দেখার হাওরের বিস্তীর্ণ জলরাশি । দেয় ঝাঁপ, আর হাওর জলের নাগাল পেলে
বৈতল যে হয়ে ওঠে মহাবীর । হয় ভয়ঙ্কর । সাপের মতো ছোবল মারতে পারে তখন মোক্ষম
। তাই মনে মনে সর্পপটে মা মনসাকে নম করে বৈতল । বলে, জয় আই। মা-ও বলে
আই, বলে ঠাকুর । বলে,

--- ঠাকুর আমার বৈতলরে রক্ষা করিও ।

বৈতলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় । বলে,

--- ই পটর ঠাকুর আমরার কুল – দেবতা । আমরার আই । তানে মানিয়া চলিও বাপ ।
তাইন তুমার লগে লগে আইছইন ই বাড়িত । ছয়ত্রিশ বাংলার গুলাত তাইন ভাইয়া ভাইয়া
আইছইন । এর লাগি রঙ উঠি গেছে ।

মায়ের বিবরণীমতো বারো বছর বয়সে বৈতল প্রথম ঘরছাড়া হয় ।

বাউরবাগ থেকে ফিরে আসে বৈতল । আবার যায় । লংলার পিরতলায় গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে খুব রাগারাগি করে পিরের মাজারে । নিরন্তর মাজার ছেড়ে আসে মিরতিঙ্গা । বৈতলের মামার বাড়ি । বইয়াখাউরির মতো না মিরতিঙ্গা । মিরতিঙ্গার মাটি শুকনো আর সবুজ । বড় মায়াধারী মিরতিঙ্গার বন টিলা ঝর্ণা । বইয়াখাউরি বার মাস ভিজে । সর্বক্ষণ জল আর জল । মা আছে বলে মায়াও আছে মমতাও আছে । মামা বৈতলের কথা শুনে হাসে । বলে,

--- আমরা আদিবাড়ি আরো শুকনা । আমরা আছলাম সিঙ্গুর । সায়েব আইল, চা বাগান বানাইল , আমরা খেদাই দিল মিরতিঙ্গা । যাইমুনে তরে লইয়া একদিন ।

মার ছোট, এক মামা বৈতলের । মাটির সরা কলস বানায়, মূর্তি বানায় আর হাটে বাজারে বিক্রি করে । বৈতল মামাকে প্রশ্ন করে ,

--- অতদূর বিয়া দিলায় কেনে তুমরা । কিতা দেখি । উত্তর থাকি দক্ষিণে । তুমরা কুমার আমরা কৈবর্ত মাছুয়া ।

--- ইতা আমি জানি না , তর দাদিরে জিগাইছ ।

মামা এড়িয়ে গেছে । মামা মনসার মূর্তি বানায় , সর্পপট বানিয়ে রাখে , শ্রাবণ মাসে বিক্রি হয় । মাটির কলসি ঘট সরা পাতিল কুজা কলকিও মটকা বানিয়ে রাখে ঝিক্কইর । এছাড়াও পুতুল বানায় ছোট ছোট হাতি ঘোড়া ননীচোরা সুভাষ বোস আর রবি ঠাকুরের । তারের স্পিং দিয়ে হুকো হাতে বুড়ো বানায়, মুখে তুলোর দাড়ি । হাত দিলেই মাথা নড়ে দাদুর মতো। দাদুর মাথা খারাপ। কিন্তু গাঞ্জা খায় আর মাথা নাড়ে । উদ্ভট উদ্ভট প্রবাদে কথা বলে। বৈতলকে দেখলেই ফোকলা মুখ হাসিতে ভরে যায় । বিচিত্র সম্ভাষণে বলে,

---- অউ আইছইন চুংটির বান্দির পুত হুলতান খাঁ । ভালো নি ? যাইরায় গি কই ভকা বেটা ? কেনে ? ছেরাণু দেখিয়া ডরাইরায় নি ? কামড়াইতাম নায় । আও । দিতায় নি একটান চিলিমো ?

নাটিকে চেনে কি চেনে না বোঝা যায় না । কিন্তু খুশি হয় বৈতলকে দেখলে । গান গায় মনের সুখে ,

--- গাইজ্ঞা চিরল চিরল পাত । গাইজ্ঞা খাইয়া মত্ত হইয়া নাচে ভোলানাথ । নাচ নাচ রে বেটা ভকার জামাই । নাচতে নায় ? দেখবে নে তর কিতা হয় । পাপে বাপরেও ছাড়ে না কই দিলাম ।

দাদি বৈতলকে দেখলেই কাঁদে । তাই কোনও কথা বলা হয় না । দাদি শুধু সাবধান করে । বলে,

--- মামীর সামনে মামারে কিচ্ছু কইছ না । মামী তো পরর বাড়ির বেটি । কী লাভ কইয়া ?

দাদির সাবধানবাণীর অর্থ বুঝতে বুঝতে বৈতলের বয়স বাড়ে । বোঝে, তার দুঃখ তারই । কেউ নেই সমব্যথী । তবু মিরতিঙ্গা তার প্রিয় । ওখানে অন্তত তিনটি প্রাণী তাকে আর তার মাকে ভালবাসে । পাগলাদাদু কী সব বুঝেও পাগলামি দিয়ে মেয়ের দুঃখ ঢেকে রাখে । মামীকে বোঝে না বৈতল । মিরতিঙ্গার বাঁশঝাড় কিতার জঙ্গল মেঠোপথ সব আলাদা । পিশাচ গাছের গন্ধেও মায়ের শরীর পরশ । দণ্ডকলস দুধফুলের মধুও এখানে মিঠে বেশি । ফুচুক ফুচুক টানতে বেশ । মা বলে,

--- ফুল না দেখিয়া মধু টানিছ না পোকা থাকে ফুলো ।

বৈতল মাকে নিয়ে গেছে তার টিলারাজ্যে । পাটপাথরে বসিয়ে দেখিয়েছে তার আপন দেশ । সব টিলায় তো আর চা বাগান নেই । জঙ্গলের অনেক গভীরে টিবির উপর বসে বৈতল চালায় তার রাজ্যপাট একা একা । অগুনতি পাখ- পাখালি আর তার একান্ত বানরসেনা । বানরের জন্য গ্রাম থেকে কলা আর সফরি চুরি করে আনে । পাখিদের জন্য আনে ধান চাল আর খুদ । সব দেখে মা খুব হাসে । বলে,

--- তর দাদু সব সময়র পাগল আসলা না, গাউর মাইনষে তান কাছে রামায়ণ মহাভারত শুনত । শুনিয়া শুনিয়া আমারও মুখস্ত অই গেছিল । ঠিক অলাখান এক পর্বতো দেখা অইছিল সুগ্রীব আর হনুমানর লগে । ঋষ্যমুখ পর্বত । ইখানো থাকিয়াউ অলা বান্দরসেনা যুগাড় করছিল তারা ।

‘যুড়িয়া আকাশভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে

দশ দিনে তথা এল সবে থাকে থাকে ।’

দশদিন থাকা হয় না কখনই । দু তিন দিন রাজ্যপাট চালিয়ে মন ভাল করে আবার
ফিরে যায় বৈতল । পাগলার বৈতল পাগলায় ফিরে যায় । বিল হাওয়ার আর নদীর গ্রাম
বইয়াখাউরি ।

যাওয়ার সময় দাদি দেয় চালপড়া জলপড়া । বৈতল খাইয়ে দেয় মাকে । মার মুখে
নীরব হাসি দেখে আনন্দ হয় বৈতলের ।

বেড়ে ওঠা সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে আই বিষহরীর মন্ত্র জপ করে
বৈতলের মা,

--- ‘জয় জয় বিষহরি শিবের কুমারি

বন্দম চরণে তোমার মাতা পদ্মাবতি ।’

জপশেষে বলে,

--- আর কিছু চাই না গো ।

কিছুই চায় না আবার বলে আর কিছু চাই না ।

বৈতল বোঝে তার মাথায় যেন মায়ের হাত থাকে সর্বদা ।

তিন

মা খেতে দেয় সিদল পোড়া পান্তাভাত আর মরিচবাটা । লাল রঙের লঙ্কাবাটা দেখলেই বাপের চোখ খুশিতে চকচক করে । বলে,

--- পুটকিপুড়া ঝাল না অইলে আর কিওর হিদলপুড়া ।

বৈতল এত ঝাল পছন্দ করে না ! মাকে বারণ করে । বলে,

--- অত মরিচবাটা দিও না , না করছি নানি ।

মা বলে দেয় নি । বলে,

--- দিছি না বে, যে কুন্সু কীরা ।

চোখের সামনে লাল রঙের সত্যকে মা কীরা কেটে মিথ্যে করে দেয় । বৈতলও তখন মুচকি হাসিতে লুকিয়ে ফেলে লাল রং । অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে তার পাতের অফুরন্ত শিউলি ফুলের হাসি । মায়ের হাতের অমৃতপরশে বাসি ভাত পান্তা থেকে উঠে ফুলের মহিমায় ছড়িয়ে পড়ে পাতে । খিলখিলিয়ে ওঠে মায়ের হাতের চাঁপার কলি । তখন আর মাকে এক দরিদ্র মৎসজীবী পরিবারের গৃহবধূ মনে হয় না । পাগলার দামবাড়ির জমিদারনির সোনালেপা শরীরের কথা মনে পড়ে । বাউরবাগে মা অন্তর্পুর্ণার সামনে জোড় হাতে বসেছিল বলে বৈতল সোনায়ে হাত দেয় নি । ‘এই সর’ বলে অবজ্ঞা করা বাবুর বাড়ির বৌকে মাপ করে নি বৈতল । ছিনতাইবাজের প্রথম অপবাদ লাগে গায়ে । তবে বৈতল জানে সেদিন জ্ঞানত সে কোনও অপরাধ করেনি । বরং, অন্যায়ের একটা উপযুক্ত শাস্তির প্রতিবিধান করেছে দেবী মাকে সাক্ষী রেখে । দেবী মায়ের প্রতিমামুখের হাসিটুকুই বৈতলকে সাহস যুগিয়েছে । নিজের মাটির বাড়ির মায়ের মুখের সঙ্গে যে মিলে গেছে অবিকল । তাই খেতে বসলেই বৈতলের মাকে

দেবী মায়ের মতো লাগে । ঘোর লাগা চোখে দেখে মাকে, দেখতে দেখতে শরীর অবশ হয়ে যায় । বন্ধু লুলাকে বলে,

--- দেখ দেখ বেটা, জমিদারগিও দেখ আমার মার কাছে ভিক্ষা চায় ।

কয়েকদিনেই বন্ধুর মনের কথা পড়তে শিখে গেছে লুলা । বলে,

--- অয়বে , এইন একেবারে গুটাটিকরর ভৈরবী মা !

--- ধুর বেটা, আমার মা, আমার মা ।

এরকম কিছু হিংসা আছে বৈতলের । কিছুই নেই যার , সে যা আছে তার ভাগ দিতে চায় না কাউকে । কিন্তু বৈতল দেয় । মুখে আমার মা আমার মা করলেও মায়ের ভাগ দেয় মাতৃহীন বান্ধবকে । বৈতলেরও এক সুহৃদ হয়েছে দেখে মাও খুব খুশি । বলে,

--- রাম জন্মাইতে রইম আর লুলা জন্মাইতে বৈতল । ছাড়াছাড়ি অইছ না বেটা ।

দশ বছর বয়সেই মাতৃহারা শিশু পায়ে সর্ষে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গান গাইতে । বাপ কটু মিয়া হিন্দুস্থানি রমণীকে নিকে করে দেশান্তরী হয়ে যায় । ছেলের খোঁজ নেয় না । লুলা শুনেছে বাপ সাপের বিষ সাপ্লাই করে কলকাতায় আর হাটে হাটে বহরের ননী বিক্রি করে । কোনও গুণ নেই লুলার, মায়ের জন্য কাঁদে, ক্ষিদে পেলে চুরি করে । লুলা গান শোনে, গান গায় । শারি গানের চটুল কথায় মজে লুলা । গানের পাকা কথা বেশিদিন ভাল লাগেনি বলে ওস্তাদের খুতি নিয়ে পালায় । ঘাটুর পুয়া হয়ে হিন্দুবাড়িতেও কিছুদিন কাটিয়ে দেয় লুলা দাস হয়ে । লুলার কী বেজ কী দাস । কী হিন্দু কী মুসলমান । ভাল লাগলে থাকে । ভাল না লাগলে চুরি করে পালায় ।

বৈতল নতুন কেরামতি শুনে প্রমাদ গোনে । বলে,

--- আমারে বালা না লাগলে চুরি করিছ না । এমনেউ লই যাইছ আমার হক্কলতা ।

লুলা লজ্জা পায় বন্ধুর কথায় । বলে,

--- তর লগে ইতা অইত নায় । অইলে ত হিদিন অউ অই গেল নে ইম্পার উম্পার । মারি লিলাম নে হিদিন । আমিও খিত্তার বাঙাল । আমারও নাকর আগাত জুলফুকর ।

--- আমিও অলাখান । মাল পাইলেউ ঝাড়ি দেই । আমি কিতা কেউ জানে না । যে যেলা পারে কয় । বৈতল দাস , বৈতল পাটনি, বৈতল উঝা, কছ না বেটা বৈতল মিয়া । আমার কিতা ।

যেদিনের কথা বলে লুলা সে এক ভয়ঙ্কর দিন । খুনোখিনির সকাল । মামার ঝাড়ি থেকে গজর গজর করতে করতে বেরিয়েছিল বৈতল । সকালবেলা পেটভরা খাবার না পেলে বৈতলের গুসা ওঠে নাকের ডগায় । বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন ধংস করলেও দুঃখ যায় না । খাওয়া কম হলেও বৈতলের মার কথা মনে পড়ে । মা কখনও কম দেয় না । মা বলে,

--- পেট ভরি খাইলা সকালবেলার মুঠি সারাদিনের খুটি ।

দাদিও পেট ভরা খেতে দেয় । খুদের ঝাউ করে দেয় সঙ্গে ঘি ভাঙা বচুড়ি । আর মামি , কড়কড়া এক মুঠো ভাতে তার পেটের কোণাও ভড়ে না । মামির উপর রাগে গর গর করতে করতে তার একাকীর টিল্লায় গিয়ে গিয়ে দেখে এক

বাঙাল পুয়া । বৈতলের রাগ ওঠে মাথায়, বিড় বিড় করতে থাকে ,

--- সুনামগঞ্জ পুয়ার লগে নি দিল্লাগি । এমনেউ মামিয়ে না খাওয়াইয়া মারি লাইত । অখন নি বাঙালে মারত । তুই কিগুরে ?

অতর্কিত লাথি মেরে ফেলে দেয় পাহাড় থেকে । আসলে বৈতলের রাগ অন্য কারণে । পাটপাথরের রাজা বৈতলের সঙ্গে গোস্বাকির শান্তি । তার রাজ্যে তার পাথরে বসার সাহস করেছে ভিনদেশি ছেলে । যে পাথরে বৈতল তার মাকে বসিয়েছে ওখানে কেন বসবে । ওখানে, ওই পাথরে মাকে বসিয়ে বৈতল বলেছে,

--- চউখ মুজো । একতা দেখাইমু তুমারে ।

মা হাসিমুখে চোখ বুজে ছিল । বৈতল বলেছে,

--- চউখ খুলো ।

চোখ খুলে মা বলেছে,

--- ওমা ই দেখি পাগলা রাজার সৈন্যসামন্ত । কিস্কিন্দার রাজা সুগ্রীব ।

এক দঙ্গল বাঁদর কিচির মিচির করে কড়া কড়া পেয়ারার ভোজ লাগিয়েছে বৈতলকে ঘিরে । আর বৈতলও একে একে পরিচয় করিয়ে দেয় মায়ের সঙ্গে । বলে,

--- অউ অইল অমূল্য অণ্ড পসন্ন অউ চটই কটই । সব আমার বন্ধু ।

--- এর মাঝে নল কে ?

--- নল আবার কিতা?

--- এ বান্দরের কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে। নল, নীল, জাম্বুবান , হনুমান আর তারার রাজা সুগ্রীব , ডাক্তর সুষণ ।

--- কও না মা কিষ্কিন্দার গপ । দাদুয়ে কিলা গাইতা রামায়ণ গান । আমিও

বড় অইলে রামায়ণ গাইমু । তুমি যে কইসলায় হিদিন আমি শিখিলাইছি । যুড়িয়া আকাশভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে ...

--- আইচ্ছা অখন সেতুবন্দর কথা ছন। বান্দরের রাজা সুগ্রীবর এক প্রজা আসলা নল। নলে বর পাইছলা ব্রহ্মার কাছে। তাইন ছইলেউ শিলা ভাসব পানিত , গাছ পাথর যেতউ ফালাইব পানিত সব যুড়া লাগব । নলে রামরে কইল এক মাসে সেতুবন্দ বানাই দিব সাগরো । লঙ্কাত যাওয়ার পথ । এর মাঝেও এক মজা । সবে ত পাথর আনি দেয় নলরে , নলে লয় আর যুড়া লাগায় । ডাইন দিকর পাথর ডাইন হাতে, বাউ দিকর পাথর বাউ দিকে । হনুমানে দেয় বাউদিকে হে লয় বাউ হাতে , তাইন ত আবার আলিম পণ্ডিত । তান হয় গুসা , বেটায় তানে অপমান করের বাউ হাতদি, হনুমানে গুসার চুটে গন্ধমাদন উদন সব পাহাড় পর্বত লইয়া আইল নলর উপরে ফালানির লাগি । নলে রামরে কইল গিয়া । রাম গিয়া উবাইলা তান ভক্তর সামনে , কইলা , কামর সময় ডাইন বাউ হয় না রে বা । কামর সুবিধাত যেমনে পারে লইব , এর লাগি কিওর গুসা । রামে তারার মিল করাই দিলা । কীর্তিবাসেও কইলা

‘কুলাকুলি দুই জনে

করে হরষিত মনে,

জাঙ্গালে উঠিয়া গিয়া নল

কীর্তিবাস কহে রাম

জপিব তোমার নাম

এই ভক্তি হউক অচল।।’

পাগলার মাছুয়া বৈতলের রাজত্ব ঐ উচ্চভূমিতে । বৈতলের মা বলেছে এই পাহাড়ের নাম ঋষ্যমুখ। এখানে এসে বৈতল খোঁজে মনের শান্তি , মায়ের জন্য শান্তি খুঁজে নিয়ে যায় । পাখপাখালিকে ডেকে এনে খাওয়ায় খুদকুড়া। পাথরের এই মন্ত্রণাসভায় বসেই শিশু বৈতল খোঁজে মায়ের দুঃখের সমাধান । হাওর জলের পোকা বৈতলের সিংহাসন ঐ পাটপাথর । তার আসনে অন্যকে বসতে দেখে বৈতল রাগে আগুন হয়ে মারে লাথি । অচেনা বালক গিয়ে পড়ে নীচে শনখলায় ।

তারপরের কাণ্ডটাও করে সজ্ঞানে। সেও লাফ দিয়ে পড়ে গিয়ে শনের বনে । এত উপর থেকে পড়ে কেউ বাঁচে না । কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দুজনেই থাকে অক্ষত , একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব। দুজনেই প্রাণ পেয়ে বোকার হাসি হাসে । হাসতে হাসতে দুজনে দুজনের কাঁধে হাত দেয়। বৈতল বলে,

--- তর মা নাই ।

--- না নাই ।

--- তে চল আমার লগে । আমার বাড়ি ।

--- কৈ তর বাড়ি ।

--- পাগলা ।

--- তুইন সুনামগঞ্জি ।

--- তেউ, সুনামগইঞ্জো মানুষ থাকইন নানি ।

--- আমিও ত যাইতাম ।

--- কৈ যাইতে ।

--- লক্ষণছিরি তর বাড়ি থাকি কতদূর ।

--- ধারউ , অউত্ত মাধবগঞ্জ, জাউয়া, সুনামগঞ্জ । গেছিনা। কেনে যাইতে?

--- গান শিখতাম ।

--- ও বুঝছি দেওয়ান বাড়ির কথা কইরে । হাছন রাজা । তাইন ত নাই ।

--- তে কিতা , তান ত গান আছে

হাছন রাজা নাচেরে নাচে

প্রানবন্ধে আমারে দেওয়ানা করিয়াছে...

--- বা বেটা বালাউ গাছ । আর কিতা হিকতে ।

--- রাজার বাড়ির সড়কো গিয়া গান গাইতাম !

--- ইতা আবার কিলাখান মাত ।

--- আমি অলাখান । বছরে একবার খিত্তাত যাই । মার কয়বরও যাই না । গাউত গেলেউ
বুঝি আমার মা আছিল এক বেটি । মারে দেখি না , তেও জানি মা আছিল ।

--- বইয়াখাউরিতও মা আছে । চল, তুই হিদল ভর্তা খাছনি ।

--- ভর্তা উর্তা কে বানাই খাওয়াইত । পুড়িয়া খাই লাই এক বর্তন ভাত ।

--- আমার মার আতর খাইবে । অমৃত লাগব । চাটবে ।

--- যাইতাম তো ।

--- তে আবার কিতা । ও বুজছি ।

--- কিতা বুঝছচ ।

--- তুই বাঙাল, অউত্ত !

--- অয়!

--- ধুর বেটা কৈবর্ত মাইমল কামলার কুন্স ইতা থাকে নি । আমার মা ইলাখান নায় ।

লুলা যায় বইয়াখাউরি । বৈতল তাকে নিয়ে যায় হাওরে । বলে,

--- অউ দেখ আমার হাওর, দেখার হাওর । অউ দেখ রাজা ছলিমর মাজার , ছালাম কর ।
আমরার হাওরর বিল হকল তুই গনিয়া শেষ করতে পারতে নায়, এগুর লাগা আর এগু,
হাওরর পরে হাওর । ই হাওর শেষ অইলেউ চেপ্টি, টেংগুয়া, শনির হাওর । ইতা শেষ হইত
নায় ।

--- আমার সিলেটও আছে । হাওরর রাজা হাকালুকি ।

--- হি ত বুজছি । মাছ মারতে পারছ নি ।

--- মারছি না । পারমু ।

লুলা পারে নি । দশ দিনে ঝাঁকিজাল একবার গোল করে ফেলতে পেরেছে । ভুঁরাজাল
টেনে পুঁটি মকা ধরেছে দুই বন্ধু । বড় মাছ ধরার কেরামতি শেখাতে বাপকে বলেছে বৈতল ।
বাপ নিয়ে গেছে হাওরে । হাওরের মাঝখানে গিয়ে লুলাকে বলে,

--- হেই লুলা, পানিত লাম ।

জল থেকে উঠে অনেকদিন আর বাড়ি মুখো হয়নি লুলা । চলে গেছে খিত্তা । আবার
এসেছে বৈতলের মার কাছে । বলেছে,

--- হিদল ভর্তা খাওয়াইবায় নি মাই ।

--- খাওয়াইমু । রোজ খাওয়াইমু, বৈতলের ছাড়িয়া যাইছ না বাপ ।

--- আমার পানিত ডর লাগে ।

--- ধুর বেটা সিলেটি পুয়ায় নি পানিরে ডরায় । ডরাইছ না ।

মায়ের আশ্বাসে লুলা ঘুরে ফিরেই আসে বৈতল বাড়ি । বৈতল লুলাকে বলে মায়ের
দুঃখ কথা । লুলা বলে,

--- চল, এক ফকিরর কাছে যাই । তান পানিয়ে বউত কাম অয় । হজরত শাহজালালর লগে
আইছলা যে ৩৬০ জন আউলিয়া , খাদিম নগরর হজরত শাহপরাণর বংশত তান জন্ম ।
হনতে নি পরাণশাহর গান । হন ,

কৈতর উড়িল রে দুই পাংখা মেলিয়া

পালকেতে ফু দিলা শাহ পরাণ আউলিয়া

বিছমিল্লার বরকতে পায়রার দেহ পাইল জান

শাহজালালরে পায়রা দিলা নিজামুদ্দিন পির

সেই পায়রাগণ ছিলটেতে বান্ধে সুখের নীর ।

এমনিতেই দুই বন্ধুর পায়ের তলায় সর্ষে । তার উপর লুলার গানে কৌতূহল বাড়ে ।
চল বলতেই চল । লুলা অনেক ওঝা ফকিরের খবর জানে । সাপ ধরতে পারে খালি হাতে ।
বৈতলকেও শিখিয়ে দেয় কেরামত ।

সুরমার উজান বেয়ে ওরা পৌঁছে যায় সতেরসতি । সাধুহাটির বাজারে লুলাই খুঁজে বের
করে পিরের মাজার । পিরতলার খাদিম ও এক পির । নাম মামুদ শেখ । পিরের কাছে গিয়ে
বিপাকেই পড়ে দুই বন্ধু । কানা পির দারোগার মতো জেরা করে লুলাকে । বলে,

--- লুলা আবার কিতা নাম ।

--- আমার নাম লুলা । ছোটবেলা ল কইতাম পারতাম না । লুল আমিন বেজ ।

--- লুলা, অ বুঝছি রুলা । তুইত অখনও র কইতে পারছ না । রুলা নায় রুহল । রুহ কারে
কয় জানছ নি ।

--- জানি । ফুকন লাগে ।

--- লগর ইগু কিগু ।

--- বৈতল ।

--- বৈতল ত গাইল ।

--- অয় গাইল । গাইল্লাইয়াউ আমার মার লাগি পানি দেও ।

--- চুপ যা বেটা তর বাড়ি কই ক চাইন।

--- পরগনা পাগলা, গাউ বইয়াখাউরি।

--- উবা উবা তরে ত আমি চিনি। তর ত আর এক বাপ আছিল।

হা করে তাকিয়ে থাকে দুই বন্ধু। এত বোঝার বয়স হয়নি, তাই শুধু রাগে গজর গজর করে বৈতল। বলে,

--- আজারি মাত মাতিও না পির। পানি দেও! একটু মিঠা করি দিও। কত পয়সা লাগব কও।

পির চিনি গোলা পানি দেয় এক শিশি। দুই পয়সা দিয়েই দুই বন্ধু ছোট্টে বইয়াখাউরি। ফিরে গিয়ে বৈতল মাকে বলে অন্য এক কিছা। বলে,

--- জাননি মা, সুরমা গাঙর পারো এক দরগা দেখি আইলাম শাহজালাল পিরর। কী মিঠা পানি গো মা দরগা মহল্লার ইন্দারার। তুমার লাগি এক বুতল আনছি। খাইয়া দেখ।

মা মুচকি হেসে খায় জল। শেখের চিনি গোলা জলের গুনে একদিন শান্তিতে কাটে। বাপ আর মাকে দণ্ডায় নি।

চার

এক পুয়ার বাপ অনেকদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে ভুলে যায় সব । মাকে বলে,

--- আইজ হিদল পুড়া আর ভাত । ঠাসিয়া দিছ মরিচ ।

ঝালের মুখে জিভের চকাশ চকাশ আনন্দে মায়ের চোখও চিকচিক করে । খাওয়ার পর মা বৈতলকে চিবুনো পান দেয় । বৈতল খায় আর হিংসুক চোখে লুলাকে দেখায় । লুলাও রেগে মাকে অনুযোগ করে ।

--- আমারে দিলায় না ।

--- মুখর পান খাইবে নি বেটা ।

--- কেনে, হিঙয়ে খাইতে পারে আমি কিতা দুষ করলাম ।

বৈতলের মা লুলাকেও দেয় । বলে,

--- অতদিন কই গেলে, কই থাকলে , কিতা খাইলেরে বাপধন ।

--- আমরা আউরি ঘুরছি গো মাই । হারা মইলবাজার ঘুরচি আর খাইছি যেতা পাইছি ।

--- আর ইবায় তার বাপে খায়না, সব বালা বালা জিনিস রাখি দেয় পুয়ার লাগি !

মা বলে,

--- এক মাস থাকি শুটকির আড়তদার আইছে বাজারো । শিলংঅ বুলে লাইয়ার শুটকির দাম বাড়ছে । দের না । কয় আরো বাড়উক । ইবার ঘাঘট, ঘনিয়া , পাবিয়াও বালা অইছে । তোর লাগি রাখি দিছে বালা দেখিয়া ।

বৈতল বাপের সঙ্গে সিদল দেয় । হাওরের বড় বড় পুঁটির শুটকি সাজিয়ে রাখে মাটির কলসিতে । পরতের পর পরত সাজিয়ে দেয় শুকনো মাছ । মাছের পেট থেকে তেল বের করে

রেখেছে বাপ । সিদল দেওয়ার সময় আবার তেল মাখায় । হাঁড়ির মুখ চুন শুকনো লতা পাতা দিয়ে বন্ধ করে । রান্নাঘরের নিচে মাটিতে পুঁতে রাখে আঘন মাসের জন্য ।

অগ্রহায়ণ মাসের নতুন সিদল আর পান্তা ভাতে শরীর বাড়ে দুরন্ত । মা বলে,

--- মাছর তেলও সব দেয় না । তোর লাগি রাখি দেয় । কয়, মাছর লগে টক্কর দিতে অইলে, সাপর লগে টক্কর দিতে অইলে মাইমলি গন্ধ লাগে । তেলাল শরীর লাগে । কয় তেলে জলে বাইচা বাড়ে । পনর বছর অই গেছে , অখনও তুই বাইচা নি ।

গল্লা বেতের শরীর বাপও মিশে থাকে মাটি আর জলের সঙ্গে । শুধু মাছ আর সাপ নয় , দশাসই মানুষকেও কাবু করে ফেলে তার কালো কুচকুচে লতা শরীরে । বেতাল বুঝলেই বেয়াড়া প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে নেয় জগৎবেড়ে আর ছুঁড়ে ফেলে বড় হাওরের গর্ভে, আইড় বোয়ালের খাদ্য হতে পানিকবরে ।

খুব বেটাগিরি আছে বাপের ।

আবার মাকে যখন মারে তখন হিংস্রতা থাকে না । নিরুপায় মানুষের দুঃখ ঝরে পড়ে ঘামের ফোঁটায় ।

সেদিন কিন্তু একবারও ঘাটার বাইরে যায় না বাপ ।

মাকেও বলে না, বেইমান বেটি ।

রাত হতেই প্রলয় ডাকে হাওরের জলে । ঝড়, তুফান, বন্যা ।

বাপ বৈতলকে ডাকে,

--- হেই বৈতল । পানিখেউড় দেখতে নি চল ।

প্রলয় রাতের অন্ধকারে বাপ বেটা বেরিয়ে যায় এক দড়ি আর এক মস্ত কলসি মাপের খলুই হাতে ।

জলখেলা দেখতে চলে বৈতল । জলের সঙ্গে খেলতে চলে । জলের সব আঁশটে প্রাণীর সঙ্গে লড়তে যায় পিতাপুত্র ।

চারদিক অন্ধকার । সে এক ভীষণ দৃশ্য । জলের সাঁ সাঁ শব্দ শুধু । জলতরঙ্গে
সুরমা নদী আর হাওরের সীমারেখা একাকার । বিদ্যুচমকের মধ্যে বৈতল ভাবে
চরাচর বুঝি শেষ হয় ।

বাপ পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় । বৈতল পেছনে আছে কি না খেয়ালও করে না ।
বৈতল ও বিজলির অপেক্ষায় থাকে, বাপের চলা কল্পনা করে আর আই মনসার থানকে গন্তব্য
ঠিক করে রাখে । থানের উপর বিশাল হেলা বটগাছ ঢেকে রেখেছে হাওর । বাপ খলুই এর
গলায় দড়ি বেঁধে তার হাতে দেয় । বলে,

--- ছাড় কইলেউ ছাড়বে ।

বৈতল দেখে আই মনসার মন্দিরের সামনে এক অলৌকিক দৃশ্য । মাতৃমূর্তির সামনে
এক চাটা জ্বলছে টিমটিমিয়ে , মাটির প্রদীপ । এই দুর্যোগের রাতে কে জ্বালিয়ে গেল প্রদীপ ।
হাটুমুড়ে বসে বৈতল এক মনে জপ করে আইমনসার স্তব ,

মনিগন - মনিগন ভূষিতে নমস্তে

ভগবতী বিষহরি দেবী নমস্তে ।

বটগাছের শিকড়ে হাত দিয়ে নম করে । শিকন্দর গাজিকেও নম করে । সিলেট
জেলার সব নদী হাওরের মালিক এই গাজি । খুশ থেকে বাবাজি । বাপের শেখানো বুলি
কপচায়,

শাহ সিকন্দর গাজি

মাছ পাইলে আধাআধি

তুমি খাইবে মাছ খান

মোরে দিবে গচা খান ।

তর তর করে গাছের উপর চড়ে যায় বৈতল । নিঁখুত আর নির্ভয়ে । বৈ তল জানে
ভয়ের কিছু নেই কোথাও , বিশ্বসংসারে অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই । হেলে থাকা বট গাছের
ডালে আর হাওরের জলে ডাকাডাকি । বৈতলের পিছল শরীর জড়িয়ে ধরেছে বটের ডাল ।
এক হাতে খলুই, দড়ি অন্য হাতে । বজ্রপাতের কড়কড়াং আর আলোর বিচ্ছুরণে অবাক
কিশোর দেখে দুই অপার্থিবের দাপাদাপি । হাওরে জলের তাণ্ডব আর তার বাপের লড়াই ।
পানিকে শাসন করছে খালি হাতে । নিচের জল থেকে ডাকে বৈতলকে ,

--- লামা বৈতল ।

বৈতল নামিয়ে দেয় খলুই ।

বাঁশের মাছপাত্র মুহূর্তেই ভরে ওঠে রূপোলি শস্যে । খলবলানো জলচরে ভরে যাচ্ছে খলুই ।
বাপকে বলে বৈতল,

--- আমি লামতামনি পানিত ।

খালি হাতে মাছ ধরার কসরৎ শিখেছে সে বাপের কাছে । বাপ বলে ,

--- না ।

ভোর হয় হয় । ফর্সা হয়ে গেছে আকাশ । বাপ বলে,

--- খলুই ধরি রাখ । আস্তে আস্তে লাম ।

বাড়ি ফিরে আসে বৈতল । বাপ ফেরে পরে । মাছের টুকরিতে খলুই উপুড় করে
খোঁজে আলদের বাচ্চা ।

রাগে নয়, কৌতুকে বাপকে বলে বৈতল,

--- পাইতাম নায় , ফালাই দিছি ।

ছেলের তেলাল শরীরে শরীর মিলিয়ে বাপ বলে,

--- সাবাশ !

বৈতল বলে,

--- তুমি আমারে মারতায় চাইছলায় ।

--- না রে বেটা , দেখলাম তুই কিতা করছ ।

--- কিতা আবার করতাম, আলদে নি মারত আমারে ।

--- তুই পারবে বেটা । সাপের লগে লড়াই করি বাচন লাগে আমার । তুই পারবে ।

বৈতল বুঝে বাপ কথা খুঁজে পাচ্ছে না । এই প্রথম বাপের সঙ্গে সংঘাতে যায় বৈতল বলে,

--- তে তুমি আমার মার লগে ঝগড়া কর কেনে, মা কুন্স সাপ নি ।

বাপ শোনেনি কথা । চলে যায় জলের বিশ বাওয়ে । বলে,

--- পানি কিলান দেখলে ।

--- পানি তো পানি উ , কিতা দেখতাম ।

--- ঠিক । ঝড়ঝাপটা হউক, ঘোলা অউক , নিন অউক , কুডুলা অউক , যেতাউ অউক পানি তো পানি অউ । তে পানি আছিল বেটা ছয়ত্রিশ বাংলাত ।

মাইনষে কইন মহাপ্লাবন । মাটি নাই কুন্সখানো । খালি ছাতকর টিল্লা আর খাসিয়াপুঞ্জি । ছাতকর তিন নদী মিলিয়া সাগর । আমরা ডরাইছি চেরাপুঞ্জির পাড়ো নি পানি উঠি যায় ।

--- ইতা হুদা মাত ।

--- না বে । জিগা না অউ বেটিরে । সব ঘরবাড়ি ডুবি গেছে , গরু মইষ নাই একটাও । পানি লামার পরে দেখছি ধান চাউল ও অই গেছে , চুন গুলিয়া পাথর অই গেছে আবার ।

--- সব যদি ডুবি যায় তুমি দেখলায় কেমনে ।

--- আমরা সব গাছো ।

--- গাছ কই , গাছও তো পানির তলে ।

--- না , আমরার ইখান তো উচা । গাছর আগা আর কিছু বাড়িনতর চাল নেতাজির টুপির লাখান ভাসি রইছে ।

--- ছয়ত্রিশ বাংলাত নেতাজি আছলা নি নেতাজি ।

--- কথার কথা কইলাম আরি । তিনদিন আছলাম গাছো । গাছো আছিল এক সাপ । জোয়ান গাট্টা আমার লাখান ।

--- কী সাপ ।

--- আলদ থাকিও মারাত্মক । পাগলার জমিন্দার বাড়িত থাকত । পালোয়ানি করত । লাঠিয়াল আছিল । লাঠিয়ামি করত । আমি চাকর ইগুরে দেখতাম পারতাম না । তে কেমনে বুজমু যে ঝিমমারি পড়ি রইছে গাছো । হাপি কুপিরে আমি ডরাই না । আর হিগুত ডরাইয়া ভিজুতিতু । আমার চউখ দেখিয়াউ কাজিমরা । কইলাম , ছাড়তাম নায় । শাশিরসো টিপিয়া মারি ফালাইছি । অখন জিগাইবে নি কেনে মারলাম । ডাক অউ বান্দির বেটিরে । তুই ওতো অউ বেইমান বেটির পুত । জিগা বজরি দাসরে চিনে নি ।

একদিনের পানি পড়া দুদিনেই জল ।

বৈতলের গৌরাঙ্গী জননীর মুখে আবার আতঙ্কের নীল ।

পাঁচ

বাবুদের ভাষায় সিলেটকে শ্রীহট্ট বলতে পারে না বৈতল । জোড়া জোড়া অক্ষর দিয়ে বানানো শব্দ যেন কিছুতেই হাটেমাঠে জলের আঁশটে গন্ধে মানানসই হয় না । তবে হ্যাঁ সিলেট বড় সুন্দর । সুরমা নদীর চান্নিঘাটও দেখতে বড় মনোরম । ঘাট থেকে উঠেই সোজাসোজির পথের উপর এক মস্ত ঘড়ি , বলে আলি আমজদর ঘড়ি । সিলেটের সুন্দর ‘ চান্নিঘাটের সিঁড়ি আর আলি আমজদর ঘড়ি ’ । দুটোই বৈতলের কাছে নতুন , এত মনোরম নদীর বাঁধানো সিঁড়ি দেখেনি , আর ঘড়িতো দেখেইনি জীবনে । নদীর উপর ধনুকের মতো একটা লোহার পুল এর ওপারে ইস্টিশন । কিনপুল পেরিয়ে এপারে পড়লেই বন্দরবাজার জিন্দাবাজার আর কালীঘাটে শুধু মানুষের ভিড় , দোকানপাটের হল্লা । শহরে নাকি গাড়ি ঘোড়া প্রচুর থাকে , সিলেটে গাড়ি খুব কম , ঘোড়ার গাড়িতে সুন্দর সুন্দর মানুষ যায় , সালু কাপড়ের ঝাঁঝরঘেরা গাড়িতে যায় বড় বাড়ির বৌঝিরা । সাইকেল চড়ে মানুষ , কিনপুলের উপর পিলপিলিয়ে সাইকেল চলে । সাইকেল দেখে লোভী বৈতলের লোভ হয় একটা হাতিয়ে নেওয়ার । সিলেটের ছোট ছোট গলি মহল্লাগুলি ঘুরে বেড়াতে সাইকেল খুব কাজের জিনিস । তবু এমনি হেঁটে হেঁটে সব রাস্তায় ঘুরেছে বৈতল । সিলেটের পাড়াগুলিও তাদের গ্রামের মতো , বইয়াখাউরিতে কোনও পাকা সড়ক নেই, সিলেটের পথগুলি সব ছবির মতো । নদীর পারে চালিবন্দর শেখঘাট থেকে দরগা মহল্লা । শাহজালালের দরগায় গিয়ে বৈতল মায়ের জন্য নতুন করে দোয়া প্রার্থনা করে । আগের বার মৌলভীবাজার থেকে পানি পড়া নিয়ে বলেছিল শাহী ইন্দারার জল । মসজিদ দেখে তো বৈতল অবাক , এত বড় দরগা সে দেখেনি জীবনে । কী বিশাল ডেকচি , ডেকচিতে বিরিয়ানি বানায় । বিশাল বিশাল সব গজার মাছকে ছোলা খাওয়ায় , পিরের কাছে মিনতি করে দোয়া কর দাতা , আমার মারে বালা করি দেও । বাসুদেব বাড়ির প্রাঙ্গণে হরিবালের সংকীর্তনে মেতে ওঠে । জলে ঘেরা ভাটির দেশের বৈতল প্রাণভরে দেখে সিলেটের গলি । মাছুদিঘীরপার তোপখানা কাজির বাজার কাষ্টঘর

জামতলা আর অনেক দূরের শুঁটকির বাজার মাছিমপুর । মাছিমপুরের বেপারীদের সঙ্গে দরদাম করে , জেনে যায় পাইকারদের লাভ । এবার বাপের সঙ্গে ভাড়া করে নিয়ে আসবে সোজা মাছিমপুর । হেঁটেও আসতে পারে , মাছিমপুর বাজার লাগোয়া সুরমানদীর ঘাটও আছে । নৌকো করেও আসা যায় । বৈতলের মাথায় অন্যচিন্তা , সাইকেল করেও তো আসতে পারে , দুচাকার সাইকেলে অনেক মাল উঠানো যাবে । তিন চাকার এক আচানকি সাইকেলও আছে সিলেট শহরে , সওয়ারি টানে । মেয়ে বিবিদের নিলে ঘোড়ার গাড়ির মতো শাড়ি কাপড়ের ঝাঁঝের বেঁধে দেয় , বলে রিক্সা । রিক্সা অনেক বড় , নিয়ে যাওয়া যাবে না বইয়াখাউরি । কিন্তু সাইকেল একটা চাই তার , বায়স্কোপ একটাও দেখবে । একটা টিংটিঙে লোক টিনের চোঙ মুখে লাগিয়ে ‘ তুফান মেল তুফান মেল ’ হেঁকে যাচ্ছে , তার পিছনে আর একটা লোক বাঁশের চাটাইএ সাঁটা এক কাগজ বাঁশে বেঁধে নগর সংকীর্ণনের মতো ঘুরছে , কাগজের ছবিটা চেনে , কাননবালার , তুফান মেল সিনেমা । টকি হাউসে দেখানো হচ্ছে । টকি হাউসে এসে কেন যে মনটা দোটানায় পড়ে । বাপের ধাত পেয়েছে বৈতল , একসঙ্গে অনেক কাজ করা পছন্দ করে না বাপ । বলে, দুই নাও চড়ে , উফিনত অইয়া মরে । কোথাও একটা হারামজাদাও জুড়ে দেয় বাপ । এখানে এই সিলেটের বিদেশে বৈতল বায়স্কোপ দেখা বাতিল করে , হলের সামনে হাম্বার সাইকেলটাই দেখে । লুলা বলেছিল সিলেটের পথে ঘাটে পয়সা , কই কোথাও ছড়ানো কিছু পায় নি বৈতল । সাইকেলটাই একমাত্র রয়েছে অনেকক্ষণ মালিকহীন । যেই ভাবনা সেই কাজ । সাইকেলের চাকায় যে তালা লাগানো থাকে জানে না বৈতল । তালা ভাঙলেও চড়ে যে পালাবে সে উপায় নেই , চালাতেও তো জানে না । পুলিশই ধরে সরাসরি । পেটি কেসএ চালান হয় বৈতল । পুলিশ নাম বলতে বলে , বৈতল বলে লুলা দাস , গ্রাম মিরাসী, পরগনা খিত্তা । সব উল্টোপাল্টা বলার বুদ্ধি তার আছে । নাম লেখে না , টিপসই করে । ছেড়ে দেয় জজ , দুদিনের হাজতবাস তো হয়েই গেছে । জজের পেশকার ছাড়ে না , নিয়ে আসে বাড়ি । বিনা পয়সার বেগার শ্রমিক ।

বৈতল দাড়িয়াপাড়ার পেশকার বাড়ি থেকে সোনার মাকড়ি নিয়ে পালায় সাতদিনের মাথায় । পেশকার কামিনী দাম-এর মেয়ের কানে জ্বলজ্বল করে সোনার গয়না । বইয়াখাউরির তুলসীতলায় সন্ধ্যাবেলা বাতি জ্বালে বৈতলের মা । মাটির প্রদীপে আলোকিত মায়ের মুখখানা বড় সুন্দর দেখে বৈতল । বাবুর বাড়ির মেয়েটির মুখখানিও বড় মিষ্টি , ফর্সা । নাম বুড়ি ।

পাশের বাড়ির শ্যামলা মেয়ের নাম হাসি । কপাল দোষে বৈতল বুড়ির বাড়ি গরুরাখালি করে ।
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত । সারাদিন গরুর পিছনে ঘুরে পুকুরে পড়ে সন্ধ্যাবেলা । আর পলায়নের
ফন্দিফিকির আঁটে । পালিয়ে গেলে একটা দুঃখ থাকবে বৈতলের , বুড়িকে আর দেখতে পাবে
না সকাল সন্ধ্যা । পুকুর পারে খেজুর আর আমলকি গাছের নিচে জলে ভাসতে ভাসতে
পরনের গামছা দিয়ে ছোট ছোট মাছও ধরে দেয় প্রতিদিন । বলে একদিন বড়মাছও ধরে
দেবে, ঘাঘট । পেশকার হাসে, বৈতল বুঝে বিদ্রূপের হাসি । এইটুকুনি ছেলের কর্ম নয় ।
বৈতল জানে একপাল রিটা আছে পুকুরের মাঝখানে । হাসলে পরে আর তুলবে না মাছ । ডুব
দিয়ে মনকে শান্ত রাখে বৈতল । ডুব থেকে উঠে শোনে বুড়ি আর হাসির খিলখিল । রোজ
আসে এই সময় । বুড়ি বন্ধুটিকে নিয়ে বাড়ি যায় না । শানে বসে হাসে , আর আমলকি
কুড়িয়ে খায় । আজলায় জল তুলে মুখে দেয় । একজনের খাওয়া ফল অন্যজন খায় । বৈতল
ওদের অকারণ কথা, হাসি শুনে উদাস হয় । লুলার কথা মনে পড়ে । হিংসে হয় , মনে মনে
বলে, তারও বন্ধু আছে । কালো মেয়ে হাসি অনেক গল্প জানে । বলে,

--- ছাতক থাকি দেখা যায় এক পাহাড় । পাহাড়ের নাম সেরা । সাহেবে কয় চেরা ।

--- ছি ছি কিতা কছবে ছেরা নি ।

--- না বে, চেরা , চেরাপুঞ্জি । দুনিয়াত সব থাকি বেশি বৃষ্টি অয় । অউ পুঞ্জির এক রাজা
আইছিল ছিলট । চান্নিঘাটর সিড়িত বইয়া খুব অ্যাওলা খাইত বেটায় আর ঘাট তানি পানিও
খাইত । খাইয়া কয় অলা মিঠা । আবার খায় অ্যাওলা , আবার খায় পানি । পুঞ্জিত তো
অ্যাওলাও নাই পানিও নাই । বন্দরবাজার থাকি তিনশ পঁয়ষট্টিটা পিতলর কলসি বানাইয়া মিঠা
পানি লই গেল বেটায় পুঞ্জিত । আবার আইব কইছে এক বছর পরে । অলা আডুয়া ।

--- অউ নি তর গপ । ইতা হুন্ছি । অখন গান শুনাইলা একটা ।

পেশকারের মেয়ের গানের গলাও মিষ্টি । হাসির অনুরোধে গায় কানন বালার গান ,
আমি বনফুল গো । দুই বন্ধুর জলসায় বৈতল খাপটি মেরে শোনে শুকসারির গান ,

--- ‘বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের রাই আমাদের ।’

কালো মেয়ে হাসি একটু ছটফটে । শুকশারি শেষ হতেই ধরে অন্য গান ।

---‘পুবেতে বন্দনা রে – পুবে ভানু করিয়া রে

পশ্চিমে বন্দনা রে- মক্কা মদিনা রে’

ইশ্ কী মশারে বুড়ি তোর পুকইরো ।

--- ভালুট অইছে তরে কামড়াইছে । অখন ইতা মক্কা মদিনা গাওয়ার সময় নি ।

মক্কা মদিনা হউক নবদ্বীপ বৃন্দাবন হউক কেউ মাঝপথে গান থামিয়ে দিলে রাগ হয়
বৈতলের । পুকুরের জলে লুকিয়ে না থেকে এবার সেও ধরে গান,

--- ‘হাওরর মাঝে আকালুকি বন্দিরে

মাছের মাঝে রউ আর চিতল রে

মই এক অধম রে নাই কুন্সু গেয়ান রে

কী শুনাইমু আমি মুখমতি রে

তে যদি দয়া করি রে আউলা ঝাউলা কথা রে’

দুই সখীকে অবাক হওয়ার সময় না দিয়েই পনের বছরের বৈতল মান্যগন্য বড়
মানুষের মতো বলে,

--- তিন হাঙ্গার সময় তোমরা পুকইরো বই রইছ কেনে । মশায় ধরত কেনে, বাঘেও ধরত
পারে । ভূতে ধরলে আমি কিন্তু ভাগমু ।

ধলা বুড়ি বৈতল থেকে বড় না হলেও পাকামির ভাব আছে নামের মতো । বলে,

--- তোরেও তো ধরতে পারে ।

বৈতল বলে,

--- আমারে ধরত নায় । আমি মাছুয়া । মাইমল ।

--- মাইমল । তুই বাঙাল নি ।

--- না, আমি পাটনি । পাটনি আর মাইমল একতাউ । গরিবর ইন্দু বাঙাল নাই ।

--- তেউ । মাইমল পাটনি অইলে কিতা ।

--- মাইমলরে ভূতে ধরে, মশায় ধরে না ।

--- ধুর বেটা পগা ।

--- পগা কইলায় নি আমারে । তে ছন এক পরস্তাব । এক বিটলা বুড়ায় কইছলা ।

--- কিতা কইছলা ।

--- জালুয়া হকলে তো রাইত জাগিয়া মাছ ধরইন । আর উঙ্গাইন । মাছর মুড়ি চাবাইয়া
খাওয়ার সময় মনো করোনি মাইমলর কষ্ট । বানে পানিয়ে মশার কামড়ে তারা তুমরার পাতো
গজ পেটি আর মুড়ি উঠাই দেয় । তারার কষ্ট কেউ ছনে না । তারা একজনরে একবার
পাঠাইলা মা মনসার কাছে । হে কইল গিয়া আইরে , ছনো বেটি , তুমি অইলায় মহেশ্বর
বেটি, তুমার আর কিতা । তুমি আমরারে দেখতায় পারো না । তুমি আমরার আসল মা নায় ,
তুমারে চন্দ্রধরে বাউ হাতে ফুল দেয় , চেঙ মুড়ি কানি কয় , ঠিক অউ । বিষরিয়ে তো হকলতা
বুঝইন , কইলা , কিতা অইছে ক । হে কইল, আমরা রাইত জাগিয়া মাছ ধরি আর আমরার
খালি ঘুম পায় , মাছ না ধরলে খাইতাম কিতা, খাওয়াইতাম কিতা তুমার বাবু হকলরে ।
পারলে আমরার ঘুম কমাই দেও । আমরার লগে থাকি থাকি মা বেটিও পেরত অই গেছিল ,
বগলো কমরো মাটি , কাম নাইতে খালি ঘষে । ঘষি ঘষি সোনার অঙ্গর জিলকানি বার করে ।
মার আতো আছিল তখন কমরর মাটি এক চিমটা । মাইমলর আতো দিলা , কইলা , যা রে
পুত গাইল্লাইছ না, ঘুম কমব । অউ থাকি মশার জন্ম , এক চিমটা কালা মাটি আরি । তার
পরে আর কিতা, পাটনির গাত তো মশা বইবউ । কও ?

বুড়ির বন্ধু হাসি খুব খুশি হয় । বলে,

--- বাক্সাউতো কিচা কয়, পুয়া ইগু কিগুরে ।

--- তুমি আমারে চিন না, আমি তুমারে চিনি ।

--- ক'চাইন আমি কে ।

--- তুমি আমারে দেখি হাস নি ।

--- না, আমি হাসি না ।

--- অউত্ত তোমার নাম ।

--- ধুর বৈতল । ইগু কিগু কছনা বুড়ি ।

--- গাইল্লায় লায়নি ।

বৈতল সচেতন হয় । তার নাম রহস্য নিয়ে মজা করা যাবে না । সে এখানে লুলা ,
লুলা দাস । আর তখনই পেশকার বাড়ির বুড়ি আলদের লেজ মাড়িয়ে দেয় । বন্ধু হাসিনাকে
বলে,

--- কেনে দেখছচ নানি । ইগু চুর । অখন আমার চাকর ।

তখনই বুড়ির কানের মাকড়ি দুটোর সোনারঙে আগুন ধরে । কেউটের বিষ নামিয়ে
আনে বৈতল জিভে । বলে,

--- চুর করে কছ । চাকর করে কছ । চাকর তো তোর বাপ, হাকিমর গোলামি করে, আবার
বড় বড় মাত । তোর কিতা বেটি অত ফুটানি ।

সোনারবরণী মেয়ের দুই কান ছিঁড়ে মাকড়ি নিয়ে ভাগে বৈতল । সিবিল হাসপাতালের
পাঁচিল উপকে দৌড় । দে দৌড় । দৌড়ে গিয়ে ঝপাং চাননি ঘাটের সুরমা নদীতে ।

ছয়

বৈতলের ভয়ডর নেই ।

জলে নামলে সে মহাবীর ।

লুলা বলেছে সিলেট থেকে দক্ষিণমুখো হাটতে হাটতে থিত্তা । গ্রামের নাম বেজরঘর ।
বলেছে,

--- দেখবে বেটা হাকালুকি কেনে কয় । বারিষর সময় মাটি পাইতে না , পানিয়ে পানি, দরিয়া
অই যায় । আর মাছ , সিলেট কুমিল্লা থাকি আসামর শিলং পর্যন্ত যায় মাছ ।

দক্ষিণমুখো হলে তো সুরমা দিয়ে যাওয়া যাবে না । নদী থেকে উঠতে হবে । সুরমা
গেছে পশ্চিম থেকে পূবে । দক্ষিণে তো কুশিয়ারা , পঞ্চখণ্ড , ফেচুগঞ্জ । হাটতে হাটতে বৈতল
পোঁছে যায় হাকালুকি । মনের টানে বেজরঘরে পেয়েও যায় লুলাকে । বলে,

--- চল ।

চল বললেই চল । দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশ্যে । যেখানে রাত সেখানেই
কাত ।

কিন্তু বৈতলের মনের জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না । দাড়িয়াপাড়ার ধলা মেয়ে বুড়ির কথা
মনে পড়লেই জ্বর বাড়ে । বিকার হয় , লুলাকে মারধর করে । গালাগাল দেয়, বলে, হালার
হালা বাঙাল । একার দুঃখ বন্ধুকেও দেয় । লুলা হা করে তাকিয়ে দেখে । মার খায় , অকথা
শোনে । বৈতল লুলাকে সব কথা খুলে বলে । বলে,

--- বিয়া অইব নি বে তাইর । কান ছিড়ি লাইছি ।

--- ছিড়ছ কেনে । অখন কান্দরে কেনে । তুইন গুনাগার অই গেচছ দোস্ত ।

--- ঠিক আছে, আমি পাপী অইছি অই গেছি তুই পুণ্যাত্মা অইলেউ চলব । চল কুণ্ডানো যাই, কিছু একটা করি ।

--- চল, ক কই যাইতে ।

--- তুই যেখানো কছ । খালি সিলটো যাইতাম নায় ।

--- অয়, পুলিশ আর পেশকারর পুড়ি তরে ধরত করি বই রইছে ।

--- কিন্তু আমার আর ইতা বালা লাগে না ।

--- কিতা বালা লাগে না বে ।

--- ইতা ভাগাভাগি , দৌড়াদৌড়ি । মারে কইছলাম কিছু একটা করতাম । মায় কইছলা উঝা বানাইবা । কইছলা তর অত বালা গলা , নাচতেও পারছ দেখছি শ্রাবণীর সময় । আমারও খুব হাউশ জানছনি । লেখাপড়া না জানলে ইতা হয় । লেখাপড়া কেমনে শিখতাম ক চাইন ।

--- অখন আর পারতে নায় ।

--- পারমু । তুই শিখাই দিবে । অ আ তো জানি । নাম লেখতাম পারি ।

--- আমিও তো জজ মেজিস্টর । হিন্দু বাড়ি থাকিয়া আমিও ক অক্ষর শিখছি ।

--- অইব । এতেউ অইব । আমি পুথি গাওয়া শিখতাম ।

দুই বন্ধুতে কাছাকাছির দক্ষিণভাগে ভাটেরা কুলাউড়া বিয়ানিবাজার অনিপণ্ডিত , জলঢুপ ঢাকাদক্ষিণ দিয়ে শুরু করে তাদের গন্তব্যহীন ভ্রমণ । রাতের পর রাত হাঁটতে থাকে । লাউড় , বানিয়াচঙ , জগন্নাথপুর হয়ে আদমটিলায় এসে লুলা বলে,

--- চল ঘুরি লাইছি সব অখন মাইর কাছে যাই ।

বৈতলের মনটাও মা মা করছিল । বলে,

--- অয় যাইতাম । আগে ছন এক গপ । মার কাছে ছনছি । গণেশ ঠাকুর আর কার্তিক দুই ভাই ।

--- অউ যে হাতির শুড় ।

--- অয় বেটা ছন । মায় কইলা দুই ভাইয়ে যাও তীর্থ ভ্রমণ করি আও । যাও কাশী যাও গয়া , সবখানো যাও । পারলে মক্কা মদিনাও ঘুরি আও । তে কার্তিক তো তোর মতো আডুয়া , হে বারই গেল, এক বছর দুই বছর তিন বছর পরে সব ঘুরিয়া উরিয়া আইল । আইয়া দেখে গণেশে তার মার চাইর দিকে চক্কর কাটের । ছোট ভাইরে কইল, তুই গেলে না । গণেশে কইল আমার মাউ আমার সব তীর্থ । তে আমরাও সিলেট ঘুরিয়া ভাবছি সব ঘুরি লাইছি । সিলটর অউ সব ঘুরা অইছে নি । তর তো অখনও লক্ষণছিরিও দেখা অইল না ।

--- অইত ইবার গিয়া যাইমু ।

এত ঘোরাঘুরি করেও বৈতলের মনটা কাঁটা খচখচ করে । মার সামনে কী করে মুখ দেখাবে । মায়ের দুঃখ দূর করতে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে , কিছুই তো পারেনি করতে , এক দরগা মহল্লায় গিয়ে দোয়া চেয়েছে শুধু । আর এক মেয়েকে দুঃখ দিয়েছে । তার আর বাপের সঙ্গে তাহলে অমিল রইল কোথায় । বৈতল ভেবে পায় না এমন শান্তশ্রী মায়ের সন্তান সে কী করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে । পণাতীর্থের জল বারবার মাথায় ঢালে বৈতল । কিছুতেই শান্ত হয় না মন । লুলাকে মারে , খুব মারে । লুলা সঙ্গে না থাকলে যে বৈতল শয়তান হয়ে যাবে । লুলা বলে,

--- চল যাই আবার মইলবাজার । এক আউলিয়া বাবার মাজার জিয়ারত করি আই । তর মনো শান্তি অইব । বাবার নাম শাহ মুস্তাফা কিন্তু মাইনষে কয় শের সওয়ার চাবুকুমার বাঘর পিঠো চড়িয়া সাপরে চাবুক বানাইয়া খেদাইছন বাঘ আর সাপ দুগুরেউ । তর ও মনর বিজ্জা খেদাইবা আউলিয়া বাবায় ।

বৈতলের কিছুতেই আপত্তি নেই । লুলাকে হিন্দু পরিচয়ে অনেক আখড়ায় মন্দিরে নিয়ে গেছে । লুলা আপত্তি করে নি । বলেছে ,

--- মাইনষর গাত লেখা থাকে না হিন্দু বাঙাল । ইতা মাইনষে বানায় ।

মসজিদে মাজারেও গেছে দুই বন্ধু । লুলা সাবধান করে দিয়েছে , শিখিয়েছে নিয়মকানুন । বলেছে,

--- দেখিছ , নমাজর সময় পাওর পাতার গাইটর উপরে রাখিছ তফন ।

সিঁদ কাঁটার হাতে খড়িও হয়েছে দুলালীর বিধু গুপ্তর বাড়ি । হাকালুকির হাওরের এক
বিলে পাতা জগৎবেড়ে টান দিয়েও দশ টাকার মাছ চুরি করেছে । পেট চালাতে হবে না ,
পেটের তান বড় টান । পেট ভরলেই মন হরি হরি বলে, বলে বিষহরি মা জননী । লুলার
পেটেও গানের বিদ্যা আছে , তবে বেসুরো । যে কবিগানের ঢঙে লুলাকে শোনায় সুরত
জামাল ও আধুয়া সুন্দরীর গীতিকা ।

--- ‘দুই দোস্ত গলাগলি জুড়িল ক্রন্দন

অন্তরে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন ।

দুলালে ডাকিয়া আলাল কহিতে লাগিল

সুখেতে বসিয়া ভাই দেওয়ানগিরি কর

আবার যাইব আমি হইয়া ফকির ।’

পাথারকান্দির কাছে আদমটিলার বাগানে ঢুকে বৈতল লুলাকে বলে,

---‘ এবার যাইব আমি হইয়া ফকির ’। আমি পাই লাইছি বন্ধু ।

--- কিতা পাইচছ ।

--- অউ হুন । আমি পাই লাইছি আমার গুরু ।

পথের ধারে এক পিরের মোকাম । ঘরের ভিতর টিমটিমে এক চেরাগ । আলো আছে
কী নেই বোঝা যায় না । দেবালয়ের আভাস বোঝা যায় । শোনা যায় এক ভক্তের করুণ সুর ,
গানের জাদুতে চরাচর মুগ্ধ । স্বল্পবাস এক ফকিরের দিব্যদেহ থেকে ঠিকরে পড়ছে আলো ।
যতক্ষণ গান ততক্ষণ জ্যোতি । কাকে শোনায় ফকির গান । কেউ তো নেই আশে পাশে । চা
বাগানের উত্তুঙ্গ টিলায় কোথায় আদমের বংশধর । ফকিরের বিলাপে বৈতল বিবশ হয় ,

---‘ ও হোছেন কাইন্দা বলে, মা জননী বলি তোরে

এটুটু পানি দিলা না মোরে...’

সুরের কেরামতি গলায় না থাকলেও লুলা সুর চেনে, গান চেনে । বলে,

---ইতা তো বাঙালর গান বেটা ! মুসলমানি গান । ফকির সাবে জারি গান গাইরা ।

--- গাউকা না গলাখান হন । আহারে । আমার মার গলার মালসি গান হনচছ নি । বুক ফাটি যায় । কথা উথা কিচ্ছু নায় , গলা বেটা গলা । তান গলা আমার মার লাখান । আমি তান খাদিম অইয়া থাকি যাইমু ।

গলা দিয়ে চিঁড়ে ভেজে না । কানা ফকির চেলা করে না । কিন্তু থাকতে দেয় মোকামে । বৈতল শুধু ফকিরের গান শুনতে চায় । ফকির গায়, বৈতলের মন ভরে না । বলে,

--- হউদিন রাইতর মতো গাউকা ।

--- আল্লার মর্জি না অইলে কুনু চউক দিয়া পানি বারয় নিরে বেটা ।

--- আপনার তো গলা দিয়া পানি বার অইছে । হিদিন রাইত মনো অইছে আপনেউ বিশ্ববিধাতা , আপনে কান্দইন আপনে কান্দইন ।

--- কান্দতে কেনে বেটা । অখন তো হাসতে খেলতে ।

--- আমার একটু কান্দন লাগব ।

--- কেনে , কুনু গুনা করচছ নি ।

--- করছি ।

--- জানি! ছুকরির গাত হাত উঠাইচছ । নানি ।

--- তুমি জানলায় কেমনে । অউ হালার হালায় কইছে ।

--- ফকিরর ইতা জানন লাগে ।

--- বেঙ জান তুমি । ফকির উকির কিচ্ছু নায় তুমি । তুমার গান বালা । আমিও গান গাই । মনসা আইর গান বালা লাগে । পাটনির পুত তো । ই লুলা ইগু বেইমান । তুমারে কই দিছে । তেও তুমারে কইলাম আর পুড়িত্তর গাত আত তুলতাম না । কান ছিরতাম নায় ।

--- তুইন বুলে সাপ ধরছ , সাপের উবা নি ।

--- আমি নায়, হে । হে বেজর পুয়া । সাপ ধরিয়া আমার থলিয়াত রাখছে । কেনে কইলায়
আকৃতা ।

--- আমিও ধরতাম । দাত ভাঙ্গিয়া রাখি দিতাম , মা'নে ডরাইত ।

মা মনসার পুথিও গাইতাম । অখন ফকির অইয়া ছাড়ি দিছি ।

--- আমারে শিখাই দেও না পুথির গান ।

--- তোবা । আর পারতাম নায় । আল্লা ছাড়া আর কেউ নাই ই দীন দুনিয়াত অখন । এক
কতা কইতাম পারি তোরে, তুইন সুজা জা গিয়া কুশিয়ারার হিপারো । ইটা পরগণা । গয়গড়
গাউ । হনো পাইলিবে ।

উপন্যাস

সাত

মাছ ধরার মতো সাপ ধরাও শিখে নেয় বৈতল ।

লুলা মন্ত্র মুক্তো অনেক কসরৎ জানে । সাপের গন্ধ শূঁকতে জানে । বন্ধুর ঝুলিতে সাপ ভরে দিয়ে বলে,

--- বেটা ডরাইছ না । আলদ ছাড়া বাকি সব অউ ধুড়ার লাখান । বিষ নাই কুলার লাখান চক্কর । তে আলদ ধরারও কেরামতি আছে । আলদর বিষর বউৎ দাম । মানুষেরে আড়ুয়া না বানাইলে তোর কিওর কেরামতি । চল গাউত ঢুকিয়াউ আমি মন্ত্র পরমু আর কইমু সাপ আছে মন্দিরো ।

বৈতলকে বলে,

--- যা অউ টিল্লার উপরে মন্দিরর পিছে গাতাগুতা পাইলে ঢুকাই রাখি দিছ ইগুরে । লড়ত নায়, কামড়াইত নায় ।

চৌচালা শিবমন্দিরের পিছনে মনসার বাহনকে রেখে আসে বৈতল । বৈতল ফিরতেই লুলা সাপ সাপ চিৎকারে গ্রামের মানুষকে সচকিত করে । গ্রামের মানুষও দুই কিশোরের পাশে হাসিমুখে জড়ো হয় । আসন্ন ভয়ের জন্য কোনও হেলদোল নেই । কেউ একজন বলে,

--- কামড়াইত নায় তো ।

--- আমরা মন্ত্র জানি । খেদাই দিমু । দেখতা নি । উঝা তুমি বাজাও ডঙ্কা , মা মনসারে ডাকি খেদাও ইগুরে ।

অনেক মানুষের সামনে গান গাওয়ার সুযোগ হওয়ায় বৈতলও খুব খুশি । সে লুলার শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্র গায় গানের সুরে ,

‘অং অগ্নি বং হংসবাহনে মা মনসা

কই দেও তোমার কালাচান্দরে যেখানো থাকউক

বার অইয়া আউক ।

বাচিবার যদি আছে সাধ বেটা

প্রাণ লইয়া ভাগ এই বেলা

রাজা ভোজের কিরা তোরে মনসা আইর দোহাই

মা মনসার দোহাই

বেটা তুই যদি থাকস গাউত

ভানুবিবির দোহাই তুই থাকতে পারতে নায় ।’

মন্দিরের পিছনভাগে ইতিউতি খুঁজে কোথাও রেখে -আসা সাপ পায় না বৈতল । দুই বন্ধু চোখাচোখি করে । কী হল , ভানুবিবির ভেঙ্কি কি তবে টিকল না ।

ততক্ষণে গাঁয়ের মানুষ আবার হাসতে হাসতে ঘিরে ধরে দুই কিশোর বহুরূপীকে । দুই বন্ধুতে কানাকানি হয় ,

--- কিতা অইছে ক চাইন । আমি তো অউ গাতো রাখি গেলাম । তে ।

--- আমরা তো অখনও কেরামতি আরম্ভ করলাম না , এর আগেউ ভাঙা ফাটি গেল কেমনে ।

--- অইছে বাদ দে অখন বার কর জড়ি বুটি । বেচি দেই কয়েকটা ।

ছোট ছোট বনাজি গাছের জড় কেটে রঙ লাগিয়ে সাপের ঘুটি বানিয়েছে লুলা । লাল জড়ের গুণ একরকম সবুজে ভিন্ন । সাপের বিষ নামে , বাড়ির ধারে কাছে সাপ আসে না । গায়ের মানুষ লুলার ভাষণ শুনে হাসিমুখে । একজন বলে,

--- দেও চাইন দেখি আমার এক ভাঙানি ,---

‘ অউ দেখি অউ নাই

কই গেলা কালা রাই ’

লুলা বৈতল বিপদের গন্ধ শুঁকতে পারে । লুলা তাও সাহস সঞ্চার করে মন্দিরের
পিছনে সাপের গর্তে হাত ঢোকাতে যায় । কিন্তু ডিটান দেওয়া শিবুদা নিষেধ করেন ;

--- গাতো হাত দিও না রেবা ।

--- কেনে কিতা অইব । আমরা সাপুড়া , আমার কিছু অইত নায় ।

--- অচিনা হাত দেখলে তারা ছাড়তা নায় । ই গাউর মাইনষে সাপ ডরাইন না , তারাও
গাউআলারে ডরাইন না ।

--- ই গাতো আছইন একজন ।

--- তোমরা রাখছ আরি । কেনে ইতা কর । ভালা কাম করতায় পার নানি ।

লুলা রাগলে সাজিয়ে কথা বলতে পারে । বৈতলের রাগ চণ্ডাল । ফোঁস করে ওঠে !
বলে,

--- আমরা ইতা রাখাখির কাম করি না । আমরা সৎ পথো থাকি , সাপ ধরি । ভাটির দেশ
তারা ঘরো থাকইন পানিত থাকইন পথেঘাটে থাকইন । আর ভালা কামর কথা কইরা ,
আপনে দিবা নি ভালা কাম ।

--- কেমনে কইমু । কাম দেওয়ার মালিক নি আমি ।

--- উঝা বেজ পাটনি ইতা ছনলেউ তো ধুরধুর করি খেদাই দিবা ।

--- আইচ্ছা খেদাইতাম নায় , কও কিতা পারবায় তুমরা ।

--- যেতা কইবা করমু ।

--- থাকবায় কই !

--- আপনার বাড়িত ।

--- আমার কুণু বাড়ি উড়ি নাই । আইজ ইখানো কাইল হিকানো । থাকি অউ শিবমন্দিরো ।
শিবর পুয়া আমি ।

--- জানি ।

জানি বলায় লুলা বৈতলের দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকায় । তাকায় কথা বলা
লোকটির দিকে । লোকটিও বিস্মিত । বলে,

--- জানো কেমনে । কিতা জানো ।

--- জানি , কইন না আইজ থাকমু নি আমরা ।

--- গাউ আলা হকলরে জিগাই লাই । তুমার লগে অহিন্দুও আছে একজন । তুমি বাঙাল নানি
।

--- অয় হে মুসলমান । আপনে না কইলে কেউ বুঝত নায় ।

--- বড় সিয়ানা রেবা তুমি ।

ওদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয় শিবমন্দিরেই । লুলাকে মুসলমান জেনেই সম্মতি দেয়
সবাই । আসলে মন্দিরটা শিবের দখলে যতটা মা মনসার দখলে অধিক । মন্দিরের বাইরে
একটা ভাঙা ছাপটা ঘর আছে , কোনমতে মাচানের উপর থাকা যায় । দুই বন্ধুর কেউই রাতে
ঘুমোয় না , জেগে থাকে । আসলে দিনের ঘটনায় দুজনেই হতমান । বৈতল লুলাকে ধাক্কা
মারে জোরে । বলে,

--- অত কষ্ট করি বেটা থাকছি না কুণুখানো ।

--- কেনে তুইন রাজার পুয়া নি । আমার বাড়িত দেখচছ নানি নানার বকরি ইগুইনে
সারারাইত ম্যাঁ ম্যাঁ করইন ।

--- হি তো বাড়ি ।

--- কেনে মন্দিরো থাকছি না নি আগে ।

--- থাকচছ , লুলা দাস অইয়া থাকচছ । ইখানো তুই আমিন , তরে করি থাকত দিছে ।

--- তুই কেমনে বুঝলে ।

--- হাচা কথা কইতাম নি ।

--- ক ।

--- আরো ছুট আসলাম । তখন কিণ্ড হিন্দু আর কিণ্ড বাঙাল বুঝতাম না । ধুমধুমাইয়া বাঙাল বাড়িত ঢুকি গেছি । মুরগির ছালইন খাইছি । গরু উরু কেউ খাওয়াইছে না । আর খাওয়াইলেউ কিতা । ইদগাত তো খেলতাম অউ । মজিদও গেছি । পাটনি বাড়ি মাইমল বাড়ি আলাদা আছিল না । অখন মন বদলি গেছে , আল্লা আলাদা অই গেছইন । তান নাম হুনলেউ গুসা উঠে । কেনে বে ।

--- আকতা তুইন ইতা মাতত্রে কেনে ।

--- না, অন্যথানো তো মান ভাড়াইয়া রইছি । কিচ্ছু অইছে না । ইথানো তারা জানিয়া হুনিয়া ফাত্রামি করলা । কইলা মন্দিরো থাকতে দিবা । ইতা মন্দির নি, জঙ্গলর মাঝে কইন থাকো । আমরা আরি তিনকড়া বালিগড়া । অলা বেরাত নি ফালাই দিলা শীবুদায় ।

--- অত শিবুদা শিবুদা কররে কেনে । তুইন তানে আগে থাকি চিনছ , নানি ।

--- না বে ।

--- নাবে কইছ না ।

লুলার মনে সন্দেহ । বন্ধুত্বের শর্ত মেনেও কোথাও একটা কাঁটা খচখচ করে । আবার বৈতল ছাড়াও তার চলবেও না । কানা ফকিরের মোকাম থেকেই বৈতলের মনে কিছু একটা হয়েছে । কিছু তল ভাজছে । ফকিরের সামনে লুলাকে বেইমান বলে । বেইমানি তো করেনি লুলা , তার দোস্তু সিলেটের মেয়ের কান ছেড়ার দুঃখে গুমরে গুমরে মরছিল । লুলা ভেবেছে যদি ফকিরকে বলে কিছু হয় , শান্তি পায় । হিতে বিপরীত হয় । এখানে এসে শিবুদা শিবুদা করছে । আবার বলছে আল্লার নামে গুসা আছে । এত বড় নাপাক কথা । তবে একেবারে মিছে কথাও তো বলেনি তার বন্ধু । লুলার মনেও একটা রাগ হচ্ছে । ছোটবেলা মন্দির দেখলেই নমস্কার করত । প্রসাদ খেতে কী আনন্দ , খিচুড়ি আর লাবড়া । তার পর থেকে কী

যে হয়ে গেল । হালাল ছাড়া মাংস মুখে রুচে না । আদা রসুনের গন্ধ না থাকলে ছালনকে রান্নাই মনে হয় না । তবে বৈতলের সঙ্গে থাকলে পালটিও খায় লুলা । বৈতলের সঙ্গে থাকলে যে ভুলে যায় তার ধর্মপরিচয় । বৈতলকে বলে মনের কথা ।

--- সারা জাহানো যেতাই হউক আমার সিলেটো ইতা হিন্দু বাঙাল না থাকলে কী মজা আছিল নানি ক ।

বৈতলের উচাটন কোন ভাল কথাও সুন্দর ভাবে নিতে পারে না । লুলাকে আবার মারে । বলে,

--- না কুন্সু মজা নাই । তুই মুসলমান আমি হিন্দু । তুই চাছ না আমি পুথি পড়া শিখি । পুথি পড়লে আমি হিন্দু অই যাইমু নানি ।

--- কেমনে কইলে তুইন ই কথা ।

--- আমি জানি তোরে ।

--- আমিও জানি , তুইন আমারে লুকাইরে । শিবুদারে চিনছ আগে থাকি । শিবর পুয়া কওয়ায় কইচছ জানি । কইচছ নানি ।

--- কইছি । জানি । তানে সিলেটর হক্কেলেউ চিনে । শিবর পুয়া কওয়ায় বুঝি লাইছি তাইন শিবনন্দন দত্ত । নন্দন মানে অইল পুয়া রে, পুয়া । আমি তো জানিয়া শুনিয়া গয়ঘর আইছি । কানা ফকিরে কইলা নানি ষষ্টিবর দত্তর নাম । মা মনসায় তানে বর দিছলা ই গাউত কেউরে সাপে কামড়াইত নায় । যে পুথি পড়া হয় শ্রাবণ মাসো , লেখচইন তাইন , পদ্মপুরাণ । লেখাপড়া শিখছি না তেও ছনি ছনি শিখছি , গাই লাচাড়ি গান মাতা পদ্মাবতীর,

‘মনসার চরণধূলি

শিরেতে সানন্দে তুলি

কান্দে লখাই লোহার বাস’

শিবুদায়ও গাইন । তাইন অখন সিলেটর নামকরা গাইন , নাচইন ও বালা ।

--- কিওর নাচ । ই বেটা তো মাকুন্দা , ধজভঙ্গ । না বেটা না বেটি ।

--- অউকা না । তান মতো গুরমি নাচ নাচতে পারবে নি ।

--- অ হালার হালা , আমারে খালি কিল খাওয়ার গুসাই পাইচছ নি । আমারে খালি লুকাছ আর গাইল্লাছ । ছিলেটর এক পুড়িরে কিতা করচছ আর ইতার সব গুসা আমার উপরে ঝাড়রে । কইরে আমি তরে পুথি পড়া শিখতাম দিয়ার না , আমি বাঙাল এর লাগি । পুথির আবার ইতা কিতা । সবুউ ইবেটিরে মানে । খিত্তাততো সিন্ধিও দেয় ।

--- ঠিক নি ।

--- তুইন বেটা কিচ্ছু জানছ না । আগে মাত্রা পথো হাগরা , খালি বড়ম বড়ম মাত ।
বিয়ানিবাজার থাকি , পাথারকান্দি থাকি আইন বড় বড় গাইন , কী সুন্দর নাচইন গুরমিএ ।
তর ই মাকুন্দা থাকি বউত সুন্দর । আমি একজনর লগে গেছি লাকড়ি লইয়া একবার । কী সুন্দর গান গাইন রে । খালি কুনু পুথির গান নি , কততা গাইছইন । একটু পাগলামি ছাইট আছে ।

--- তারা একটু পাগল পাগল অইন । হাচন রাজায় দুপইর বেলা লেমটন জ্বলাইয়া হাটতা রাস্তাত । তে লাকড়ি কেনে বে ।

--- ও , তাইন তো করাতি নানি । পালং উলং বানাইন ।

--- কই বাড়ি , বিয়ানিবাজার নি । চৈতন্য চরণপাল নি ।

--- অইব অলাখান অউ নাম ।

--- চল তে ইখান থাকি ভাগি । তুই চিনছ নি বাড়ি ।

--- চিনি । চল তরে তোর জাগাত পৌঁছাই আমি খিত্তাত যাইমু গিয়া ।

--- কেনে বে আমার মাইরে দেখতে নানি একবার ।

যেমন কথা তেমন কাজ । রাতের বর্ণ দুই বন্ধুর রাতের গায়ে মিশে যায় মধ্যযামে ।
অন্ধকার বিজয় করে সকালে পৌঁছে যায় দিঘীর পার , পঞ্চখণ্ড ।

আট

লুলা এক ছুতোর মিস্ত্রির বাড়ি দেখিয়ে বলে,

--- তোর গুরুর বাড়ি । যা ।

যা বলেই ধা । কী জানি কোন আভিমানে কৃষ্ণ সুদামার বিচ্ছেদ হয়ে যায় । দুজনেই ভেতরে ভেতরে ভেঙে খানখান । বন্ধুত্বের অভ্যাস ছাড়তে বড় কষ্ট । কিন্তু মচকাবে না কেউ । তাই দুপথে দুজন । লুলা এবার কোথায় যাবে জানে বৈতল । কিছুদিন হয়তো দেশের বাড়িতেই যাবে । মা ছাড়া নানার বাড়িতে থাকবে, ছগলসহ মাচানের উপর শুয়ে নানার কাছে মায়ের কথা শুনবে । একদিন চোনার গন্ধে বিরক্ত হয়ে বাড়ি ছাড়বে , যাবে বইয়াখাউরি বৈতলের খোঁজে । দেখা না হলেও তার অন্য আকর্ষণ যে আছে বৈতল- বাড়িতে ওখানে মা আছে । মা -এর আদরে থাকবে কিছুদিন বৈতল - বাপের গালমন্দ খেয়ে । লুলার পথ যে শেষ হয় নি । বেরিয়ে পড়বে আবার মাধবগঞ্জও থেকে জাউয়া, জাউয়া থেকে সুনামগঞ্জ , লক্ষ্মণশ্রী । অনেকদিনের সাধ লুলার । যাত্রাপথও দুই বন্ধু মিলে ঠিক করেছে । এই জীবনে কী আবার মিলবে দুই বন্ধুতে বৈতল জানে না । মাছুয়া বৈতল এখন নিজেকে তৈরি করতে চায় । তার মার ইচ্ছা পূরণ করতে চায় , পুঁথি পড়া শিখতে চায় । লুলাকে বৈতল বলেছিল বিয়ানিবাজারের চৈতন্য চরণ পাল-এর কথা । বাংলায় নাকি জেলায় জেলায় মনসাপুথির রচয়িতা আছেন । চৈতন্য চরণ তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি মহাভারতের ব্যাসদেবের মতো । তিনি জুড়েছেন , ব্যাস দিয়েছেন , সবঘটের জল দিয়ে পূর্ণ করেছেন পদ্মপুরাণ । এই বাড়ি কই তাঁরই তবে । তিনিই চৈতন্য চরণ পাল । বইয়াখাউরির বৈতল উত্তেজনায় সরাসরি কাঠমিস্ত্রিকে প্রশ্ন করে,

--- আপনে চৈতন্য চরণ পাল নি ।

মিস্ত্রি জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলেন ,

--- তাইন তো সিষ্টিধর রে বাবা, আমি অইলাম সিষ্টিছাড়া । কেনে রে বা কী কাম । আমি করাতির কাম করি আর আইর সেবা করি । নাচি , গান গাই । তুমি কিতা চাও কও ।

মানুষটির কোনো গুণ জানে না বৈতল । কিন্তু এমন মমতাময় পুরুষ এই প্রথম দেখে । দেখে আর তাঁর ধূলি ধূসরিত পায়ের দিকে তাকায় । বৈতল মনে মনে ঠিক করে এই পায়ের ঠাই নিতে হবে । পিতা, মানে বাপ দেখেছে বৈতল বইয়াখাউরিতে , বড় হাওরে । হেই বৈতল পানিত লাম, খলই ধর বলতে শুনেছে বাপকে । খাটিয়ে মারা শুধু , চাকরের জীবন । বৈতল চোখ বুজে ঠিক করে নেয় তার গন্তব্য । হাঁটু মুড়ে বসে । মনের ভিতর তখন বড় হাওরের উথালপাথাল জলের ঢেউ । কান্না , বৈতলের কান্না কেউ দেখতে পায় না । শুনকো চোখে একবার হাত বুলিয়ে সেই হাত দিয়ে নাম পরিচয় অজানা পুরুষের পায়ের প্রণাম করে । বলে,

--- আপনে আমার গুরু ঠাকুর অইবা নি । আমি নাচ শিখতাম , গান শিখতাম । বিষরির গান, জিয়ানি ঢলানি !

গুরু বলেন,

--- ঢলানি জিয়ানি । আমি কুনু গুরু নি বা । আমি শখর উবা ।

--- আপনে যেতা কইবা করমু করাতর কামও করমু ।

--- বুঝছি বাবা । থাকবায় কই , খাইবায় কিতা । আমার নিজর অউ বুঝ নাই । কাঠ মেইস্তরর আর কত পয়সা ।

বৈতল বলে,

--- আমার আছে পয়সা ।

পুন্দো নাই চাম, রাধাকৃষ্ণ নাম । বলে তো দেয় বড় মুখ করে । দেওয়ার মতো কানা পয়সাও নেই সঙ্গে । বৈতল হেরে যাওয়ার পাত্র নয় । বাপ তাকে হাওরের মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছে , হাঁকপাক করে নি , জল খেয়ে দম বন্ধও হয় নি । মনের জোরে সব করেছে । খলুই এর ভিতর আলদের বাচ্চা রেখে দিয়েছে বাপ, বৈতল বের করে ফেলে দিয়েছে । লড়াই গুরু হওয়ার আগেও হারে না বৈতল , পরেও না । বাপের দেওয়া তেলাল শরীর তো আছে ।

আরো তেল মেখে নেয় নিশুতি রাতে । বেরিয়ে যায় অন্ধকারে । সিঁদকাঠির দরকার হয় না
বৈতল পাটনির । বৈতল গুরুদক্ষিণা যোগাড় করে আনে । গুরু পদে দিয়ে বলে,

--- বাপ দিয়েছে ।

ওঝাগুরু শিখিয়ে দেন গুরুমন্ত্র । বলেন,

--- কও বাবা আমার লগেলগে,

‘ আগে বন্দি মাতা পিতা আর শিক্ষাগুরু

এ জগতে যারা হন বাঞ্ছা কল্পতরু ।’

সৃষ্টিধর সূত্রধরের বাড়িতেই তার দোকান ও কারখানা । রইদপুয়ানি গ্রামে ঢোকার
মুখেই বৃন্দাবন কামারের দোকানবাড়ি । মাঝখানে পুকুর । ওপারে গুরু সৃষ্টিধরের ভদ্রাসন ,
দোকান ও শাকসজির বিচরা । দোকানেই থাকে বৈতল । গুরুর বিশ্বাসের অমর্যাদা করে নি ।
গুরুবাক্যের অমান্য করে নি । বিয়ানিবাজারে , কসবাবাজারে টুল জলচৌকি মিটসেফ আলনা
বিক্রি করে হাটবারে । গুরু সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন শিষ্যকে । বলেন,

--- কাম না থাকলে টুকিটাকি কাম করিও । বেলাইন চাকি বানাইও , খাদা বানাইও ।

কতরকম হাতের কাম করা যায় । কাঠের পুতুল বানাইতায় পারো । দেপতার কুসুসি বানাও না
কেনে ।

--- আমি তো কাম না থাকলে গান গাই ।

--- গানও গাওন লাগব । মাছও মারণ লাগব । মৎস মারিব খাইব সুখে ।

রসিকতার কথা বলে মিষ্টি করে হাসেন । গুরুর হাসিতেও নির্দেশ পায় বৈতল । পুকুর
থেকে মাছ ধরে দেয় । কাঠের কাজ করতে করতে বৈতলের গালে নরম নরম দাড়ি গজায় ।
কেন জানি দাড়ি ঘন হয় না ।

সৃষ্টিধর ওঝার পাঁচ মেয়ে , কোনও ছেলে নেই । সব কটিই বিবাহযোগ্য , বিয়ে হয় না
। ওঝারও কোন চেষ্টা নেই বিয়ে দেওয়ার । ছোটটির নাম চায়না । বড় চারজনের ফুলের

নামে নাম । জবা, মালতী , করবী আর পদ্মা । নামের বাহারে অবাক হয়ে বৈতল চায়নাকে বলে ,

--- তুমার ই কিতা বিদকুটি নাম ।

--- আমরার সব ফুলের নামে নাম ।

--- চায়না আবার কী ফুল ।

--- চামেলি চিন না নি ।

--- চিনি , তুমি চামেলি অইলেও কেউ তুমারে চায়না ।

--- অইব ।

মনোদুঃখী হয় চায়না । বৈতল বিব্রত হয় । বলে,

--- অউ দেখ , তুমি অখন কান্দি দিবায় নি , কান্দলে কইলাম তুমারে খুব সুন্দর লাগব ।

একা একা একরাতে বৈতল দোকানঘরে সুন্দর দেখে । সুখের স্বপ্নে বিভোর হয় । স্বপ্নের ভিতর চামেলির সুগন্ধ ।

কাঠের কারখানায় শুয়ে শুয়ে গুরুকন্যাকে খাবলে খুবলে আদর করে বৈতল । গুরু দৃষ্টির ভৎসনা দুঃখও মেশে সুখস্বপ্নে । গুরুর মায়াময় চোখের তারা কথা বলে । বলে, তুমিও বাবা । বৈতল গুরুকে কখনও রাগতে দেখে নি, তাই স্বপ্ন দেখার সুখে তেমন ব্যাঘাতও হয় নি ।

স্বপ্নদোষ হয় বৈতলের । তরল বীর্যপতনের সুখ ও বিষাদ । এর পর অনেকবার ঘটেছে । করাতি গুরুর কনিষ্ঠা কন্যাকে কামনা করে প্রায়ই অঘটন ঘটিয়েছে কাঠ- কারখানার করাত – গুঁড়োয় ।

নয়

লোভের আঠায় জড়িয়ে পড়ে বৈতল । বইয়াখাউরির কথা ভুলে যায় । লুলার কথাও মনে পড়ে না । মাকে দেখার ইচ্ছে হলেও দমন করে । মা-ই তো তাকে বলেছে মানুষ হতে । মানুষের মতো মানুষ না হলে সংসারে সুখী হতে পারবে না । বৈতলের মা ভুলেও বাপের অত্যাচারের কথা বলে না । একা একা সব সহ্য করে তার দুখিনি জননী ।

বইয়াখাউরিতে ফিরে এসে বৈতল মাকে পায়নি ।

স্বার্থপর এক মানুষকে দেখে বাড়ি ছেড়ে হাওরের পারে বাঁশের টঙ বানিয়ে বসে থাকতে । জল দেখে , মাছ দেখে, সুতার লাছি দিয়ে জাল বোনে । বৈতল একা মানুষকে প্রশ্ন করে ,

--- আর রাইত অইলে কিতা করো ।

--- পানিত নামি । মাছ ধরি, বেচি, গুটকি দেই ।

--- পয়সা কিতা করো ।

--- তোরে জবাব দিতাম নি ।

--- দিও না । কও মারে মারলায় কেনে ।

--- জানি তুই জিগাইবে । আমি মারছি না । মারছে তোর হউ বেটিয়ে ।

--- কে । কার কথা কইরায় ।

--- যে বেটির লাগি সবরে ছাড়িয়া গেলে গি । তুই যাওয়ার পরে খালি কান্দত তোর লাগি ।
তোর মামায় আইয়া লই গেল মিরতিঙ্গা । হনো সাপে কামড়াইল , লুলা আছিল ইনো , হেও
গেল । ঝাড়াঝাড়ির কতা কইছিল হে খালি কান্দল ।

--- তেও আমারে খবর দিলায় না । তুমি নি গেছলায় ।

--- আইজ তর লাগি মাছ ধরমু ।

--- বাদ দেও ইতা মাত । আমি থাকতাম নায় তুমার টঙ্গো ।

--- তুই আর যাইছ না । থাকি যা ।

--- আইমু । তোমার লগে হিসাব আছে ।

কিসের হিসাব কিছুই জানে না বৈতল । শুধু এটুকু জানে তার মা নেই । বৈতল জানে
তার মা জীবনে সুখের মুখ দেখে নি এই মানুষটার জন্য । মাকে দণ্ডে দণ্ডে মেরেছে তার বাপ
। সাপের কামড়ে মুক্তি পেয়েছে , বাপ এমনিতেই তার শরীর মন বিষে নীল করে রেখেছে
কবেই । তবু বৈতল বাপের বিরুদ্ধে কথা বলে নি । কিশোর বৈতলের বয়স হয়নি তখনও
হিসেব চাওয়ার । বাপকে ভয়ও করত বৈতল । এতদিন পর আগল ভেঙেছে, একটা অপরিচয়
তৈরি হয়েছে বলে মুখের উপর বলতে পারে । হয়তো বৈতল নিজের সঙ্গেই হিসেব হিসেব
খেলা খেলছে । কার দোষ , মার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী । বাপ , নাকি সে নিজে । কালনাগ তো
উপলক্ষ । মা তো অনেক আগেই চলে গেছে তার জীবন থেকে । মা বলেছে তাই মানুষ
হওয়ার জন্য যখন ছেড়ে যায় মাকে । এভাবে কেউ মাকে ছেড়ে যায়, নিজের বাড়ি ছেড়ে যায়
। পাটনি বাড়ির দারিদ্র্যের সঙ্গী অশান্তি এড়াতে গিয়ে নিজেই পালিয়ে যায় বৈতল । বৈতল
থাকলে মার মিরতিঙ্গা যাওয়া হত না একা একা । মা বৈতলকে সঙ্গে নিয়েই যেত । বৈতল
ভগবান মানে না , মাকে মানে বলে বড়াই করে । গ্রাম ছাড়া থাকতে পারে না । শহরবাসীর
স্বাচ্ছন্দ্য পছন্দ করে না । পাগলা বা ছাতক গেলে পাগল হয়ে যায় বাড়ি ফেরার জন্য , মায়ে
হাতের গুঁটকি পোড়া ভাত-এর জন্য । সুখী মানুষের বাচ্চাদের দেখে হিংসা হয় বৈতলের ।
বৈতল তার মার জন্য গর্ববোধ করে, জানে সবার মার থেকে ভাল মা তার । তাই পাগলার
দামবাড়ির বৌদের গায়ে সোনাদানা দেখলে হাত নিশপিশ করে । পেশকারের মেয়ে তাকে
চাকর বলায় অপমানিত হয় । বৈতল মার কাছেই বারবার ফিরে আসতে চেয়েছে । বৈতল মাছ

ধরাটা জানে, মাকে নিয়ে সুখে থাকতে পারে । চুরি করাটাও জানে , মা জানে না । কিন্তু বেশ তো থাকতে পারে মনের ব্যথা আনন্দ একজনের কাছে সপে দিয়ে । হ্যাঁ , যখন অসহায় হয়েছে ভগবানের কাছে মাথা কুটেছে । নিজের জন্য নয় , মাকে সুখী করতে সুস্থ রাখতে অলৌকিকের আশ্রয় চেয়েছে । নিজের জন্য বৈতল কারো কাছে হাত পাতেনি । ভগবানের কাছেও না । লুলা মানে । বলে,

--- আমি তোর মতো নয় । আল্লা আছইন , সব দেখরা ।

বৈতল ছোটবেলা থেকেই মনসাপূজোর ধূমধামে সামিল হয় । বোঝা বেঁধে কাঠালপাতা খেতে দেয় বলির পাঁঠাকে । পাঁঠার মাংসে তার লোভ আছে । মা রাঁধে লংএলাচ দারচিনি দিয়ে । বাপ কখনও পূজাপার্বণের ধার ঘেঁষে না । কিন্তু মনসা পূজায় মেতে ওঠে । বলে,

--- ই বেটিও জমিদারনি । কিন্তু মাতন যায়, কথা কওয়া যায় । আদায় করা যায় । চন্দ্রধরে যেলাখান পারছে ।

সাধারণ পূজোর গল্প নয়, শুধু চালকলার নৈবেদ্য নয় , আছে সংকল্প , মনসামঙ্গলের কথায় আছে প্রতিবাদের গল্প । প্রতিরোধ আর সংঘাত । ধর্মকে নিপুণভাবে তছনছ করার কথা । ছোটবেলা থেকেই বাপের কথায় প্রভাবিত বৈতল । মায়ের উপর বাপের অত্যাচারকে বাপের পৌরুষ বলে মেনেছে । ওদিকে মনসা পুঁথিতেও চন্দ্রধরকে পছন্দ করেছে । চেঙমুড়ি কানি বলে প্রতিষ্ঠানকে গালাগালি করার সাহস কার হয় । প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে, স্নেহ মমতার কাছে হেরে গিয়েও বাঁ হাতে ফুল দেওয়ার শর্তে জয় না পরাজয় বোঝা যায় না । হেরো নেতা নয় চান্দ সদাগর । বৈতলও কোনও সমঝতায় যায় না । বৈতল প্রতিশোধ নিতে জানে । বৈতল ভুল করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করার পথ এখনও খুঁজে পায় নি ।

মায়ের মৃত্যুও বৈতলকে অপরাধী করে । বৈতলের মমতাময়ী মা কোন অপরাধ করেনি, তবে কেন আইর অভিশাপ । মা মনসার কোপ কেন সবসময় নিরীহ মানুষের উপর হয় । কালনাগের নিশানা কালো মানুষটাই হতে পারত । প্রতাপের কাছে দেবতারাও হেরে যায় আর মনসা আই তো আধা দেবতা । গ্রামের দেবতা , লোকমানসের দ্রাতা । দ্রাতা কোথায় , বৈতল তার মায়ের প্রতি অবিচার মেনে নেবে না । আর পড়বে না পুঁথি । গুরু সৃষ্টিধরের কাছ থেকে

শেখা পুঁথিবিদ্যা কোনও কাজেই লাগবে না তার । সাপ দেখলেই এবার ধরে ধরে মারবে । মাকে যে মেরেছে তার বংশ নাশ করবে বৈতল । বৈতল এবার ঘুরিয়ে দেবে তার জীবনের রাশ । মা চেয়েছে বৈতল মানুষ হবে বিষহরির শরণ নিয়ে । নাম হবে , প্রতিপত্তি হবে! মা যে থাকবে না তার সে কথা মা একবারও বলেনি ।

মা মরে গেছে, মা আর নেই তার জীবনে, মায়ের গায়ের গন্ধ নেই , নেই গুঁটকি – পোড়া পান্তাভাতের স্নেহ । তাই মৃত্যু পরবর্তী আচরণে কোনও উৎসাহ নেই বৈতলের । শ্রাদ্ধশান্তি নিয়েও কিছু ভাবে না । মানুষ মরে গেলে কিছুই থাকে না স্মৃতি থাকে প্রিয়জনের মনে । তিলে তিলে গড়ে তোলা সন্তানের দেহ থাকে , থাকে তার মন । সেই একাকী মন নিয়ে বৈতল আপাতত বইয়াখাউরি ছাড়ে । শুধু বাপের সঙ্গে নিবৃত্তিহীন এক যুদ্ধের ঘোষণা করে যায় । কবে ফিরবে জানে না , কোথায় গিয়ে প্রস্তুতি নেবে তাও জানে না । রইদপুয়ানি যাবে না আর , বিয়ানিবাজারে আর কেউ নেই তার । বন্ধু লুলার খোঁজে ঘোরে এদিক ওদিক । লুলাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে । বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছে । মাকে শেষ দেখা দেখেছে সে । অকারণ কেন যে এতগুলো বছর নষ্ট হয় দুই বন্ধুর ।

‘বুলবুলি গো মাই

পান খাইয়া মুখ লাল করলায় চুন পাইলায় কই’

বৈতল নিজের মতো করে অশৌচ পালন করে একা একা ! অভুক্ত থেকে ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক । শ্রীমঙ্গল থেকে রেল গাড়িতে চড়ে বসে । কোথায় যাবে জানে না । তবু জানি কিসের আকর্ষণে দক্ষিণমুখী হয় তার যাত্রা । নেশার ঘোর থেকে মুক্তি পেতে বিয়ানিবাজার ফেরে আবার । আবার রইদপুয়ানি গ্রাম । বৃন্দাবন কামারের বাড়ির সামনে এসেই ঝাঁপ দেয় জলে । পুকুরপারে কামারের হাপরের সামনে এসে হাত মেলে আগুন চায় বৈতল । বৃন্দাবন চন্দ্র কিছু না বুঝে আগুন এগিয়ে দেয় বৈতলের হাতে । লোহা ছুঁয়ে শুদ্ধ হতে হয় , কামার সদ্যপ্রস্তুত লোহার অস্ত্র দেয় হাতে । মাতৃদায়ের প্রাথমিক শুদ্ধতার পাঠ শেষ করে বৈতল যায় গুরুগৃহে ।

বৈতলের খুব খিদে পায় এবার । কী করবে , কার কাছে জানতে চাইবে এই অবস্থায় তার করণীয় কী । বাড়িতে ছোট মেয়ে চামেলি ছাড়া কেউ নেই । তাহলে কি চায়নাকে বলবে,

ভাত দাও । কিন্তু তার যে অশৌচ । অশৌচ কতদিন থাকে । বৈতল তো জানেও না কবে
মৃত্যু হয়েছে তার জননীর । বৈতলের উদাসী হতভম্ব মুখ দেখেই হয়তো চায়না বুঝতে পারে
ক্ষিদের কথা । গুরুর কনিষ্ঠা কন্যা তাকে খেতে দেয় । বলে,

--- মা গেছইন শেওলার হিপারো , সরিষাত আমার মৌসা মরছইন । তান শ্রাদ্ধ । আমারে
কইছইন তুমি আইলে খানি দিতাম ।

--- আমি আইমু কেমনে জানো ।

--- আমি জানি । মায়েও জানইন ।

--- আইলাম নানে ! আর করাতির কাম করতাম নায় ঠিক করছি ।

--- কিতা করতায় তে ।

--- গেলাম গি নে হাকালুকি ।

--- তুমি যে কইলায় তুমার বাড়ি বইয়াখাউরি । ভাটির দেশো ।

--- তে কিতা সব অউত্ত সিলেটো । হাকালুকি কুন্সু দূর নি , হাওরর রাজা অইল হাকালুকি ,
আর আমি অইলাম পানির পুক, অউত্ত রইদপুয়ানি থাকি এক দৌড়ে গিয়া পড়তাম পারি
পানিত । ছনছ নানি কথা, হাওরর মাঝে হাকালুকি , আর সব কুয়া ।

--- অয় ছনছি , মানুষর মাঝে মনসুর মামুদ ,বাকি সব পুয়া । তে আইলায় কেনে ।

--- তুমার লাগি নায় ।

--- জানি ।

--- না জানো না । খামোকা মাত মাতিও না ! ছন, শ্রীমঙ্গল থাকি রেলগাড়িত উঠলাম । আর
ঝমঝমি শব্দে আমার মন বদলি গেল ।

--- আমার মন ইলাখান কেনে !

--- কিলখান ।

--- ছাতকর মেঘর লাখান । খনে ধলা , খনে কালা !

--- ছাতক নায় কও চেরাপুঞ্জি । হনছ নানি ,

‘ পিঞ্জামেঘর আঞ্জা আঞ্জি চেরাপুঞ্জির পাড়ো ,

ধলাভেড়া ফালদি পড়ে কালা ভেড়ার ঘাড়ো ।’

অউত্ত কথা ! তে এক কথা থাকি আর এক কথাত লই যারায় গি কেনে ।

--- আইছা কও ।

--- কইবায় আডুয়ামি । রেললাইনর ধারো লুয়ার খুটি দেখছ নি । খুটির উপরে ধলা ধলা পাথরর কইতর বওয়াই রাখি দিছে । কুনাখনো চাইরটা, আটটা । আর কইতরর গলাত দড়ি । কত লম্বা কী জানি । রেললাইনর লগে যার অউ যার ।

--- ইতা দেখছি । বদরপুর গেছি না নি ।

--- আমি হি কথা কইছি না । মাঝখানো ফালাও কিতা ।

--- আর ফালাইতাম নায়, কও ।

--- ঠিক তো । রেলগাড়ি চলে আর তারও দৌড়ে । কি সুন্দর শব্দর বামঝামি । এর মাঝে এক পাখি অউ লম্বা লেইঞ্জ বুলাইয়া বই রইছে । পাখির নাম ফিঙ্গা । আমার খুব ভাল লাগে । তুমার লাখান । খালি ফালায় ।

--- তেউ ।

--- আইলাম ।

দশ

দেশ বলতে সিলেট ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না বৈতল । উত্তরে খাসিয়া পাহাড় দক্ষিণে লুসাই তিপরা আর চাকমা পূর্বে কাছাড় পশ্চিমে ময়মনসিংহ । দাড়িওলা পাঞ্জাবি ছাড়া সিলেটে ভারতের সব প্রদেশের মানুষের বসবাস । গুরুসঙ্গ করে বৈতল শিখেছে অনেক । গুরু সৃষ্টিধরের সঙ্গে ঘোরাঘুরিও কম হয় না । এর মধ্যেই দেশভাগের গল্প শুরু হয়ে যায় পথে ঘাটে । গুরুর দোকানে ঠাকুরের কুর্সি বানানো কম হয়ে যায় । কারণ হিন্দুরা কোনরকম প্রাণরক্ষা করে টিকে থাকে , ঠাকুর যখন ভাল থাকতে দেবে না তখন আর আসন কুসনের হয়ে ভার বাড়িয়ে কী লাভ । সবাই বলাবলি করে সিলেট জেলা পাকিস্তান হয়ে যাবে । গুরু বলেন,

--- করিমগঞ্জ মহকুমা যাইত নায় । আমরা বিয়ানিবাজার রইদপুয়ানি ইন্ডিয়াত অউ থাকব ।

আবার একদিন খবর হয় সিলেট আসামেই থাকবে । থাকবে আর যাবের এই টানা পোড়নে বিরক্ত বৈতল গুরুকে বলে,

--- ঠাকুর ,দেশ কিতা ।

--- ভাল কতা কইলায় বাবা । কিতা কইতাম কও চাইন । দেশ অইল, বুঝছনি , এক ঝাণ্ডা । বদমাশির জয়পতাকা । দেখিয়া ডরাইতা ।

--- বুঝছি না কুস্তা ।

--- অত বুঝিয়া কিতা করতায় । কিচ্ছু করতায় পারবায় নি । আটকাইতায় পারবায় কিচ্ছু ।
অখন দেশ অইল মন্দির আর মসজিদ । হিন্দুর আর মুসলমানের জোর যার দেশ তার ।
সিলেট অখন বউত পক্ষর এক কমরর তেনা । এইন টানলে হেইন লেংটা । আসামি হকলে
ডরাইন বাঙালি রাজা অই যাইব । বাংলা ভাগ না অইলে হিন্দুয়ে বাবইন প্রধানমন্ত্রী পাইতা নায়
। মুসলমানে ভাবইন ইন্ডিয়াত থাকলে পাড়ার তলর বেঙ অইয়া থাকন লাগব । অতাউ খেইড়
। দেশ উশ কিচ্ছু নায় । মাটি লইয়া কামড়াকামড়ি ।

--- মাটিউ নি সব । জল আছে না নি ।

--- জলও ভাগ অইব । হিন্দুয়ে নিবা বরাক কুশিয়ারার জল আর মুসলমানে সুরমার পানি ।

--- পাহাড় ।

--- পাহাড়ও ভাগ অইব গুনছি । জয়ন্তীয়া ভাগ অইব । যাইতায় নি পাহাড়ো ।

পাহাড় চড়ায় বাড়তি উৎসাহ নেই বৈতলের । জলের মানুষ জল দেখলেই খুশি ।
পাহাড় দূর থেকে দেখাই ভাল, মাথা উঁচু হয় । দুই দেশ হয়ে গেলে ছাতকের মেঘ এবার
আসবে বিদেশ থেকে । কী অপরূপ দৃশ্য হয় যখন খাসিয়া পাহাড় থেকে মেঘ ভাসতে ভাসতে
টুকে যায় ছাতকের কমলাবাগানে । মনে হয় যেন আকাশ ভেঙে পড়বে হুড়মুড়িয়ে ।

দেশ যদি ভাগ হয় মানুষের কী হবে তবে । হিন্দুস্তানের মানুষ পাকিস্তানে যেতে
পারবে না । গুরু বলেন,

--- না ।

--- গরু ছাগল ।

--- না ।

--- জংলি জানোয়ার ।

গুরু আমতা আমতা করে বলেন,

--- পারব পয়লা পয়লা । তার পরে পারত না ।

বৈতল বলেছে,

--- আর পাখি । আকাশ কেমনে ভাগ অইব ।

গুরু বলেন,

--- অইব , কিচ্ছু একটা উপায় অইব । সীমা তো ঠিক করন লাগব ।

বৈতল আরো কঠিন প্রশ্ন করে এবার ,

--- হিপার থাকি মেঘ আইলে কে আটকাইব । হিপারের জলে ভরা মেঘ ইপারো আইয়া ভাসাই দিলে কিতা অইব । সীমা ভাঙার শাস্তি নাই ।

গুরুর তুণে আর অস্ত্র নেই । তাই বলেন ,

--- কী জানি বা ।

বৈতলের ছেলেবেলায় বাপ বলত ,

--- মেঘ অইল আকাশের গরু । মেঘ আকাশো চরে । জল খাইয়া পেট মোটা করে । আকতা বিয়ান দেয় ঝামঝমাইয়া ।

জয়ন্তীয়া পাহাড়ের পুঞ্জিতে করাত টানতে টানতে বৈতল গুরুকে বলে বাপের কথা । গুরু বলে,

--- অয় ঠিক অউ কইছইন । দেখিলাও বালা করি অখন , গাই তো বুড়ি, বিয়ানও শেষ । আর বিয়ান দেয় কী না দেয় ।

গুরুর সঙ্গে থাকতে থাকতে ওস্তাদ হয় বৈতল । বাইশ করাত আর যাঁবদা চালাতে শেখে । গুরু প্রশংসা করে বলেন,

--- তুমি বাবা জাত কারিগর । যে কামোউ লাগো , সুন্দর করি শেষ করো । হিদিন অনিপণ্ডিতর সীতেশ ভটে তোমার কতা খুব কইলা । খুব সুন্দর কুস্‌সি বানাইছ , কুস্‌সির মাখাত বুলে গডুড় খোদাই করি দিছ । ইতা কেমনে করলায় ।

--- আপনেউ তো কইলা বিষ্ণুর রথের মাথাত গড়ুর বই থাকইন ।

--- অয় অয় । লেখাপড়া শিখলায় না, কিন্তু বাইশ কবি ষষ্ঠীর দত্ত আর চৈতন্যচরণ পালর
পদ্মপুরাণ যে লাখান মুখস্ত গাইতায় পার রেবা । পাক্কা উঝা হকল হারি যাইবা ।

গুরুর প্রশংসা নেওয়ার মতো মানসিক শারীরিক অবস্থা নয় বৈতলের । পান খেয়ে
মুখের ব্যথা । পাহাড়ের পানে যে এত ঝাল জানে না বৈতল । তার উপর চুন বেশি কোয়াই
সুপারিতেও নেশা বেশি । গালে ব্যথা আর মাথার চক্কর , এর মধ্যে গুরুর পায়ে হাত দিয়ে
প্রণাম করে । মাথা তুলে তাকাতে পারেনি, পাহাড় থেকে নেমে পালিয়েছে সোজা বইয়াখাউরি
।

পালাবে , বৈতল আভাস দিয়ে রেখেছে আগে । গুরু তার সদা হাস্যময় । রাগ করে নি,
বলেছেন,

--- বুঝি গো বাবা । পানি না দেখলে তোমার পরাণ ঠাণ্ডা হয় না । ভাটির দেশর ই এক
বেমার ।

বৈতলকে কেউ কাঁদতে দেখে নি । তবু আগের রাতে বৈতল অঝোরে কেঁদেছে শুকনো
কান্না । আর পান চুন কোয়াই সুপারি খেয়েছে , মনে মনে গুরুর পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছে
। পরদিন নেমেছে নিচে । ওঝা বোঝে নি , কেউ বোঝে নি বৈতল কেন নামে ।

টেলিগ্রাফের তারে ফিঙ্গা পাখির লেজ ঝোলানো নাচ দেখে কী যে নেশা হয় বৈতলের । গানে
নাচে কাঠের কাজে মন কমে । চামেলির গন্ধে বিভোর হয়ে থাকে সর্বক্ষণ । গুরুর বাড়ির
গুরুমা গুরুকন্যারা যখন এদিক ওদিক যায় বৈতল সঙ্গে থাকে । সৃষ্টিধর গুরুর পাঁচফুল থেকে
চামেলিকে নিয়ে বাসুদেববাড়ির মন্দির অঙ্গনে হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে বারবার সঙ্গী হয়েছে
উনকোটি গোটাটিকর ঢাকাদক্ষিণে । এবার বারুণি মেলা । ওঝার বাড়ির সবাই যাবে কপিলাশ্রম
সিদ্ধেশ্বর শিবের বাড়ি । সিলেট জেলার সীমার বাইরে মন্দির কিন্তু মেলামগুপ সিলেটে ।
কোথাও যাওয়ার আগে গুরু স্থান- মাহাত্ম্য শুনিয়ে দেন । বলেন, আগবেড়ানি । বেড়ানোর
আগেই বেড়িয়ে আসা । বৈতলের উৎসাহের কেন্দ্রে তো গুরুর কনিষ্ঠা কন্যা । তাই চায়নাকেই
বলে,

--- রেল গাড়িত ত ! যাওয়া অইব কেমনে ।

--- অয় , রেল গাড়িত অউ । টিকেট কাটিয়া যাইমু আমরা । তুমি যাইবায় তারে তারে ।
লেইঞ্জ বুলাইয়া । নাচতে নাচতে ।

উপন্যাস

এগারো

গুরু কন্যা চামেলি, যার ডাক নাম চায়না , বৈতলকে চিমটি কেটে ডাকে । বলে,

--- খুব হাউশ অইছে নানি । বদরপুর যাইতায় । তারে তারে পাখির নাচ দেখতায় ।

--- অয় , অইছে তো ।

--- তে যাও একলা । আমি তো যাইয়ার না ।

--- হে ।

--- হে কিতা । ভকামি করিওনা । আমার ইবায়দি ছেরা ছুটের , তাইন যাইতা নাচ দেখাত ।

ধর্মপ্রাণ করাতি পরিবারের বারুণি স্নানের পুণ্যার্জন বাধা দূর করতে দায়িত্ব দেওয়া হয় বৈতলকে । কনিষ্ঠা কন্যা থাকবে বাড়িতে । গুরু বলেন,

--- পেট যখন ছুটছে, ছোটজন থাকউকা । বাবাজিও তো আছইন দুকানো , দেখবানে ।

ওঝার বিশ্বাস বৈতল তার পুত্রসম । তাই অগাধ ভরসা ।

দুর্গা দুর্গা বলে সবাই তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে যেতেই চামেলি সুস্থ । চায়না রেঁধে খাওয়ায় পিতার শিষ্যকে । বৈতলকে কেউ অনেকদিন পর আদর করে খেতে দেয় একা একা । মাও দেয়নি এমন, ইচ্ছে থাকলেও বাপের ভয়ে ছেলেকে আদর দিতে পারে নি । বড় মাছ বৈতল কখনও খায় নি , বাপকে না দিলে মার গায়ে ছুঁড়ে মারে থালা । খেতে খেতে বৈতল চায়নাকে বলে,

--- তুমি আমার মার লাখান ।

--- কেনে , তুমার মা তো কইছ খুব সুন্দরী । ধলা । আমার মতো কালা নায় ।

--- না না হে কতা নায় । ইরকম একলা বওয়াইয়া কেউ আমারে খাওয়ায় না ।

--- খাওয়াইব বিয়া কর । তখন উল্টি যাইব । তখন কইবায় ,

‘ মার রান্দা যেমন তেমন বইনর রান্দা পানি

আমার বাড়ির এইন যে রান্দইন খাইতে যেমন চিনি ।’

বৈতল হাসে । জুত হয়ে বসে পিঁড়িতে । বলে,

--- আইচ্ছা করমুনে , অখন একটু হাওয়া কর দেখি । বিচইন খান আনো ।

একদিনের নবাবের কথা মতো কাজ হয় । খাওয়ার পর বলে,

--- পান দেও দেখি , একটু শাদার গুড়া দিও ।

--- ইস্ , আমি যেন তান বান্দি আরি । দিমুনে , কিন্তু গান শুনানি লাগব ।

--- হে কতা নি । তে হ্ন, বৈতলরে কইলেউ গান গায় ।

বলে মিষ্টি হাসি দিয়ে গান ধরে উচ্চকণ্ঠে ,

‘ উঠিল জয়ধ্বনি । মেদিনী সকম্পিতা

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান ।’

চায়না থামিয়ে দেয় গুরুতেই । বৈতলের মুখে হাত দিয়ে বলে,

--- ইতা না ইতা না । বাবার লগে থাকিয়া থাকিয়া ইতা কিতা ভদ্রা ফদ্রা গান শিখছ । অন্যতা গাও ।

বৈতল যেন গুরুর বাধ্য ছাত্র । গায়,

--- ‘ ছিকালড়ে ছিকালড়ে

ঝন্ঝনাইয়া টেকা পড়ে ।’

--- ইশ্ বাদ দেও, তে গাওন লাগত নায় ।

--- আইচ্ছা গো মাই, কান্দিও না, গাইয়ার গান,

মুচকি হাসি দিয়ে বৈতল এবার তার গানের গাড়ি ঘুরিয়ে দেয় । মনপ্রাণ ঢেলে গায়,

--- ‘আইল রে বসন্তকাল

দুঃখিনীর দুঃখের কপাল ,

প্রাণকান্ত বিনে আর প্রাণ বাঁচে না’

শেষ লাইন বিভিন্ন মোচড়ে বারবার গাইল । চোখের ইশারায়ও স্বরগমের ওঠাপড়ায় ,
আবহ তৈরি হয় । গানের শেষে ঘোর নামে চামেলির মনে । বৈতলকে বলে,

--- অখন যাও , আমি ঘুমাইতাম ।

--- ঘুমাও না, কে না করছে ।

--- তুমি গেলে আমি দরজাত বেন্দা দিতাম ।

--- কই কও বেন্দা ।

বৈতল দরজায় বেন্দা নামের হুড়কো দেয় । স্বপ্নের ঘোরে এতদিন যা খাবলাখুবলি
করেছে, হাতের কাছে পেয়ে বৈতলের কেমন ‘বেভুতা’ লেগে যায় । বলে,

--- খুলো না, একটু দেখি ।

খুলে দেয় বৈতলের কৃষ্ণ বিহঙ্গ । লেজঝোলা পাখি পেচকুন্দা । যাকে বারবার তারের
উপর খেলতে দেখেছে দূর থেকে । তারের পাখি থেকে প্রাণের মানুষ । মানুষ আঠালি মাটির
ঢেলা । যেমন ইচ্ছে গড়ে নাও মূর্তি । মূর্তির বুকে দুটো সন্ধ্যাপ্রদীপ , কে জ্বালায় , বিধাতা না
বৈতল । প্রদীপ দুটো এগিয়ে আসে বৈতলের কাছে । বৈতলের মুখে আগুনের পরশ লাগার
আগেই এক বিকট শব্দ হয় গুরুর বাড়ির বাইরে । দরজা কেঁপে ওঠে, বেন্দা নড়ে । বৈতল
বলে,

--- বাইরে তুফান উঠছে ।

অগ্নিকন্যা চায়না বলে,

--- ডেকা ঢুকছে বিচরাত ।

--- না না , তুফান আইছে , দেখ বেন্দা লড়ের ।

বাঘিনীর দৃষ্টি নিয়ে নগ্নিকা মূর্তি বৈতলকে আক্রমণ করে ।

আধা সম্বিতের ঘোরে বৈতলের চোখে তখন দারিয়াপাড়ার এক গর্বিত কিশোরীর অসহায় মুখ ।

আর এক ফকিরকে দেওয়া কথার সত্য । যন্ত্রণাবিদ্ধ বৈতল কোনোক্রমে বাঁশের দরজার
ছড়কো উঠিয়ে দেয় ওপরে । দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সদ্যযুবক ।

উপন্যাস

বারো

বারুনি মেলা থেকে ফিরে এসে গুরু সৃষ্টিধর বলেন,

--- পাহাড়ো যাইতায় নি বাবাজি । বহুত টেকার কাম অইব ।

বৈতল জানে অকুলস্থল থেকে পলায়নেই অপরাধের মুক্তি । হয়তো শাস্তিও । তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় । চামেলিকে মুখ দেখানো নিয়ে দ্বিধায় ছিল , গুরু তাকে মুক্তির পথ বাতলে দিলেন । দুম করে পালিয়ে যেতেও মন চাইছিল না । আবার চায়নার সামনে কাপুরুষের মতো দাঁড়াতেও চায় না । তাই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে কোন জায়গায়, এমনকি পাহাড়ে যেতেও সে প্রস্তুত । পাহাড় একদম পছন্দ নয় বৈতলের । পাহাড় আর টিলা তো একই , একটা বড় একটা ছোট । পাহাড়ে গেলেই মার কথা মনে পড়ে । মিরতিঙ্গার টিলায় যে তার রাজ্যপাট , পাট পাথর । প্রাণের বন্ধু মার সঙ্গে বৈতল রাজা বসে পাটে । শিশু বৈতল , কিশোর বৈতল , ঘিরে থাকে তার মা । টিলার উপর বাধাবন্ধহীন পবিত্র বাতাস শুধু । মাতা পুত্র আর অরণ্যের প্রাণীদের সঙ্গে উপভোগ । চরিত্র দোষ হয়নি বৈতলের । যুবক হওয়া , যৌবনের ধর্ম পালন করা কই দোষের । দোষের কোনও কাজ করে নি বৈতল । চায়নাকে নিয়ে কী না করতে পারে সে । করে না । চামেলি ওকে ভালবাসে । বৈতল যে নিজেকে জানে না , ঘরজামাই হয়ে থেকে যাওয়ার কথা ভাবেনি । ওঝাগুরুর ঘরটাকেও সে ভালবেসে ফেলেছে । ওঝার মন্ত্রগুণেই হয়তো শরীর নিয়ে খেলায় তার আপত্তি । নাকি অন্য কারণ । বৈতল তল পায় না আপন শরীর মনের । চরম উত্তেজনার সময় কেন বিম মেরে যায় তার শরীর ।

বৈতল ওঠে পাহাড়ে আবার নেমেও আসে । গুরু তার অন্তর্যামী , কিছু একটা আঁচ করেন । তাই তো কথায় কথায় বলেন ,

--- বুঝি, পানি না দেখলে তোমার পরান ঠাণ্ডা হয় না ।

গুরুর বাড়ির পুকুরেই বৈতল হাওরের জলসুখ উপভোগ করে । যখন ইচ্ছে নেমে যায় জলে । জলের প্রাণী খুব একটা বা থাকলেও অভ্যাসবশে লুকিয়ে মাছ ধরে বৈতল । দিয়ে আসে পঞ্চকন্যার জননীর হাতে । ওঝার হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই । শরিকানা পুকুরের অর্ধেক মালিক বৃন্দাবন কামারের ভাগে যায় পুরো ।

জলে থাকলে হাত পা নাড়তে পারে বৈতল । জলে থাকলে তার সাহস বেড়ে যায় । জলে থাকলে সে মহাবীর । তবে পাহাড় থেকে সে জলের টানে নামেনি । নামতে হবে বলে নেমেছে । না করতে হবে বলে নেমেছে । গুরু সৃষ্টিধরের পায়ে পড়ে কেঁদেছে বৈতল শুকনো চোখে । গুরু ভেবেছে বৈতলের চোখে ঘোর লেগেছে । নেশা হয়েছে । বৈতলের গুরু মানুষটা বড় খাঁটি । সোনার মতো চকচকে , শুদ্ধ । ছেড়ে যেতে মন চায় না বলে শুকনো চোখের অনুনয় , ক্ষমাভিক্ষা করে । দিঘীর পারের মানুষ জন , বাসুদেববাড়ি , পঞ্চখণ্ড , অনিপণ্ডিত , পণ্ডিতপাড়ার মানুষেরা তাঁকে সম্মান করে । সম্মানিত মানুষরা নিজের জন্য কিছুই চায় না , বিলিয়ে দিয়েই আনন্দ । ছেলে নেই বলে যে একটা দুঃখ ও আছে মনের ভিতর , জানতেই পারত না বৈতল জয়ন্তীয়ার পাহাড়ে না এলে । মনের দুঃখে পাঁচমেয়ের বাপ বৈতলকে বলেন, --- বুঝালায় নি বাবা , নরম নরম মাইনুষে পুয়া জন্মাইতা পারইন না । খালি পুড়ি জন্মায় । আমার পঞ্চকন্যা । মা মনসা এক একজন ।

ওঝা পাহাড়ে ওঠে নেশা করার জন্য । পাহাড়ি মানুষের ঘরের দুঃখহরণ মদ । থালার ভাতে সুখের ঘুম হয় , নেশার ভাত গেলাসে উঠলে দুঃখও ওঠে উথলে । ছেলের বয়সী শিষ্য নিয়ে স্বপ্ন দেখে । বৈতলকেও দেয় এক পাত্র । গুরু শিষ্যের নেশাচর্চায় অসুন্দরের দরজা থাকে বন্ধ । গুরু শিষ্যের নেশায় প্রতিক্রিয়া দুরকম । গুরু সৃষ্টিধর পাত্র হাতে নিয়ে দ্রব হয়ে যায় , চোখ দিয়ে জল গড়ায় । আর বৈতল , বৈতলের চোখের জল দেখে নি কেউ , নেশার পাত্র বৈতলকে বোবা করে , গুম মেরে যায় , থম হয়ে যায় কালো পাথরের মূর্তি । গুরু নিজের জন্য কখনও যা চাইতে পারেন না , বৈতলের কাছে চেয়ে বসেন । কান্না চোখে আবেদন জানান ,

--- তুমি নিবায় নি আমার একজন ।

পাথরের মূর্তি না হলে বৈতল কিছু একটা বলতেই চাইত । নেশার সময় মেয়েমানুষ নিয়ে কথা শুনতে মন্দ লাগে না । আর সেই মেয়েকে নিয়ে যদি কখনও স্বপ্ন সাজিয়ে থাকে কেউ । কিন্তু বৈতল শুধু স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে না । বৈতল শুধু ঈশানের খুঁটি হয়ে বাঁচতে চায় না , বৈতল পায়ের নিচে সর্ষে নিয়ে বাঁচতে চায়, ডালার কুল হয়ে জীবন দেখতে চায় । বৈতল কোনও উচাটন নিয়ে থাকতে চায় না । অনেকদিন তো হলো গুরুগৃহে , এবার তার ফেরা । এতদিন প্রাণে ছিলেন মা বিষহরি । গ্রামে গ্রামে গুরুর সঙ্গে পুঁথি পড়ে বেড়ানোর আনন্দে মশগুল ছিল । গুরুর জোগালি হয়ে কাজের জন্য ওঝার কাছে মজুরি নেয়নি বৈতল । পেট চুজিতে থেকেছে । মাঝে মাঝে সিঁদ কেটে অভ্যাস বজায় রেখেছে । বাপের বানানো শরীরকে তেলাল রাখতে পুকুরের এপার ওপার ভুসভুসিয়ে বুক চিৎ ডুব সাঁতারে কসরৎ করেছে । তাহলে কেন । মার মৃত্যুসংবাদে কি সত্যিই বিচলিত বৈতল । নাকি গুরুগৃহবাস সমাপ্ত বলে মনোব্যথা , এবার অন্য ঠিকানার হালহাতি । দেশের টানে আবার বইয়াখাউরি অভিযুক্তী । নাকি এক জটিল সময়ের পূর্বাভাস পেয়ে স্বভূমির টানে প্রত্যাবর্তন । গুরু মহাশয় অনেক কিছু জানেন , রাজনীতির সর্বশেষ খবরও রাখেন তিনি । বৈতলের কিশোর থেকে যুবক হওয়ার বয়সকালে রাজনীতির তেমন ডামাডোল দেখেনি । সিলেট দেশে শান্তির হাওয়া দেখেছে । এখন লীগ তেভাগা কংগ্রেস আর দেশভাগ নিয়ে গুরুর ভাষ্যে বৈতল বিভ্রান্ত । বৈতল এখন আর নিজের জায়গা ছেড়ে থাকবে না । নিজের মাটি আর জলের সুরক্ষায় এখন বৈতলের বইয়াখাউরি ফেরাই প্রধান ।

তেরো

গুরু সৃষ্টিধর নিজেকে মিস্তিরি মানুষ বলতে ভালবাসেন । ভেতরে বাইরে এরকম সাদা মানুষ দেখেনি বৈতল । যা বলেন মনের ভিতর দিয়েই বেরিয়ে আসে কথা । মানুষটিকে যেন গড়ার সময় সৃষ্টিকর্তা রাগ দিতে ভুলে গেছেন । সমীহ হয় দেখলে , সদাহাসি যে থাকে তাও নয় , কিন্তু মুখে এক অনাবিল প্রশান্তি । বৈতল বুঝতে পারে , তার স্বকীয়তা নষ্ট হচ্ছে , সেও ভালমানুষ হয়ে যাচ্ছে গুরুর সঙ্গে থাকতে থাকতে । গুরু ওকে ওর মতাদর্শে দীক্ষা দিচ্ছেন নীরবে । পুঁথির পাঠ নাচ আর কাঠচেরায়ই সব নয় , নীরবে যেন অন্য মানুষ গড়তে চাইছেন শিষ্যকে । বৈতলও সম্মোহিত হয়ে তাঁর কথার টানে ছুটছে । ছোটবেলায় যেমন বাপ বলত , ‘হেই বৈতল পানিত লাম’ , বৈতল নেমে যেত জলের অতলে । গুরু সরাসরি নির্দেশ দেন না , ওকে বিবশ করে দেন প্রতিবেদনে । পাহাড়ে চড়ার সময় এক গ্রাম পড়েছে সোনাপুর । ওঝা থেমেছেন পাহাড়চূড়ায় । বুকভর দম নিয়ে বলেছেন ,

--- দেখো রেবা , আমাদের দেশ । কুটি কুটি মানুষ নিচে দেখরায় , এরা সব আমাদের ভাই বেরাদর । সব সিলেটি । আর অউয়ে বড় দড়ি এক গাছা দেখরায় , দড়ি নায় , আমাদের মা , আমাদের সুরমা নদী । কী সুন্দর দেখরায় নি । অউতান অউগদাউ আমাদের শরীর । পল্লাম কর নদীরে ।

গুরুবাক্য পালন করছে বৈতল । প্রণাম করেছে নদী মাকে । আর ভেবেছে সুরমা সিলেট নিয়ে পাগল মানুষটা কেন যে সংসারী হয়েছে । উল্টোদিকে আর এক গাছি দড়ি দেখিয়েছে বৈতল । বলেছে,

--- আর হউ নদী ।

--- অউ আর হউ কই রেবা । এইন একজন অউ । আমরা চিনি না তানে । তাইন আমাদের মা নায় । সুরমার উপরে কোনও নদী নাই , সিলেটর উপরে দেশ নাই ।

নদীর উপর রাগ অভিমান শেষ করে শিষ্যকে বলেছেন ,

--- অউ নদীর নাম বরাক । উল্টাদিকে এক পাহাড় আছে, বড়াইল, অখান থাকি বার অইছইন । সিলচরর উপরে দিয়া অউ দেখে ত্রিভঙ্গ অইয়া নাচিতরা । তেড়া বেকার লাগি নাম বড়বক্র , বুলে বরাক । বরাকর পারো যারা থাকইন তারা সিলেটিও না বাঙালিও না কাছাড়িও না মনিপুরিও না , সব মিলাইয়া তারা এক আজব চিজ । হিবায় চাওন লাগতনায় , মুখ ফিরাই লাও । হিখান বলে হিন্দুস্থানো পড়ব । হের লাগি সবে ভাগের হিবায়দি । আমরা যাইতাম নায় । বাপদাদার দেশ ছাড়িয়া যাইবায় নিবা ।

--- না । এক নদী দিয়া কিতা অইব । হাওর আছে নি , বিল আছে নি ।

--- আছে কিতাকিতি । চাতলার হাওর , নদীও আছে ছুটো ছুটো । জিরি চিরি মধুরা ধলেশ্বরী সোনাই । জেতাউ হউক মা থাকতে মইর বাড়ি কতদিন থাকতায় পারবায় ।

--- আমার তো মা নাই ।

--- এ, তোমার দেখি রেবা নিয়ত বালা নায় ।

--- না । আমি যাইতাম নায় । আমার বড় হাওর অউ বালা । হাকালুকির লাখান হাওর আছেনি দুনিয়াত । পানি যেখনো , আমিও হিখানো ।

গরীব সূত্রধরের মেয়ের কন্যাদায় উদ্ধারে অপারগ বৈতল স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে দেয় গুরুকে । এছাড়া কীই বা করতে পারে সে । তার বয়স কম , রইদপুয়ানিতে পড়ে থাকতে পারে না সারাজীবন । চায়নাকে বিয়ে করার অর্থ , গোটা পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া । সৃষ্টিধর ওঝা বড় মাপের মানুষ ঠিকই কিন্তু সংসারী হতে পারেন নি । পাঁচ মেয়ের সংসার প্রতিপালনে অমানুষিক পরিশ্রম করেন । পাহাড়ে এসে , পরিচিত মানুষ থেকে দূরে এসে দুএক পাত্র নেশা করে মনের দুঃখ শোনায় শিষ্যকে । বলে,

--- রোজগারর পয়সা আমি আনে বানে খরচ করি না রেবা । আমি খুব বেড়াই , বেড়ানির পয়সা আমার আলাদা । সিলেটখান অউ দেখতাম পারলাম না ভালো করি , জানি না কাশী বৃন্দাবন যাইতাম পারমু নি । কিন্তু একবার নবদ্বীপ যাইমু । যাইবায় নি আমার লগে ।

--- যাইমু ।

--- তেউ অইব , বুড়া মানুষৰে টানন লাগব । দেখমু, দেখমু সব । আইয়ে চাইলে সব অইব ।

বৈতলৰ মন আই বিৰূপতায় ৰুদ্ধ । তাই গুৰুকে প্ৰশ্ন কৰে ,

--- আপনে ভগবান মানইন নি ।

--- মানি বাবা । মানি । ভগবান মানি , আল্লা মানি । মহাভাৰত পড়ছ না তুমি , ভিষ্ময়
কইছলা মৱাৰ আগে ‘ মানুষ ছাড়া মানাৰ মতো আৰ কিছু নাই’ । বুঝলায় নি কিতা ।

উপন্যাস

চৌদ্দ

মানুষে বিশ্বাসী বৈতলের গুরুর ভালমানুষী ছাড়া কোনও পার্থিব সম্পদ নেই । এক বাস্তবভিটে পঞ্চপুষ্পের পাচকন্যা , তাদের জননী আর ভুল বিশ্বাসের শিষ্য বৈতল, এই মাত্র রোজগার । পরিশ্রমের অল্পে কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদন হয় বটে । সঞ্চয় শূন্য । শুধু শ্রাবণ মাসে যা কয়েকটাকা আলাদা রোজগার । সেই আয়ের ভাগ সৃষ্টিধরের পরিবার পায় না । লুকিয়ে রাখে ওঝা । শুধু বৈতল জানে । বৈতলকে বলেন ,

--- আইর ঘড়াত রাখছি, আস্তিক মুনিয়ৈ পাৱা দেইন ।

ওঝার ভাঙারে কখনও দৃষ্টি দেয় নি বৈতল । বৈতল জানে গুরুকে বললেই দিয়ে দেবে সর্বস্ব । আর মানুষটার ঝাঁপিতে তো মাত্র এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর রাহাখরচ , পা গাড়ির তো কোনো ভাড়াই নেই । তাও লুকনো দুচার পয়সা সঞ্চয় নিয়ে সংশয় যায় না । বলেন ,

--- মনসামঙ্গল গাইয়া , নাচিয়া যে মাইনষর কাছ থাকি পয়সা নেই, ইতা কুন্ঠিক নি । আমি ঠগাইয়ার নি তারারে । ধর্মকথা শুনাইয়া দাম নেওয়া পাপ না নি বা ।

--- আপনে নু কইন মনসামঙ্গল ধর্মবই নায় ।

--- নায় তো । গরিব মানুষর কথা আছে । ভালায় মন্দে মিশাইল মাইনষর কথা । বেউলা যে গেলা নদী দিয়া , তার ঘাটো ঘাটো কত কিছিমর মানুষ , কেউ ভালা কেউ বদ । বদ মানুষ ভালাও তো অইল । হিন্দু মুসলমানর মিলর কথাও আছে । হক্কলতা তো পড়তাম পারি না , নাইলে দেখলায় নে । অত ঘুসা বেটির কিন্তু বেটিয়ে সবরে এক করি রাখে । বাংলার সবখানোউ তো মনসা পূজা হয় । কিন্তু কুন্ঠানো মা বেটিরে ইলাখান পুড়ির মতো ডরাইন না । এর লাগিউ তুমারে কই সিলেটর লাখান দেশ পাইতায় নায় । ইখান ছাড়ি যাইও না ।

কী কথায় কী কথা । গুরুর মনে সন্দেহ কখন থেকেই । পড়াশুনা জানা মানুষ অনেক আগে থেকেই সব জানতে পারে । দেশভাগ যে হতে পারে , দেশভাগ যে অবশ্যম্ভাবী , সৃষ্টিধর

ওঝা জেনেছিলেন অনেক আগেই । তাই সব তছনছ হওয়ার ভয় তাঁর মনে । তাই সিলেটের গুণবর্ণনায় প্রিয় শিষ্যকে অবাক করে দেন যখন তখন । বৈতলকে অনুপ্রাণিত করে বলেন ,

--- যাইতায় নি বাবা একখানো ।

গুরুর অনুরোধকে আদেশ মেনে বৈতল প্রস্তুত হয় তৎক্ষণাৎ । বলে,

--- কই যাইতা ।

--- যাইমুনে একখানো । যেখানো বউত বড় বড় মাইনষর পাড়া পড়ছে । অউ যে নদিয়ার চান্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু , তান বাপর বাড়ি কই জানো নি । চল যাই ধারঅউ ঢাকা দক্ষিণ । দেখিয়া আই শচি রানীর গিরিস্তি । জগ্ননাথ মিশ্রর বাড়ি ।

ওস্তাদের মতো শিষ্য হাঁটতে পারে লম্বা লম্বা পা ফেলে । দিঘীরপার থেকে ভোরের বেলা রওয়ানা হয়ে সূর্যের তেজ বাড়ার আগেই পৌঁছে গেছে গন্তব্যে । পথে যেতে যেতে গুরুই শুধু কথা বলে গেছেন । সব মহাপ্রভুর লীলা প্রসঙ্গ । বলেছেন ,

--- মহাপ্রভু আইছলা ‘পিতৃজন্মস্থান’

‘কিছুদিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে

যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে ।’

আমরার তরফর বাবন , বুঝছ নি বা , বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রহনক্ষত্র নিয়া মাস্টারি করতা এক পণ্ডিতে , নাম নীলাম্বর চক্রবর্তী । বিশ্বস্তর মিশ্রর দাদু । বিশ্বস্তর কে জানো নি । নিমাই পণ্ডিতর নাম । একদিন খুব গুসা করিয়া নবদ্বীপো কাজির বাড়ি চড়াও অইছইন নিমাই শ্রী চৈতন্য । খুব গুণ্ডা প্রকৃতির আছলা তাইন । তখন কাজিয়ে তানে কেমনে ঠাণ্ডা করইন হনো । কাজিয়ে কইন,

‘গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা

দেহ সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা

সে সন্মুখে হও তুমি আমার ভাগিনা ।’

আর কিতা, গুসা পানি । মামা ভাইগনা যেখানো, আপদ নাই হিখানো ।

খেপা মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে সব সময় ভালও লাগে না । সব সময় এক কথা, মানুষে মানুষে মিল , ভালবাসার গল্প । গুরু সৃষ্টিধর তো নিজেকে বলেন সৃষ্টিছাড়া, স্বীকার করেন নিজের পাগলামির কথা । বলেন,

--- আমার কানুছাড়া গীত নাই । মিলমিলাপ ছাড়া মাত নাই । কেনে করতাম না কও চাইন ।
খামোকা খামোকা কেনে অউ মারামারি, খাকরা খাকরি । ইগুয়ে ইতা খায়, তে হিগুয়ে হিতা
খায় না । ইগুয়ে বলি দেয় । তে হিগুয়ে পুছ দেয় । ইগুয়ে চুটকি রাখি ডর দেখায়, হিগুয়ে
দাড়ির উপরে মুছ কাটিয়া ধমকায় । অখন অইচে আর একতা, ধুতি পিনতা নায় বাঙালে ।

গুরু মেনেছে যাকৈ, তাঁর পাগলামিও মানতে হয় । তবু প্রশ্ন করে বৈতল ,

--- ইতা করিয়া কিচ্ছু অয় নি কইন । আমার বন্ধু লুলা আমারে ছাড়িয়া গেল গিয়া । আমি তো
ভুলতাম পারি না । দিনো একবার অইলেও মনো পড়ে । হেও তো অলা নিমক হারাম ।

--- বন্ধু অইলে আইব বাবা । দেখিও । আর হে কুনু মুসলমান নি, হে তো তুমার বন্ধু । বন্ধুর
কুনু জাত ধর্ম নাই রেবা ।

--- বুঝলাম, লুলার কথা আলাদা । কিন্তু হউ তো রায়ট হয় ।

--- না রেবা বাপধন, হক্কলতাত গুসা করলে অইব নি । রায়ট অইল বানর পানি । আয়,
আবার যায় গিয়া । কোন সময় আইব, কেউরে কইয়া আয়না । আর বছরে বছরে কুনু হয় নি
। একটু উচা বান্ধ বান্দলে, রাস্তা ঘাট উচা করলে, ভিটা উচা করলে পানির হাত থাকি বাচা
যায় ।

মনে গেঁথেছিল বৈতলের । তবু সংশয়, তবু প্রশ্ন । বলে,

--- নারায়ে তকবির শুনলে ইতা মনো থাকে না । গা জ্বলি যায় ।

--- ঠিক কইছ । একলা একলা মানুষ বড় বালা । শান্তির সময় ভালো । তে আর পরীক্ষা
কিওর । কঠিন সময়ো অইল আসল পরীক্ষা । রায়ট আইলে আমারও মনে লয় সব বাঙাল

মারি ফালাই দেই । এমনে তো ডরালুকর পাদরাপুক , রায়ট আইলে তাউক বাড়ি যায় ।
এরলাগিউ আমরা মানুষ । গুসা আইব গুসা কমানি লাগব । ভালা কথা কইলে ভালা কথা
হুনে ইতা কমে । আইছা কওছাইন একখান কথা । পারবায় নি দেশ থাকি সব মুসলমান
খেদাইতায় । পারলে খেদাই দেও , আমিও মারমুনে এক ধাক্কা । আর চাচা হকলে পারবা নি
হিন্দু খেদাইতা । আর মাইনষে কইন মুসলমানে দেশ মানইন না , তারা দেশ ভাবইন আরব ।
মক্কা আর মদিনা । তে কিতা অইল , আমরা সিলেটি হিন্দু , মরলে ইখানোউ পুড়ানি হয় ,
কুশিয়ারার পারো নাইলে সুরমার পারো । তে অস্থি লইয়া কেনে যাই গঙ্গাত , কেনে যাই
গয়াত । ধর্ম করার লাগি যাই কাশী বৃন্দাবন । আমরাও তো, দেশরে দেশ মানি না । অইল
নানি । ইতা সব খামোকা মাত । মুসলমানর মাঝেও তুমার হিন্দু থাকি বউত বড় বড় মানুষ
আছইন । তারা দেশ মানইন সিলেটরে । ইতিহাস মানইন , গর গোবিন্দরেও মানইন
শাহজালালরেও মানইন । ইদেশর ধর্মকর্ম সব মানইন । একখান গান গাই শোন ।

কথাপাগল বৈতলগুরু কথার মাঝখানে গান ধরেন মধুর কণ্ঠে ,

‘মধুপুর গেলা হরি না আসিলা আর

হইল গোকুল অন্ধকার হয় হয় হয় ।’

গুরুর গান শুনে বৈতলের দশবার রইদপুয়ানির পুকুরে অবগাহন হয়ে যায় । কিন্তু
গুরু দীর্ঘায়ত করেন না গান । নিশ্চয় কোনও ধাঁধা আছে , প্রশ্ন আছে, সমাধান আছে অবাক
করা । গুরুকে যে পথে বেরোলে কথায় পায় । কথকতার অমূল্য আধার এই অখ্যাত গ্রামের
মনসাগানের গায়ক । গান যে মুখ্য নয় সে বোঝে বৈতল , তাক লাগানো তথ্যে সত্যি অবাক
হয় । গুরু বলেন ,

--- কুন্সু হিন্দুর লেখা নায় বাবা । মুনিরুদ্দিনর লেখা , সিলেটর এক মুসলমান সাধক । দৈ
খাইতা খুব । এর লাগি নাম দৈখোরা পাগল । আমারো মনোলয় ই সৃষ্টিধর নামর বোঝা
লামাইয়া সিষ্টিছাড়া হইয়া খালি গান গাই ,

‘ দৈ খোরা পাগলে বলে আল্লার নাম সার

মিছা ভবের বাজার হয় হয় হয়

কি জবাব দিবায় মনা কবর হাসরে ?’

পনেরো

কোথায় যায় বৈতল । এমন মানুষকে ছেড়ে থাকা যায় । পাহাড় বেয়ে নামতই নামতে কচি চা পাতার গন্ধে বিভোর হয় । কিছুদূর পর চায়ের গন্ধ কড়া হয়, নেশা ধরে । চাঘরে চা হচ্ছে । খাকি হাফপ্যান্ট আর হ্যাট মাথায় চাঘর বাবুর কাছে চাইবে একমুঠো চা, তাজা চা । চায়ের গন্ধে বিভোর হওয়া মানে শ্রীমঙ্গলের কাছাকাছি হওয়া । তবে কি আবার রেলগাড়ি চাপবে, আবার রইদপুয়ানি , তারের উপর ফিঙ্গে পাখির নাচ । না, বৈতল আর পুব মুখো হবে না, এবার উত্তরে গমন । আবার বইয়াখাউরি । ওখানে সে কার জন্য চা নিয়ে যাবে । এবার লুলাকে খুঁজে বের করবে । বলবে,

--- আয়, এঙ্গা ভাগিদে, মিল কর । আবার আমরা বন্ধু ।

লুলাকে মিষ্টি কথা বললে হবে না । ওকে মারতে হবে কষে এক লাথি । তবেই সে ঠিক হয় । এত কথা জমে গেছে যে একা একা বইতে পারছে না । চামেলি চায়নার কথা বলতে হবে । লুলা তো আবার সাধুমানুষ , মেয়েমানুষের কথা পছন্দ করে না । কিশোর বেলায় সেই এক ধলা মেয়ের কান ছেঁড়ায় রেগেছিল, বলেছিল ,

--- গুনা করিলাইচছ দোস্তু ।

প্রায়শ্চিত্ত তো করেছে বৈতল । কালো বরণী ফিঙ্গে পাখির গায়ে হাত দেয় নি, ছেড়ে চলে এসেছে । লুলা পাইয়ে দিয়েছিল বৈতলকে তার গুরু । গুরুর কথা বলতে হবে না ! গুরুর কথা শুনলে খুশি হবে লুলা । খুশিতে উজ্জ্বল মুখটাও তার মলিন হয় অভিমানে । একবার, এত বছরে একবার বন্ধুকে দেখার ইচ্ছে হয়নি । কিসের তবে বন্ধুত্ব । বৈতল আবার উল্টোপায়ে হাঁটে । কাজ নাই গিয়ে বইয়াখাউরির ভাটিতে । জালুয়াগিরি করে কী হবে বড় হাওরে । এর থেকে ভাল ওঝার চেলাগিরি । কত কথা শোনা যায়, দেখা যায় নিত্যনতুন

গ্রাম, চেনা হয় জানা যায় ইতিহাস । অর্গল খুলে বেরিয়ে আসা ঘরে না হয় মাথা নুইয়ে আবার ফিরে যাবে । গুরুকে বলবে,

--- নিমু, আপনার কালা পুড়িরেউ বিয়া করমু ।

গুরুর চাহিদাও নেই খুব বেশি । দিনে একবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই খুশি । খুশি হয়ে বলেন,

--- যাইতায় নি বাবাজি ।

--- কই যাইতা ।

---অউ দেখ, আইর ভাঙুর থাকি বার করছি চৌষটি পয়সা । পুরা এক টেকা ।

--- এক টেকা দিয়া কই যাইবা । কুণুখানো যাওয়া অইত নায় ।

--- কেনে অইত নায় । অইব । দেখবায় পুরা এক টেকাউ ফিরাইয়া আনমু ।

--- তে আনা পয়সায় অউ চলইন ।

--- রাজার বাড়িত যাইতে টেকা পয়সা লাগে না । তে লগে যে নিলাম , টেকা থাকলে বল বাড়ে । দুই জনর জাগাত তিনজন । তুমি আমি আর এক টেকা ।

--- আপনার খালি হাউরি মাত । রাজার বাড়ি কই ।

--- সুনামগঞ্জ ।

--- ইতা কিতা কইন । আমার দেশো যাইতা । যাইবানি বইয়াখাউরি ।

বৈতলের খুব খুশি, খুশিতে ডগমগ । গুরুকে সে জল দেখাবে , ভাটির দেশের জল, বিল আর হাওরের জল । মাধবগঞ্জ হয়েই তো যেতে হবে সুনামগঞ্জ , সোজা গেলে সুনামগঞ্জ ডান দিকে ছাতক । তবে একটা আশঙ্কাও আছে বৈতলের মনে । কোথায় নিয়ে যাবে সে মানী মানুষকে । বাপ যদি রাগারাগি করে । মা থাকলে খুশি হত , বিব্রতও হত । এত বড় মানুষ , তার বৈতল যাকে গুরু মেনেছে তিনি কি আর তাদের মতো সাধারণ । কোথায় থাকতে দেবে , কী খেতে দেবে । বৈতল শুধু মুচকি মুচকি হাসবে । বৈতল তো জানে গুরু তার কোন মাটির

মানুষ । কিন্তু সৃষ্টিধর ওঝা যদি না করে দেন , বলে দেন যাবেন না বিল হাওর ভাটির দেশে । সুনামগঞ্জও তো ভাটির দেশ , তবে । তবে কেন চুপ শিষ্য বৈতলের প্রিয়তম মানুষ । বৈতলের উৎসাহের জবাবে চুপ থাকার অর্থই তো যাবেন না । বৈতল লুলাকে বলেছিল একসঙ্গে যাবে লক্ষ্মণশ্রী । লুলা যদি বইয়াখাউরিতে অপেক্ষা করে থাকে বৈতলের জন্য । গুরু সৃষ্টিধরকে অবিশ্বাস করে না বৈতল, নিশ্চয় কারণ আছে চুপ থাকার । নৌকো করে আসতে আসতে বৈতল গুরুর কাছ থেকে শোনে তাঁর চুপ থাকার হেঁয়ালি রহস্য । বলেন,

--- সুরমা নদী দিয়া সুনামগঞ্জ যাওয়া সব থাকি সহজ রেবা , ভাটির টানে লামি যাইবায় ।

--- আর ফিরার সময় তো উজান ।

--- ই ও এক মজা, যখন উজাইবায় তখনও কিন্তু কষ্ট কম, সময় কম লাগে ।

সুনামগঞ্জের ঘাটে নৌকো থেকে নেমেই দেওয়ান বাড়ি । দেওয়ান বাড়ির পিছনে এক মস্ত বড় দিঘী, দিঘীর সঙ্গে সুরমা নদীতে যাওয়ার জলপথ ছিল এক কালে । নদীর ভাটিতে দুলতে দুলতে গুরু শুনিয়েছেন তার আগবেড়ানির বার্তা । রামপাশা আর লক্ষ্মণশ্রীর তীর্থভ্রমণ কথা ! এক জমিদার কথা , দেওয়ানজির কথা । বলেন,

--- লেখত পারব নি কও কেউ এমন কথা, এমন গান

‘মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন’

সৃষ্টিধর গুরু শ্যামলা সুনামগঞ্জের এদিক ওদিক দেখেন আর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন । শিষ্যকে ডেকে বলেন,

--- দেখরায় নি, চাইরো দিকে হাসন রাজা । আর তান গান,

‘আমিই মূল নাগররে

আসিয়াছি খেউড় খেলিতে

ভব সাগররে রে ।

আমি রাধা আমি কানু

আমি শিবশঙ্করী’

মুসলমান ধর্মের তো নাচগান মানা । হাসন রাজা কিন্তু মনের আনন্দে গাইতেন,

‘হাছন রাজার লাগিয়াছি শ্যাম পীরিতের টানা

হাছন রাজায় শুনে না ত কট মুল্লার মানা

বাজায় ঢোলক, বাজায় তবলা আর গায় গানা’

তাইন সব মানতা, অন্ধতা মানতা না, তাইন বাঙালি আছলা রেবা, কুণু ভেদাভেদ
আছিল না । তান বাপের বাড়ি সিলেটের রামপাশা, কিন্তু থাকতা সুনামগঞ্জের লক্ষ্মণছিরি । কেনে
জানো নি ।

--- জানি । গাঙের লাগি, সুরমা গাঙের লাগা তান বাড়ি এর লাগি । আপনার লাখান আমারো
মনে লর একটা গান গাই । গাইতাম নি ।

--- গাও রেবা গাও, দিওয়ানা অইয়া গাও ।

গুরু দিওয়ানার সূত্র ধরিয়ে দেওয়ায় বৈতল গায় ।

--- ‘সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল ।

দেওয়ানা বানাইল মোরে, পাগল করিল ।’

গুরু সৃষ্টিধরের ভালর মধ্যে মন্দও আছে কিন্তু । গুরুর প্রাণের আরাম যখন হয় তখন
কোনও বাধা মানে না । সুরমা নদীর জলকল্লোলের সঙ্গে বাউলার গান গুন গুন করেই চলেছে
তাঁর কণ্ঠে । তাই শিষ্যকে থামিয়ে নিজেই গেয়ে চলেন একমনে,

হাসন রাজা বাঙালি হয়ে কাঙালি

প্রেমানলে জ্বলিয়ে যায় প্রাণ

আমি তোমার কাঙালি গো সুন্দরী রাধা...

তোমার লাগি কান্দিয়া ফিরে

হাসন রাজা বাঙালি গো ।

হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা

রাধা বলিয়া ডাকিলে মুন্না মুসল্লিয়ে দেয় বাধা ।

শিষ্যকে শোনান অনেক মজার তথ্য । বলেন,

--- তান শখ আছিল বউততা । হাতি পালতা, ঘোড়দৌড় করাইতা, জলমুরগি পালতা । বউত শউখিন আছলা ই জমিদার । কিন্তু তান ঘরো কুনু শখর জিনিস আছিল না, এক কাঠর তক্তা ছিড়া পাটি নাইলে শতরঞ্চি চেয়ার টেবিল টুল অতাউ । বাড়ির উতরে দি নু সুরমায় নাচতা, তাইনও নাচতা , নৌকাত উঠিয়া ধেই ধেই করি নাচতা । আর গান গাইতা । বহুত সান্দোপান্দো নিয়া বার অইতা রাস্তাত । একজনর হাতো থাকত এক লেমটন, দিনও জ্বলত । আর তাইন গাইতা একমনে গান,

‘ প্রেমের আগুন লাগল রে, হাছন রাজার অঙ্গে

নিভে না আগুন, ডুবলে সুরমা গাঙে ।’

লঠন জ্বালিয়ে দিনের বেলা পথ চলতেন হাছন রাজা । সুফী সাধুরা যে মনে করতেন এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন , তাই আলোর প্রতীক । গুরুর মতো এত না জানলেও বৈতলও জানে কিছু কিছু । লুলার কাছ থেকেও জেনেছে কিছু । সেই জানা অংশ থেকে সুনামগঞ্জের বৈতল শোনায় কিছু তথ্য । বলে,

--- হাসন রাজা তো নাই ।

--- না রে বা নাই ।

--- একলেমুর রাজা আছইন । তান পুয়া । তাইনও অলাখান , দেওয়ানা । তারা বলে আগে হিন্দু আছলা ।

--- তে কিতা অইল বাবা । খালি হিন্দু থাকিনি মুসলমান অইছইন , বাংলাত তো বেশিরভাগ মানুষ আছিল বৌদ্ধ । নেড়া মাথা থাকি বেশি অইছইন মুসলমান । শঙ্করাচার্য নামর এক সাধু না অইলে আমরাও অইলাম নে বৌদ্ধ , তার পরে মুসলমান । ইতা কিছু নায় , ধর্মর গুরু

হকল খুব ভাল আছিল, মাইনষৰ ভাল কৰতা চাইতা, হাছন ৰাজাৰ মতো। তার পরে
তারার শিষ্য সাবুদে সব নষ্ট কৰি দিছইন। ইতা আমাৰ গাউআলা বুদ্ধি দিয়া যেতা বুঝি বা।

--- ইলাখান আৰ একজনৰ গানও আমি জানি। হুনতানি।

--- গানৰ লাগি বাবা জিগানি লাগে নি, গাও।

উচ্চ গ্রামে ‘ওগো সজনি’ৰ ধুয়া ধৰতেই প্রমাদ গোনেন গুরু। ‘গুয়াগাছো টেক্সো
লাগিল নি’ৰ পর আবার ‘ও সজনি’ গাইতেই বৈতলের মুখ চেপে ধরেন সৃষ্টিধর ওঝা। বলেন,

--- চুপ চুপ বাবাজি। ইগান হুনলে পুলিশে ধরব।

--- ইতা কিতা কইন। গান গাইলে কেনে পুলিশে ধরত। ইতা কুন্ চুরি ডাকাতি নি।

--- বন্দেমাতরমও তো গান রেবা। কেনে পুলিশে ধরে। আসাম সরকারৰ এক কালা কানুনৰ
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কৰছিল বাগৰসঙ্গনৰ পল্লীকবিয়ে। গাও বাবা গাও ইতা এমনেউ কইলাম।
গাউৰ মাইনষৰ উপরে টেক্সো লাগাইছিল আসাম সরকারে। তখন ইগান হুনলেউ পুলিশে
ধরত। অখন নাই। তান নাম আব্দুল গফ্ফার দত্ত চৌধুরী। তান লেখা শ্যামাসঙ্গীতও আছে,
হনো,

‘লুকাবি আৰ বল কোথা মা

ধরেছি এই অভয় চরণ ভয় দেখানো মিছে শ্যামা।’

ষোল

দোটানার মনকে আবার ফেরাতে বৈতল জৈন্তিয়ার পাহাড়ের দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকায় । এক মুহূর্তেই যেন পণ্ডিত পয়গম্বর হয়ে যায় বৈতল । গুরুর কথামতো অদৃশ্য নদীর উদ্দেশে প্রণাম জানায় । নদীকে মা বলে ডাকেন গুরু সৃষ্টিধর । গুরুকেও প্রণাম করে বৈতল । দোটানা ছেড়ে আবার পেছন ফেরে বৈতল । এবার ফেরা বইয়াখাউরি ।

বৈতল একা লড়তে চায় । সৃষ্টিধর সূত্রধর ভবিষ্যৎ পড়তে জানেন । গুরু জানেন বৈতল তাকে ছেড়ে যাবে একদিন । তাই বলেন ,

--- বুঝালায় নি বাবা, তখন অতো ইস্কুল উস্কুল আছিল না, কিন্তু শিক্ষা আছিল । সবরেউ মা বাপে পাঠাইতা শিক্ষার লাগি । মহাভারতো দেখবায় সবেউ তিন চাইর পাঁচ বছরর লাগি যাইতাগি পরিবার ছাড়িয়া । তখন তারার শিক্ষা অইত, উচ্চ – শিক্ষা, বিয়াও অইত এক দুইটা । মহাবীর অইয়া ফিরতা । তুমিও যাইবায় গি । মায়া বাড়াইরায় আর কিতা ।

বৈতলের লড়াকু মনের ভিতর যে কত কথার ফুটকড়াই । এক দুই তিন করে গুনলে আর গুনতি শেষ হয় না । তাও গুণে দেখে বৈতল । এক, মায়ার বাঁধন বড় আঁট হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, না ছাড়ালে ভেড়া হয়ে হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন এই দিঘীর পারের অন্তঃপাতি রইদপুয়ানি গ্রামে । দুই, চামেলির সঙ্গে শুকনো সম্পর্ক আছে তার । স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করতেও মন চায় না । চায়নার মন ভাল, শরীর ভাল, কিন্তু গায়ের বর্ণ কালো, দূরে চলে গেলেই এক আকর্ষণ পিছু টানে । কালো পাখি ফিপের কাছে ফিরে যেতে মন চায় । কিন্তু কিছুতেই যে কিশোরকালের এক ডাকাতি কথা ভুলতে পারে না । পেশকারের মেয়ে বুড়ির মাকড়ি ছেঁড়া কানের স্পর্শে এখনও সে রোমাঞ্চিত হয়, অপরাধী হয়ে আছে যে । বুড়ির ‘আওয়া’ দুধের বর্ণ এখনও ভুলতে পারে না বৈতল, চায়নার পাখি রঙে জীবন চলবে না । তাই

পলায়ন । তিন, আগডুম বাগডুম না বকলে বৈতলের দিন কাটে না । রইদপুয়ানির চায়নার সঙ্গে তো মনমন একাকীর কথা বলা । লুলাকে যেমন, গালাগালি বকাবকি মারপিট করে নির্ভর রাখা যায় মন । বৈতল জানে পঞ্চাংগ রইদপুয়ানিতে লুলা কোনদিন আসবে না । বৈতল নিশ্চিত এবার পাবেই পাবে বন্ধুকে বইয়াখাউরিতে । চার, মা তো চলেই গেল ধেইধেই করে বৈতলকে একা ফেলে । মা ছাড়া জীবন যখন কাটাতেই হবে তখন মায়ের স্মৃতি নিয়েই বাঁচবে বৈতল । বইয়াখাউরি বাড়িতে যে মায়ের গন্ধে ভুর ভুর করে । মা তো মাই, শরীরের মা নেই তো কী হয়েছে, বৈতল তার সুখের কথাই মাকে শোনাবে, দুঃখের কথা বলে দুজনেই মন খারাপ করবে । দুয়ার ঐটে ঘরের ভিতর মায়ের বাতাসকে বৈতল বেরতেই দেবে না । আর পাঁচ, দিঘীর পারেও বৈতলের কাজ ফুরিয়েছে । যে- কাজের জন্য এসেছিল সেই শিক্ষাও নিষ্ফলা হয়েছে । মনসা পুঁথি আর সে গাইবে কেন । বৈতলের মা তো আই মনসার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল, তবে কেন বিষহরির অনুচরই বিষ ঢেলে দিয়ে গেল গৌরাঙ্গী মায়ের দেহে । মায়ের যে এত কষ্ট জীবনে, মা একবারও মর যাওয়ার কথা বলেনি , বাঁচতে চেয়েছে মা, ছেলেকেও শিখিয়েছে লড়াই করে বেঁচে থাকার শিক্ষা । তবে কেন, বৈতল যতক্ষণ না জবাব পাচ্ছে সে আর শ্রাবণের আনন্দে উদ্বেল হবে না । ঢলানি জিয়ানির উত্তেজনায় নেচে উঠবে না তার প্রাণ ।

মিরতিঙ্গার মাটিতে একবার গিয়ে মায়ের শরীরগন্ধ নিয়ে আসবে বৈতল । পাহাড়ের পাটপাথরে মায়ের সঙ্গে বসে আসবে, হারিয়ে যাওয়া প্রজাকুলকে বলে আসবে, বৈতল আছে যেমন ছিল । জেনে আসবে কে করেছে মুখান্নি । বৈতল নেই, লুলা তো ছিল মায়ের পাশে । ঝড়ফুঁকে যখন বাঁচাতে পারেনি মুখান্নি তো করতে পারত । মা ওকে সম্ভানস্নেহে ভালবেসেছে । বলেছে,

--- আমার দুই পুত রাম রহিম ।

সাপে কাটা মড়া তো কেউ শ্মশানে নেয় না । জলে ভাসায় । তার মাকে কি তবে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে । কলাগাছের ভেলায় দুলে দুলে ভাটি বেয়ে মা কি তবে স্বর্গে পৌঁছে গেছে । পথে, নদীর ঘাটে, জঙ্গলে কি বাঘরূপী নেতার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ধনামনা জুয়াড়ি ধনপতি কিংবা গোধার দেখা কি পেয়েছে মা । বৈতল অনেক রাতের স্বপ্নেই মাকে দেখেছে বিষহরি আইর সঙ্গে । হাসি মুখে উঠে এসেছে মা ভেলা থেকে । রইদপুয়ানি বিয়ানিবাজার

যাওয়ার পরই অলৌকিকে বিশ্বাস হারিয়ে যায় । করাতি গুরু আর জল্লারপার সিলেটর অনন্ত সাধু তার সুখের স্বপ্ন সব ভেঙে চুরমার করে দেন । বলেন,

--- অলৌকিক কিছু নাইরেবা । দুনিয়াত যা দেখরায় অতাউ হাচা এর বাইরে কিছু নাই ।

--- তে যে আপনে মনসামঙ্গল গাইন নাচইন ।

--- অয় কইছ ঠিক অউ । অলৌকিক নাই এর লাগি মানুষ নাই নি । মানুষরে খুশি করন লাগব । ধর্মকর্ম করে মাইনষে, করিয়া যদি শান্তি পায়, কাড়ি লাইতাম নি । এর থাকি ভালা কিছু থাকলে কইলামনে ধর্ম করিও না । কামলা হকলে, হালুচা হকলে কিতা করত কও, একটু যদি খুশি হয় শ্রাবণীর সময়, অউক না । আর ই পাচালিত দেখছ নি মজার মজার সব মানুষ আর তারার গপ । স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা নদী দিয়া, ভুরা বাইয়া যায় গণ্ডকী যায় দক্ষিণ সাগর । লৌকিকের মাঝে অলৌকিক দেখা কুণু দোষর নি । অউয়ে সকালে উঠিয়া নমাজ পড়ইন মুসলমানে, এর থাকি ভালা কিছু দিতায় পারবায় নি ঘুম ভাঙানির মন্ত্র ।

আর একজন আছেন অনন্ত সাধু, তার কথা আরো সোজা । বলেন,

--- মাইনষর খালি ক্ষুধা, পেট ভরলেউ অইল । এর লাগিউ ইনকিলাব জিন্দাবাদ ।

একজনের সরাসরি শিষ্য সে, আর একজনের একলব্য ! গুরু সৃষ্টিধরের সিলেটের বন্ধু । দুজনেই নতুন করে ভেঙেচুরে গড়তে চেয়েছেন বৈতলকে । অলৌকিকের প্রতি অভিমানে বৈতল দুজনকেই ছেড়ে দেয় ।

বইয়াখাউরিতেও চমৎকার অপেক্ষা করে থাকে বৈতলের জন্য । বৈতল মাকে ফিরে পায় না কিন্তু লুলাকে পায় । সেই লুলা, ধলা ফক্ফকা মনের অভিমানী বন্ধু বৈতলের । রুল আমিন বেজ , ধর্মকর্মে মতিহীন লুলার ঠিকানা এখন এনায়েতপুর কবরখানায় । সবুজ ঝুঁয়াপোকাকার রোঁয়ার মতো দাড়ি ছিল ছেড়ে যাওয়ার সময় । এখন তাকে চেনার উপায় নেই, থুতনির নীচে এক খাবলা সাজানো দাড়ি, মাথায় সাদা টুপি । বৈতল না লুলা কে যে কাকে প্রথম দেখে চিনতে পারে সে-বিতর্কে না গিয়ে লুলাই শুরু করে গালাগালি পর্ব । বলে

--- শুওরর জনা । হালার হালা । ভুলি গেচছ, নানি ।

উল্টো অভিমানের তর্কে জড়ায় না বৈতল । বলে,

--- আমি ভাবছি তুই আমার বাড়িত আচ্ছ । বাপে কুণু খেদাই দিব নি ।

--- তোর বাপ, মৌসা ইগু পাগল । আমারে ইবারও খেদাই দিছে । কয় বাঙালরে বাড়িত থাকতে দিত নায় ।

--- এর লাগি তুই দাড়ি আর তকি লাগাইয়া বাঙাল অই গেলে নি ।

--- না বে । ইতা ভেক ধরন লাগে । পেটর লাগি । পরে কইমু নে ।

--- পরে কিতা কইতে অখনঅউ ক । ইতা কয়বরো উয়বরো থাকন লাগত নায় । আমার লগে থাকবে তুই । তুই কিতা করছ, সাপ ধরছ নি ।

--- ইতা ছাড়ি দিছি । অখন আমি চুঙা ফুকাই ।

লুলা বৈতলের বাড়িতেই থাকতে এসেছিল । বাপের তারা খেয়ে চলে যায় পিয়াইন নদীর পারে এনায়েতপুর । কবরের ভিতর এক ফকিরের মাজার । মুসাফির থাকার মোকামও আছে একটা । কয়েকজন মিলে একসঙ্গে থাকে । বৈতল লুলার ভেকের কথা জানতে চায় । বলে,

--- কছ না বে কিতা করছ ।

--- কিতা আবার । কবিগান করি । গাউয়ে গাউয়ে ঘুরি আর প্যার মোহব্বতর গান যোগার করি ।

--- কিলাখান ক চাইন । হিন্দু ছুকরি আর বাঙাল পুয়া, না হিন্দু পুয়া বাঙাল পুড়ি ।

--- দূর বেটা । বাজারো বাজারো ঘুরিয়া চাইর পাতার কবি বেচি দুই পয়সা দিয়া । হিন্দু বাঙাল মিলাইলে মাইনষে কল্লা লামাই লিবা । অখন আর হিদিন নাই । আমি কই, কুতুবে লেখি দেয়, ছাপাই আনে যেণ্ডয়ে তারেও দেই ।

--- তেও তো তুই কররে । আমি পানির বেঙ আছলাম, আবার পানিত পড়মু ।

জল বৈতলকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে । জলে জন্ম জলকে ভয় করে না বৈতল । ব্যাঙ এ মুতলে বন্যা হয়, বিল হাওর টাইটুম্বর হয়, ভাসিয়ে নেয় সব কিছু, কই মাছের মতো কানে হেঁটে ফিরেও আসে একদিন । যেমনকে তেমন হয় । জলের কোনও ক্ষতিও হয় না । কিন্তু ঘরবাড়ি মানুষের বসত নষ্ট হয় সাময়িক । জলের ভয়েই কই বাপ হাওরের পারে টঙ বানিয়েছে স্বার্থপরের মতো । দুই গাছের মাঝখানে এক মাচান । ওখানেই থাকে সর্বক্ষণ । কেন, কোন উদ্দেশ্যে কে জানে, বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে, শন বাঁশ খুলে গেছে, আকাশ দেখা যায় । মেরামতির খরচ খরচা বাঁচাতে কি । বাপ বলে,

--- কে ইতা দেখিয়া রাখত, লেপাপুছা করত । তুইও আইয়া থাক টঙর উপরে । বিয়া করিয়া যাইছ গিয়া ।

--- আমি বিয়া উয়া করতাম নায় । করিয়া তুমার মতো অইতাম নি ।

--- কেনে, আমি কিতা করছি ।

--- ইতা বাদ দেও, কও লুলারে থাকতে দিলায় না কেনে ।

--- কেনে দিতাম বাঙাল ইগুরে । আমার বাড়ি !

--- তুমার বাড়ি কিতা, আমারও বাড়ি ! হিগু থাকব !

--- ঢুকাইলাছ না, ইতায় অখন সব হিন্দুর বাড়ি নের গি ভুলাই ভালাই । সব বুলে বাঙালর অই যাইব ।

--- লুলা ইলাখান নায় । মাইনষে কর তুমি পাগল অই গেছ । তুমারে আমি চিনি । তুমি যে সেয়ানা ।

--- কিতা চিনছ । পাগল না অইলে কেউ টঙো থাকে নানি!

--- ইতা ঢঙ তুমার । আমি জানি ।

--- জানছ তে জানছ । অখন ক তোর কিতা হিসাব কিতাব । কইয়া যে গেলেউ গেলে ।

তার মানে, বাপের মনেও উচাটন । জানতে চায় হিসাব । হিসাবের কথায় বাপ উত্তেজিত হয় । যেন বেঁচে থাকার নতুন উদ্যম খুঁজে পায় বৈতলের হিসেব – কথায় । বৈতল কোন জবাব দেয় না । জঙ্গলে যায় লুলাকে নিয়ে । বরগা কাটে, খুঁটি পুঁতে সুন্দিজালির বেত দিয়ে নতুন করে বাঁধে তিন কোণা মাড়লই । নতুন পুরনো শন মিশিয়ে দেয় ছানি । মুলিবাঁশের খাপ কেটে বেড়া দেয় ঘরের বাইরে । ঘাটালাগায় বাইরে, দরজা লাগায় ঘরে ।

টিলার উপর চান্দকপালিকে দেখে বৈতলের চোখ ছলছল করে । গরুর বাচ্চাটি বড় আদরের ছিল মার । বাচ্চার মা সারাদিন শরীর চাটত চান্দকপালির । মা টিলার উপর নিয়ে যেত বাচ্চাটিকে, ডিগরা দিয়ে আসত । বাপের তো কোনও কাজ নেই শুধু হাওরে যাওয়া, মাছ মারা, গুটকি দেওয়া । এখন আর ডিগরা দেওয়ার কেউ নেই, চরে খাচ্ছে একা একা । বৈতল হান্সা ডেকে ফিরিয়ে আনে বাড়িতে । বাপ দেখে বলে,

--- এইন এখন আমার নায়, ছাড়ি দে । টিল্লার উপরে দিগম্বররে বেচি দিছি । কে দেখত ।

মা নেই, চৈ চৈ ডাক ও নেই বাড়িতে । সন্ধ্যা হওয়ার কত প্রস্তুতি । হাঁসের ঘর ভাল করে বন্ধ না করলে শেয়াল নিয়ে যাবে । পাটনি বাড়িতে এখন হাঁস নেই, জাল নেই, পলো নেই, কিছু নেই । মায়ের সংসারে কত পোষ্য । চালের নিচে পায়রার খোপ । পায়রার ডিম কে ডিম বলে না মা, বলে পাথর । না হলে যে ভোলা হয়ে যায় । ভোলা মানে নষ্ট । পাথর ফোটে বাচ্চা বেরোলে চোখে চোখে রাখে । কাক আর দুষ্ট বিড়ালের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে । পনেরো দিনের পায়রার ঝোল রাঁধে মা গোলমরিচ দিয়ে, বাপেরও খুব পছন্দ । ছাগল পালে মা, ছাগলের পরুষ বাচ্চা নধর হলেই বলি দেওয়া হয় রামদা দিয়ে । বাপ কেটে ছাড়িয়ে কিন্তা পাতায় ভাগ করে রেখে দেয় । চাঁদাওয়ালা গ্রামবাসী এসে নিয়ে যায় মচা । চান্দার পয়সার ভাগ পায় মাও । নারকেলের মালায় পয়সা জমিয়ে রাখে মা । মাড়লইএ ঝোলানো থাকে শীতের কাঁথা, তার উপর দড়িতে লাগিয়ে রাখে আধখানা নারকেল মালা । ইঁদুর যাতে না নামে । সেই নারকেল বাটিতে থাকে মার ঝনঝনানো তহবিল । আর বৈতল উঠিয়ে নেয় যখন তখন । মা জানে সব, কোনোদিন কিছু বলে নি । হেমন্তের সময় টাকার দরকার পড়ে, হাওরের জল শুকিয়ে জায়, বসে বসে খাওয়া । বাপ বলে,

--- বেটির কাছ থাকি একটা টাকা আন চাইন ।

মা কোথায় পাবে টাকা। সব তো উধাও। মা বলে,

--- আমি কই পাইতাম টেকা।

বৈতলের জমিদারি তার মা। বৈতল তার মায়ের সত্যবাদী পুত্র, মাকে বলে দিয়েছে তার অপকর্ম কথা! মা এত দুঃখেও হেসেছে। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলে,

--- জানি। তর লাগিউ রাখছি।

মায়ের থেকে দূরে গেলেই বৈতল নষ্ট হয়ে যায়। শয়তানি বাড়ে। কত কিছু করে একা একা। কেউ যখন তাকে কিছু দেয় না তখন চুরি করে বৈতল। লুলাকেও পেয়ে যায় সঙ্গী। শেখার মধ্যে শেখে পুঁথি পড়া, চামর হাতে নাচ, ‘নাচে সুন্দ্রি, রঙ্গে ভুলিলা দেব ত্রিপুরারি।’ ওঝার কাছ থেকে অন্য কত গান শেখে বৈতল। ওঝা শেখান, ‘ডিঙা বাওরে কাগুরী’। কে কাভারী কিছুই জানে না। শুধু জানে ডিঙা ভাসে জলে। আর তার মাকেও ভাসিয়ে দিয়েছে ডিঙায়। কাগুরী কি কেউ আছে যে ফিরিয়ে দেবে তার মাকে। তুফান উঠতে দেখেছে বৈতল বারবার। তার নৌকোয়ই কেন বারবার জানে না। যুবতী শরীরের তুফান দেখেছে চায়না সুন্দরীর বুকের প্রদীপে। ভয় পেয়েছে, পালিয়ে এসেছে তার জলের জীবনে! তার প্রতিক্ষায়। যেখানে সে প্রতিপালিত হয়েছে। যা তার জন্মগত। জল দিয়ে জীবন বাঁচে, জল তাকে বাঁচায়। একটু গভীর হলে হলও, তখন সে মহাবীর। জল বৈতলকে বাঁচতে শেখায়। জলকে প্রতিপক্ষ করে শুরু হয় বৈতলের নতুন লড়াই।

এত যে সাজগোজে তার মায়ের বাড়ি আবার গড়ে তোলে বৈতল, সেও তো চলে যায় জলের তলায়। বন্যার জল চৌকাঠ পেরোতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মন। বাপের বেটা বৈতলের শরীর খলখলিয়ে ওঠে এক অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে! বাপ তার লড়াইতে ভুলে গেছে। জলকে ভয় করছে বাপ। তাই টঙ বানিয়েছে হাওরের পারে। জলেও থাকবে আবার জলের দূরত্বে থাকবে। হাওর বাঁওড় বিল সবখানে যখন সসাগর জল, তখন বাপ টঙ থেকে ডাকে বৈতলকে,

--- উঠি যা, উঠি যা রে! উঠিয়া আইয়া কর তোর হিসাব কিতাব।

যে-বাপ নির্দেশ দিয়েছে শুধু, পালিত হওয়ার জন্য। সেই বাপ এখন অনুন্নয় করেছে। ভয়কাতুরে বাপ শূন্যে বসে জলের প্রকোপ থেকে বাঁচতে চাইছে। বৈতলের বাপ হাড় হিম-

করা কণ্ঠস্বর বলেছে ‘হেই বৈতল, পানিত লাম’ সেই বাপের কণ্ঠে এখন জড়তা । হিসাব
কিতাব শেষ করে কি তবে মুক্ত হতে চাইছে । বৈতল তার মুক্তিদাতা । বোঝাপড়ার গুপ্তধন
নিয়ে বসে আছে বৈতল ।

জল ডিঙিয়ে বৈতল বাপের খাঁচায় ওঠে । তিন দিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া জলঘর ।
বাপের পাশে বসে বৈতল, অনেকদিন পর কাছাকাছি পিতাপুত্র । বাপের সঙ্গে বসে বৈতলের
মনে পড়ে কত কথা । সে-রাতেও ছিল দুর্যোগ । বাপ তার খলুই এ আলদের বাচ্চাকে ঢুকিয়ে
দিয়েছিল । পরদিন গল্প বলেছিল ছয়ত্রিশ বাংলার বন্যার । এমনি এক গাছের উপর বসেছিল
তিন দিন তার বাপ । বাপের পাশে ছিল এক আলদ । ভীতু ভয়ঙ্কর । শ্বাসনালী টিপে
মেরেছিল তাকে বাপ । বেইমানি করেছিল বাপের সঙ্গে । অনেকদিন পর বৈতলের ঘ্রাণ নেয়
বাপ । বলে,

--- আমারে ঠেলাইরে কেনে, পড়ি যাইমু নু !

--- সরিয়া বও । পড়লে কিতা অইব, পানিত অউত্ত পড়বায় । তুমি অইলায় পানি ডাকাইত ।
আবার উঠবায় । তুমি বলে বিয়া করতায় আবার ।

--- তোরে কে কইল ।

--- ইতা কওন লাগে নি । তুমি যখন লুলারে থাকতে দিছ না তখনঅউ বুঝছি । মাইনষে যখন
তুমারে পাগল কইছে তখন অউ বুঝছি । আমার মার চান্দকপালি যখন দিগম্বর বুড়ারে দিছ
তখন অউ বুঝছি ।

--- কিতা বুঝছস ।

--- বুড়ার কালা পুড়িরে বিয়া করতায় ।

--- অউ নি তোর হিসাব ।

--- না, তুমার হিসাব । অখন কও কে বেইমান, তুমি কুন ইমানদার, আমার মার লগে ই
বেইমানি কেনে করতায় ।

--- তুই আইচছ, অখন ইতা ভুলি গেছি ।

--- তুমি কিছু ভুলো না বুড়া ।

--- অখন ভুলন লাগব । জানছ নি সব জমি নু নিবো গিয়া ।

--- কে নিত ।

--- কেনে লীগে । আমার আর ক কিতা নিত । তেভাগা হকলে লড়া হালুচার লাগি ।

আমরার তো পানি, পানির কিতা ভাগ । আমরা কেউর নায়, কুন পক্খতঅউ নাই ! তেভাগা নাই লীগ নাই । লীগে কয় সব জমিন মুসলমান চাষীর অইব । অউক আমার পানি তো আমার অউ থাকব ।

বাপের উল্টোপাল্টা বকবকানিতে বিরক্ত হয় বৈতল । আগুনের মতো ছড়াচ্ছে গুজব চারদিকে । তবে গুজবের ভয়, লীগের ভয়, হিন্দু মহাসভার ভয়, তেভাগার আশ্বাস কিছুতেই কিছু যায় আসে না বাপের । বাপের ভয় বৈতলকে । এই রাতের আঁধারে বৈতল কেন উঠে এসেছে টঙে । এমন দুর্যোগের রাতে বৃদ্ধ পিতা ভরসা খোঁজে যুবক সন্তানের কাছে । ঘোর অন্ধকারে আলোর আশ্বাস খুঁজে পায় পুত্রের শরীর স্পর্শে । বৈতল যত বাপের কাছাকাছি হয়, বাপ ততই সম্ভ্রান্ত হয় । বৈতল বাপের ভুল ভাঙাতে প্রতিবাদ করে । বলে,

--- মিছা কথা । হিন্দুহকল কিতা অউ পচা পানিত ভাইয়া আইছইন নি । ইতা হুদা মাত ! পানির মালিকও আমরা নায় । ইতা অউ নিশি পাল আর হুরমত আলির মতো বড়লোকর । যারা হাওর ধরইন, বিল ধরইন । আর আমরা মরি । তেভাগা আমার চাই, পানির ফসলের তিনভাগ আমার ।

রইদপুয়ানি গ্রাম থেকে বিয়ানিবাজার এসে চুঙাওয়ালা অনন্ত সাধুর লেকচার শুনেছে বৈতল । গরীব মানুষ হিন্দুস্থান পাকিস্তান বোঝে না । তাদের পেট ভরলে তো অন্য চিন্তা । কিছু চালাক মানুষ গরীবকে বিভ্রান্ত করেছে, বলেছে তিনভাগ নয় মুসলমান পুরো ফসলের ভাগ পাবে পাকিস্তান হলে । লোভের কাছে যুক্তিবুদ্ধি খাটে না, নারায়ণে তকবির হয় । তবু অনন্ত সাধু আর সৃষ্টিধর ওঝার মতো মানুষরা বুঝিয়ে যাচ্ছেন, ধাপ্পার রাজনীতিতে যে সরকার চলতে পারে না বুঝিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের পর গ্রামে চুঙা নিয়ে । বেঁটেখাটো অনন্ত সাধু এখন কৃষককে

এক নতুন জিগির শিথিয়েছেন ইনকিলাব জিন্দাবাদ । বৈতলও খোলা মাঠে দমভোর জিগির দেয় । বাপকে বলে,

--- সিলেটো ইতারে বিটলাইয়া কয়, টাউনক্লাব জিন্দাবাজার ।

--- তুই গেচছ নি সিলেটো ।

--- না । আমি গাউআলা পুয়া টাউনো গিয়া কিতা করতাম ।

ছেলের চ্যাংটা চ্যাংটা লেকচারে এমনিতে বাপের ভয় বদলে যায় রাগে । বলে,

--- তরে ইতা কে শিখাইল ।

--- কে আবার শিখাইত । নিজরতা মাইনষর নিজর অউ বুঝন লাগব ।

--- তুই কইচছ হিসাব করতে আমার লগে । অউ নি তর হিসাব ।

--- অয় ইতাও হিসাব ! হক বুঝিয়া নেওয়া ।

--- তর আর হক কিতা । পাটনির পুয়ার আছেউ কিতা, যাইতউ কিতা । এক তেনা ।

--- হক্কলতাউ আছে । বড়লুকে জানইন নি কার অউগদা খাইন । ধান চাউল তরিতরকারি মাছ আমরা না দিলে ফুটানি কই যাইব পেশকারর পুড়ির ।

--- পেশকারর পুড়ি কিগুরে ।

--- ইতা এক মাতর মাত কইলাম । পুড়ির নাম হুনলে তুমার অখনও ফালায় ।

--- মুখ সামলাইয়া কথা কইছ বৈতল ।

--- কেনে কিতা করবায় তুমি ।

--- কিতা আর করমু ক । আইচ্ছা হুন, কে জিতব ক চাইন । লিগ না তোর চুঙা আলা ।

বয়স বাড়লেও ভোটের রাজনীতি বোঝে না বৈতল । অনন্ত সাধু তো বলেছেন তারা ভোটে লড়তে চান না, জমির আন্দোলনে কৃষকের সঙ্গে থাকতে চান । তাই বৈতল ব্যক্তিগত উত্তরই দেয় বাপকে । বলে,

--- ফালাড কমঅউক । তখন বুঝা যাইব । অখন তো সব সমান । আলদর দাতোও বিষ নাই,
তোমারও গাত তেল নাই ।

বাপ ফুঁসে ওঠে । বলে,

--- কিতা কইলে, আমার গাত তেল নাই ।

--- নাই । বুড়া অই গেছ । আর চেপ্টা করলে আলদদি মারাইতায় পারতায় নায় । আমি ভুলছি
না কিচ্ছু । আমারও জন্ম ছয়ত্রিশ ইংরাজির গুলাত ।

--- তুই তোর মার মতো কতা কইচ না বৈতল । হিদিন পারছি না, আইজ মারি লাইমু তোরে
। জানছ তো কথাত আছে, মায় বানায় ভূত, বাপে বানায় পুত । তুই ভূত অইচছ । আমার
পুত অইলে ইলাখান অইলে নানে ।

বৈতলও রাগে অথর্ব বাপের উপর, বলে,

--- মার না বেটা মার । আমার মারে মারচছ, অখন আমারে মার ।

টঙ ভেঙে মরেছিল বৈতলের বাপ সে-রাতে ।

সতেরো

মা গেল বেঘোরে, বাপও গেল । অনাথ বৈতলের পিছুটান আর কিছুই রইল না
বইয়াখাউরি গ্রামে । অস্থির সময় বৈতলকেও আরো দুরন্ত করে তোলে । বন্ধু লুলাকে প্রাণপণে
কাছে পেতে চায় । গ্রাসাচ্ছাদন আর জীবিকা পরিবর্তনের লড়াইএ লুলাকেও খুঁজে পায় না
বৈতল । বেজগিরিতে অবিশ্বাস ছাড়া কিছু নেই বলেছে বৈতলকে । এর থেকে এই কবিগানে
সম্মান বেশি । গ্রাম সিলেটের মানুষের কাছে এখন আর সে লুলা বেজ নয় । জড়িবিটি রং
করে বুজরুকের কারবার সে আর করে না । তার কবিগান শুনে গ্রামের মানুষ, হাটুরে মানুষ
থমকে দাঁড়ায় হাসে কাঁদে এক আনা দিয়ে কিনে নিয়ে যায় চার পাতার বই । তার নামও
পাল্টে নিয়েছে, এখন সে দিলবাহার বাঙাল । অবাক বৈতল বলে,

--- ইতা কিতা বে । তুই তো রুল আমিন শেখ । আকুতা ই দিলবাহার বাঙাল অই গেলে
কেমনে ।

--- অই গেলাম আরি । জানছ নানি গপ, সবর অউ চিৎ অইয়া ঘুমানির শখ হয় । আমিও
জাতো উঠছি । গত বছর আমি বেজ আছলাম, ইবার আমি শেখ, আগামী বছর আমি সৈয়দ
অইমু । আমি বাঙাল অই গেছি । ইতা কুতুবর কাম । কইল কবির নাম সুন্দর সান্দর না
অইলে মা'নে পড়তা নায়, কান্দতা নায় ।

--- তর কুতুবরে কইছ, আমার লাগিও একটা সুন্দর নাম দিত ।

--- এ, কুতুবে কিতা করত, আমিউ দিলাইমু নাম, নে তোর নাম অখন সুখবাহার । কিন্তু
বাঙাল লাগানি লাগব ।

--- লাগাইমু । তুই আইও , তোর লাগি বাড়ির ছানি দিলাম, বেড়া লেপলাম । তর কিতা মতলব ক চাইন , আমার লগে থাকতে নায় নি ।

--- না বে কুতুবরে লইয়া কিতা করতাম । ইগুওনু আছে আমার লগে ।

--- তে কিতা অইছে ইগুরেও লইয়া আইও ।

--- না না । এর থাকি এক কাম কর । তুইও আইও পিয়াইনের পারো । আমি থাকমু কয়বরো, তুইন থাকবে শ্মশানো । ইলাখান লাগালাগি কয়বর শ্মশান সারা সিলেটো নাই । আইও থাকমুনে দুইজনে ।

--- কেমনে থাকমু । তরে শ্মশানো ঢুকতে দিব নি ।

--- তে তুই আইঅইছ কয়বরো আমরার ইতা মানামানি নাই ।

--- কইরে নি । আইতাম । না বে শ্মশান কয়বর ইতা আমার ভালা লাগে না । ডর লাগে মরার আগে মরতাম কেনে । একেবারে আইমু । তুই থাক তর কয়বর আর কবি লইয়া । মাঝে মাঝে আইছ ।

নদীর গায়ে পাশাপাশি হলেও একটা প্রাকৃতিক বিভাজিকা আছে শ্মশান আর কবরের । সুরমার গায়ে শ্মশান আর পিয়াইনের গায়ে কবর । বইয়াখাউরি থেকে অনেক দূরে । কথার কথা বলেছে বৈতল, সে ভয় করে না কিছুর । শ্মশান কবরে কী ভয় । বরং এরকম জায়গা নিয়ে বৈতল অন্যকে ভয় দেখাতে পারে । আসলে বাড়িটার প্রতি একটা টান আছে বৈতলের । মাতৃস্মৃতি ছেড়ে আর নড়তে চায় না ।

জেলা সিলেটের একমাত্র দুঃখ তার বন্যা । আর বন্যার সময় সুখের জায়গা হলো তার টিলাভূমি । বেশির ভাগ টিলাভূমিতেই এখন চা বাগান । সুনামগঞ্জ মহকুমায় চা বাগান নেই । সুনামগঞ্জের সুনাম তার জলের জন্য । তিন ভাগ জল একভাগ কিংবা তারও কম স্থল । জয়ন্তীয়া পাহাড় থেকে নদী এসে মিশেছে সুরমায় । পিয়াইন নদীর যখন তখন জলবমি হয় । উপত্যকা ভরিয়ে দেয় । সুরমার যেখানে পিয়াইন এসে মিশেছে , সেখানে প্রকৃতি আর ধর্মের এক অবাক সমন্বয় । পাশাপাশি দূরত্বের কবর আর শ্মশানঘাটের জমি অনেক উঁচু, টিলা না হলেও উচ্চভূমি । এই দুই অন্তিম গন্তব্যের মুখোমুখি এক সুউচ্চ

পাহাড় । পাহাড়ের নাম মালীর ভিটা । কেউ কেউ বলে মোল্লার ভিটা । কত কথা এই পাহাড় নিয়ে । রাজা গোবিন্দর আমলে এখানে মন্দির ছিল মা কালীর, সংক্ষিপ্ত হতে হতে মা কালী হয়েছেন মালী । পীরসাহেবের আগমনে ইসলাম ধর্মের প্রচারে মন্দির বন্ধ হয়ে যায় । মুসলমান অধীনে যায় অসাধারণ সৌন্দর্যময় এই উচ্চভূমি । মন্দির মসজিদ হয় বলে কথিত । আবার ফিরে পায় হিন্দুরা সম্প্রীতির হাত ধরে । মালী আর মোল্লা নিয়ে যতই মতভেদ থাকুক কেউ অধিকার যাচাই করে না । অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীকে জাগ্রত বলেই জানে অধিবাসীরা ।

বৈতল বন্ধুত্বের টানে, জলের ঠেলায় আবার লুলার কাছাকাছি হয় । বইয়াখাউরি ফেরার তিনমাসের মধ্যে দ্বিতীয় বন্যায় ঘরছাড়াদের সঙ্গী হতে মন চায়নি বৈতলের । দেখার হাওরের পারে উত্তর টিলার মনসামন্দিরের দুর্গতরা আশ্রয় নেয় । কিন্তু বৈতলের এক গোঁ, মনসার সঙ্গে আড়ি । তাই কালীমাতার সঙ্গে মিত্রতা । মালীর ভিটার সঙ্গে এমনিতেও যাতায়াত আছে বৈতলের । অমাবস্যার রাতে ওখানেই থাকে । বিভোর হয়ে কাটিয়ে দেয় রাত মন্দিরের সেবাইত গিরিবাবাকে গানের সুরে বিভোর করে গায়,

‘ বড় ধুম লেগেছে হৃদি কমলে

মজা দেখিছে আমার মন- পাগলে ।’

বাবাজিও শুদ্ধচিত্তে বৈতলের এনে দেওয়া জবা ফুলের অর্চনা দেয় মাতৃচরণে । আর মধুর স্বরে গায় গান,

দ্যাখনা চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে করতেছে কী কারখানা

হাস্য করে, আস্যে পোরে মত্ত মাতঙ্গ সেনা ।

আসব পানে মত্ত মন রোষে আরক্ত নয়ন

রাত বাড়ালে যুবক শিষ্য বৈতলের দিকে ন্যাকড়াজড়ানো ছিলিমটিও বাড়িয়ে দেয় । বৈতলকে বলে,

--- গাও, গাইলে দিমু নাইলে দিতাম নায় ।

বৈতলও মিষ্টি হাসিতে ভরিয়ে দেয় মায়ের মুখ । গায়,

গাইঞ্জা চিরল চিরল পাত

গাইঞ্জা খাইয়া মত্ত হইয়া নাচে ভোলানাথ ।

গিরিবাবার শালগাছের মতো বিশাল দেহের উপর জটার পাহাড় দীর্ঘ দাড়ি আর
কপালের রক্ততিলক দেখে বৈতল বোল দেয় ‘হর হর মহাদেব’। বৈতল জানে এই মানুষটির
সঙ্গে থাকলে সব দুর্যোগ কেটে যাবে । বিশালদেহী মানুষটার মিষ্টিভাষণেও আপ্লুত হয় বৈতল ।
ভাবে অভিভাবক এমনই হওয়া উচিত ।

একদিকে প্লাবনের জল, অন্যদিকে গুজবের বন্যা । কত মানুষের কত কথা । শুনে
শুনে বিরক্ত হয় বৈতল । এক পক্ষ ভীত , অন্য পক্ষ উল্লসিত । এছাড়াও একদল আছে যারা
শান্তিসুখে থাকতে চায় মিলেমিশে । বৈতল খোঁজে মানুষ । মানুষের মতো মানুষ, যে নেতৃত্ব
দিতে পারবে, দুর্বল মানুষকে বল দিতে পারবে । একজন শক্ত মানুষের আশ্রয় চাই । গিরিবাবা
পারেন, একমাত্র নির্ভর মানুষ এ তল্লাটে । নেশার ঘোর যখন জমে ওঠে বৈতলের তখন
অমাবস্যা রাত্রির মধ্যযাম । তখন বৈতলের শুরু হয় কথোপকথন ! বাবাজির পায়ে হাত দিয়ে
বলে,

--- আইচ্ছা বাবাজি ইতা ঠিক নি কথা ।

--- কী কথা বা ।

--- অউযে খেদাই দিব । ঘরবাড়ি নিব গি ।

--- শুনা কথাত বিশ্বাস করিও না । অইলে তো অইবউ, কিতা করবায়, গুলার পানি
আটকাইতায় পারবায় নি ।

--- সিলেটও পাকিস্তানো যাইব গি । আমরার সুনামগঞ্জও ।

--- অ বা বৈতল । হিন্দুস্থান পাকিস্তান দিয়া আমরার কিতা কও । গরিবর হক্কল খানোউ কাম
করি খাওন লাগব । তুমি তো ইলাখান মানুষ নায় ।

--- আমি চুকি না কুণ্ডুরে । কিন্তু একলগে যদি আইন তখন তো বেবস্তা রাখন লাগব ।

--- কিতা বেবস্তা ।

--- কয়েকটারে মারিয়া তো মরতাম ।

--- মারামারির কথা ভাবিও না । আমরা যেলাখান আছি মিলিমিশিয়া থাকমু । মার উপরে
ভরসা রাখিও ।

--- আমার মা নাই ।

--- তে এইন কে ।

বৈতল ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে দেখে করালবদনির চোখে মিটিমিটি হাসি । হাসির অর্থ
বোঝে বৈতল । কালো পাথরের মূর্তি থেকে উপহাসের জট খুলে ছুটে আসছে তার দিকে ।
বিদ্র ক করেছে । বলছে কাপুরুষ । বলছে অসমসাহসের বলিহারি । বইয়াখাউরির জলকে ভয়
পেয়ে পালিয়ে এসেছে করালবদনীর কাছে । বাপের আর্ত চিৎকার, বড় হাওরের জলে
হুড়মুড়িয়ে টঙ ভেঙে পড়া, রইদপুয়ানি গ্রামের ঘাটা খুলে বেরিয়ে আসা, সিলেটের সাদা মেয়ের
কান ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়া, এসব কোন বাহাদুরি । বৈতল মিথ্যে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে
মরিয়া চিৎকার করে ওঠে । বলে,

--- মিছা কথা, সব মিছা কথা । তাই আমারে চাকর কইছে, বাপে পুত মানে না, আলদ দিয়া
মারত চায়, আর কালো পুড়ি এগুরে বিয়া করিয়া আমি কিতা করতাম । পানি কম অউক আমি
যাইমু গি আমার বাড়িত । বাড়ি ছাড়িয়া আমি লড়তাম নায় । পাকিস্তান উকিস্তান আমি চুকি না
।

রাত বাড়ে জলও বাড়ে । মাতৃমূর্তিকে মনের কথা বলে নিরুদ্বেগ শুয়ে থাকে মন্দির
গৃহের এক কোণে । ঘুম ভাঙে লুলার গালাগালিতে । অকথ্য চিৎকারে লুলা বৈতলের গায়ে
লাথি মারে । বৈতল ওঠে । এত বড় সাহস তার । ভাল করে তাকায় ঘাতকের দিকে ।
চিনতে পারে না লুলাকে । এই কই তার প্রাণের বন্ধু রুল আমিন শেখ । দেখে লুলার
থুতনিতে পেয়াজের জড়ের মতো কালো এক মুঠো দাড়ি । বৈতল ভাবে লুলা ঠাটা করেছে,
আবার কোনো দুষ্ট পরিকল্পনা আছে, আবার বেরোবে কোথাও । বৈতলকে বলবে ‘চল’ ।
বৈতলও বেরিয়ে পড়বে । বৈতল তাই হাসি মুখে লুলার দাড়ি নেড়ে দেয় । বলে,

--- ইতা কিতাবে ,

‘এক বেটা যায় শ্বশুরবাড়ি

মাথা নাই তার পুন্দো দাড়ি ।’

--- তুই আক্তা দাড়ি রাখলে কিতা ।

--- দাড়ি রাখন লাগে । ইমানদার মুসলমান অইলে রাখন লাগে । তুইও রাখবে ।

--- আমার দাড়ি উঠে না ।

--- ইখানো থাকলে উঠানি লাগব ।

--- অই হালার হালা, তুই মন্দিরো ঢুকলে কেমনে ।

--- অখন মন্দির উন্দির কিচ্ছু নাই ।

--- কেনে ।

--- ইনো আমার মজিদ আছিল, কাফির হকলে মন্দির বানাইছিল মোল্লার ভিটাত । আমরা
আবার আজান দিমু ইনথনি ।

--- তুই নি দিবে আজান । বেজর বেটা অইতে মুয়াজ্জিন । কইতে পারবে নি আল্লা হো
আকবর কথার অর্থ কিতা ।

লুলার কণ্ঠ নয় অন্য এক গমগমে গলার আওয়াজ শোনে বৈতল মন্দির চত্বরে
ঘুমঘোরে,

--- ঈশ্বর করুণাময় । অখন উঠো রেবা, দেখ চউখ মেলিয়া চাইর দিকে । সব বাড়িঘর ডুবি
গেছে । কবর আর শ্মশানও ডুবি যাইব মনোলায় বিকালর আগেউ । কিচ্ছু করণ লাগব রেবা ।

কী করে বৈতল । সকালের স্বপ্ন যদি সত্যি হয় । তার বন্ধু যদি পাণ্টে যায় । পাণ্টাবে
কেন, লুলার মন একেবারে সাদা , চেরাপুঞ্জি চুনের মতো । বৈতলের মতো কুকড়ি নয় । প্যাঁচ
পয়জার নেই, একটু অভিমানী । বৈতলের কিল চড় লাথি না খেলে ঠিক হয় না । আসলে পাঁচ

বছরের ব্যবধানে, অদর্শনের দূরত্বে লুলার যে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছে তা মানতে পারছে না বৈতল । তাই সবসময় উল্টো পাল্টা ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে । গিরিবাবার কথার সূত্র ধরে তাই লাফিয়ে ওঠে বৈতল । বলে,

--- লুলা অগুরে লইয়া আই আগে ।

--- কই আনতায় ।

--- কেনে, মন্দিরো । মন্দির টিল্লা ছাড়া মাটি নাই কুনাখানো ।

--- আনতায় । মাইনষে যদি কিচ্ছু কইন । দেখো তুমি যেতা বুঝো । শ্মশানো একলা পুড়ি এণ্ড থাকে । আইত কও, সব আউকা, যেতা অইব দেখা যাইব নে । বিপদ থাকি রক্ষা অউক আগে ।

লুলা একা জলভূমিতে যেতে চায় না, বৈতল কুতুব সহ সব আবাসিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে । লুলা বলে,

--- তোর বাবাজি এইন বড় ভালা নানি রে । দেখলে কিন্তু ডর লাগে ।

--- আইবে নি ক ।

--- আইমু আইমু, পানি কয়বরর উপরে উঠলেউ যাইমু । হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করণ লাগব নানি ।

প্রলয় কাকে বলে জানে না বৈতল, তবে সে বুঝতে পেরেছে প্রকৃতি এবার ত্রুদ্ব হয়েছে । সৃষ্টিনাশ হওয়ার কথা বলেন বয়স্কজনেরা, জল যে – হারে বাড়ছে তাতে আর পায়ের তলার মাটি থাকবে না । সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে এসেছে দুপুরেই । চোখের দেখায় বেশিদূর দেখা যায় না । বড়জোর কয়েক পাড়া । কয়েক পায়ের দূরত্ব দৃশ্যমান । অনেক দূরের একটা আভাস শুধু চোখের সামনে । বন্যার জলের ধূসর, আর মাঝে মাঝে গাছগাছালির সবুজথোকা । আকাশে কালো মেঘের লড়াই থামছেই না, ঝমঝমানি বেশি করে শুরু হতেই বৈতল মন্দিরের ভিতরেও দেখে বন্যার প্রকোপ । পীড়িত মানুষ উঠে আসছে একজন দুজন করে । অসহায় জলবন্দী মানুষ এখনও ধর্মে জড়িয়ে আছে । সবাই মা কালীর ভক্ত । কুপি লঠনের আলোয় মা কালীর সামনে বসে জল্পনা করে সম্ভাব্যের । টিলার নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে অস্থির সময়ের

ভাবনায় কাতর হয় । কেউ বলে ওরা যদি দল বেঁধে ওঠে আসে । একা কতজন অসহায় মানুষকে আক্রমণ করলে কী হবে । কেউ বলে, জবাব হবে । কেউ বলে নিচে কবরের ভিতর লাল ফকিরের মাজারে ওরা জড়ো হয়েছে । আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে ঐ নিচে । কেউ একজন দেখে এসে সত্যতা নির্ধারণ করে । ভীত মানুষকে বরাভয় দিয়ে গিরিবাবা বসেন পূজায় । বাবাজির মুখে এক উজ্জ্বল আলো, কালো মায়ের মুখে তাকিয়ে যেন কাতরে কিছু বলতে চান । পাশে বসা বৈতলকে ডেকে বলেন,

--- চিলিম সাজাইছ নিবা । চিলিম সাজাইয়া গাও, ‘সমরে নাচেরে শ্যামা শিব সীমন্তিনী’ ।

নৈবেদ্যের ভজিতে চিলিম সাজিয়ে ন্যাতায় জড়িয়ে জোড় করে বৈতল বাবাজির হাতে দেয় । অচিরেই ফেরত পায় বৈতল । এক চিলিমে যেমন তেমন হতেই বৈতল বোল দিয়ে ওঠে ‘বোম বোম বম্বালে’ । কুড়ি কণ্ঠের প্রতিধ্বনিও ওঠে ।

আল্লা হো আকবরের জিগিরও ওঠে কোথাও । এবার তাহলে সম্ভাবনা সত্যি হয়ে ওঠে । ‘হায় হায়, গেল গেল’ করে ওঠে সমবেত শরণার্থী । গিরিবাবার মুখেও এবার আতঙ্কের ছাপ । এ কই সত্যি জিকির নাকি সুরমা পিয়াইনের সম্মিলিত আক্রোশধ্বনি । বাবাজি বৈতলকে ডেকে বলেন,

--- তেউ । কিতা অইব বা বৈতল বাবাজি ।

--- কিতা আর অইব । এমনে ছাড়ি দিমু নি ।

--- ইতা কিতা কও, কত মানুষ তারার । সব গাউউতো তারার । এক কাম করণ লাগব, মন্দিরর পিছে দি গিয়া সুরমাত ঝাপ দেওন লাগব ।

বৈতল মন্দিরের পিছনে যায় । জলের শব্দ শুনতে পায় । বলে,

--- ডরানির কিছু নাই । এমনে মরতাম নায়, মারিয়া মরমু । এক একটারে মারমু আর পিয়াইনো ফালাইমু সুরমাত ফালাইমু, সোজা স্বর্গত যাইব, বেহেস্তু উয়েস্তু পাইত নায় । আপনার রামদা বার করইন বাবাজি ।

আঠারো

গিরিবাবা হাতজোড় করে বৈতলকে নিরস্ত করেন । বলেন,

--- বাদ দেও বা । তারার জিনিষ তারারে দিলাও । জমিদারে মোল্লার টিল্লা দখল নিয়া মন্দির বানাইছলা । অখন তারা গেছইন, লিগ আইছইন । তারার জিনিস তারা নেউকা ফেসাদ করিও না । জান বাচউক ।

ওদিকে তখন লুক্কার আলো দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট কবরের মাজার থেকেই উঠে আসছে উপরের দিকে । বৃষ্টির বেড়া ভেঙে ভেঙে উঠে আসছে উপরের দিকে । টিলার উপর এসে থেমে যায় সমবেত ভেজা মানুষের দল । লুক্কার আলোয় লুঙিপরা মানুষ বোঝা যাচ্ছে, মাথায় টুপি আছে কই নেই বোঝা যাচ্ছে না স্বপ্ন আলোকে । বৈতল ওদের দেখে গিরিবাবার দিকে ডাক পাঠায় । বলে,

--- ও হরি ।

সমবেত প্রতিপক্ষের কণ্ঠ থেকেও ধ্বনি ওঠে,

--- তুমরা নি ।

বৈতল দেখে লুলার নেতৃত্বে দুর্গত মানুষের দল মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছে । বৈতল লুলাকে ডাকে,

--- ইতা কিতা বে । আয় ভিতরে আয় । বাইরে থাকিয়া কত ভিঝতে ।

--- তুইন সকালে কইয়া আইলে নু । আমি গাউআলা হকলরে ডাকলাম ।

--- তে অত দেরি করলে কেনে, লইয়া তাউকাতাউকি ।

--- তারা আইতা কি আইতা না । একবার আউগাইন একবার কর লামইন । কইন তারার মন্দির নু । কইলাম চল যাই, বাবাজিরে জিগাই, জাগা দিলে থাকমু, নাইলে লামি যাইমু পানিত । যা বৈতল তানে জিগা । জাগা দিবা নি । আর কুন্স উচা জাগা নাই ইদেশো ।

একটু আগে সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে কাতর মন্দির সেবাইত হতভম্ব । ভিজে সপ্সপা মানুষদের দেখে কেঁদেই ফেলেন । বলেন,

--- আমরা ভাবছি তুমরা আমরারে মারিয়া খেদাইতায় আইছ । ইদেশ তো অখন পাকিস্তান অই গেছে, এর লাগি সবে ভাগের । আমরা কই যাইতাম ।

করিম বক্স সবচে' বয়স্ক । লজ্জায় মাথা নুইয়ে গিরিরাজ সাধুর কাছে এসে দাঁড়ায় । এদিকে লুলাও বৈতলকে কিছু বলতে চায় । করিম চাচা বলে,

--- উবাও রেবা, তোমার নাম কিতা, বাহার নানি । দিলবাহার । তুমি কইছলায় এর লাগি আইলাম । বুঝি লাইছি, চল যাই, পিয়াইন অউ আমরার গতি । আর কই যাইতাম কও রেবা সাধু । তুমারে তো হুন্ছি খুব দিলদার মানুষ । ইতা ভাবলায় কেনে । পাকিস্তান বনব এর লাগি মুসলমান অত বাদ নি ।

--- আমরা ভুল করছি, ডরাই গেছলাম ।

--- আমরা কই যাইতাম আছলাম কও চাইন । দেখরায় নি চাইয়া, চাও চাও লুকা হাতো নিয়া দেখ, ঘোলা পানির গর্জানি ছাড়া কিছু দেখরায় নি, পানিয়ে সব মিশাই দিছে । মুসলমান উন কিছু নাই, হিন্দুও নাই । শুকনার সময় অইব নে সব খেদাখেদির গপ । আর মারামারির ধুম । অখন চাচায় আপন পরাণ বাচাইতা । দুনিয়াত খালি তুমরার অউ মন্দির অউ রাখছইন আল্লায় । কও কিতা কেরামতি । খালি মাতবায় নি আদাপথো । থাকতে দিবায় নি কও । নাইলে তো কইছি সুরমায় দিবা জাগা ।

বাবাজি লজ্জায় একশেষ হয়ে জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধকে । দুজনের চোখের কোণের জলরাশি আলাদা করে চেনা যায় বৃষ্টিধারার মধ্যেও । চাচা বলেন,

--- অত আইঞ্জা মারিয়া ধরিও না । পানি লামলেউ খেদানির জিহাদো লামমু । তখন ।

--- আইচ্ছা । ইতা দেখা যাইব । অখন কও কিতা খাইবায় তুমরা । সিন্ধি বানাইমু নে, ভোগও দিলাইমু । কিন্তু অতজনর চাউল তো নাই । যেতা আছে এক মুইঠ খিচুড়ি খাইবায় গরম গরম । দুর্গায় বানাইব ।

--- দুর্গা । অউ শ্মশানর ভুড়ুং ঠাকুরর পুড়ি নি । তাইও উঠি আইছে । মা বাপ মরা পুড়িইগু বড় মায়াধারী রেবা বাবাজি ।

--- সব অউ আইছে । আরো আইবা । খাওয়াইমু কিতা ।

--- অত ভাবিও না । কিচ্ছু অইত নায় । পানি লামব ।

--- যদি না লামে ।

গিরিবাবা সাদাসিধে মানুষ, বেশি জেরা সহ্য করতে পারে না । বলে,

--- আমার বৈতল আছে, তুমরা ভাবিও না ।

‘বোম বোম বম্বালে’ বলা বৈতল এখন অন্য মানুষ । রামদা দিয়ে একটা একটা করে কাটার শিক্ষা তাকে গুরু সৃষ্টিধর দেন নি, দেন নি কালীমন্দিরের গিরিবাবাও । গুরু সৃষ্টিধর দেন নি শিক্ষা আর বৈতল গিরিবাবার কাছ থেকে পায় উৎসাহ । টেংরা মাছের ফুটকরার মতো ফুলিয়ে দেন বাবাজি । একা বতলের কাঁধে এতজন মানুষের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ায় বৈতল নিজেকে ধন্য মনে করে । বৈতল লুলাকে ডাকে । বলে,

--- অউ দেখরে নি বেটা পিয়াইনর উপরে ।

--- কিতা দেখতাম আন্ধাইরো কিচ্ছু দেখা যায় না । কেউ লুকা জ্বালার বউত দূর । ভোরা উরা বার ।

--- না বেটা, মনা রায় যাইরা, টান উপরে দেখরে নি তর লুকা, তাইন অউ দানিশপির । অউ দেখ আমার লাগি ভোরা পাঠাইছইন । ভুলি গেলে নি বেটা ।

লুলা ভুলে নি কিছুই । লুলা জানে বৈতলকে । বৈতলের শরীরে তখন তেজ । বৈতল লুলাকে দেয় হাঁক,

--- হেই লুলা, পানিত লাম ।

জলকে লুলার ভয় সবসময় । বাপ লুলাকে নাকানি - চুবানি খাইয়েছে জলে । তবে সিলেট জেলার ছেলের জলের সঙ্গে স্বাভাবিক সখ্য হয়ে যায় জন্মের সঙ্গেই । আর লুলার বাড়িও তো হাকালুকির পারে । খিত্তা গাওয়ার বাঙাল বৈতলের মতো দুরন্ত না হলেও জল চেনে । তাই বন্ধুর ডাকে লুলাও নেমে যায় জলে । দুজন মিলে অনিশ্চিতের উদ্দেশে ভেসে চলে, জলকে জয় করে । তেলাল শরীরের বৈতল জানে না কোথায় যাবে । লুলাও না । লুলা জানে বৈতল যখন ঝপাং মেরেছে তখন কিছু একটা আছে উদ্দেশ্য ।

লুলা বৈতল পরদিন ভোরের বেলা কলার ভোরায় চাল ডাল নুন হলুদ নিয়ে ফেরে । সবার সব প্রশ্নের জবাব ওরা রহস্য ভরে দেয় । কখনও বলে মাধবগঞ্জ, কখনও জাউয়া, কখনও রাউলি খুরমা । করিমচাচার শ্বশুরবাড়ি খুরমা । বলেন,

--- ই যত নাম কইলায়, এক মাধবগঞ্জ ছাড়া তো কুখানো বড়লোক নাই । ডাকাইতি করলায় নি তুমরা ।

অন্য একজন বলে,

--- ডাকাইতি করলে তো মানুষ মারন লাগে । মারছ নি কিতা ।

অনাবশ্যক জেরার মুখে বৈতলের রাগ হয় । বলে,

--- তুমরার আম দি কাম বড়া দি কিতা করতায় । আজারির মাত । খাইছ তো গরম গরম । তে চুরি করছি, কার বাড়ি থনে জানি না । কুমড়া কয়টা আর চাল থাকি চুনা কয়টা । ভাবছিলায় নি বো কুনিদিন হিন্দুর মন্দিরো পিয়াইজ রশুন ছাড়া খাইবায় । কিশমতর খানি দুশমনে খাওয়ায় ।

--- দুর বেটা, দুশমন করে কইরে । তুইন অইলে ফেরেশতা । আল্লায় পাঠাইছইন । খালি মানুষ উনুস মারিছনা রেবো, খানককা গুনাগার অইছনা ।

বৈতল জলের দিকে তাকিয়ে হাসে । বলে,

---অত মানুষ মরের পানিত । খানি পার না, আর মাধবগঞ্জর সেন হকলে দুই তালাত উঠাইয়া
রাখছে চাউল । আমার টিল্লাত কও কত মানুষ বাচের । পানি না কমলে আবার যাইমু ।
পাইলিছি মাত্তা । মনা রায় আর দানিশ পিরে দেখাইবা রাস্তা । ইবার খলিল আর আব্দুলরেও
লই যাইমু, বাস তুইও যাইবে । যোগেশ আর কার্তিক কই গেল । তারারও পুটকিত গুসা ।
কাইস্তর জাত গেছে, শিবনাথ পাঠনিয়ে খাওয়ার সময় ছইলিছে, এর লাগি খাইছইন না । অখন
বাঙালে দিলেও খাওন লাগব । পানি টানউক তারপরে জাত দেখাইছ বেটা ।

যোগেশ বৈতলের অকারণ অভিযোগ মেনে নেয় না । প্রতিবাদে বলে,

--- এর লাগি নায় । আমার ঠিক অউ পেট খারাপ । অউ চাচিরে জিগাও তান বাড়িত আমি
খাইছি না নি । তান পুয়া নুর আমার দোস্তু । না জানিয়া মাতিও না বা বৈতলদা ।

উপন্যাস

উনিশ

বিপদ মানুষকে একত্রিত করে, ভেদ ভাবনায় শত্রুতায় সামতিক বিরতি দেয় । বন্যার কবল থেকে বেরিয়ে গেলে সিলেট আবার উতপ্ত হয় । শ্রীমঙ্গল স্টেশনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে যায় । অনেক মানুষের মৃত্যু । তবে ভাটির দেশে বন্যার জল গেলেও জল থাকে । বৈতলও লুলাকে পেয়ে অন্য ভাবনায় মাতে । লুলাকে নিয়ে যাবে এবার বাড়ি , কোনও কথা শুনবে না । শুনলে মার কিরা দেবে । বইয়াখাউরি ছাড়া বৈতলের আছেই বা কী । মানুষ নিয়ে বড় আতান্তর । নানা জনে নানা কথা কয় । সদর সিলেট থেকেই সব গুজব ছড়ায় । শূনা যাচ্ছে বন্দরবাজার থেকে সব মাড়োয়ারি ভাগছে । শ্রীমঙ্গল থেকে প্রতিরোধ আসছে জোর, চাবাগানের সব শ্রমিক মদেশিয়া হিন্দু, সাহেব মালিক রাও প্রথমে মাড়োয়ারির কোম্পানির কাছে বিক্রি করার কথা ঠিক করেও আদমজীকে দেবে এখন । মৌলভী বাজার কুলাউড়া নিয়েও সংশয় । জল্লার পার সিলেটের অনন্ত সাধু খুব ছুটছেন এদিক থেকে ওদিক, জোরালো বক্তৃতা দিচ্ছেন সিলেটভাগের বিপক্ষে । বলেছেন, দেশভাগ মেনে নিয়েছে মানুষ । সিলেট কেন । সিলেট তো আর বাংলায় নয় । লুলাও ইদানীং রাজনীতি করছে খুব । বলে,

--- সিলেটও অইছে বাংলার মতো । বান্দরর রুটি । আসামো থাকলে প্রধানমন্ত্রী অইব বাঙালি । আসামি হকলেউ চাইরা না, গোপিনাথ বরদলইর ডর লাগি গেছে, এর লাগি গণভোট করি দিলাইলা পাকিস্তানো । হিন্দু হকলে ইতা চাল বুঝাইন না ।

বৈতল জানে রাজনীতি করে সে পারবে না । বোঝেও না । লুলার রাজনীতি আর ধর্মনীতির কথা শুনে তাই রাগে । সেন বাড়ির ডাকাতির পর আবার দোস্তি ফিরে এসেছে । আবার খুনসুটি শুরু করেছে, লাথি কিল চড় সব চালিয়ে যাচ্ছে যেমন করেছে মিরতিঙ্গার

পাহাড়ে । বৈতলের মার খেয়ে কোনোদিন পাল্টা মারে নি লুলা । লুলার কাছে বন্ধুর অধিকার
একএকজনের কাছে একএক রকম ।

বৈতল ওকে খুব মারে, যখন তখন মারে, বৈতল জানে লুলাকে মারতে মারতেই

ওর কাছে নিয়ে যাবে । না হলে ঐ কুতুব-এর মতো সাথীরা দখল করে নেবে । এখন
লুলা ছাড়া দুনিয়ার শাসন করার মানুষ নেই বৈতলের । ভালোমন্দ বিচার করার কেউ নেই ।
চাঁপার বরণ মেয়েটির গায়ে হাত দিয়ে যে অপরাধ করেছিল বৈতল, লুলার কাছে স্বীকার করে
। লুলা বলে,

--- তুইন গুনাগার ওই গেলে দোস্তু ।

চায়নার কথা বলায়ও একই কথা বলেছে । বলেছে,

--- তুইন কিতা চাছ ক চাইন । পেয়ার মোহাব্বত ইতাও তো লাগে । তে কেনে তাইর লগে
গপ করতে । ইতা উতা কেনে কিনি দিতে বিয়ানিবাজার থাকি ।

কী জবাব দেবে বৈতল । বোকার মতো বলে,

--- দিতাম আরি ।

লুলাই প্রথম আসল জায়গায় মোচড় দেয় । বলে,

--- ছুকরি ইগু কালা নি বে ।

--- একদম তসলার তলর রং ।

--- অউ বুঝছি, হউ পুড়ি ইগু তোর মনো পড়ি রইছে । সিলেটি ইগুরে ভুলতে পাররে না ।
খুব সুন্দর নানি, বাবুর বাড়ির পুড়ি । তুইন কিতা দেখছ নি নিজরে, কালা তো কালা বেটা
ধ্বজভঙ্গ । তর তো মুছও নাই ।

--- হিতো তরও নাই । খালি এক গাছা ছাগলা থুতার তলে ।

--- আমি পুড়িস্তর লগে এর লাগি একেবারেউ মিশি না । আমার ভাল লাগে না ।

--- আমি এখন কিতা করতাম ক । যাইতাম গিনি আবার পঞ্চখণ্ডত ।

--- একবার গুনা করচছ, করি লাইচছ, অখন দেখবেনে তরে চিনত নায় ।

--- তোর ইতা গুনা উনা ভাল লাগে না । সব কিছুত তুই গুনা দেখছ । এক কথাউ হিকচছ ।

--- আল্লার দুনিয়াত নেকি করণ লাগে ।

--- ফালাই থ তোর নেকি । চুরর মুখো রামনাম ।

সময় আস্থির হলেও বৈতল তার মতো থাকে । বৈতলের কর্মকাণ্ড বেড়ে যায় । ওর এখন দুই সংসার । সে আর তার বন্ধু লুলা । দুই বন্ধুতে বড় হাওরে জাল ফেলে মাছ ধরে । চুরি ডাকাতি দিন গুজরান হয় । লুলা কবির শোনায় বৈতলকে । বৈতল বলে তার ফিঙে পাখি নিয়ে কবি গান লিখতে । লুলা বলে,

--- কে ছনব । আমার কবি গুনে খালি মুসলমানে ।

--- তে এক কাম কর, আমারেও বাঙাল বানাইলা । হাসিনা তো আছেউ ।

--- আসল ইগু তো হাসিনা নায় । নাম জানি কিতা কইছলে ।

--- বুড়ি । ইতো ডাকনাম, ভালো নাম কিছু আছে একটা, খুব ভালো ।

--- অইব, লেখমু । তার নামেউ লেখমু । বুড়ি চলত নায়, কাননবালা দিলাইমু, আর তুই বৈতল অউ ।

--- ধুর বেটা কবিত কুনু নাম বৈতল হয় নি । বৈতলতো গাইল । হালার হালা বাপে রাখছিল, গাইল্লাইবার লাগি । মায় ডাকছে না কুনুদিন । এক কাম করিছ, দাড়িয়াপাড়ার পুড়ির নাম রাখি দিছ চামেলি ।

মালীর ভিটার গিরিবাবাও এখন বৈতলকে চোখে হারায় । কালীমন্দিরে এখন এক নতুন হাওয়া এসে গেছে । এখন আর জাতধর্ম নিয়ে খুব কড়াকড়ি নেই । বৈতল যায় সঙ্গে লুলাও যায় । রুল আমিন বেজও স্বনামে মন্দিরের প্রসাদ পায় । বাবাজিও রাজনীতির আঁচ নিতে দুই যুবকের সঙ্গে মন বিনিময় করেন । গণভোট শেষ, সিলেট- চলো আন্দোলনও শেষ । কুঁড়েঘর প্রতীক হেরে যায়, পাকিস্তান পত্নী কুড়াল এর জয় হয় । শ্রীমঙ্গল কমলগঞ্জ বড়লেখা কুলাউড়া আসামে থাকবে না, না পাকিস্তান যাবে স্থির হয়নি । কংগ্রেসি মন্ত্রী বসন্ত দাস কিংবা অনন্ত

সাধুর মতো নেতাদের বক্তব্যের তেজ কমে যায় ফল বেরোনোর আগেই । পাকিস্তানপন্থী মতিন চৌধুরী মনোয়ার আলি মৌলানা ভাসানী ও ময়নুল হক চৌধুরীদের দাপট বাড়ে । অনন্ত সাধু আর প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার সাহস পান না । গিরিবাবার মনেও সংশয় । আশার আলো কোথাও নেই । বলেন,

--- গণভোট অইছে, তে কিতা অইছে । এক মাসের ভিতরে সব ঠিক করা যাইব নি কুন্সু । পনর আগস্ট ভাগাভাগি অইব, এর মাঝে ঠিক করা যাইব নি । দিল্লীত প্যাটেলে কইছইন রাস্তা তো দেওন লাগব, কিছু থানার অদলবদল অইব । রেডক্লিফ সাহেবে অখন যেতা কইবা অইব । নেহেরুয়েও কইছইন এক কথা । মন্ত্রীসভা বইলে সব অইব । ইতা কিলানথান থম মারি বই রইছে ।

হিন্দুস্থান পাকিস্তানের গরমাগরম চলছেই । অসন্তোষ বাড়ছে মানুষের মনে । নিজে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে হিন্দু পাটনিদের গলার আওয়াজ বাড়ে । নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে,

--- কোন বেটায় খেদাইত । অউক না দেখি একবার ‘কুড়াল’ আলা, রামদা ঘষিয়া রাখছি, কল্লা উড়াই দিমু ।

কিন্তু মনের ভিতর সে-বল কোথাও নেই । জাদুকরের ভেঙ্কিবাজির মতো রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে মতটা । সে লোকটা আগের দিন বলেছে ভিটে ছাড়বে না । পরদিন সকালেই দেখা যাচ্ছে সে হাওয়া । বইয়াখাউরির ভীম পাটনির উপর ভরসা করে অনেক মানুষ । ভীম চলে যেতে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে । বৈতল রাগে মাটিতে থু থু ছেটায় বলে,

--- হালার হালা নেতা অইয়া ভাগল !

তখন গুজব ছড়ায় আগুনের থেকেও দ্রুত । আর সাহসে ভরসা করা মানুষের মনের আগুন জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয় । অসহায় হয় ।

সিলেটের লিডার অনন্ত সাধু চলে যায় শিলচর ।

কুড়ি

যে যেখানে যায় যাক । বৈতল তার মায়ের জন্মদেশেই থাকবে, বাঁচবে, মরবে ।
বইয়াখাউরি ছেড়ে কোথাও যাবে না । মা নেই বাপ নেই তো কী হয়েছে, কাকা চাচা মই ভাই
বন্ধু গিরিবাবার মতো সাধু মানুষ আছে । একা লুলার জন্য সে সর্বস্ব ছেড়ে দিতে পারে । গুরু
সৃষ্টিধর তাকে জৈন্তিয়ার পাহাড় থেকে এক ক্ষীণ জলরেখা দেখিয়ে বলেছেন,

--- তেড়া ভেড়া এইন সৎ মা । আপন মা নায়, যাইও না সুরমা মারে ছাড়িয়া । বৈতল তাই
নিজেকে দিনরাতের অবিশ্বাস ভরা হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের বাইরে রাখতে চায় । লুলাকে বলে,

--- দোস্তু ইতা তকরারো আমরা থাকতাম কেনে চাইন । অউ তরে ছাড়িয়া, পানি ছাড়িয়া, টিল্লা
ছাড়িয়া, জঙ্গল ছাড়িয়া কই যাইতাম । আর অখন যেখানো যাইমু, নুতন জাগা চিনতে চিনতে
বুড়া ওই যাইমু ।

লুলাও বন্ধুর সঙ্গে সহমত পোষণ করে । কিন্তু বন্ধু সদুপদেশ দেয় । বলে,

--- দোস্তু, যা গিয়া হিন্দুস্তানো । জান বাচাই লা, পরে দেখা অইবনে ।

রাগে দুঃখে, চোখের কোণের শুকনো জল আটকে বন্ধুর মুখে মারে এক আঠারো সিক্কার ঘুষি ।
বৈতল বলে,

--- গেলে তুই যা বান্দির বাইচা, হালার হালা !

মা বাপ তুলে গালাগালি তাদের সমাজে রাগের কারণ হয় না কখনও । বরং দুঃখিত
হওয়ার অভিপ্রকাশ । বন্ধুর সংবুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে না বলে রাগে লুলা । বলে,

--- ভালা কথা তো কানো যার না । পুটকি দিয়া যখন বরুয়া বাঁশ ঢুকাইয়া মারব তখন দেখছি ।

--- ইতা তোর খিত্তার বাঙাল হকলে পারে । বইয়াখাউরিত বাঙাল কম ।

--- অয়, কম । অখন দেখ গি তোর মতো মরার উফরা দুই এক বাড়ি আছে খালি । বাকি সব ভাগছে । আমারেউ কইছে তোরে ভুলাই ভালাই ভিটা দখল করি লিতাম ।

--- অ, অউ বন্ধু তুই । সব ভুলি গেচছ । দিন নাই রাইত নাই হাকালুকিত পড়ি থাকছি তোর লগে । তুই কইচছ, মজিদো গিয়া নামাজ পড়ছি । গোস্ত খাইছি ।

--- অই বেটা, আমি গেছি নানি । ঢাকাদক্ষিণ গেছি, বাসুদেব বাড়ি গেছি, পনা মন্দিরো গেছি । বাপরগুতে ইতা নিরামিশা খাইছি না । বিষর লাখান কচু শাক । তেও খাইছি, তোর মহাপ্রভুয়ে নু ভালা পাইন ।

--- খাইচছ খাইচছ, অখন বিষ ঝাড়বে । ঝাড়, আমার লাগে না কুস্তা । তুই থাক বাড়ি লইয়া ।

--- তোর তো বেটিও লাগে । ইন্ডিয়াত গিয়া পাইবে খুমখুমা পুড়ি ।

--- ইন্ডিয়াত কেনে যাইতাম । হিন্দু না পাইলে বাঙাল বিয়া করি বাঙাল অই যাইমু । তেও তুই বাঙাল অইছ না ।

--- কেনে ।

--- বাঙাল অইলে তুইন গরু খাওয়ার যম অইবে ।

নতুন দেশের দুই নবীন নাগরিক ধর্মের বিভাজন ঝেড়ে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় । দুই অনাথ যুবকের একজন দেশি অন্যজন খিত্তা গাওএর পরদেশি । তবু, দুই সহচরের সিদ্ধান্তের জেরে তো আর দেশ চলে না, সহাবস্থান হয় না । আজব সময় কোনও নিয়ম মেনে চলে না । হিসেব নেই, আইন নেই, মূল্যবোধ নেই, মান্যমানতা নেই । দেশভাগের ফলে কেউ হারল, গণভোটে ঘরবাড়ির শান্তির প্রতীক হেরে গেল মনে করে একপক্ষ, অন্য পক্ষ মনে করে কুড়াল তো কুড়ালের কাজই করবে । হারল যারা, তাদের এবার তাড়াতে হবে । কিন্তু বাঙালির

এক পক্ষ অতিথিকে দেবতা ভাবে, অন্যপক্ষও মেহমানের সেবা করে । প্রতিবেশীকে নিয়ে সুখে থাকতে চায় । ধর্মভীরু দুপক্ষের ধর্মই বলে প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব কথা । কিন্তু লোভের কাছে ধর্মকর্ম কিছু নয়, লুঠতরাজে কোন ধর্মমানুষ থাকে না, অমানুষ হয়ে ওঠে । এখন তাই দখলের রাজনীতি । এখন শুধু বিদ্বেষ । হিন্দুর পূজা পার্বণে মুসলমানরা দূরে থাকে, কিন্তু জড়িয়ে থাকে । এখন উদ্ধত ছোঁয়াছুঁয়ি মানে না । মজা করে ছড়া কাটার কথা কেউ ভাবে না এখন । এমন সুন্দর কবির কথা হয়তো হারিয়ে যাবে ধীরে ধীরে । বৈতলকে যা শিখিয়েছেন গুরু সৃষ্টিধর । বলেছেন,

--- শিখিলে দেখবায় নে কী মজা কথার মাঝে,

‘ও বাজান দুগ্গি দেখলায় নানি ?

হিন্দু হকলর দুর্গাপূজা

বেলপাতা বোঝা বোঝা

চন্মামিতি খাইয়া দেখলাম,

সুরমা গাঙুর পানি ।’

শুনে শুনে লুলা বলেছে,

--- ইতা হিন্দু হকলে বানাইছে, আমার নাম দিছে ।

শরৎ-এর উৎসব নিয়ে বৈতলের মনেও দ্বিধা । পূজা শব্দ দিয়ে কেন যে প্রকৃতিকে বেঁধে রাখা । ঢাকের বাদ্যি কেন শুধু হিন্দুদেরই হয় । কাশফুল তো পুজোয় লাগে না, তবে কেন শরৎ -এর একটা উৎসব হয় না ধর্মছাড়া । লৌকিক উৎসব শুধু, কাশ উৎসব, সবাই শুধু আনন্দ করবে । ধর্ম হবে না, ধূপ হবে না ধুনো হবে না এমন কী যদি কখনও শরতেই ইদ উৎসব ঘুরে ফিরে আসে, আসুক । বাঙালির শরৎ উৎসব চলতেই থাকুক । বৈতল বোঝে শরৎ এলেই বৈতল কেমন একলা আলাদা হয়ে যায় । বৈতলের সঙ্গে মেলাতে পারে না । শরৎ এলে সে ঢাকের বাদ্যির জন্য অপেক্ষা করে । শব্দের উৎস কোথায় জানে না বৈতল । ধ্বনি দিয়ে যে শব্দ তৈরি হয় সে কি কোনো ভাষার, কোন ধর্মের । অতশত না জানলেও তো

চলে । বৈতল জানে তিন শব্দে শরৎ আসে বইয়াখাউরিতে, শিউলি ফোটে । বিলে শালুক ফোটে, পদ্ম চোখ মেলে । উৎসবের অগ্রদূত হয়ে আসে বাদ্যি, ঢাম কুড়াকুড় । সবাই পছন্দ করে । পবিত্রভূমি পাকিস্থান হওয়ার পর প্রথম পুজোয় কোন জৌলু নেই এবার । ঢাকের বাদ্যিও কেমন শহুরে বাবুর মতো ভদ্রলোক । হুড়মুড়িয়ে সবাইকে ডাকে না উৎসবে যোগ দিতে । বৈতল জানত না উৎসবের এই তিন শব্দও মানুষ অপছন্দ করে । এরশাদ, মকবুলরা এসে বলে যায়,

--- ইতা বাজনা উজনা একটু আস্তে বাজাইছ বা ।

লুলা প্রতিবাদ করে । বলে,

--- কেনে, আস্তে কেনে আকুতা । বাঙাল হকল জিনি গেছইন, নানি ।

লুলা দ্বিধাশ্রিত হলেও জানে কাশের বনে দোল জাগিয়ে আসে ঋতুর রাজা শরৎ । আর ঢাম কুড়াকুড় ধবনিও প্রকৃতির সাজ বদলের অঙ্গ । কিছু ধর্মব্যবসায়ী আর নেতৃত্বলোভী মানুষকীটের দংশন ক্ষতে ছারে খারে যেতে বসেছে তার নকশিকাঁথা । তার ঐতিহ্যের স্বদেশ । ভোরের আজানের শব্দ তো বৈতলের কানে তলা লাগায় না । যেখানে ঢাকের কাঠি অসহায় নয়, অসহায় নয় সেখানে মোয়জ্জিনের কণ্ঠস্বরও । সময় মানুষকে বদলে দেয় প্রতিনিয়ত । কত রকম যে সময়ের খেলা, ছোট বড় মাঝারি । বৈতলের কাছে সময়ও দেখার হাওর, বড় হাওরের মাছের মতো । জগৎবেড় পড়ার পর মাছের লাফালাফি শুরু হয় হাওর জুড়ে । নৌকোর খোলে কেউ নিস্তেজ । ব্যাপারির হাতে আবার লাফালাফি । ভাগার মধ্যেও লাফায়, এই ভাগা থেকে ওই ভাগায় । কড়াই থেকে পাতে গিয়েও কি শেষ হয় । সময় শেষ হয় না । সময়ের স্মৃতি, সময়ে ক্ষত থাকেই । বৈতলের বাপ খলুই- এ আলদের বাচ্চা ঢুকিয়ে দেয় । বৈতল তুলে ফেলে দেয় । লুলা পারে নি, নতুন সময়ে এসে বৈতলও পারে নি । অভিমানী মানুষ কখন যে কী করে কেউ জানে না । অভিমান মানুষকে দুর্বল করে, সহনশীল করে, সব মেনে নিতে শেখায় । আবার অভিমান দুর্বিনীত করে, হিতাহিতজ্ঞান শূন্য করে । সময় নতুন সমাজের জন্ম দিচ্ছে দেখে লুলা দুঃখিত হয় বলে ‘বাঙাল হকল জিনি গেছইন’ । একার প্রতিবাদী কণ্ঠ কি তবে লুলার একা লাগে । সঙ্গীহীন । সেই লুলাও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন পন্থায় নাম লেখায় । সেই লুলাকেই সময় শেখায় ঝাঁকে থাকার তত্ত্ব । নতুন সমাজ সংস্কারের

পস্থা । মানুষ একা থাকতে পারে না, প্রতিবাদী হয়ে সুখী হওয়া যায় না জেনে যায় লুলা । যে লুলাকে বৈতল চরিত্রবান জেনে এসেছে কৈশোর কাল থেকে, সভয় নারীসঙ্গ পরিহার করতে দেখেছে, সেই লুলাও পাল্টে ফেলে নিজেকে । সেই লুলা যে বৈতলের মনোব্যথা শুনে ব্যথিত হয়, কোন আদিকালের এক দুঃখ বয়ে বেড়ানোর জন্য । দাড়িয়াপাড়ার গৌরাঙ্গী কন্যার কান ছিঁড়ে পলায়নের জন্য দায়ী করে । বলে,

--- তুই গুনাগার অই গেলে দোস্তু !

বলে,

--- পুড়ির গাত হাত দিলে কেনে । তোর ধর্মতও তো বেটা ইতা পাপ !

লুলার রায় শুনে গর্বিত বন্ধু বৈতলও বলে,

--- মুসলমান না অইলে তো বেটা তুই বরমচারী অই গেলে নে । হনুমানর লাখান ধুপধাপ করলে নে । সব লাগে বেটা দুনিয়াত । খালি বেটা দিয়া কিচ্ছু হয় না, বেটিও লাগে ।

একুশ

সেই বন্ধুও বদলে যায় । পাকিস্তান হওয়ার পর ধীরে ধীরে পাল্টে যায় লুলা । হয়তো দেশের জন্য ধর্মের জন্য কোনও কাজ পেয়ে যায় । লুলাও হয়তো ভাবে এক ধর্মরাজ্য গড়তে হবে । সব বাধা দূর করতে হবে । দলে দলে যারা দেশ ছেড়ে যায় তারা তো যায় । যারা, মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়, তাদের কথা ভাবে লুলা । ওদেরও তাড়াতে হবে । কিংবা ধর্মান্তরিত করতে হবে । এই ভাবনায় লুলার মানবিক চরিত্রে কোনও তারতম্য হয় না । সে বৈতলের বন্ধুই থাকে । শুধু রাতের জন্য ওৎ পেতে থাকে, পরিচয় পাল্টায় । গরিব যারা, যারা ভাবছে ওপারে গিয়ে কী হবে, কী কাজ কী খাওয়া নতুন দেশে, ওরাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে । বয়সের ধর্মের বিপরীতে যাওয়া হয় না লুলার, রুল আমিন বেজ –এর । বৈতলের প্রতিবেশীরা অভিযোগ জানায় । বলে,

--- বৈতল, তুই কিন্তু দারাইশ সাপের লগে ঘর করবে !

--- কেনে, কিতা অইছে ।

--- কিতা অইছে জিগাছ নি, তোর হিণ্ডয়ে, লুলায়, হে বুলে দিলবাহার বাঙাল কবি । তোর বন্ধু ।

--- কিতা অইছে কও, ইতা জানি ।

--- তুই জানছ না, হে যে হিন্দুর বৌ বেটি হক্কলর ইজ্জত লুটের ।

--- তুই দেখছ নি । লুলা বরমচারি মানুষ, ইতা মাতিও না ।

সংখ্যাগুরু অপরাধীর বিরুদ্ধে কেউ প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে না । বৈতলও বিভ্রান্ত, ভাবে মিথ্যা । আবার ভাবে, হলেও হতে পারে, বয়সের দোষ, দুদিনেই কেটে যাবে । একদিন বলে,

--- তুই জিনচছ কম নায় । মাইনষে যেতা মাতের একেবারে মিছা নায় ।

--- হাচা মিচা দিয়া তুইন কিতা করতে । তুইন তো বাগদাদর হারুণ রসিদ ! পাচ বেগমর হারেমওয়ালা বাদশা ! আমারে কেনে দিলে না একটা, অখন কেনে চউখ টাটার ।

বৈতল জানে সেও ধোয়া তুলসী পাতা নয় । গুরু সৃষ্টিধরের মেয়ের সঙ্গে শুকনো সম্পর্কের কথা সব জানে লুলা । তাই বৈতলের দুর্বল জায়গায় আঘাত করে । বৈতল লুলার বদলে যাওয়া নিয়ে ভাবে না । হিন্দু – বিদ্বেষের কিছু কেন কোথাও খুঁজে পায় না । লুলা তো আর বাবুর বাড়ির ছেলে নয় যে নিয়মনীতি মেনে ভালবাসার বাড়ি খুঁজবে । আর পাটনি মাইমলের মেলামেশারও এত বাধা নেই । লুলা হিন্দুকে শত্রু ভাবলে বৈতলকেও ছেড়ে যেত । তাই বন্ধুর প্রশ্নের সূত্রে লুলার অভিমানও আবার সক্রিয় হয় । বলে,

--- তুইও বদলি যাইরে বৈতল । তুই কিতা ভাগি যাওয়ার কথা ভাবরে নি ।

--- ভাবিয়ার তো । তোর মতো বদমাইশর লগে কে থাকত ।

--- তুইন আমারে ছাড়িয়া ইন্ডিয়াত যাইছ না রেবা ।

বৈতলের রাগ জল হয় । বলে,

--- ধুর, ইন্ডিয়াত আমার কিণ্ড আছে যে যাইতাম । বইয়াখাউরিত অউ মরতাম । তুই আমার মুখো আগুন দিবে ।

--- আইচ্ছা । তুইও আমার কয়বরো মাটি দিছ একদলা ।

--- দিমু । কিন্তু তুই আর ইতা করিছ না । তুই তো ইলাখান আছলে না । ই কি লাখান পাকিস্তান অইলে রে ।

--- হুন । কয়েদে আজমে কইছইন...

--- ছাড় তোর কয়েদে আজম । আমরার মাঝে কয়েদে আজম কে রে ।

গান্ধীর নামের আগে অসম্মানের ‘ইণ্ড’ আর মহম্মদ আলি জিন্নাকে সসম্মানে কয়েদে আজম বলার শুরু গণভোটের সময় থেকে । যে কোন অন্যায় চলে কয়েদে আজমের নামে । যেন, ‘কয়েদে আজমে কইছইন’ বললেই বেছে বেছে হিন্দু রমণীর সর্বনাশ করা যায় । হিন্দুর ভিটে দখল করা যায় । কয়েদে আজম তো বলেছেন ‘পাকিস্তান কোনও ধর্মের দেশ হবে না । পাকিস্তানে মুসলমান হিন্দু শিখ পার্শি খৃষ্টান সব ভাই ভাই হয়ে থাকবে ।’ এই কি নমুনা ।

দেশভাগ মানুষের কোনও ক্ষতি করেনি । সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের তার ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকার অধিকার আছে । সংখ্যালঘুও যেন মাৎস্যন্যায়ের শিকার না হয় সে – অধিকার নিশ্চিত করতে হয় গুরুজনদের । এর অসাম্য হলেই হয় রায়ট । রায়ট মানুষের ক্ষতি করে । রায়ট হলেই মানুষ পাঁটে যায় । রায়ট হলে বৈতল পাঁটে যায়, রামদা তুলে নেয় হাতে । হাঁক দেয় বোম বোম বম্বালে ।

রায়ট যেন এক দেশ । আলাদা আলাদা জাতি । কেউ কারো ভাষা বোঝে না । রায়ট লুলাকেও বদলে দিয়েছে । লুলা মায়ের উপর অভিমানে বদলে যায় । জন্মের পরই কেন মরে যায় লুলার মা । তাই তো মায়ের আদরে জড়িয়ে গেল বৈতলের সঙ্গে । আর তার বাপ তাকে নানার কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় অন্য রমণীর সঙ্গে । লুলার নতুন মা হিন্দু রমণী । তাই হয়তো রাগ জমে ছিল মনের ভিতর । রায়টের সময় মনের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরোয় । রায়ট মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে দেয় । বন্যা হলে এক করে ।

জলস্রোতের ধর্মে যেমন মালীর ভিটায় জড়ো হয় হিন্দু মুসলমান । একসঙ্গে, এক পাতে একই হাঁড়ির রান্না খায় সকলে মিলে । বৈতলের লুঠ করা চাল ডাল সবজি দিয়ে রান্না করে এক চণ্ডালিনী যুবতী, নাম দুর্গাবতী । পাকিস্তান হওয়ার বছর খানেক আগে রাজরোগে মরে যায় ভুরুং আচার্য । অগ্রদানী ব্রাহ্মণ । গ্রামের মানুষ বলে কটার বাবন, অগ্রদানী না হলে স্বর্গের দ্বার খোলে না, তবু এ ব্রাহ্মণের সম্মান নেই সমাজে । বলে, মড়িপুড়ি ব্রাহ্মণ । এই ব্রাহ্মণের সংখ্যাও খুব কম । পিয়াইন পারের শ্মশানে কোনও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নি । ভুরুং আচার্য মরার পর তার যুবতি কন্যা দুর্গাবতী বলে সে তিলকাঞ্চন করবে । সমাজ মানেনি । নদীর পারের ঘরে একা যুবতিকেও কেউ উঠে যেতে বলেনি । দুর্গাবতী নদীর পারে থাকলেও মালির ভিটা কালীবাড়িতেই সময় কাটে গিরিবাবার কন্যা- স্নেহে । সেই দুর্গাবতী

নিয়েই বন্যার জলে ভাসে বৈতল । সুরমার উজান বেয়ে ছোটো কলাগাছের ভোঁরায় ।
গিরিবাবার অনুনয় যে ঠেলতে পারে নি বৈতল । বাবাজি বৈতলের দুহাত ধরে বলেছেন,

--- বাবা, ই পুড়ি ইগুরে বাচাও । তোমার বন্ধু ইগুরে খুব জ্বালার ।

পিয়াইন আর সুরমার জলে তখন উথালি পাথালি । বছরকার বন্যার প্রলয়ঙ্করী রূপ । প্রবল
স্রোত আর কুডুলা । জোড়া নদী মিলনের আক্রোশে ফুঁসছে । এনায়েতপুর শ্মশানের অগ্রদানী
ঘরের দরজা ভাঙে বৈতল । জলের তাণ্ডবকে ভয় পায় না বৈতল । তাও লুলাকে বারণ করে
বৈতল । রিপুতাদিত লুলা নিভিয়ে দেয় কুপি লঠন, বৈতলের হাতে এক তরফা মার খেতে
অভ্যস্ত লুলা অন্ধকারে বৈতলকে আক্রমণ করে । জলের পোকা বৈতলকে আক্রমণ করলে কী
ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, লুলাকে বুঝিয়ে দেয় । রাতের অন্ধকারে বন্ধু লুলার লাশ পিয়াইনের স্রোতে
ভাসিয়ে দেয় বৈতল । বলে,

--- যা দোস্তু ! মাটি দিতাম পারলাম না, পানি দিলাম এক আইজলা । লুলার শেখানো মন্ত্র
উচ্চারণ করে ‘বিসমিল্লাহ রাহমানির রহিম’ । দুর্গা বতীর বাপ ভুরুং ঠাকুরকে দেখেছে উপর
জল ছিটিয়ে বলতে ‘পবিত্রোপবিত্রবা’ । বৈতলও বলে,

--- পবিত্রপবিত্রবা ।

আরবি কথা কিংবা সংস্কৃত কথার অর্থ জানে না বৈতল । বৈতল জানে শুধু সদগতি । বন্ধু
যেখানেই থাকুক শান্তিতে থাকুক ।

বাইশ

জল বৈতলকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে । দেশের জল, বইয়াখাউরির জল, রইদপুয়ানির জল, লুলার বাড়ি হাকালুকির উত্তর পারে খিত্তাগাও এর জল । মিঠাপানির দেশ পেরোতে বড় কষ্ট । দেহের কষ্ট একটানা ভোরা বাওয়ার, মনের অবস্থা তো খান খান । মা গেল, বাপ গেল, বন্ধুও গেল বেঘোরে । আনুষ্ঠানিক শোক উদ্‌যাপনের কোনও উপায় নেই । ভোরা যখন কুশিয়ারায় পড়ে তখনও তরীর নিচে ঘোলা জল ।

জালুয়া বৈতল, মাইমল বৈতল জানে কোথায় নদী আর কোথায় মিছাপানি । খেতখামার বাড়িঘর । মাটির রাস্তা । দুই একটা নারকেল সুপারি তাল বটের মাথা দেখা না গেলে বোঝার উপায় নেই জলরাশির সীমানা । মালিকানা খুঁজে বের করা অসম্ভব । ইন্ডিয়ার জলও ঘোলা, পাকিস্তানের পানিও গেরুয়া । সৃষ্টিধর ওঝাও চেনেন জল । বলেন,

--- পানির কুণু দেশ নাই বাবা ।

বৈতলের বাপও যে জলের জন্তু । বলে,

--- পানির কুণু তেভাগা নাই, লিগ নাই, কংগ্রেস নাই । পানি শুকাইলে মাটি মাটি অইলেউ দেশ । দেশ দেশ করে, আর মরে মারামারি করিয়া ।

এপারে এসে বৈতল দেখে সব এক । মানুষের দুঃখ দুর্দশার শেষ নেই । ওদিক থেকে চলে আসার আগে হিন্দুরা বলত ইন্ডিয়ায় বড় সুখ । ওদিকের মন্ত্রী যোগেন মণ্ডল বলে

হিন্দুদের বাঁচানোর দায়িত্ব তাঁর নয় । বলে, মাইমল চাঁড়াল কৈবর্ত পাটনি এরা তার মানুষ । এরা ছাড়া নাকি পাকিস্তান চলবে না । মাছ খাওয়াবে কে । মড়া পোড়াবে কে । পড়ানোর মতো মড়া ওদেশে থাকলে তো, মাইমল ছাড়া মাছুয়াও নেই । যোগেন মন্ত্রী নাকি এবার দেশ ছাড়া হবে । ওপারে গণভোটে ময়নুল হক চৌধুরীর নাম শুনেছে লিগ নেতা । এপারে এসেও তিনি নেতা কংগ্রেসের । হাইলাকান্দি রাতাবাড়ি পাথারকান্দি করিমগঞ্জেরমানুষ সাতচল্লিশের পনেরো আগস্ট পর্যন্ত ছিলেন পাকিস্তানের নাগরিক । উঠিয়েছেন চাঁদ তারার পতাকা, আঠারো তারিখে পালটে যায় তেরঙ্গায় । মৌলভী বাজার শ্রীমঙ্গল বড়লেখা কুলাউড়া বিয়ানিবাজারও থেকে যায় পাকিস্তানে । রইদপুয়ানি, বইয়াখাউরির স্বদেশ এখন আর বৈতলের দেশ নয় । লিগের দেশ থেকে বৈতল এখন চরকার দেশে । নেহেরু গান্ধীর কংগ্রেস, জোয়াল কাঁধে জোড়াবলদ । এপারের নবগঠিত কাছাড় জেলায় শুধু কংগ্রেস ছাড়া রাজনৈতিক দল নেই । স্বাধীনতা জোয়ারে শুধু কংগ্রেসেরই ঘোলা জল । দু – একটা লম্বা গাছ আর ভেসে- থাকা বাড়ির মতো কম্যুনিষ্ট পার্টির বীরেশ মিশ্র অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, পার্টি থেকে বেরিয়ে- যাওয়া তারাপদ ভট্টাচার্যর মতো নেতা আর স্বতন্ত্র পার্টির জমিদার কিংবা হিন্দু মহাসভারও দম শেষ । ওদিকেও শুধু চাঁদ তারা, কয়েদে আজম । এপারে কয়েদে আজম উধাও হলেও কয়েদে আজম ভক্ত আছে আছে, চাঁদ তারার পতাকাওয়ালা । যারা বলে ‘সিলেট নিলাম ভোটের জোরে, কাছাড় নিমু লাঠির জোরে’ । কাছাড় নিয়ে নিলে ত্রিপুরাও চলে যাবে পাকিস্তানে । বেরোনোর পথ নেই যে । গান্ধীকে এপারেও অনেক ‘ইগু’ বলে । দেশভাগের জন্য দায়ী করে । বৈতল তো জীবনে জল ছাড়া কিছুই দেখেনি তেমন । সব কিছুর সঙ্গেই জলের তুলনা করে । দেশভাগও বৈতলের কাছে জলরাশি । যে – জল কারো কথায় চলে না, গান্ধীরও না, জিন্নারও না । দেশভাগ এমন এক সময় যে- সময় মানুষ তৈরি করলেও রাশ থাকে না মানুষের হাতে । তখন কালের গর্ভ থেকে উঠে আসে কালো জল । সে – জলের নিয়ন্তা সাধারণ মানুষের ভগবান আর খোদা । লুলা যখন হিন্দু মেয়ের সর্বনাশ করে তখন তাকে সময়ের নির্দেশ হিসেবেই মেনে নিতে হয় । আর প্রত্যক্ষ সত্যে ক্রোধ থাকে । ক্রোধের প্রতিফলে হিংসা, খুন । জিন্না গান্ধীকে ধরতে পারবে না জেনেই দুরন্ত ক্রোধে বৈতল লুলাকেই নিশানা করে । একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে বৈতলকে রোখে কার সাধ্য । এপারে এসেও বৈতল জলের সঙ্গে লড়াই করেছে । ওপারের বন্ধুজলের সঙ্গে এপারের বিস্তর ফারাক । ওপারের জল বৈতলকে নিয়ত ডাকে,

--- আয় ।

বাপ ডাকে,

--- হেই বৈতল, পানিত লাম ।

নেমে যায় বৈতল বড় হাওরের গর্ভে, টেনে আনে আধমণি বোয়াল । এখানে মানুষ বড় চালাক, ধুরন্দর । কেউ কাউকে চেনে না । এখানে বেজুড়া, তরফ, মিরশি আর পণ্ডিতপাড়া নিয়ে কামড়াকামড়ি ! সবাই ওপারের জমিদারি ছেড়ে এসেছে । সবার জমিবাড়ি কেড়ে নিয়েছে মিয়ারা । বৈতল কাউকে বলে না তার ছেড়ে- আসা গ্রামের কথা, তার বিল আর হাওর কথা । বলে না মামার বাড়িমিরতিঙ্গার কথা, তার শৈশবের পাটপাথর আর তার সাম্রাজ্যকথা । ওপারের আল্লা হো আকবর এপারে হয়েছে বন্দেমাতরম । আল্লার নামে জিকির এপারে ওহয় । হয় নারায়ণ তকবির ! দাঙ্গাও হয়, দাঙ্গা থামে ।

এপার বরাক নদীর পারে শিলচর শহরে বেচুদার কশাইখানার কচি পাঠা খাশি খেয়ে তাগড়া হয় হিন্দুর রক্ত । শিলং টেলার্স-এর ইন্ড্রিশ মিয়ার ডগকলার উল্টেই পুজো প্যাভেল মাত করে ডেকা গরুর পাল, নতুন যুবা কিশোরের দল । হিন্দু মহাজনের দাদন দিয়ে ইদের কুর্তা তফন কেনে মুসলমান চাষী । স্বাধীনতার দুবছর পর বিজয়া ইদের কোলাকুলি দেখে তো মনে হয় না কোনও গভীর দুঃখ আছে দুই জাতির । পার্বণের সময় সব একাকার হয়ে যায় । নতুন জলের দেশে সব মলিনতা ধুয়ে যায় নিমেষেই । আবার হয় । ধর্মকর্তারা বিভিন্ন বীজতলিতে বিভেদের বীজ পুঁতে রাখেন । নইলে সিলেট কাছাড়ে কজন এসেছে আরব মিথিলা থেকে । নাটকের প্রয়োজনে মাথা মুড়িয়ে গিরিমাটির তিলকে বৈষ্ণব, লম্বা দাড়ির রক্ত তিলকে শাক্ত, গোঁফহীন দাড়ির চাচাগিরির শেষে সাড়ে তিনহাত জমিও উড়ে পুড়ে শুকিয়ে শূন্য হয় । নতুন দেশে বৈতলের তৎপরতা নেই । গিরিবাবার মতো কেউ নেই বলে ডাকাতি করে নারায়ণ সেবা কর । কেউ নেউ ‘জলে লাম’ বলার । মা নেই মনে করিয়ে দেওয়ার, ভাঙা বাড়িটাও নেই বৈতলের । তাই বৈতল মানুষ দেখে আর মানুষের কথা ভাবে । শিলচর শহরের হরিৎবরণ রিক্সা চালাতে চালাতে বৈতল নিজের অতীত বর্তমান নতুন করে সাজায় । কিছু

রিফুজি মানুষ আর গরিব মুসলমান নিয়ে ইন্ডিয়ায় এখন তার নতুন সমাজ । বন্ধুদের কাছে
অতীতের মুখবন্ধ করে রাখে । বলে,

--- কুণ্খানো কিছু আছিল না আমার । পানিত জন্মাইছি, পানিয়ে নিছে ।

আবার নিব আবার দিব ।

উপন্যাস

উজান পর্ব

বন্যার জল চৌকাঠ পেরোলে বৈতলের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । ঝমঝমঝম বৃষ্টির শব্দে উতলা হয় শরীর । বেতুল হয়ে যায় সব । সাকিন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে জলের টানে । স্ত্রী কন্যা আর তিন চাকার বাহন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নদীর টানে । নতুন এক নদী । বলেছিলেন তিনি মা নন, তিনি সৎ- মা । বৈতল এখন সৎ- মাকেই মা মানে । নদীবাঁধের উপর নির্দিষ্ট সংকেত স্থানে জড়ো হয় আরো তিন ভবঘুরে । দুখু, বছই আর আপদ । চার বন্ধু ভাতরুজির টানে এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে সারাদিন । বিকেল হলেই শুনকো নেশার ইশারায় ছটফট করে তিনজন । দুখু সাধু মানুষ, ওদের সঙ্গ উপভোগের জন্য নেশাদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে আসে ।

বৈতল আর দুখুর বনিবনা কম । বৈতল যা বলে দুখু বলে তার বিপরীত । গরিব হলে সমাজের সবচে সাহসী অংশের প্রতিভা ভেবে গর্বিত হয় বৈতল । দুখু ভাবে ওরা একেবারে নীচুতলার মানুষ, ছোটলোক । সমাজের আলোকিত অংশের প্রতি দুখুর এক অসহায় ক্রোধ । বৈতলের ওসব নেই । বৈতলের ভয়ডর নেই । সে বলে,

--- ছোটলোক কিতা রে । আমরা কেউরে চুকি না ।

--- অইছে বেটা চুকছ না । ইদিকে জমিদারোর গুলামি করছ,আর বড় বড় মাত ।

--- অই গুলাম কইছ না ।

দুইদিনের বন্ধু দুখু বৈতলকে চেনে না । বৈতলের রাগ চণ্ডাল । রাগলে পরে বৈতলের ভালমন্দ শত্রুবন্ধুর খেয়াল থাকে না । বৈতল তার মজির মালিক । বৈতল কারো গুলাম নয়, চাকর নয় । সিলেট দাড়িয়াপাড়ার এক কিশোরীও তাকে অপমান করে । চাকর বলে । পেশকারের মেয়ের কান ছিঁড়ে তাকে শাস্তিও দেয় বৈতল । সেই তার ভবঘুরে জীবনের শুরু ।

কম বয়সের ভাললাগা সেই ফক্ফকা সুন্দর মেয়েকে এখনও ভোলে নি বৈতল । ফর্সা মেয়ে বুড়ির ছেড়া কানের মুখটাই তাকে চাকর ভাবতে দেয়নি সারাজীবন । দুখুর মতো নিজেকে ছোটলোকও ভাবতে পারেনি । রাগারাগির কথা হলেও বন্ধুত্ব নিয়ে টানাটানি করে না বৈতল । মারামারি হাতাহাতির শেষে নদীকে সাক্ষী রেখে ওরা বন্ধু থেকে যায় । নতুন দেশের নতুন নদীকে সাক্ষী রেখে বৈতলের বলতে ইচ্ছে হয়,

--- আমরা অইলাম পানির বন্ধু, নদীর বন্ধু ।

বলে না দুখুর ভয়ে । আবার কী উল্টো কথা ভেঙে দেবে মন । সবে মন বসাতে শুরু করেছে নতুন দেশে । আসলে স্বদেশ ছেড়ে তো স্বেচ্ছায় আসেনি বৈতল । কার্যকারণ তাকে বাধ্য করেছে । নইলে বন্ধু লুলার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল দেশ ছাড়বে না, আজীবন থেকে যাবে দেখার হাওর, বড় হাওরের আশ্রয়ে । কিন্তু সমাজ সংসার রাজনীতির এমন চক্রর যে বেঁচে থাকার জীবনটাও মানুষ নির্বাচন করতে পারে না । লুলার মৃত্যু আর দুর্গাবতীর ভালবাসার ঢেউএ ভাসতে ভাসতে চলে এল অচেনা দেশে । ভেবেছে, থাকতে পারবে না, তকি লাগিয়ে মুসলমান হয়ে চলে যাবে আবার আপন দেশে । সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ছাতক পাগলা বইয়াখাউরিতে জল বিস্তর । কিন্তু এমন নদীঘেরা শহর তো নেই কোথাও । বর্ষায় নদী উপরে, শহর থাকে নিচে । তাই তো বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা নদীর পার । বাঁধের ভিতর সুরক্ষিত মানুষের ঘরবাড়ি, জীবন । এত সুরক্ষার কল্পনা করে না বৈতল । ভাটির দেশে আশ্রয় বলতে গাছের উপর নয় মালির ভিটার কালী মন্দির । এখানেও বছরে একবার লড়াই হয় জলের সঙ্গে । ঘর ছেড়ে, আশ্রয় ছেড়ে চলে যায় মানুষ কাছাড় হাই স্কুল নয় সরকারি স্কুলে । গুরু সৃষ্টিধর বলেন বছরে বছরে ভিটে উঁচু করার কথা । নদীর পারে একটি ঘর কল্পনায় তাই বিভোর হয় বৈতল । বছর বছর যার ভিটে উঁচু করে লড়াই করবে জলের সঙ্গে । মধুরামুখের বিস্তৃত নদীমুখ সবচেয়ে পছন্দ বৈতলের । বাঁধের প্রতি, নদীর প্রতি টান মমতায় একা একা মেয়েকে নিয়ে বেড়ায় বৈতল । সাত বছরের কন্যার হাত ধরে হাঁটতেও সুখ । বিস্তীর্ণ চরভূমির মালিকানা হয় বালিকার সঙ্গে । নদী বাঁধের এ মাথা থেকে ওমাথা বিস্তৃত তাদের চারণভূমি দেখিয়ে বলে,

--- ইখানো যদি একটুকরা জমি পাই । বুজছো নি মাই, তুমার মার আর কষ্ট থাকত না । বাইঙ্গন পুড়তা, রান্দতে রান্দতে হাত বাড়াইয়া পাড়ি লাইবা । লাউ কুমড়ায় ভরি থাকব চাল ।

চুনা কুমড়া আমার খুব ভাল লাগে । তুমার ঠাকুমারবাড়িত আছিল ইতা । চৈ চৈ হাস আছিল,
ছাগল আছিল, চান্দকপালি গাই আছিল ।

বাঁধের প্রতি, নদীর প্রতি, মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বৈতল ঘরবাড়ি সাজায় নদীর চরে ।
মেয়েকে উপলক্ষ করে মনের কথা মুখে আনে । বাড়ি ফিরে মেয়ে মাকে বলে বৃত্তান্ত । অবাক
দুর্গাবতীর কল্পবাড়ির সঠিক ঠিকানা জানতে চায় । বৈতল বলে,

--- মধুরামুখো অইব আমার বাড়ি ।

--- ঠিক নি, সুরমা আর পিয়াইনর মুখো আছিল আমার বাড়ি ।

--- বাড়ি কৈ, হি তো শশান । বউত কষ্ট করছ । অখন নিজর বাড়িত আরাম
করবায় ।

--- মানুষ যেখানো থাকে হিকানোউ বাড়ি । ভালো অউত্ত আছি ।

--- না, ইখান আমার বাড়ি নায় । তুমার ই জমিদার ইগুর তলুয়া অইয়া
থাকতাম নায় । আইজ দুখুয়ে কইছে আমারে গুলাম ।

--- আইছা অইবনে । অখন কও কুনখানো দেখলায় ।

--- কইলাম নু । বরাক নদীর পারো, আবার কুনখানো । মাস্টরর বাড়ি বান্দর
ভিতরে, শিববাড়ির দিকে । আমি থাকমু নদীর পারো, খুলা আশমান, জমিন
আর পানি । সরকারে দিব মাগ্না ।

--- দিবো নি । কুনখানো, বরাক নদী তো আমি চিনি । কুনদিকে ।

দুর্গাবতীর চোখেও আপন বাড়ির আনন্দ । বৈতলও স্বপ্নের নাড়ুতে ঘি দেয়
বেশি করে । বলে,

--- অউ যেখানো আরি ..., কেমনে বুঝাইতাম কও । অউ যে নদীর আটুর লাখান জাগাত ... ।

নদীর আবার হাঁটু কী । মা মেয়ে অবাক হয়ে বৈতলকে দেখে । বৈতলও বোঝে
জুতসই হয় না । তাই মিথ্যে বাড়ির ঠিকানা বদলে দেয় । বলে,

--- বি সি গুপ্তর বাড়ি দেখছ না নি । তারার বাড়ির ধারো এক টুকরা জমি দিবা কইছইন ।
আমি কিছু মাতছি না । একদিন দেখাইয়া আনমুনে । তারপরে কওয়া কওয়ি ।

দুর্গাবতী বৈতলের সঙ্গে কোথাও যায় না । এ নিয়ে একটা মনখারাবির ঘুষঘুষে জ্বর
আছে তার । সোজা কথা সোজা ভেবেই সে দুঃখের পশরা সাজায় । সে কালো কৈবর্ত, সে
রিক্সাচালক, তাকে নিয়ে মানুষের নানা কথা । আর দুর্গাবতীর শিউলি ফুলের মতো গায়ের
বরণ ; ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, সামাজিকতায় উঁচু নিচু একটু তো আছেই । বৈতলকে তো
তার মা, কাথামালী ফুলের বরণ মা কখনও অবজ্ঞা করেনি । দুর্গাও তাকে হেলাফেলা করে না
। নইলে একসঙ্গে আছে কী করে এত বছর । সামাজিক বিয়ে হয়নি ওদের । সুরমা
পিইয়াইনের সঙ্গম থেকে গিরিবাবার কালীবাড়িও খুব দূরের নয় । বাবাজি মানুষটা মন্দ নয় ।
কৈবর্ত ব্রাহ্মণ মানেন না । হাসিমুখে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যেতেন । কালী মন্দিরে যায়নি ওরা
। দুর্যোগের রাতে লুলা বন্ধুকে জলসমর্পণ করেই বেরিয়ে পড়েছে অজানার উজানে । ভোরা
বাঁধতে বাঁধতে বিয়ের কথা মনেও পড়েনি । অজানার অনিশ্চয়তায় সব ভুলে গেছে বৈতল ।
মেহেরপুর শিলকুড়ি মাছিমপুরের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়ানো শুধু দুর্গাবতী শর্মার অকর্মণ্য
স্বামী হয়ে । নিজের নাম ঘুচিয়ে বিয়ানিবাজার রইদপুয়ানির গুরু সৃষ্টিধরের নাম নেয় বৈতল ।
হয়ে যায় সৃষ্টিধর শর্মা । যদিও এনায়েতপুরের নরহত্যার ছায়া একটা ওকে তাড়া করলেও ভয়
পায়নি বৈতল । অস্থির সময়ে শুধু সিলেট কেন সারা বাংলা জুড়ে ভ্রাতৃহত্যার তাণ্ডব । ভৈরব
আর শ্রীমঙ্গলের হত্যাকাণ্ডে বৈতল বিচলিত হয়েছে কিন্তু ভয় পায়নি । মানুষকে ভয় করে না
বৈতল ।

লুলার মৃত্যুর আকস্মিকতায় বৈতল ভয় পায়নি । একা যুবতি দুর্গার ভবিষ্যৎ ভেবে
আকুল হয়েছে । নইলে মা ছাড়া বন্ধু ছাড়া একাকীর জীবন বড়হাওরের বুকে কাটিয়ে দেওয়া
বৈতলের কাছে অসম্ভব নয় । ভদ্রলোকের রান্নাঘরে পোঁছে দেওয়ার জন্য ভারে ভারে রূপোলি
মাছ ধরতে পারে বৈতল । মালির ভিটা কালীমন্দিরের সেবাইত গিরিবাবার অনুরোধ যে
ঠেকানো যায় না । দুর্গাবতীকে রক্ষা করতে গিয়ে কী থেকে কী হয়ে যায় ।

ভাল মানুষ দেখলেই গুরুর আসনে বসিয়ে দেওয়ার স্বভাব বৈতলের । সৃষ্টিধর ওঝা মনের ধনে ধনী করেছেন বৈতলকে । গিরিবাবা তার ব্যবহারিক শক্তির প্রয়োগ শিখিয়েছেন । মানুষের ভিতরকার ভেদাভেদ দূর করার মন্ত্র, পুঁথি পত্র আর গানের সুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন কর্মজঙ্ঘে । একজন শিখিয়েছেন মন্ত্র, অন্যজন তার সাধনা । তাই গিরিবাবার আদেশ শিরোধার্য করে তাকিয়েছে দুর্গাবতীর চোখে । সৃষ্টিধর গুরুর মন্ত্রই যোগায় দুর্গা । বৈতলের তৈরি করা কলা গাছের ভোরাকে সখী জ্ঞানে গেয়েছে গান,

চন্দ্র সূর্য সই সাক্ষী হইও তুমি

নদ্যার ঠাকুর হইল প্রাণের সোয়ামী ।

ময়মনসিংহের গান শিখিয়েছেন গুরু সৃষ্টিধর । তাই সেই দুর্যোগের রাতেও দুর্গা বতীকে মছয়া ভেবে গান গেয়েছে । আসলে বৈতল তখন পালানোর মতলবআঁটছে । কয়েক দিনের জন্য গা ঢাকা দেওয়া । ভাটির টানে ভোরা গিয়ে পড়বে ব্রহ্মপুত্রে, ব্রহ্মপুত্র থেকে পদ্মায় গঙ্গায় । জলে জলে কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসা গ্রামে । ততদিনে লুলার মৃত্যু ভুলে যাবে মানুষ । একাকী দুর্গাবতীর আকুল সমর্পণে বিবশ হয়ে যায় বৈতল । দুর্গা বৈতলের হাত ধরে বলে,

--- আমারে কই ছাড়িয়া যাও ।

একটুখানি হাতের স্পর্শে বৈতল মহাবীর উজানে ঘোরায় ভোরায় গতি । টেনে তোলে দুর্গাকে । বলে,

--- ছাড়তাম নায়, চলো । এখন তুমি আমার ছিরিগুরু কাণ্ডারী ।

কোমরে গোঁজা এক কাঠের গুলতি ছাড়া কিছুই সঙ্গে নেই বৈতলের । বৈতল ‘সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়’ । সে থেকেই বৈতল সঙ্গী তার গুলতি । পেয়ারা গাছের ত্রিকোণ কাণ্ড ও বৈতলের সঙ্গে তেলেজেলে বাড়ে । আর বৈতলের শরণ নিয়ে দুর্গাবতীও ভাসে জীবনজলে । বৈতল জানে বিয়ে না হলেও দুর্গাবতী ভালবেসেই তার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে ।

ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেরিয়েছে এক সঙ্গে । মেয়ের জন্ম, না হরিৎবরণ জমিদার বাড়ির আশ্রয়,
বৈতল জানে না কখন তারা দুজন প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । তখন কোনও লজ্জা কিংবা
জড়তার লেশ দেখেনি দুর্গার হাবেভাবে । সবাইকে বলেছে,

--- আমার তাইন ।

এখন বলে,

--- মনির বাপ ।

উপন্যাস

দুই

জমিদারবাড়িতে কাজ করে দুর্গাবতীর ফুরসত হয় না কোথাও যাওয়ার । কাজেরও তো সময়গময় নেই । দুর্গাবতীর কাজের বিনিময়েই বাসস্থান । পুকুর পারে টিনের ছাউনির বড় বাড়িটা বৈতলকে মনে ধরলেও এক কাঁটা খচখচ করে । মাঝে মাঝে বৈতলের মন বিদ্রোহী হয় । দুর্গাকে বলে,

--- চলো, বারই যাই ইখান থাকি । নদীর চরো উরো যেখানো পারি বাড়ি একটা বানাই লিমু ।

স্বামীভক্তিতে দুর্গা কম যায় না । বলে,

--- তোমার মনো দুঃখ থাকলে চলো যাই গিয়া ।

মনে উপরে, মনের নিচে দুঃখ যে কোথায় নেই । বৈতলের দুঃখ সুন্দরী দুর্গাবতীকে নিয়ে । বৈতলের মনে সর্বক্ষণ হারাই হারাই । তাই খোঁজে । জমি খোঁজে । জমানো টাকা যা আছে তাতে কিছু হয় না । খাস জমি পেতেও ঘুষ দিতে হয় রিফুজি অফিসকে । তবু হতোদ্যম হওয়ার মানুষ নয় বৈতল । মধুরামুখে নদীর হাঁটুর উপর জমির টুকরোটুকুও চোখে চোখে রাখে । আর দুর্গাবতীকে শোনায় ভিন্ন কথা । কোনদিন শোনায় বিসি গুপ্ত বাড়ির পাশের জমি । কোনদিন বলে আর্যপট্টির ইড কোম্পানির জমিকথা । বলে,

--- কম্পানি তো উঠি গেছে । কেউ নাই । বউত জমি । চধরি বাড়ির ছোটজনে কইছইন দিবা আমারে একটুকরা ।

--- ইতা মাতো বিশ্বাস করিও না ।

--- না না, তাইন ভালা মানুষ ।

--- আর ভালা মানুষ । কতউত্তো দেখলাম । বিলাইর ভাগো ছিকি ছিড়ে নি ।

দুর্গাবতীর মতো নিরাশ হওয়ার মানুষ নয় বৈতল । সে তার কল্পরথকে এরপর টেনে নিয়ে যায় রহমানবাড়ির গায়ে । সব শুনে দুর্গাবতী বলে,

--- তুমিও এক ভালা মানুষ । যে যেটা কয় মানিলাও । বড়লোকর পুয়ারে লইয়া যাও কলেজো । তোমার লগে দুই কথা মাতছে, কইছে বাপরে কইব তোমারে জমি দেওয়ার লাগি, আর তুমিও পুবেদি দুয়ার উয়ার লাগাই দিরায়ে ।

--- তার মন ভালা । যেতা কয় কথা রাখে । পুয়া ইগু কী সুন্দর জানো নি । সবে ছোট নবাব কইয়া ডাকে । তারা বলে আরবর মানুষ । অউ লম্বা চওড়া, রাজপুত্রর লাখান দেখাত ।

--- মাইনষে যে কইন চন্দনবাড়ির পুয়াইন্ত হকল রাজপুত্র ।

--- রহমান বাড়ির পুয়া ইগুর রঙ দেখলে তোমারও শরীর ঝলসি যাইব ।

--- আইচ্ছা তে, তারার শরীর আর রঙ দিয়া কিতা করতাম । পুড়ির বিয়া দিতাম নি ।

--- তুমি অউত্ত মাতলায় কান্দায় আর কুন্দায় । অখন কও যাইবায় নি আমার লগে ।

--- তুমি দেখি লাও ।

বৈতল জানে এসব কথার কথা । দুর্গাবতীর না যাওয়ার অজুহাত । তাই গুলতির বাঁটে চামড়ার রশি বাঁধে শক্ত করে । তেল চকচক করে নতুন রবার লাগায় । গুলি ছাড়াই তাক করে জমিদারের মাথা বরাবর । আঁঠালো মাটির গুলি এক আঙুলের টিপেই ঝুরঝুর করে ঝরে যায় হাতে । মেয়েকে আদর করে ডেকে নেয় কাছে । বলে,

--- চল বেটি ।

মন খারাপ হলেই বেরিয়ে পড়ার স্বভাব বৈতলের । নিরিবিলিতে উপভোগ করা । মনের মানুষ সঙ্গে থাকলে বৈতলের সুখ হয় । মা বাপের ঢলানি জিয়ানিতে জেরবার হয়ে

কতবার চলে গেছে মিরতিঙ্গার পাহাড়ে । ওখানে পেয়েছে বন্ধু লুলাকে । ওখানেই বৈতলের রাজ্যপাঠ, মাও গেছে তার গাছগাছালি পাখপাখালি আর পাটপাথর দেখতে । এখন মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে নতুন পাটে । নদীর ওপারে দুধপাতিল গ্রাম । গোয়ালারা রোজ দুধ নিয়ে আসে শহরে । ভারি করে রান্নার লাকড়িও নিয়ে আসে গ্রামের কাঠুরে । ভাগা করে হরিণের মাংস নিয়ে আসে কাঠের গুঁড়োয় ভরে । একদিন খাকি হাফ প্যান্ট সার্ট হ্যাট আর বন্দুক কাঁধে একটা লোকও আসে । পেছনে বরুয়া বাঁশের ভিতর চারপা বাঁধা মরা বাঘ ঝুলিয়ে জনা চারেক চা - বাগানের শ্রমিক, কুলি । মরা বাঘের মুখেও মানুষের প্রতি আক্রোশ দেখে বৈতল । সঙ সাজা লোকটা এক চা বাগানের ম্যানেজার, দক্ষ শিকারি । মিরতিঙ্গা, বইয়াখাউরি, পাগলায় টিলা আছে অনেক, কিন্তু ঘন জঙ্গল নেই, তাই বাঘ ভালুকও নেই । একা একা বৈতলেরও হারিয়ে যাওয়ায় কোন বাধা নেই । বৈতলের মেয়েও ভয় পায় না কিছুতে ! বাঘমারা দুর্ধর্ষ মানুষটিকে দেখে হাসে মেয়ে । বৈতলও মেয়েকে শেখায় মন্ত্র । বলে,

--- ভয় করলেউ ভয়, নাইলে কিছু নায় ।

সেই নির্ভীক মেয়েও ভয় পায় । বৈতল মেয়েকে কাঁধে নিয়ে নদীর ওপারে যায় শুকনোর সময় হেঁটেই নদী পারাপার করা যায় । বৈতল দুধপাতিলের জঙ্গলে গুলতি বের করে । দু- দুটো ঢুপি মারে । আধমরা পাখির ছটফটানি দেখে মেয়ের মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । বৈতল মেয়েকে কোলে তুলে নেয় । বলে,

--- কিতা অইল বেটি । ডরাইলে নি ।

বৈতল বুঝে শিশু মনের প্রতিক্রিয়া । বাঘমারা সাহেবের দিকে তাকিয়ে মেয়ে তার অকারণ হাসে নি । তবু মেয়েকে প্রবোধ দেয় বৈতল । বলে,

--- না মারলে আমরা বাঁচতাম কেমনে কও মাই । তারা মরলে তো আমরা খাইয়া বাঁচতাম । দেখবায় নে তুমার মায়ে কী সোয়াদ করি রান্দইন ঢুপির মাংস ।

এক ছটাক তেল কেনে বৈতল । এই টুকুনি তেল দিয়েই রাঁধে, পাখির মাংস ভালই রাঁধে দুর্গাবতী । পেঁয়াজ রসুন ছাড়াই রাঁধে । দুর্গাবতীকে অনেক বলেও পাখির রাজা মুরগি ঢোকাতে পারে নি রান্নাঘরে । বৈতল যুক্তি দিয়ে বলে,

--- মুরগিও তো চুপির মতো হাসর মতো পাখি । রান্দ না কেনে ।

--- কী জানি, ইতা অই গেছে । হিন্দুবাড়িত আরো বউত্তা খায় না । গজার মাছ পারবায়নি
খাইতে, বাঘ মাছ । দুখুদায় যেতা খায় ।

--- আমি ইতা খাই ।

--- তুমার কথা বাদ দেও । তুমি তো আধা বাঙাল ।

--- ওগো মাই, খাওয়াইছো ভালা । রান্দছ ভালা । অখন ইতা মাতিয়া আমারে ছলাইও না কই
দিলাম ।

দুর্গার উপর বৈতলের রাগ যেমন হয় যখন তখন, ভালও বাসে পাগলের মতো । বৈতল
জানে স্বদেশ ছেড়ে এই অজানা শহরে না এলে এমন ভালবাসাও শিখত না সে । বৈতল
বুঝতে পারে নতুন এক শিকর ছড়াচ্ছে তার । তাই নতুনের কথায় গুরু সৃষ্টিধরের শরণ নেয়
বৈতল । গুরু বলেন,

--- নতুন অইলেউ রেবা পুরানার ডাক পড়ে । পুরানা অইল আসল জড় । যে ভুলি যায় তার
হক্কলতাউ যায় ।

তিন

বৈতলের নতুন শিকর যত বাড়ে দুর্গাবতীকেও তত আঁকড়ে ধরে । দুর্গার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে তার অতীত । তার জন্মভূমি, জন্মজল আর জন্মবাতাসের অভিজ্ঞান । সুখের সময় সে অতীত রোমন্থন করে দুর্গার সঙ্গে নীরব থেকে ।

চৌকির উপর গল্লাবেতের চাটাই, আর একদিকে গোল করে রাখা ঘুমের সরঞ্জাম । তিনজনের বিছানা । প্রধান ঘুমের জন্য গুটিয়ে রাখা । গোটানো বিছানায় পিঠ দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বৈতল দুর্গাবতীকে বলে,

--- একটা পান দেও । একটু সাদার গুড়া দিও ।

মনেপড়ে যায় রইদপুয়ানি গ্রাম । আর এক ফিঙ্গে পাখির কথা । একদিনের রাজা বৈতলকে একা বাড়িতে খাওয়ায় বিয়ানিবাজারের পেচকুন্দা । বৈতলের গুরুকন্যা চামেলি । সেদিনও বৈতল চায়নাকে বলে,

--- একটা পান দিও । একটু সাদার গুড়া দিও ।

সাদার গুড়ো দিয়ে পান দেয় চায়না । সব কিছু দিতে চায় । বৈতল নিতে পারে না । পালায় গুরুর বাড়ি থেকে । দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কত বছর যে পার হয়ে যায় পালাতে পালাতে ।

দুর্গার বিছানায় কাত বৈতলের কপালে আর পান জোটে না । দুর্গা বলে,

--- পান আনছনি । খালি সাদার গুড়া খাও । নাইলে যাও, ভোলার দোকান থাকি কিনিয়া আনো ।

--- অখন অত রাইত যাইতাম নি । কুনু কামর ভাগ নাই বেটি । একটু পানও রাখছ না বাড়িত ।

--- রাইতর টিপ মারাত যাইবায় তো জানি । লইয়া আইবায় পানপট্টি থাকি ।

--- না আইজ সব হল বন্দ ।

--- কেনে ।

--- গোলদিঘীত বুলে পানি নাই । বিজলি দিত পারত নায় । তিনদিন থাকি ভটভটি চালাইয়া সিনেমা দেকার । আর পারত নায় ।

--- তে, তুমি পান খাইতায় অউ, নানি

--- খাওইয়াইবায় নি ।

--- দেখি, হি বাড়ি থাকি আনি দিমু ।

--- না ।

মরাবাঘের মুখ দেখে বৈতল আবার । মৃত জন্তুর মুখেও হিংস্রতা দেখে । হিংসা, নাকি মানুষজাতির প্রতি ক্রোধ । ওরকমই এক ক্রোধের প্রতিফলন হয় বৈতলের মুখে । জমিদারের প্রতি আক্রোশ থেকেই হয় প্রতিবাদ । দুর্গাবতীও বুঝতে পারে অসাবধানতা । কথা ঘুরিয়ে নিয়ে যায় বৈতলের স্বপ্নে । বলে,

--- বাদ দেও তে । আইচ্ছা কও চাইন তুমি ঠিক কুনখানো দেখছ মাটি ।

এবার সত্যি কথাই বলে বৈতল ।

--- মধুরামুখো । তুমি তো গেছ ।

--- গেছি নানি । বারুণির মেলাত গেছি ।

মনের সুখে গোটানো বিছানায় শুয়ে পা দোলায় বৈতল । চাটাইএ গল্লাবেতের চোখ
খুঁটতে খুঁটতে দুর্গাকে প্রশ্ন করে আচমকা । বলে,

--- আইচ্ছা কও চাইন, আমার অউ হাটুর লাখান নায় নি নদী হিখানো ।

--- কুনখানো । নদীর আর হাটু কিতা । নদী কুনু তোমার মতো লেংটা বেটানি । তফন
সামলাইয়া পরতায় পার না । পুড়িয়ে নু দেখব ।

--- অ, আমার লগে মশকরা কররায় বেটি । আইচ্ছা বাদ দেও, হাটুউটু সবে বুঝত নায় । দুখু
ইগুরে আমার বুজানি লাগব । খুব বরফুটাজি হালার হালার । সব বেশি বুঝে ।

পরদিনই বৈতল বন্ধুমহলে ঘোষণা করে বরাক নদীর বাঁধের আকৃতি গুলতির মতো ।
বলে,

--- আমার গুলাইলর কনইর মতো ।

দুখু ছাড়া বাকি দুজন, আপদ ও বহুই, হাত চুলকে পা চুলকে মাথা চুলকে ভাবে ।
কুচকিতে লুঙ্গি ঘষতে ঘষতে মেনেও নেয় । দুখু মানে না । দুখু দেখে অন্যরকম । দুখুর পছন্দ
নয় সবকিছুতে বৈতলের ওস্তাদি । তাই উল্টো কথা বলে,

--- গুলাইল দেখলে কই । গুলাইল অইলে খালি বাট থাকে নি, গুল্লি ইগু যাইত কই ।

--- গুল্লি নু আমি । বেশি মাতলে নাক বরাবর লামব গিয়া । তখন কইছ না বৈতলে মারে ।

--- তুইন আমারে বহুই পাইচছ নি । খালি মারতে । গালি ফালাই দিমু তর ইও । তে হন,
গুলাইল উলাইল কিছু নায় । বান্দ অইল খুরাদিল বাটির লাখান, ঘুরিঘুরি আইছে । মালগুদামো
গিয়া মিলাই গেছে ।

--- অই বেটা আউয়া । বাটি অইল গুল, নদী কুনু গুল নি । নদী কুনু পুকইর নি ।

--- অ পুঞ্জির ভাই । বান্দর কথা কইরে, ইখানো নদী আর পুকইর ঢুকাইয়া পেক কররে কেনে
। আর গুল না অইলে কিতা অইছে, কথার কথাত অতো পেছ ধরণ লাগে না । মনর মিল
থাকলেউ অইল ।

- তোর লগে আমার কিতা মনর মিল । তুই কাছাড়ি বাঙাল, আমি হিন্দু, আমি রিফুজি ।
তরে আমি দেখতাম পারি না, যা । তোর তো পছন নায় আমার গুলাইল, যা , তোর বাটিরও
কালাই উঠি গেছে, আমার পছন নায় । অউত্ত মাত শেষ ।
- শেষ অইত কেনে, বুঝাইয়া ক ।
- তুই অইলে শিবর ষাড়, করমচান্দে ছাড়ছে যেগুরে জানিগইঞ্জো, তুই কিছু বুঝতে নায় ।
- কছ না, কইলে বুঝতাম না কেনে ।
- কইতাম নি ।
- কছনা বে হালার হালা ।
- কওয়াইলে তো কইতাম ।
- ও তরে কওয়ানি লাগব । গাইঞ্জা খাইতে । ইতা তো আমি পারতাম নায় ।
- তুই বেটা হারামজাদা, তোরে আমি চিনি । ডুব দিয়া পানি খাছ, হারাদিন রোজা রছ । খাছ
না ঠিক আছে, আনাইবে নি ।
- আইচ্ছা, অইব নে বে পেরত । অখন ক কিতা কইরে ।
- না, কইয়ার ‘ শিবো হে’ কইয়া গাইঞ্জার চলিমো টান দেয় দেখচছনি বছই আর আপদে ।
- না । ইতা তুইন কছ । মুসলমানে কুনুদিন শিবরে ডাকে না ।
- কেনে ডাকলে কিতা অইব । কাটা ইণ্ড জুড়ি যাইব নি । ঠিক আছে যা, আমি অউ কই ।
আমি অউ ভাল ডাকি শিবরে । শিবর মাথাত দেখচছ নি এক তেড়া চান্দ ।
- দেখছি । অন্নপূর্ণা মন্দিরো চুনকাম করছিলাম একবার । তখন দেখছি সাদা পাথরর মূর্তি ।
মাথাত চান্দর টুকরা ।
- পাকিস্তানের ঝান্ডা দেখচছনি ।
- চান্দ তেরা ।

--- বাক্সাউতো, পাকিস্তানর নাম হুনিয়াউ ফালাইরে ।

--- হুনাছি তো । তুইন কইচছ । তুইন অতো পাকিস্তান তনে আইচছ ।

--- আইছিতে কিতা, আমি অখন পাকিস্তানি নি । তুইতো হালার হালা গদার । তোর বাড়িত আছে ঝাণ্ডা, আমি জানি । মাইনষে কয়, তুই উঠাছ চান্দতেরা ।

--- মাইনষে কইলে আমার ইও নি । পাকিস্তান অইলে মাইনষর ভালা অইল নে । শরিয়তি মতে চলল নে সব । মালাউন হকলরে কলমা পড়াইলাম নে । তোর লাখান রিফুজিয়ে লাম্বা মাত মাত্ত পারল না নে । দেখছি, ঝাণ্ডা আমি গাড়মউ একদিন । অখন ক, শেষ কর কথা ।

--- না, আর কিছু না ।

--- অউত্ত গুসা অই গেলে হালার হালা । মাইনষর মাত হুনিয়া নাচচ কেনে । তুইন দেখচছ নি আমারে ।

--- দেখছি না । সবে কয় । তুইও চুপ মারি থাকছ ।

--- তে চুপ যা । জানছ নানি বোবার শত্রু নাই । চুপ করি থাকা উ ভালা । আর সাফ কথা হুনিলা, আমার নদী, আমার বান্দ যে লাখান অলাখান অউ । সুন্দর অইলে সুন্দর, বান্দর অইলে বান্দর, তোর কিতা । তুইন বেটা রিফুজি, যতদিন থাকতে চাইবে দিমু, থাকবে । তুইন অইলে কুলির বাদাত কাউয়ার ছাও । থাকলে থাক, নাইলে ভাগ ।

দুখু ইচ্ছে করে বৈতলকে রাগিয়ে দেয় । বৈতলেরও নাকের ডগায় গোফ । তৎক্ষণাৎ রাগে সব ভস্ম করে । বৈতলের সেই গুলতি ছোঁড়া রাগের সময় চুপ করে থাকে দুখু । শুধু মুচকি হাসি দিয়ে তাতিয়ে দেয় বন্ধুকে । দুখু কম কথার মানুষ । বেশিক্ষণ বকতে পারে না । নাগাড়ে কথা বলে চপু মেরে যায় । কিন্তু যতটুকু বলে তাতেই হাড় জ্বলে বৈতলের । মহাশূন্যে আগুন লাগার পর যখন ঝামঝামিয়ে বৃষ্টি নামে তখন বৈতলও হাসে । বন্ধুত্বের মজা উপভোগ করে । বুঝতে পারে বন্ধুত্ব শুধু হ্যাঁতে হ্যাঁ মেলানো নয় । রাখঢাক না রেখে মনের কথা বলাও দোস্তি ।

দুখু বহুই আপদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বন্ধুত্বের সংজ্ঞা নতুন করে শিখেছে বৈতল ।
বুঝেছে বইয়াখাউরি যা পারে নি, মিরতিঙ্গা পারে নি, খিত্তাগাউ বা রইদপুয়ানিও যা দিতে পারে
নি তাকে, তাই দিয়েছে তেড়া বেড়া এক নদীর পার । সুরমা থেকে ভেসে আসা ভোরার অস্তিত্ব
এখন আর কোথাও নেই । কিন্তু সেই উজান ডিঙায় বয়ে আনা বিশ্বাস ছড়িয়ে গেছে নতুন
দেশে । লুলার মৃত্যুর পর উদ্ভাস্ত বৈতল অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে কিছুকাল । দুর্গাবতী
পারেনি তার ক্ষতে নিরাময় দিতে । আগলখোলা বন্ধুত্বের হাওয়ায় শুধু বাড়তে থাকে বৈতলের
নতুন শিকর । ফনফনিয়ে বাড়ে মিতালির চারাগাছ ।

মিত্রতার কড়ামিঠে সম্পর্কেই পরিমিতি বোধ তৈরি হয় । তাই ওদের এত টান । কেউ
কাউকে বলে দেয় না সংকেত স্থান, তবু মিলিত হয় । বৈতল ছাড়া তিনজনেরই স্বদেশ কাছাড়
জেলা । নতুন দেশে, নতুন জেলায় বৈতলের পরিচয় উদ্ভাস্ত, রিফুজি । ওদের তিনজন
মুসলমান আর বৈতল একজন হিন্দু । তবু ওদের অস্তিত্ব নিয়ে কোনও সংশয় নেই । তাই
বন্ধুত্ব ছাড়া ওদের দেশ নাই । নদী ছাড়া প্রিয়জন নেই । এক বস্তুনি ছাড়া ওরা কোথাও কিছু
লুকিয়ে রাখে না । বস্তুনিতে থাকে নেশার সামগ্রী । দুখুমিয়ার কোনও নেশা নেই, আবার
দুখুরই তত্ত্বাবধানে সংগঠিত হয় ওদের ধোঁয়ার মজলিশ । আর বৈতলও নতুন নদীর পারে,
নবীন বন্ধুত্বের পরশে পরম সুখে তার শেখড়ে দেয় নেশাধুমের ওম । আর তাই, জীবনের এই
অধ্যায়কে উপভোগ্য করতে বৈতল সন্ধি করে দুখুর সঙ্গে । বলে,

--- দেখ দুখু, তুই চুরি করতে, ধাউড়ামি করতে যখন, মাইনষে গাইল্লাইত । অখন মামুর
খেদমতগিরি করবে, মাইনষে ভালা কর । এর লাগি ভাবছি না তুই ভগবান অই গোচছ । মানি
লা আমার কথা ।

--- কী কথা ।

--- ব্যাঙর মাথা ।

--- অ বুঝছি, তুই অউ গুলাইলর কথা কইরে আবার । বান্দর মাত, নানি ।

--- না না , খালি বান্দ কেনে, নদীর কথাও কইয়ার । নদী না থাকলে বান্দ আইত কই থাকি
। কইছলাম নানি, চান্দর টুকরার লাখান । মানি লা ।

দুখু মিয়া হেরে গিয়েও হার মানতে চায় না । বলে,

--- অই বেটা, নদী আর বান্দ দিয়া কিতা করতে তুইন । কবিতা লেখতে নি । আমরার নদীর পারর মানুষ নিয়া কিচ্ছু মাতিছ না । খালি তেড়া আর বেকা । আমরার লাখান ইলা সোজা মানুষ পাইবে নি তোর পাকিস্তানো ।

--- আবার পাকিস্তানি কইবে । আমি পাকিস্তানি নায়, আমি ছিলেটি । তোর মতো কাছাড়ি ভূত নায় । আছে নি তোর হাকালুকির মতো হাওর, ভাটির দেশর লাখান বিল । হাকালুকি ইখান অইল সাগর, মাইনষে কয় ‘হাওরর মাঝে হাকালুকি, আর সব কুয়া ।’ কুয়া বে কুয়া ।

--- আবার তুইন পানি লইয়া মাতরে । মানুষ লইয়া মাততে পারছ না ।

--- মাতিয়ার তো, আধা হুনিয়াউ কান্দায় কুন্দায় বাইড়াইরে কেনে ।

--- ক ।

--- মাইনষে কইন ‘হাওরর মাঝে হাকালুকি বাকি সব কুয়া

বাবুর মাঝে মুরারি চান্দ বাকি সব পুয়া ।’

--- তাইন আবার কে ।

--- তান নামে কলেজ আছে । তান নাম নেয় সদর ছিলেটো । আর এমনে গাউআলা হকলে কয়, ‘বেটা অইল মামুদ মনছুর বাকি সব পুয়া ’

--- ইতা আমরাও আছইন, নসিবালি হাকিম আছলা, গফুর খান আছলা, কামিনি চন্দ আছলা, ছবির খান আছলা । অখন সতিদেব আছইন, হুরমত আলি আছইন, কামিনি সেন আছইন বিধুভূষণ চধরি আছইন পরেশ চধরি আছইন, রনেণ দাস আছইন, বিছি গুপ্ত আছইন, উপেন দত্ত আছইন । আরো আছইন, কত ছনতে ।

--- এরা সব বড় বড় মানুষ । ভালা অইবাউ । গরীব মানুষও সব দেশো ভালা । গরিব ভালা অইলে, নেতা ভালা । মানুষ ভালা অইলে নদী ভালা হওন লাগে । তরে পালত কে । নদী ছাড়া কুনা মা আছে নি বেটা । তুই থাম ।

বৈতলের মাথায় কেড়া নড়ে চড়ে । দুখুর বকবকানি বন্ধ করতে হবে । উপায় একটা ওকেই বের করতে হবে । পুঁথিপত্র থেকে তুলে আনতে হবে প্রমাণ । দুখু জানে অশিক্ষিত মানুষের কথা কখনও প্রামাণ্য হয় না । সব কথায় তর্কের সূত্র থেকে যায় । ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়া যায় । বৈতল জানে গুলতির উপমা যদি সে হরেন্দ্র মাস্টারের নাম করে চালিয়ে দেয়, দুখু মেনে নেবে । ফণা নামিয়ে ফেলবে । বৈতলকে এবার পড়াশুনা শিখতে হবে নতুন করে । বইয়াখাউরির জীবন ছিল অন্যরকম । পড়াশুনার পরিবেশ তৈরি হতে দেয় নি গ্রাম্যতা । বরাক নদীর পারে জীবন অন্যরকম । শুধু চাষী পাটনি কামার কুমোর আর করাতি মানুষ নিয়ে নয় সমাজ । এখানে ইস্কুল পাঠশালা আছে, আছে কলেজও । অফিস কাছারি জজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিল সাহেব বাবু পুলিশ সবই আছে । আর আছে শহরের এমাথা থেকে অমাথা যাওয়ার রিক্সা আর সওয়ারির সঙ্গে বকম বকম করার রিক্সাওয়ালা । বৈতল বলে,

--- আমার রিক্সাত চড়লে মাত পাইবা মাগ্না ।

মাগনা মাত শোনানোর একজন ভিন্ন মানুষও খুঁজে পায় বৈতল । বৈতলের রিক্সায় কোনোদিন পা দেন নি । শুধু রিক্সা কেন অন্য কোনও যানবাহনেই চড়েন না তিনি । বৈতল যায় তাঁর কাছে, সে নিশ্চিত জানে তার সমস্যার সমাধান হবে । তিনি লাখুদা । মধুরামখেই এক ভাঙা ঘরের বাসিন্দা । স্থাবর সম্পত্তি বলতে শুধু কাপড়ের ঝুলি । সব খদ্দের, নিপাট গান্ধীবাদি । ঝুলির ভিতর শুধু কাগজ আর কাগজ । বাপ কাকার মতো মুরব্বি মুরব্বি মনে হলেও বৈতলের থেকে বেশি বয়স নয় । আপন জনের মতো কথা বলেন । সিলেটের অনন্ত সাধুর কথায় যেমন আগুন ঝরত তেমন নয় । তিনি গুরু সৃষ্টিধরও নন, আবেগের বন্যায় ভেসে যাওয়ার মানুষ নন । এ মানুষকে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই । পথে ঘাটে আত্মীয়বাড়িতে দেখা যায় এমন মানুষ । সবার কথা মন দিয়ে শোনে, সবাই সমস্যার কথা বলে । সমাধানের উপায় বাতলে দেন । বৈতল রিক্সায় ব্রেক দিয়ে থামে তাঁর সামনে । বলে,

--- চলইন ।

--- কই চলইন । তুমি কইলেউ যাইতাম নি । তুমি কুন লাটসাহেব ।

--- আপনে যেখানো কইবা লই যাইব বৈতলে ।

--- তুমার নাম বৈতল নি ।

--- অয় । বাপে গাইল্লাইয়া গাইল্লাইয়া রাখি দিছিল । আপনার নাম লাখুদা কে রাখছে ।
লাখটেকার মালিক নি আপনে ।

--- আমার অউ থলিয়াত আছে লাখ টেকা, নিতায় নি ।

--- নিতাম নায় । বৈতলে সবতা নেয় না । আপনে সুনামগঞ্জি নি ।

--- অয় । তারপরে কইবায় মধুরামুখি নি । তারপরে কইবায় আপনে হিন্দু নি । গান্ধীজিয়ে
কইছইন মানুষরে অত টুকরা কড়া ঠিক নায় ।

--- রিক্সাআলা মানুষ, অত ভাবিয়া কইছিনা আইজ্ঞা । কইলাম আরি । ভালমানুষ দেখলেউ
মনো অয় সুনামগঞ্জি । তে চলইন ।

--- আমি তো রিক্সাত চড়ি না । পুন্দো নাই চাম, রাধাকৃষ্ণ নাম । খাওয়ার পয়সা নাই রিক্সা
চড়তাম কেমনে ।

--- আমি কুনু ভাড়া চাইছি নি ।

--- না রেবা আমিও গাড়ি ছাড়া চড়ি না । তুমার তিন চাকায় অইত নায় ।

--- আমি জানি, খামোকা মাতরা । শহরো তো মাতর তিন খান আর চাইর খান গাড়ি । ভুতু
চধরি, নলিনাক্ষ ডাকতর, অমূল্য হালদার, গাভরু মিয়া আর নছিব আলির । আর আছে নি
।সতিদেবর আছে । আপনার নাই ।

--- কিচ্ছু জানছ না বেটা আডুয়া । হাজার হাজার গাড়ি আছে । আমার পাওগাড়ি যতদিন
আছে কুনু চিন্তা নাই ।

--- আপনে হাটিয়া হাটিয়া অত কাম করইন কেমনে ।

--- কাম আর কিতা করি । খালি গপ । অউত্ত দ্বিজেন চধরির বাড়িত গিয়া চা খাইমু, আজারি
গপ মারমু । আবার যাইমু কেউর বাড়ি । এর কথা হেরে কই , হের কথা এরে, যদি
কুনুকাম অয় । অতা করিউ কাটি যায় সময় ।

--- আইচ্ছা, বুঝছি, আপনে আমার লগে যাইতা নায় । তে আমার একখান কাম করি দিবানি ।

--- কইলে বুঝমু মহারাজর আদেশ কিতা ।

--- আদেশ উদেশ নায় । আমি পড়তাম । আপনার বুলে এক ইস্কুল আছে ।

--- বাল্যকাল শিক্ষার সময় । তখন কিতা করছো । মাছ মারছো আর মাইরে খাওইয়াইছ নানি,

--- অয় । মাইমলর পুতে আর করত কিতা । দেশ ভাঙাভাঙি না অইলে আপনারে কইলাম নানে । পড়ার কুনু বাল্যকাল বুড়াকাল নাই । আমার বন্ধু দুখুয়ে কইছে, খান সাহেব রশিদ আলি এ গরুরে থি থি হৈ হৈ করতে করতে ইশকুলর পড়া ছনতা । তাইনো বড় পণ্ডিত অইগেলা ।

--- আরো আছইন । মহাভারতর একলব্য আছলা জংলি পুয়া, বাবনও নায়, রাজার পুয়াও নায় । সব শিখিলাছলা গুরুর কাছ থাকি লুকাই লুকাই । গুরুইয়েনু তার ধনুক চালানির বুড়া আঙ্গুল নিলাগি গুরুদক্ষিণা । তুমি কিতা দিবায় ।

--- যেতা চাইন দিলাইমু । জিবরা দিতাম নায় ।

--- তে আর যেতা চাইন অইল কেমনে । না বা অখনও ইস্কুল অইছে না । অইলে গুরুদক্ষিণা ছাড়াউ পড়বায় ।

--- অইব পুত ডাকব বাপ । আমি তখন বুড়া । আর কুনু ইস্কুল নাইনি ।

--- নাই, আবার আছেও । বগা মাস্টরর ইস্কুলো ভালা ভালা মাস্টর আছইন, তারা পড়াইন । তুমি কিতা পড়তায় ।

--- সব সব পড়তাম । কিছু জানি না আমি । আমি পুথি পড়তাম আন্তাজে, গুরুয়ে শিখাই দিছলা, অখন পড়ি না গুসা করিয়া ।

--- কেনে । কিওর গুসা ।

--- মায় ভাবছিলা পুথি পড়িয়া পুত লাটসাহেব অইব । শ্রাবনীত পূজা দিতা । আমি তখন
গুরুর বাড়ি বিয়ানিবাজার, আস্তিক মুনিরে দি উঠাইলাইলা মারে । এর লাগি ছাড়ি দিছি ।

--- ছি বা । তুমার নি নাকর আগাত গুসা । মারে সাপে কাটছে এর লাগি মনসার কিতা দুষ ।
আর তুমার মায় যে চাইতা তুমি উঝা অইতায় । মার মার খুশির কথা ভুলি গেলায় ।

--- না ভুলছি না । ইদেশো আইয়া আবার আরম্ভ করছি । ইতা আর এক গপ । অখন কইন
কেমনে শিখতাম । আমি খালি পানিকিতাব জানি । পানিত জন্ম পানিত কর্ম, আমরা তো
পাটনি । কইয়া দেখইন, অউ মধুরা থাকি আপনার লাগি ধরিয়া আনমু দেড়মনি বোয়াল ।
হাওরর ইপাতা থাকি হিপাতা পড়ি ফালাইমু মুখস্ত । হাওর দেখছি কত সুন্দর সুন্দর । শল্লা
গেছইন নি, দেখার হাওর, দেকার হাওর । ডেকার হাওর, বড় হাওর, জামাইকাটা, টেঙ্গুয়া
লঙ্গুয়া, মাটিআইল, হকালুকি কত যে পানির টেঙ্কি । আর কত কিছিমর মাছ, ঘনিয়া গজার
শউল পাবিয়া বাচা মাগুর কই চেঙ রানি টেংরা পুটিমকা কাংলা মহাশউল আর বাঘমাছ তো
আপনারার ইখানো দেখিউ না । সুরমা পিয়াইনর লাখান নদী আছিল আমার দেশো,
সুনামগইঞ্জো । আর ইবেটিরেও দেখছিলাম জৈন্তিয়ার পাহাড় থাকি, সুতার নালর লাখান ।
আমার গুরুয়ে কইছলা এন দিকে চাইতাম না, এইন বুলে তেড়া ভেড়া নদী, এইন আসল মা
নায়, সৎ-মা । গুরুয়ে চাইছলা না আমি ছিলট ছাড়িয়া যাই । আর অখন অউ তেড়া নদী
দেখিয়া পাগল, এক বন্ধুর লগে ঝগড়া করছি । আমি কই নদী ইলাখান, হেকয় হিলাখান ।
আপনে নি পারবা তারে বুঝাইতা ।

--- নারে বা কথার টেংকি । আমারো অ কইতে মার্গো ফাটে । বিদ্যা শিক্ষা কিছু নাই ।
কাছাড় ইঙ্কুলর ভুগোলর মাস্টররে ধরো, বুঝাই দিবা ।

--- আমি আবার ধরতাম কেমনে ।

--- এক কাম করো । হেডমাস্টর ব্রজেন ধরর বাড়িত যাও গিয়া তারাপুর । আর গিয়া কও
চলইন । আমারে যেমনে কইছো । না, তানো আমার লাখান গাড়ি আছে ।

--- বুঝছি, আপনারে দি অইত নায় আমার কাম । ইঙ্কুলর চকিদার যুগেন্দ্রদায় পারব ।

--- অউত্ত অই গেছে । যুগেন্দ্র বড় ভালা মানুষ । যাও তার লগে টেক্কর দেও গিয়া । দেখিও
খালি টেক্কর খাইও না ।

--- অয়, খাইছি তো, তাইন খালি মারইন ।

--- তুমি নি মাইর খাওয়ার বেটা ।

--- না, ভালা মাইনষর খাই । ইস্কুলর বাগান থাকি আমি নু রুজ সকালে ফুল চুরি করি । কিন্তু
তাইন ধরতা পারইন না ।

--- ফুলচুরি তো ভালা । এর লাগি মারত কেনে ।

যুগেন্দ্রদায় কইন আমি বুলে রাইত ডাকাতিও করি । আমারে দেখলে লাগেনি অলা, কইন ।

--- চকিদার অইলে কিতা অইব যুগেন্দ্রর চউখরে ফাকি দেওন যায় না । তুমারে দেখলে লাগে
না ঠিক অউ । কিন্তু যুগেন্দ্রর কথা ফালাই কেমনে কও ।

উপন্যাস

চার

ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করতে জন্ম জয় কাছাড় হাইস্কুলের । স্বদেশি আন্দোলনের দিন তখন । বন্দেমাতরম আর নেতাজি নিয়ে মানুষের উন্মাদনা । চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আর মাস্টারদা তখন নয়নের মনি । ভগত সিং-এর ফাঁসি হয়ে গেছে । পাড়ায় পাড়ায় কলাপাতায় লবন বানানর ধুম শিলচরে । শিলচরের গান্ধি শ্যামাচরণবাবু অভয়াচরণ ভট্টাচার্য পাঠশালায় শুরু করেন কাছাড় হাইস্কুল । স্বদেশি স্কুলের জন্ম হয় । কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান কিংবা তৎসম্পর্কিত আলোচনায়ও যোগ দেবে না কোন ছাত্র এবং অভিভাবক । লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে । স্বাধীনতার কথা যেমন জানে, স্কুলের কথাও জানে যুগেন্দ্রদা । কেউ শুনতে চাইলে তার কী আনন্দ । পাশে বসিয়ে, কাঁধে হাত রেখে শোনায় সোনালি সেসব দিনের কথা । বলে,

--- মাইনষে বানাইছে ই ইস্কুল । ইট কাঠ ইতা তো পরে অইছে । অভয়াচরণ থাকি আইল আর্যপট্টিত, বাশর বেড়া টিনর চাল কাচা মাটির ঘর ।

--- ঠিক অউত্ত আছে । সব ইস্কুল বাড়ি অউত মাইনষে বানায়, এর মাঝে আচানকি কিতা ।

--- ইতা তুই বুঝতে নায় । ইতা দেখন লাগে । ব্রিটিশর অত্যাচার তো দেখছনা । আমি দেখছি তারারে । কত বড় বড় মানুষ ।

--- আর তুমরা কিতা করতায় ।

--- আমি তো ছোট । হেডমাস্টারর লগে লগে ঘুরতাম বেত হাতো লইয়া । ছাত্র হকল ও অত ভাল আছলা, মাস্টারর লাগি আম সফরি বাড়ির ফল পশারি আনতা, আমারেও দিতা । মনিপুরি পুয়া এগুয়ে পালটইও আনি দিছিল ।

--- হিতো আমার দেশর মনিপুরি । বিষ্ণুপ্রিয়া, খাইয়া নায় । খাইয়ায় খায় ইরম্বা । খাইতায়নি হিদল লাড়া । আমি আনি দিমুনে তুমারে । খালি আমার একখান কাম করি দেও রেবা ।

--- তোর কাম পারতাম নায় ।

--- কেনে ।

--- তুই যেতা দিবে ইতা চুরির মাল । আমার চাকরি খান যাইব । তোরে সবেউ কয় চুর বৈতল । তুই ধাউড়ামি করছ ।

--- কিগুয়ে কয় ।

--- কিগুর কথা কইতাম ক চাইন । অউত্ত ভুলু মুচির গাছো উঠিয়া সব পাকনা আম পাড়ি লাইচছ হিদিন । শিলচরো মধুগলগুলি আমর গাছ অউ একটাউ । তরে ডরাইয়া কেউ কিছু কয় না । সেন্ট্রেল রোডর মুর্তি শিলার শিক অ বুলে চুরি করচছ । সাপ নালাৰ ধার থাকি বাইচাইন্তর দুলনা চুরি করচছ । সঙ্গীত বিদ্যালয় থাকি হারমনি চুরি করলে কেনে । তুই তো ইতা বাজাইয়া গান গাছ না । তর তো খালি মিরদঙ্গো আর করতাল ।

--- আর সোনাদানার কথা কয় নানি । জমিদার বাড়ির সব সোনা নিয়া নসিবালি হাকিমর পুকইরো ফালাই দিছি ।

--- কয় । তে অতবড় ডাকাইতি তুই করতে নায়, ইতাও কয় ।

--- কে কয় । আমি ছিচকা চুরনি । যেগুয়ে কয় ইগুর পুটকিত নানি...

--- নানি নানি কিতা কইরে । খুলিয়া ক ।

--- কিতা আর কইতাম তুমি আমার বড়ভাই তেও কই, অউ যে মূর্তি শিলার চুকা শিক
কইলায় নানি, ইগুরে কানাই কামারর ভাটিত গরম করিয়া ঢুকাই দিমু ।

--- দিছ, দেখমুনে কেমন বেটা ।

--- না, এমনে ঢুকাইতাম নায়, ঠাণ্ডা বাজু ঢুকাইমু ।

---তেউ ।

--- অখন টানিয়া বার করঅউক বেটায় । ধরব কেমনে ।

একথা সেকথায় সময় কাটায় বৈতল । বৈতল জানে গল্প করতে করতেই যোগেন্দ্রদার
মন পাওয়া যাবে । স্কুলের গল্পঅ হয়, দেশের গল্প হয়, বৈতলের কীর্তিকাহিনীও হয়, আর তবে
বাকি রইল কী । বৈতল স্কুল চৌকিদারের ঘরের দিকে তাকায় । বলে,

--- ই ভূতর বাড়িত থাকো কেমনে একলা একলা ।

যোগেন্দ্রদা হাসে । বলে,

--- আমি অউত্ত ভূত ।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলে শুনশান । একামানুষ যোগেন্দ্রদা ইস্কুল আর স্বাধীনতার স্বপ্নে
বিভোর হয়ে কাটিয়ে দিয়েছে যৌবন । বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি । তাই একা, সৎমানুষের জীবন
শুদ্ধতায় কাটিয়ে দিচ্ছে স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণে । সামনে বিশাল মাঠ, মাঠ পেরিয়ে বাঁধ । বাঁধের
ওপারে বিসি গুপ্তর বাড়ি । এপাশে কিছু বিহারি রবিদাসের ঝুপড়িবাড়ি, ওপাশে চিনা মুচিদের
বাড়ি । অমাবস্যার রাতে বৈতল আর তার বন্ধুরা কাজের ধান্দায় বেরোয়, তখন বৈতল দল ছুট
হয়ে বিশ্রাম নেয় ইস্কুলে । যোগেন্দ্রদার রান্নাঘর থেকে ডেগ কড়াই পরিস্কার করে । শুদ্ধাচারী
মানুষের খাবার সাবাড় করলে বৈতলের নিশিপালনে সিদ্ধি হয় । দিঘীর পাশে জমিদার বাগানে
এনে নিরাপদে ফেলতে পারে ট্রাঙ্ক বাক্স পোটলা পুটলি, পিতলের জাফরি কাটা মনিপেটিকা ।
কাপড় চোপড় নিয়ে বহুই ভোর ভোর বেরিয়ে পড়ে বাগরসঙ্গন পাথারকান্দি চুরাইবাড়ির

বাজারে । সোনার বাক্স নিয়ে বৈতল নেমে যায় হাকিমবাড়ির দিঘীর অতলে । পেতলের বাক্স
জলের নিচে মাটিতে ঢুকিয়ে বাশ পুঁতে চলে আসে ।

দেওলা দিঘীর বদনাম বলে কেউ আর গভীরে যায় না । বৈতলের ভয়ডর নেই ।
বৈতলের কেরামতিতে দুখু অবাক হয় । বলে,

--- অত যে জমাইরে পানির নিচে, ইতা খাইত কে ।

--- হুন । সব চুরে খালি খানির লাগি চুরি করে না । খাইটে ধরলে আর ছাড়া যায় না ।

--- বুঝছি, আমরা ঠগাইয়া ইতাদি পুড়ির বিয়া দিবে ।

--- চুরির মাল দি নি বৈতলে পুড়ি বিয়া দিতো । চিনচছ বালা ।

দুখু জানে বহুই আর আপদের লোভ বেশি, গরিবানা হাছতাশও বেশি । তাই প্রায়ই
ওদের জলের সিন্দুকে টান পড়ে । এদিকে বৈতল দুখুকে, দুখুও বৈতলকে সন্দেহ করে
আবার নিশ্চিতও থাকে । আর একজন যোগেন্দ্রদা, যোগেন্দ্রদার চোখকে ফাঁসি দেওয়া যায় না
। যোগেন্দ্রদা সব জানে, জেনে বুঝেও কোনোদিন বৈতলকে সরাসরি বলে না কিছু । কে কী
বলে তা নিয়ে মজা করে । সরাসরি বলে না বলেই বৈতলের মনে উচাটন । যোগেন্দ্রদাকে
খোঁচায় । বলে,

--- তোমার হাতর রান্দা রেবা অমৃত ।

--- তুই কেমনে জানছ ।

--- খাইছি নানি ।

--- কেমনে খাইলে ।

--- ঘ্রাণে । মিঠালাউ আর এলেঙর গুটকি দিয়া ঝোল রান্দলায় নানি হিদিন ।

--- কুনদিন বে ।

--- অইব কুনদিন, ঘ্রাণে কুনু অত দিন তারিখ লেখি রাখে নি । এর লাগিউ আধা খাওয়া অর
। একদিন তো দাকিয়া খাওয়াইলায় না । হেডমাস্টররে তো খুব খাওয়াও রান্দিয়া ।

--- ছি । স্যারে খাইবা নি চকিদারর বাড়িত ।

--- কেনে, তাইন ত কইছইন ইতা মানইন না ।

--- তাইন বাইরর কিচ্ছু খাইন না ।

--- খাইন খাইন । আমার লগে গেলে খাইন । আমি রিক্সা করিয়া কত জাগাত লই গেছি ।
কত গপ তানলগে ।

--- গপ মাররে বেটা । স্যারে রিক্সা চড়ইন না, অত কথাও মাতইন না । স্যারর জানছ নি
বেত রাখার চুঙা আছে একটা । কুণুটা ছোট, কুণুটা বড় । এক এক বেতর মাইর এক এক
রকম । গল্পার বাড়ি ছিতরাইয়া পড়ে, জালি বেতে হাত ফালাফালা অই যায় । আর তানে
বারিন্দাত দেখলেউ পুয়াইন্তর মুত বারঅই যায় । আমার দিকে না চাইয়া হাত বাড়াইলেউ
আমার বুঝন লাগব, কোন বেত দিতাম । তার পরেউ, হাত পাত । এক বাড়ি মারিয়া বেত
বারিন্দাত, আর তাইন ঘরো । এইন যে তর লগে অত মাত মাতবা মনো লয় না ।

--- তোমার মন লইয়া তুমি থাকো । তে আমি যেতা জানি ইতা কইয়ার হুনো । তাইন
কইন, অউ যে বেত মারিয়া ঘরো ঢুকলা, ঢুকিয়া বুলে খালি কান্দইন । তুমার হাতো এক আনি
এগু ধরাই দেইন, পুয়া ইগুরে খাওয়াইবার লাগি । আর তুমি হি পয়সা মারি দেও । আর
লাগিউ হিদিন ফাটক বাজারো দেখলাম তুমারে । আম কাঠলর ছন্তর থাকি ইয়া গাটা এক
কাটল আর এক টুকরি পুকড়া আম লইয়া কালিবাড়ির সামনে উবাই রইছো । দেখছি নানি
কও ।

--- আর তুই যে আমারে পৌছাই দিলে আম কাটল লইয়া, ভাড়া দিচ্ছ কয় আনা ।

--- অউত্ত ভালা কথা মনো করছ রেবা যুগেন্দ্রহন্দা, ভাড়া টাইন দিলাও অখন ।

--- আয় ভাড়া নিতে না কিল খাইতে । আমি জানি তুই কিতার লাগি আইচ্ছ, কেনে আনদু
ফানদু মাতরে । লাখুদায় কইছইন । শিববাড়ির ধারো আছইন বীরেনবাবু, অদরচান্দর মাস্টর
। তাইন তরে কই দিবা নদী তেড়া, না নদী সোজা । আর একখান কথা কই দেই, আমার
সারে ছাত্রের মারইন না । তানে এমনেউ ডরায় । কী সুন্দর তান কাপড় চুপড় দেখচ্ছনি,
ধপ্পা, ধুতির কড়া ইস্ত্রি সব সময় । বাজাবরিছড়ার মোটা গিলা দিয়া হাত বানাই দেয় বাদল

শুক্লবৈদ্য । এর লাগিউ সবে তানে কয় বগা ধর । তর রিক্সাতও তাইন চড়ইন না, তারাপুর
থাকি হাটিহাটি আইন ।

--- ইতা কিতা কও বা । আমি ওত তানে চিনি । তাইন আইন মধুরামুখ থাকি ।

--- মধুরামুখো কেউ থাকইন না । সব মাস্টরর বাড়ি আমি চিনি । শ্যামাদাসবাবু গুরু দাস বাবু
থাকইন ইঙ্কুলর ধারো । জ্যোৎস্নাবাবু প্রমোদবাবুও ধারোধারো থাকইন । হরেন্দ্রবাবু প্রেমতলা,
তারাপদ বাবু বান্দর তলে, বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ ও তারাপুরো । গিরিজাবাবু কি জানি কই
থাকইন, তাইনও তারাপুর । রাজকুমার বাবু শিরিষবাবুও তারাপুরো ।

--- তে তাইন কে ।

উপন্যাস

পাঁচ

তিনি কে তবে। যোগেন্দ্রদা বলেছে মধুরামুখে কোনও শিক্ষক নেই। যোগেন্দ্রদা বললেই সে মানবে কেন। বৈতল তাকে রোজ স্কুলের সামনে ছেড়ে দিয়ে যায়, যতক্ষণ রিক্সায় থাকেন, দুজনে কথা বলে বকমবকম। যোগেন্দ্রদা মানুষ ভাল হলেও বৈতলের সঙ্গে মস্করা করে খুব। সত্যিমিথ্যে মিশিয়ে কথা বলে। হেডমাস্টারকে বলে হেডমাস্টার নয়। আর বৈতলও কোন ধাঁধায় থাকার মানুষ নয়। যতক্ষণ না নিরসন হচ্ছে, তার শান্তি নেই। তাই মাস্টারকে রিক্সায় উঠতে দেয় না। বলে,

--- আগে কইন আপনে কে। হেডমাস্টার নানি।

--- তার আগে কও তুমারে না কইল কে। যুগেন্দ্রয় তো। তুমার লগে রসিক করছে। তুমি তার ভাত তরকারি খাও চুরি করি, কিচ্ছু কয় নি।

--- না, কয় না।

--- তে তুমার লগে লাগলেও কিচ্ছু কইও না। হেউ তো কইল তুমি ভুগল শিখতায়।

--- অয় শিখতাম। উঠইন।

--- তুমি অইলায় রেবা আমার সারথি শ্রীকৃষ্ণ । তুমি হা করলেউ ভুগল । বিশ্ব ব্রহ্মান্ড । অখন কও কুন ভুগল শিখতায় । ভুগল দুইরকম, সব তুমার 'হা' ভিতরে আছে । যখন তুমি মাছ ধরো বড় হাওরো, একলা একলা ঘুরিয়া বেড়াও মিরতিঙ্গার পাহাড়ো তখন অইল প্রাকৃতিক ভুগল, আর যখন তুমি কও 'বোম বোম বম্বালে' কও 'নারায়ে তকবির', যখন রামদা লইয়া দৌড়াও ইটখলা থাকি ঘনিয়ালাবস্তিত, তখন অইল রাজনৈতিক ভুগল । বুজছ নি । অউ যে তুমি রিফুজি অইয়া ইপারো আইছো, ইতা ভুগল নায় । ইতা বানাইল ভুগল । ইতা ভুল ভুগল । ইতা না মানলেউ সুখ ।

বৈতলের প্যাডেল ঘোরে ধীরে । জোরে ঘোরালেই তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে গন্তব্যে । স্কুলের সামনে রিক্সার চাকা থামলেই বৈতলের পাঠশালা ছুটির ঘণ্টা বাজবে । বৈতল জানে হেডমাস্টার এক বিশাল হাওর । হাকালুকি থেকেও বড় । আর তার ভিতর কত কিসিমের মাছ । দক্ষ মাছুয়া বৈতল বিশাল এই জলরাশির সামনে অসহায় হয়ে যায় । ভাবে, ছিপ দিয়ে সে কী মাছ ধরবে । অবাক বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করে,

--- আপনে অততা জানইন কেমনে ।

--- বুঝলায় নিবা, শিখার কুনু শেষ নাই । কিছু জানি না । শিখার কুনু বয়সও নাই । যতদিন বাচমু ততদিন শিখমু ।

বৈতল ও তার বন্ধুদের সঙ্গে শেখা ভাগ করে নেয় । জানার ইচ্ছেকে পোক্ত করে । বৈতল মেয়েকেও দেয় তার অভিজ্ঞতার ধন । গর্ব হলে বৈতলের বাপ বলে , ' বাপে বানায় পুত' । বৈতলের ছেলে নেই তো কী হয়েছে । বিয়ানিবাজারের গুরু সৃষ্টিধর তাঁর পাঁচ কন্যাকে মানুষ করতে পারেননি বলে দুঃখ করেছেন । বলেছেন,

--- গার্গী আর খনার মতো সব অইন নি বা । আমি নিজে শিখতাম করি তারারে কিছু শিখাইলাম না । অখন কারে দিয়া যাইতাম কও আমার ত্রিভুবন ।

না বৈতল ভুল করেনি । সে সব দিয়ে যাবে মেয়েকে । মুদিখানার দোকান বিনোদা ভাণ্ডার থেকে কেনা এক পয়সার বর্ণপরিচয় আর দুই পয়সার শেলেট পেন্সিল দিয়ে পড়াশুনা শুরু করে মেয়ের । ধাপে ধাপে অনেক বইখাতা হয়েছে । ছোট মেয়ে এখন বই দেখে বাপকে শাসনও করে । বলে,

- কখনও মিছা কথা কহিও না ।
- আমি কইনি কুণু ।
- কাহারো সহিত ঝগড়া করিও না ।
- আমি করি নি ।
- কাহাকেও গালি দিওনা ।
- আমি গাইল্লাই নি ।
- ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না ।
- জিগা তোর মারে ।

প্রথম প্রথম সন্দেহ হত মেয়ের মা শিথিয়ে দিচ্ছে না তো । তারপর মেয়ে পুরো বইটাই পড়ে শুনিয়েছে । বৈতলও হেডমাস্টার কম নয় । মেয়েকে বলে,

--- আইচ্ছা গো মাই । পুড়িস্তর কথা কিছু নাই কেনে তোমার বইত । তাইন তো বিদ্যাসাগর । বিধবা বেটিস্তর বিয়া দেওয়াইছইন । তোমার মতো ভালা সোনামনির কথা লেখতা পারতা । ই খালি রাম নবীন তারক ঈশান কৈলাশ গিরিশ আর গোপাল রাখালর কথা ।

মেয়ের বাপের কথা বোঝার বয়স হয়নি । তাই খুশি খুশি বৈতলকে বলে,

--- আমার লগে অপেনটি বায়স্কোপ খেলতায়নি । অউ দেখ পাচটা গুটি ।

একটা গুটি ছেড়ে দেয়, মাটিতে তালি দেয়, আবার গুটি ধরে । এক এক করে সব গুটি হয়ে গেলে খেলার ছড়াও শেষ হয় । ছড়ার কথায় সুর দেয় মেয়ে দুলে দুলে,

‘ অপেনটি বায়স্কোপ

টাইটাই টায়স্কোপ

চুলটানা বিবিয়ানা

লাটসাহেবের বৈঠকখানা

লাটে কইছে যাইতে

পান সুপারি খাইতে

পানের আগাত মরিচ বাটা

ইক্ষাপনের চাবি আঁটা

আমার নাম রেবুবালা

গলাত দিছি মুক্তার মালা ।’

হেডমাস্টরকে বৈতল শোনায় তাঁর মেয়ের বিদ্যাশিক্ষার কথা । ছড়ার খেলার কথা ।
মাস্টার বলে,

--- একদিন লইয়া আইও আমার বাড়িত । শিখাই দিমুনে বউত ছড়া । বৈতল মেয়েকে
শোনায় সমাচার । বলে,

--- আর পুকইরো নায় মাই, অখন নদীতে যাইতাম চলো । মস্তো বড় নদী ।

মেয়েকে নিয়ে যায় মধুরামুখের চরে । তেলের শিশি থেকে তেল মেখে মেয়েকে দৌড়
করায় চরের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে । বলে,

--- বুঝছনি মাই, আমার বাপে কইতা তেলে জলে বাইচা বাড়ে । সাতার দিতায় নি নদীত ।

মেয়েকে নিয়ে বৈতল নেমে যায় জলে । পেটে হাত রেখে বলে,

--- হাত পা চালাও দেখি ।

মেয়ে একবারও বাপকে জড়িয়ে ধরে না । খাবি খেয়েও ভেসে থাকে । বাপের হাতের
ছোঁয়া নিয়ে ভেসে থাকে নদীর জলে । সিনান শেষে যায় মাস্টারবাড়ি । জানায় মেয়ের জলে
ভেসে থাকার কথা । হেডমাস্টার বলেন,

--- তুমি অইলায় পানির পুক । তাই অইল পুকর পুড়ি পুকি । অইবউ । নানি গো । এই দেখি ছড়া লইয়া ঘুরবায় তুমি । অউ তেলর শিশি ভাঙতায় পারবায় নি ।

--- কেনে ভাঙতাম ।

--- ভাঙলে একটা ছড়া শিখাইমু ।

--- না ভাঙতাম নায় ।

তাও হেডমাস্টার শেখায় ছড়া ;

‘তেলের শিশি ভাঙলে পরে খুকুর পরে রাগ করো ?

তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো ? তার বেলা?’

বৈতলের মেয়ের পছন্দ হয় না ছড়া । কিন্তু বৈতলের মনে ধরে যায় কথা । খানসাহেব রশিদ আলির দক্ষতায়, একলব্যর মেধায় শিখে নেয় গানের ছন্দে । হেডমাস্টারকে বলে,

--- কে লেখছইন ইগান ।

--- বালা লাগছে নি কও । কবির নাম অন্তদাশঙ্কর রায় ।

--- আপনার দেওয়ালো অত ছবি ইতা কার ।

--- তুমি চিনবায় নি । অউ যে লাম্বা দাড়ি আলা, তাইন রবি ঠাকুর, বিশ্বকবি । আর অউ যে লাম্বা চুল আলা তাইন কাজি নজরুল, তাইনও কবি । রবি ঠাকুরর ভাই ।

--- ঠিক নি ।

--- ঠিক নাতে বৈঠিক নি, তুমার যুগেন্দ্রদারে জিগাইও ।

--- বুঝছি, আমার ভাই আছিল লুলা । রুল আমিন বেজ । হেও কবি আছিল । আমি মারি ফালাইছি । আপনে খোদা মানইন নি, আল্লা ।

--- এরাউ আমার খোদা, এরাউ আল্লা ভগবান । আর অউ যে হাসিমুখো একজন মানুষ দেখবায় তানে দেখলে মন ভালো অই যায়, বাবায় কইছইন তাইন আমার গুরু ।

--- তানে আমি চিনি, তাই সুঙু গোসাই ।

--- মানুষেরে তাইন আদর করইন । বালা রাস্তাত চলার কথা কইন ।

--- আপনে গোসাইরে মানইন । তে নু কইলা আপনি লস্কর । আপনে কুন্সু হিন্দু নি ।

--- মাইনষে কিতা কয় কও । হিন্দু না মুসলমান ।

--- মানুষ দিয়া কিতা করতাম । আপনারে লইয়া আমার অউ আতান্তর । আপনে কিতা আমি জানি না । লেখাপড়া জানলে ইতা অইল নানে ।

--- লস্কর অইল উপাধি । আমরা লস্কর, বড়খলা বাড়ি । অউ যে তুমি আমারে কও হেডমাস্টার । হেডমাস্টার কুন্সু হিন্দু নি, মুসলমান নি । তুমারে যে ইতা কে কয় । তুমারে যে কইছলাম ভুগলর কথা, মিলাই লাও । ধর্মও দুই রকম । প্রাকৃতিক ধর্মত হাগা মুতা খাওয়া ঝগড়া না করা মারামারি না করা অইল আসল ধর্ম । আর রাজনৈতিক ধর্ম অইল ঢাক ঢোল পিটানি । মন্দির মসজিদ বানানি । ইতা অইল বানাইল ধর্ম, আসল নায় । তুমি কুনটা যানতায় কও । কওন লাগব । ছোট সময় হুন্সু নানি ঠাকুরমার পরস্তাব । কিচ্ছা । কিচ্ছা শেষ অইলে কইতা, দুধ হালো যাইতায় না মুতহালো যাইতায় । কও কই যাইতায় ।

--- আমি কুন্সুখানো যাইতাম নায় । আমার ঠাকুমা কেউ আছলা না । থাকলে নি আমার নাম বৈতল হয় ।

--- আইচ্ছা, যে দেখছে না, তারও আছিল, হেও মনে মনে হুন্সু কিচ্ছা, পরস্তাব । ঠাকুরমার পাওর উপরে বুলিয়া বুলিয়া কত জাগাত গেছি । সাত সাগর তের নদী পার করছি পঞ্জীরাজো চড়িয়া । ঠাকুমায় কইতা,

--- ‘বাড়ইরে বাড়ই

যাইতায় কই ?’

কইয়াউ পঞ্জীরাজো উঠাইতা । কত নদী পাহাড় পর্বত রামধনু মেঘ বৃষ্টি রাজপুত্র রাজকন্যা সোনার কাঠি, রাইফলস, সব বেড়াইয়া উড়াইয়া আবার দুধ আর মুতর কথা । কইয়াই ফালাইতা ধপাস । ধর্মও অইল অলাখান, ঠাকুরমার ধপাস ।

ছয়

এরকম এক এক দিন এক এক রকম । এরকম চলে দিনের পরে দিন । মেয়ের চান হয়ে গেলে বৈতল মুখে দেয় উনুন থেকে উঠিয়ে আনা কাঠ কয়লা, আংড়া । চিবোতে চিবোতে মিহি হয়ে গেলে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বত্রিশ দাঁতে ঘসতে থাকে এদিক ওদিক, মধ্যমা তর্জনী মিলিয়ে উপর নিচ । নদীর জলে কুলকুচি করে । হেমন্তের নদী তেমন ভরভরাট নাহলেও ধীরে ধীরে নামে গভীরে । মেয়ের অনুরোধে দেখাতে হয় জলের কসরৎ । ডুব সাঁতারে নদী পারাপার করা । রূপোলি রঙের পাহাড়ি কইমাছ তুলে আনে জল থেকে, শিলের তলার কৈ মাছ নামেই কই, স্বাদ নেই । অন্য মাছও তুলে বৈতল । কোনোদিন নিয়ে যায় বাড়ি, কোনোদিন দিয়ে যায় মাস্টারবাড়ি, গুরুদক্ষিণা ।

যেদিন মেলে না কিছু, সেদিন পান্তাভাত আর খেসারি ডালের বড়া । নয় সিদলপোড়া ভাত । সিলেট আর কাছাড়ের এই একটা জায়গায় খুব মিল । সিদলপোড়া খায় সবাই । হেডমাস্টার কী খায় । মনে যখন একবার প্রশ্ন জেগেছে, বৈতল বলবেই মাস্টারকে । কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাল্টে দেয় প্রশ্ন । মাস্টার রিক্সার পাদানিতে পা রাখতেই বলে,

--- পুড়িরে কই দিতাম ছার । ইস্কুলোর সময় তো অই গেল ।

--- কত অইছে বয়স ।

--- অউত্ত আট বছরো পড়ব । জয়কুমারো তৃতীয়মান ।

--- স্বদেশি ইস্কুলো দিলাও । আমি কই দিমুনে ।

--- আইচ্ছা । আপনার ইস্কুলো অইত নায় ।

--- পুয়াইন্তোর ইস্কুলো কেমনে পড়বো ।

--- অ, তে আমারে ভর্তি নেইন গি ।

--- তুমি তো পুয়া নায় ।

--- তে কিতা ।

--- তুমি বৈতল ।

--- আমি নানি পরতি দিন ছানউন করিয়া আপনার ইস্কুলর লাগি সাজি লাই । ঘণ্টি পড়লেই জেন বেধিত বইতাম ।

--- ইস্কুলর পড়া না পড়লেও হয় । মানুষ হওন লাগে । দেশভাগ আমরারে অমানুষ বানাইছে । কও চাইন তুমি যে সিলেটো আছলায় কুনু কষ্ট আছিল নি । মাছ মারতায়, খাইতায়, বাউটামি করতায় আর পুথি পড়তায় ।

--- আমার কষ্ট আছিল ছার, পুথি পড়তাম পারতাম না । ভুষিমালর দুকান থাকি কিনা বর্ণপরিচয় পড়িয়ার অখন পুড়ির অউগদা । আমার নানি খুব শখ আছিল পাঠশালাত পড়তাম । আমার মায় চাইতা । আমারে কত জাগাত পাঠাইছইন, মনসামঙ্গলর উঝা বানাইবার লাগি । আমার এক বন্ধু আছিল লুলা, হে হিকাই দেয় থুড়া । হেও তো অলাখানঅউ । হে আছিল বেজ, বাদিয়া আরি । রুল আমিন বেজ । সাপ ধরার কারবার আছিল তার বাপর । হে অইগেল কবি । কবি গান লেখত আর গাইত গাউর বাজারো । খিত্তার বাঙাল আছিল, কী গুসা কী গুসা তার । আমার লগে দেখা অইছিল মিরতিঙ্গার পাহাড়ো, ছোট আছলাম । আমার মা মরার সময় হে আছিল । আমি তখন কৈ । তত্তাত রান্দা মারিয়ার, পেচকুন্দার নাচ দেখিয়ার আর গুরুর কাছ থাকিয়া পুথি শিখিয়ার । কত গান যে শিখছি ।

--- অখন কই থাকে বন্ধু, পাকিস্তানোনি ।

--- না, উপরে ।

--- অ, কইছলায় একদিন ।

বৈতল আর কথা বাড়াতে চায় না লুলা বিষয়ে । বন্ধুত্বের সংজ্ঞা সে কাউকে বোঝাতে পারবে না । বোঝাতে পারবে না প্রাণ দিয়ে রক্ষা করার বন্ধুত্ব কেন প্রাণঘাতী হয় । তাই লুলার মৃত্যু প্রসঙ্গ সরিয়ে রাখে হেডমাস্টারের কাছ থেকে । বৈতল কথা সরিয়ে নেয় সিদল পেড়ার দিকে । বলে,

--- অউ আর এক জিনিস দেখলাম ইখানো সিলেটর লাখান ।

--- কিতা বা ।

--- হিদল আর কি । হিদলর গন্ধে পাগল অই যায় মানুষ । আপনারা খাইন নি । আপনারা তো ভদ্রলোক ।

--- খাওয়ার আবার ইতা কিতা । তে এও ঠিক কথা, গাউর মাইনষে খাটইন খুব । খাটলে খাওন লাগে । কিতা খাইত । মেকুরে লাফ মারি যাইত পারত নায় অলাখান উপুরতুপুর টিক্কইর মারা ভাতর থালোর এক কুনাত থাকে ছোট এক দলা হিদল পোড়া । হালুচার আর কিতা লাগে । পুটকিপুড়া মরিচবাটা দেওয়া হিদলর দলা ইপার থাকি হিপারো নেয়, আর এক গরাস ভাত দেয় গলাত । হাতো যেতা লাগল অতাউ । আবার আনল ইপারো । অউ করতে করতে গন্ধেউ ভাত সাবাড় ।

মাস্টারের এই সিদলপোড়া ভাতের বৃত্তান্ত বৈতলের আনন্দ হয় না । একবার প্যাডেল থামিয়ে মাস্টার আর তার দূরত্ব পরিমাপ করে । এই গল্পটাই দুখু বললে তার নির্যাস অন্যরকম হয় । হাসির খোরাক হয় । ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে দরিদ্র চাষীর অন্নব্যঞ্জনর এই কটাক্ষ মানতে পারে না বৈতল । বলেই ফেলে প্রিয় মানুষকে ।

--- আপনারা খাইলে কিতা হাত লাগাইন নানি । ইপার থাকি হিপারো নেইন নানি রউমাছর টুকরা ।

বৈতল কারো মন রেখে কথা বলতে শেখেনি । তাই কথাটা বলেই বুঝতে পারে নতুন গুরুর মনে দুঃখ দেওয়া হয়েছে । তাই আবার বিষয় পাল্টায় । ভূগোল সংক্রান্ত তার মূল প্রশ্নে যায় সরাসরি । বলে,

--- আইছা, ইতা ছাড়ইন । অখন কইন চাইন দেখি একখান কথা ।

--- কও ।

--- অউ যে আপনার নদী ।

--- নদী তুমার নায়নি ।

--- অখন তো আমারও । তবে আমার সুরমার লাখান নায় । পিয়াইনর লাখান নায় ।

--- ওরেবা, সুরমা তো অইলা পরে । যার পরসাদে রামর মা তারেউ তুমি চিন না । অউ যে দেখরায় নীল নীল বাতাসর রঙর পাহাড় ওখান থাকি বার অইছইন বরাক, একটু আউগগাইয়া অইছইন কুশিয়ারা, সিলেটো গিয়া অইছইন সুরমা । এনে ইখানো বন্ধ করি দেও, কও আর যাইতায় পারতায় নায়, দেখবায় তুমার গাউত পানি নাই । কিতা নাম নানি তুমার গাউর ।

--- বইয়াখাউরি ।

--- তুমি তো সুনামগঞ্জ নানি । তুমার মাতে বুঝা যায় । সিলেটি মাতর আছে তিন রকম । সুনামগঞ্জের মাইনষে একেবারে নদী আর মাটির লগে মিলাইয়া মাতইন । করিমগঞ্জর মানুষও অলাখান । সদর সিলেটর মাইনষে ভাবইন তারাউ আসল সিলেটি, মাতো মিঠা নাই । কিন্তু তারা আছইন দুনিয়ার হক্কলখানো । কত বড় বড় মানুষ । আর হবিগঞ্জ তারা কুনু সিলেটি নি । কি রকম গুলগুল করিয়া মাতইন । যাইতাম নাতা, খাইতান নাতা । তারা আর বাইন্যাচঙি, সিলেটি অইয়াও সিলেটির লাখান লাগে না । একটু বেশি মিঠা ।

--- আপনেও কিতা সুনামগঞ্জ নি ।

--- নারেবা, আমি কাছাড়ি । আমার নদী আলাদা, তাইন ও পাহাড়ি, খুব গুসা তান । আমার গাউর উপরেউ তান গুম্‌গুমি । কুনদিন নিশ্চিহু হই যাইব আমার বড়খলা জাটিঙ্গার যাতাত । জঙ্গল উঙ্গলো সাফ, কত হাতি আছিল, হাতির খলা আছিল । অখন নাই ।

--- ও, এর লাগিউনি আপনে আইছইন মধুরামুখো ।

--- চাকরির লাগি আইছি রেবা ।

--- অউত্ত, একঅউ কথা । আপনেও রিফুজি, চাষবাস নাই, চাকরি নাই দেশো । আমরা দেশ
অই গেছে বিদেশ, আপনার দেশ নিছে পানিয়ে । আমরা রাজনৈতিক উদ্বাস্তু, আপনে প্রাকৃতিক
উদ্বাস্তু ।

--- ইতো দেখি গুরুমারা বিদ্যা তুমার । তে ভুল শিখছ, আমরা কেনে রিফুজি অইতাম ।
আমরা কাছাড়র আদিবাসিন্দা । আমরা বড়লস্কর । যতীন্দ্র দেব লস্করর নাম হুনছনি, আমরা
গুপ্তির ।

--- না না, কাছাড়ি হকলও ভাল ।

--- আইচ্ছা আমারে আর ফুলানি লাগত নায় । আমি মাছর ফুটকরা নি ।

--- আপনারে কিছু কইলেউ গুসা করি লাইন । কইলাম একখান কথা কইন, হুনইন অউ না
।

--- কও কও ।

--- এক আতান্তরো পড়ছি অউ নদী লইয়া আর নদীর বান্দ লইয়া ।

--- কেনে, নদীয়ে তুমার কুন পাকনা ধানো মই দিলা । এইন একটু নাচইন, একটু তেড়া
ভেড়া । আদর করি মাইনষে ডাকইন বড়বেকা । দেখছো নানি মধুরামুখো ।

--- আপনার বাড়ির সামনে দি ঘুরি গেছইন মধুরার লগে মিলিয়া ।

--- ইখানরে কিতা কয় জানো নি । কাখো কলসি লইয়া যাইরা যেখানো ।

বৈতল জানে গুলতির কথা, বৈতল জানে বাটির কথা, জানে চাঁদের কথা, কিন্তু কাঁখে
কলসীর কথা জানে না, তাই চুপ করে থাকে । পণ্ডিত মানুষের মুখে মুখে ওস্তাদি করতে নেই
জানে । জানে নতুন কথা শিখতে হলে শ্রদ্ধায় নত করতে হয় মাথা । কিন্তু মানুষটা দেখলে
তো কেউ বলবে না তার মনের ভিতর এমন রসকুস্তের ছলছলাৎ । গাগরি রাখা নারী-
কোমরের সঙ্গে নদীর বাঁক মেলানোর মানুষ কিছুতেই অতিসাধারণ নয় । মনে মনে
যোগেন্দ্রদাকে দুয়ো দেয়, যোগেন্দ্রদা বলেছে তিনি হেডমাস্টার নন । চালকের আসনে বসে
প্যাডেল না থামিয়েই বৈতল নম করে তার নবীন শিক্ষককে ।

দুজন দুই মেরুর বাসিন্দার কল্পনার মিল দেখে বিস্মিত হয় । দুর্গাবতী, তার স্ত্রীও নদীকে নারী কল্পনা করে, এই মানুষটিও করে । দুর্গাবতীর নদীকে নারী ভাবায় সে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখে না, কিন্তু এই মানুষ, তার হেডমাস্টার । একজন পুরুষের এই বিভোর হয়ে নারী নয় বস্তুতে রমণীরূপ আরোপ করায় সন্দেহ হয় বৈতলের । লোকটি কি তবে কবি, লক্ষ্মণশ্রীর দেওয়ান যেমন, কবি ষষ্ঠীর যেমন, সাধক রাধারমণ যেমন । নাকি সুখের ঘরে কোনও চোর ঢুকেছে । মানুষটার ঘরেও তো নারী আছে । আভাসে জেনেছে বৈতল, দেখেনি কোনোদিন । তবে কেন পরনারী কল্পনায় সুখী হয় । নাকি আরো খুঁড়তে চায় । চোরাবালি আর জলের হদিশ জানে না । জানবে কী করে, অসম্ভবকে কি কেউ জেনেছে কখনও । তাই, বৈতল কিছুক্ষণ আপনমনে রিক্সা চালায় আর গুনগুন করে গায় সিনেমার গান, ‘তুফান মেল যায়’ ।

--- জয়কুমার এর বাঁক ঘুরতেই বৈতল গান থামায় । মনে পড়ে হেডমাস্টারের কিছু একটা বলা হয়নি, সাবধান করে দেওয়া হয়নি । বৈতল সরাসরি সারথির আসন থেকে বলে,

--- গুরুদেব । বেটিমানুষ আর পানির নিন মাপিয়া কিতা করতো । আম দি কাম আপনার, খামোক্খা কুড়ুলাতে পড়তা কেনে । কাখো কলসি লইয়া, কমর বেকাইয়া, পানি ফালাই ফালাই যখন যাইন তখন কিতা তারা ঠিক অউ অত সুন্দর অই যাইন নি । না আমরা ভাবি । ভাবনা শেষ, আমরাও আবার কালা তস্লা ।

বৈতল নেশাগ্রস্তের মতো কথা বলে যায় । রাশভারি মানুষটি একটু সময়ের জন্যও রাশি আলাগা করেন না । বৈতলেরও কথা শেষ হয় না, আরো অনেক প্রশ্ন তার মনে । সব কথা কি এখনই বলে ফেলবে । ননীদার দোকানের সামনে এসে বলে,

--- চা খাইতা নি ।

--- না বা ।

--- আপনে সিনেমা দেখইন নি ।

--- দেখি, তুমার অউ তুফান মেইল দেখছি গীতশ্রীত । আর ওরিয়েন্টেলো দেখছি মর্নিং শো, সব ইংলিশ সিনেমা ।

--- একলা দেখইন নি ।

--- কেনে দুকলা কার লগে দেখতাম, তুমি দেখতায় নি ।

--- না না , আমার রিক্সার এক না রাখি দিবা নি ।

--- অখন তো সবে সিনেমার নামে রাখরা ।

--- তুফান মেইল পাচখান অই গেছে ।

--- তে কিতা রাখতায় । ইংলিশ নাম রাখতায় নি । রাখিদেও ‘বাইসাইকেল থিবস’ ।

--- অর্থ কিতা ।

--- সাইকেল চুর ।

--- ঢঙ নায়, হাচারির নাম কইন ।

বৈতলের বিস্ময় বাড়ে । মানুষটি তার অতীত নিয়ে এত তথ্য কোথায় পায় । বৈতল জীবনের প্রথম বাঁক ঘুরেছিল সাইকেল চুরি করতে গিয়ে । ধরা পরার পর সাজাও হয় । এর পরেও বন্দী থাকে বৈতল পেশকার বাড়িতে, দাড়িয়াপাড়ায় । পেশকারের ফর্সা রঙের কিশোরী কন্যা বুড়ি তার মনে দুঃখ দেয়, গভীর ক্ষত । আপন মর্জির মালিক বৈতলকে বলে চাকর । বৈতল মেয়েটার কান ছিঁড়ে মাকড়ি নিয়ে পালায় । আর যায় নি সিলেট শহরে । কৈশোরের মন্দ স্মৃতি থেকে বৈতল বেরোতে পারে নি আজ পর্যন্ত । তাই রিক্সা নামের এক বিকল্প জানায় মাস্টারকে বলে,

--- দুখুয়ে কইছে বুরবক রাখার লাগি । হিন্দুস্থানী হকলে কয় বুরবক আডুলরে । দুখু ইগু এক কীচক ।

--- না রেবা, বুরবক নায় । বুরবক, স্বর্গর ঘোড়া । আমরার যেমন উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ইন্দ্রর ঘোড়া, আকাশো উড়ে । রাখতায় পারো, ডাকতায় পারবায় নি ।

--- আমার এইন ইস্কুলো পড়ছইন । কইছইন চৈতক রাখি দিতাম ।

--- এইনও এক ঘোড়া, রাণা প্রতাপর ।

--- এর থাকি বালা কইন, আমার মতো মাইনষে বুঝব ।

--- তে নাম রাখি দেও পঙ্খীরাজ ।

বৈতলের পছন্দ হয় নাম । ইটখোলার রাজকুমার পাটোয়ার সঙ্গেও কথা হয়, লিখে দেবে নাম । মাস্টারকে তার পছন্দের কথা বলা হয় না তালেগোলে । বীরেশভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথির ডাক্তারের ঔষুধ নিতেই দেরি হয়ে যায় মাস্টারের । খুব ভিড় থাকে, এমন নামকরা ডাক্তার তো আর নেই শহরে । হেডমাস্টার ফিরে এসে দেন তাড়া, বৈতলও জোরে পা চালায় প্যাডেলে । কাছাড় ফার্মেসির কম্পাউন্ডার ভোলা চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে এসে খোঁচা খেয়ে থামতে হয় বৈতলকে । মাস্টারের খোঁচা ইশারায় থামে বৈতলের পঙ্খীরাজ ।

বৈশাখের শেষ, সকাল থেকেই গরম । স্কুলের সামনে ছাত্রদের ভিড় গিজগিজ করছে । বইপত্র খুব কম, সবার হাতেই ফুলের মালা নয় তোড়া, বিস্কুটের মালা, ছোট ছোট হাতের নানা উপহার । গরমের ছুটি হয়ে যাবে স্কুলে । তাই স্যারদের জন্য শ্রদ্ধার্থ । এর মধ্যেই সেই গরুর গাড়ি বঝাই বরুয়া বাঁশ আর তার গাড়োয়ান জগড়দেও । বড়াইল পাহাড় ঘেরা এই শহরে গরমকাল খুব বিচ্ছিরি । প্যাঁচপ্যাঁচে অসহ্য গরম । বৈতল বোঝোনা, ওর ঠাণ্ডা গরম বোধ একটু কম । দুখু এ নিয়ে বৈতলের বৈতশরীরকে কটাক্ষ করে । বলে,

--- গরম লাগত কই । পাটাকাঠি তো হেলিয়া দুলিয়া বিচইনর কাম করে ।

বৈতল মানে না । তার ছিপছিপে শরীরের দোষে নয় তাপ উত্তাপ । বলে,

--- অত যে পানিত থাকি, গরম লাগত কই ।

ওদিকে জগড়দেও গাড়োয়ান আমকাঠের লাঠি দিয়ে অনিচ্ছুক বলদকে পিটিয়ে যাচ্ছে, আর মুখে বলছে, হেই থি, থি থি, । অন্য বলদের লেজ ধরে টানছে, মুচড়ে দিচ্ছে । গরমে গরুও যেমন, মোটা সোটা জগড়দেও গাড়োয়ানও সমান কাতর । গামছা মাথায় দিচ্ছে, নামিয়ে আনছে, ঘাম মুচছে আবার মাথায় দিয়ে সূর্যের তাপ বাঁচাচ্ছে । আর গরু পেটাচ্ছে । ষাঁড় দুটোর বেয়াদবিতে যার পর নাই বিরক্ত, গরু এক পা এগোয়, আবার ঝিমিয়ে পড়ে । বৈতল দেখে, কষ্ট হয় বন্ধু গাড়োয়ানের জন্য । রিক্সায় বসা মাস্টারের রাগও চড়চড়িয়ে বাড়ে । বৈতলকে বলে,

--- দেখরায় নি গরু ইগুর তাল । গরুর নি মাইনষে ইলাখান মারে, মরি যাইব তো ।

--- পারের না নানি, উবাও দেখাইয়ার । হেই বৈতল, থামো চাইন ।

--- হকচকিয়ে যায় বৈতল । এ তো তার পরিচিতি নির্দেশ । বাপ বলে,

--- হেই বৈতল, পানিত লাম ।

বৈতল মাস্টারের কথায় প্যাডেল থামায়, ব্রেক লাগায় । ধুতির কোঁচা পকেটে ঢুকিয়ে
রিক্সা থেমে নামে বৈতলের হেডমাস্টার । জগড়দেও এর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, যুগেন্দ্রদা
যেমন বলেছে বেত মারার আগে হাত বাড়ায় । বলে,

--- দে লাঠি ।

জগড়দেও ও রাগী গরুর গাড়ির চালক । দেয় না । বলে,

--- কিতা অইছে ।

--- কিতা অইছে কছনি । লাঠি অণ্ড দে । তরে মারি অলা উবাথুবা । দেখ কেমন লাগে ।

--- ইতা মারণ লাগে । আপনে যাইন । রিক্সা থাকি নামিয়া ইতা বাবুগিরি করলে আমার চলত
নায় । পেট আছে ।

--- কিতা কইলে । দেখতে নি । বাজারি মাইর কারে কয় দেখতে নি । একটাও মাটিত
পড়ত নায় । অউ পিপড়ার পাল দেখরে নি । সব আমার ছাত্র । এক ডাকেউ আইব
। ভালা কথা কই হুন, গাড়ি ছাওয়াত লইয়া যা, গরু দুইটারে ছাড়ি দে । একটু পানি খাওয়া
। গরু বাচলে তোর পেটও বাচব ।

বৈতলের রিক্সায় আর চড়ে নি মাস্টার । বলেছে,

--- অউ নেও তুমার দুই আনা । ইস্কুলো তো আইছি অউ, আর উঠিয়ার না । কাইল থাকি
কয়েক দিনর লাগি বড়লাগি যাইমু । তুমারে কইমুনে পরে । আগুন রঙের মাস্টার কড়া
রোদকে উপেক্ষা করে পকেটের কোঁচা হাতে নিয়ে হনহনিয়ে ঢুকে যান ইস্কুলের গলিতে ।

বৈতলও লুঙির খুটে দুআনি রাখতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে পথে । খেয়ালও করে না । বৈতল
কিন্তু বোঝে হারিয়ে গেছে কিছু ।

সাত

একদিন দুদিন করে, এক হপ্তা দুহপ্তা করে একমাস কেটে যায় । বৈতলের
হেডমাস্টারের আর দেখা নাই । যোগেন্দ্রদার কাছে গেলে কোনও সদুত্তর পাবে না বৈতল ।
বিশ্বাসই করবে না লস্কর হেডমাস্টারের কথা । বলবে মধুরামুখে কোনও মাস্টারই থাকে না ।

বৈতল দুআনি হারানোর পরই বুঝে যায় এবার সাধুসঙ্গ সঙ্গ হলো তার । জগরদেও
গাড়োয়ানের কথা মনে লেগেছে তার । যেরকম গোঁয়ার মানুষ, হয়তো জীবনে আর রিক্সাই
চড়বে না । তা বলে বৈতলের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করবে । একমাসের মাথায় যায় মধুরামুখের
মাস্টারবাড়িতে । তালাবন্ধ বাড়ির চারদিকে অযত্ন । বৈতলের মনে কুড়াক ডাকে । মায়ে
মৃত্যুর পর বাপের বাড়িতে গিয়ে যেমন দেখেছে বৈতল । বৈতলের গা ছমছম করে ।
হেডমাস্টার নিজেই বলেছে বড়খলায় বাড়ি । ছেলেপুলের কথা প্রশ্ন করেনি । জানতে চায় নি
কে রান্না করে দেয় । এমন ধোপদুরন্ত পরিপাটি বেশবাস দেখে কে । কে কাচে, কে সাজায় ।

আবার লাখুদার কাছে যায় । নদীর চরে বাঁধের লাগোয়া এক টুকরো জমি বেড়া দিয়ে
ঘিরে রেখেছে মাঙ্গি সিং আর তার মা । মাঙ্গি সাইকেলের রিক্সা মেরামতের করে । তার মা
ফাটক বাজারে মুড়ি বিক্রি করে । শীতের দিনে লাইপাতাও বেচে । মুলো লাই আর সর্ষেবাটার
চচ্চড়ি বা রুইমাছে মনিপুরি লাইএর ঝোল হলো শীতকালের অমৃতপদ । বৈতল বুঝতে পারে
না নদীর পারের এইজমি এত উঁচু করল কে । কেই বা এই জমির মালিক । মাঙ্গি আর তার
মাকেই বা শাকসবজি করার জন্য বেড়া করে দেয় কে । লাখুদাই বা ওদের ছাপটা ঘরের
দাওয়ায় বসে চা খাচ্ছেন কেন ।

বৈতলের চোখের সব প্রশ্ন এক করে লাখুদাই হাসিমুখে জবাব দেন । বলেন,

--- দেখছনি না বা মনিপুরি পুয়ায় কীরকম শাকসবজি ফলাইছে । নদীর চররে কি রকম সবুজ
বানাইলাইছে । কত কিছিমর ডেঙ্গা ফলাইছে কও । অউ দেখ, ছিংলার লাখান ইতা ডাইলো
দিলে কিতা অইব কও, খালি চুষতায় আর অমৃত অমৃত কইয়া ছিবড়া ফালাইতায় । আর অউ

মোটা ডুগির লগে কাটল বিচি দিয়া কড়ু । নালিয়াগাছ আর বড় করিয়া লাভ নাই কইছি, কচি দেখিয়া আগপাত বেচিলাউক মাইনষে গিটটো দেওয়ার লাগি নিবা । খাইছ নি বা নালি গিট ।

--- আপনার খালি খানির মাত ।

--- এ, না খাইয়া পারবায় নি । ই মা বেটা কই যাইত আছিল, না খাইয়া মরলনে । অউ মাঙ্গি ইগুর বাড়ি আছিল নদীর পারো, নদীয়ে নিছইন গিয়া । তারাও কুনু নদীরে ছাড়বা নি । আবার মাটি উটি ভরাইয়া বাড়ি করছে । আবার নিতা গি পারইন মা গঙ্গায় । সরকারেও নিতা পারইন । এর লাগি মানুষ বাচত না নি । তুমিও তো রিফুজি, তুমারে জমি দিছে নি সরকারে ।

--- আর সরকারে দিছে জমি । ঠগর বাড়ি নিমন্ত্রণ আচাইলে বিশ্বাস । কিছুর ঠিক নাই । আপনে দিবা নি ।

--- আমি কুনু জমিদার নি বা । নদীরে কও, তাইন দিলে দিতা পারইন । এক টুকরা লইয়া বই থাকো । দেখা যাইব নে ।

--- ইতা জাহাজ কম্পানির চাকরিত নাই আমি । আইজ আছে কাইল নাই । কাইল কেউ আইয়া কইব উঠ, তেউ কই যাইতাম ।

--- কেউ কিছুর কইত নায়, তুমি আইও আমার লগে থাকবায় ।

--- আইছা অইব নে । ইতা আজারি মাত বাদ দেইন । কইছলাম যে একটা কথা, কিছুর কইলা না ।

--- অ, তুমি কইছলায় ভুগল শিখতায় । যুগেন্দ্রর কাছে পাঠাইছলাম, তার লগে লাগালাগি করলায় । লস্কর মাস্টারে শিখাইছে নানি ।

--- শিখাইছলা । কিন্তু তাইনতো নাই অখন বাড়িত । কই গেলা ।

--- হে আর আইত নায় । বাড়িত গেছেগি চাকরি ছাড়িয়া ।

--- আমার কুনু দোষ নাই তেও আমার উপরে গুসা করলো । জগড়দেও গাড়োয়ানে কইলো এর লাগি রিক্সা চড়া ছাড়ি দিলা ।

--- হে অলাখান অউ । মানসস্মান বেশি । যেতা ভালা মনো করে অতাউ করে । এমন বিয়া এণ্ড করল তো দেখাই দিল কেমনে থাকন লাগে । অয়, তোমারও তো টিপ একটা কমি গেল । দেখি হিদিকে যাওয়ার তো বউত আছে, কই দিমুনে ।

--- না, টিপ উপ লাগে না । তানে এক কথা কইমু ভাবছিলাম ।

--- জানি । ভুগল নানি । আমি কইমুনে । তোমার হেডমাস্টারে যাওয়ার আগে আমারে কইয়া গেছইন ।

--- আমি কুন্ তানে জিগাইছিনি ।

--- হে হক্কলতা জানে । অউ যে বড়বেকা যেখানো অইয়া ত্রিভঙ্গ অইছইন, নানি । লস্কর মাস্টরর বইত বুলে লেখা আছে, ঘোড়ার নালর লাখান ।

--- বইত লেখা থাকলেউ অইব । তান অত ছুং নি । আমারে কইয়া যাইতা পারলা না ।

মাস্টারের উপর অভিমান নিয়েও বৈতল মেনে নেয় । হাজার হোক লেখাপড়া জানা মানুষ । রাগ করলেও কাজের কথা ভোলেন নি । কিন্তু ঘোড়ার নাল নিয়ে বৈতলের ধন্দ যায় না । তা বলে বই-এর লেখা তো আর মিছে হয় না । ঘোড়ার গল্প শুনছে, ঘোড়া দেখেছে দুএকটা । কাছাড়ের ঘোড়া নিয়ে অনেক কথা শুনছে সৃষ্টিধর ওঝার কাছে । চা বাগানের সাহেবের ঘোড়া, ডাক্তার কবিরাজের ঘোড়া, রায় বাহাদুর খান বাহাদুরের ঘোড়া, ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ঘোড়ার ভূতও তাড়া করেছে কাউকে কাউকে । ঘোড়ার খেলা পোলা দুনিয়ায় প্রথম হয় কাছাড় । ঘোড়ার ভূতের কথা বলেননি সৃষ্টিধর গুরু, যেসব বলেছে দুখু । টোপাকুলের গাছ একটা আছে মাঠের মাঝখানে, ওখান থেকেই দৌড় শুরু হয় অন্ধকার রাতে, খটখটা খট, খটখটা খট । দুখু বহুই আপদকে নিয়ে যাবে এক রাতে । ঘোড়া ভূত আর মানুষ ভূতের খেলা জমবে ভাল । বৈতল শুধু দেখবে ঘোড়ার পায়ের নাল । বলদ গরুর পায়ে নাল পরাতে দেখেছে ইটখোলা ঘাটে । অনেকটা ছোট মাপের হাঁড়িকাঠ । মাপির দোকানেই পাওয়া যায় । কিছুটা মেলে, অনেকটাই মেলে না । তুলনা কিংবা উপমা সবসময় যে সঠিক হয় না বৈতল জানে । কল্পনার জোর থাকলে কালো জিনিষ দুধের বর্ণ হয়, টানটান লোহার দণ্ডকেও ধনুকের মতো দেখা যায় । নদীকে আর নদীর বাঁধকে ভালবাসলে দুর্গাবতীর গলার বিছে হারও মনে হতে পারে । ভালবাসার ধনকে যেভাবেই দেখা যায়, সেই দেখাই সত্য । দুর্গার গলায় বিছে

হার দেখেনি বৈতল, পাগলার জমিদারনির গলা থেকে নামিয়েছে একবার তার বালক বয়সে ।
বৈতল তো রইদপুয়ানিতে তার প্রথম প্রেমিকাকে ফিপের সঙ্গে তুলনা করেছে । সে কি শুধু
লেজঝোলা পাখির রঙ দেখে সাজিয়েছে । সেই কৃষ্ণা তো এখনও তার মনের তারে বসে লেজ
ঝোলায় । নদীর কথা হলেই বৈতলের ভরাগাগরি দুর্গাবতীকে মনে পড়ে । জলের সব ধর্ম যে
খুঁজে পায় দুর্গাবতীর মধ্যে । বৈতল বলে ‘নির্ন’, দুর্গাবতীর গভীরে ডুব দিয়ে বৈতল তল পায়
না । দুর্গাবতী এদিকে হাসলে ওদিকে পাড় ভাঙে । হেডমাস্টার বলে কাঁখে গাগরি । বৈতল
দুর্গাবতীর কাঁখের বাঁক দেখেছে । উপমা সঠিক হয়েছে । বড়াইল পাহাড়ের তীর জলধারা বহন
করতে গিয়ে বরাক নদীরও ভুলচুক হয় । দুর্গাবতীও পাড় ভেঙে তছনছ করে দেয় ।
বৈতলমনের অনেক দুর্গতির কারণ হয়েছে বৌ দুর্গাবতী । কখনও খরস্রোতা করালবদনা
কখনও মিঠেপানির ভরাকলস । দুর্গাবতী যখন মিঠে থাকে তখন কথার স্রোতে ভাসিয়ে নেয়
বৈতলকে । বলে,

--- বর্ষার নদীতে মানন লাগে । গাভিন সময় বেটিনতর বড় কষ্ট, আবার সুখও ।

গাভিন কথাটা শুনে এত ভাল লাগে বৈতলের যে গাল টিপে দেয় টুসটুসে বৌ এর । কপটরাগে
খলবলিয়ে ওঠে দুর্গা । বলে,

--- ইতা কিতা ।

--- কিতা আবার । গাভিন । তুমার মুখো ইকথা যেনে কালীনাগর দংশন ।

‘কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হতে করে চিম চিম ।

ক্রমে ক্রমে সর্ব অঙ্গ করে রিম বিম’ ।

--- করঅউক রিমবিম । আমি অখন ই তিন সন্ধ্যাত জিয়ানি দিতাম পারতাম নায় । থাকো
ঢলিয়া ।

--- ঠিক আছে । রাইত অউক । কিন্তু তুমি মাজেমাজে ইতা কিতা মাতো বুঝি না । নদী
আবার বেটি অইলা কেমনে । নদীর আবার পেট কিতা গাভিন কিতা ।

--- ইতা বুঝতায় পারতায় নায় তুমি । তুমি খালি ঠুকরাইতায় পারবায় । কুনু কামর ভাগ নাই
।

--- কিতা কইলায় । দেখতায় নি ।

--- না অখন দেখানি লাগত নায় । বর্ষা গেলেউ দেখবায় ।

--- কিতা দেখমু ।

--- দেখবায় আনে আর বানে । ফলে ফুলে ধানে আনাজে ঝলমলি উঠবো দেশ । কার অউগদা
।

--- নদী নি ।

--- তে মায় যেলাখান পেটো ধরছইন আমরারে, নদীও আমরার মা ।

--- কোন নদী । তুমি তো সুরমা, পিয়াইনর বেটি ।

--- না তারারে ভুলি গেছি । অখন তেড়া ভেড়া বরাক অউ মা ।

--- খালি মা কেনে । আমার গুরু সিস্টিধরে কইন নদী পুড়ির লাখান । খালি তিড়িং বিড়িং
করইন । আর গুসা উঠলে অইন মা মনসা ।

বর্ষায় বরাক নদীও মা মনসা হয়ে ওঠে । চন্দ্রধরের মতো দুর্গতি শহরবাসীর । লোহার
বাসনের মতো বাঁধ নিয়ে ঘিরে রাখতে হয় শহর । জাহাজঘাট থেকে মধুরা মুখ হয়ে দুধপাতিল
ইটখোলা আর অন্নপূর্ণা ঘাটের অদূরে গিয়ে শেষ হয় মাটির প্রাচীর । যেখানে বৃষ্টির জল আর
নদীর জল একাকার । এই তো মাটির বাসর । মানুষ, মানুষের ঘরবাড়ি, গৃহপালিত জীবজন্তু
ডোবে, আবার বাঁচে । তরোয়াল হাতে লড়াইএর ‘তাও’ শুধু । প্রকৃতিই জেতে শেষ পর্যন্ত ।
প্রকৃতির ভিতর থেকে মানুষের জয় হয় । এক এক যুদ্ধের পর, ‘মনকাঠের নাও শূন্যে করে
উড়া’ । আবার মানুষ জাগে ।

রইদপুইয়ানির গুরুর অভাব পূর্ণ করতে হেডমাস্টারের শরণ নেয় বৈতল । সেই
মাস্টারও বৈতলের মনে দাগা দিয়ে চলে যায় । বৈতল তো আর কিছুই চায়নি, শুধু লাগসই
একটি উপমা চেয়েছিল । নিজের মুখে বলতে পারতেন । তা নয়, লাখুদার কাছে জমা রেখে
চলে গেলেন বড়খলা । আসলে, বৈতল বন্ধু দুখুর সঙ্গে লড়াই- এর একটা হাতিয়ার চায় । গুরু

সৃষ্টিধর তাকে অনেক দিয়েছেন, সবই ভাবের ঘরের কারিগরি । রাঁদা ঘষে ঘষে আসবাব চিকন করার কথা । রইদপুয়ানির গুরু বলেন,

--- মনাসা পুথিত অতো উপমা টুপমা নাই রেবা, সোজা কথা সোজা কথাত লেখা । মাইনষর বিড়ম্বনা, মাইনষর সর্বনাশ আর তারার লড়াই করার কথা । চান্দ সদাগরর নাও কই ডুবে । নদীত ডুবে । কালীদয় সাগর ও নদী অউ । নদীর লগে লড়াই করইন বানিয়ায়, শাহের পুড়ি বেউলায়ও কম কষ্ট করছইন নি পানির পথো । অউ যুদ্ধ দেখিয়াউ মানুষ জাগে । আর পানি কুনু জানান দিয়া ডাকইন নি বিপদরে । এর লাগিউ অজানা বিপদ যতদিন আছে, মনসা দেবীও আছইন । পানির সময়, গুলার সময় নায় গাইলাম বাচার গান । অন্য সময় কিতা করতাম । এর লাগিউয়াউ আমি মনরে ভিজাই রাখি, লুলাই রাখি, আলাদা গান গাইয়া । শাড়ি জারি ভাওয়াইয়া থাকি পিরাকির গানও গাই । পদাবলী গান গাই । আব্দুল গফ্ফার দত্ত চধরির গান গাই । মিরাসীর বিশ্বাস বাড়ির একজনেও অখন খুব গাইরা, গাউয়ে গাউয়ে ঘুরিয়া গাইরা । দেশ স্বাধীন অইব, মানুষরও বলে মুক্তি অইব । জালালি কইতরর লাখান উড়া দিব মাইনষে । অখন তো রবি ঠাকুরর গানও মাইনষে খুব হ্নইন । আমি গাইতাম পারি না, তে হ্নলে খুব ভাল লাগে; বড় শুদ্ধ ভাষাত লেখা ।

এক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের কথায় রাগ করে মাস্টার তার রিক্সা চড়া ছেড়ে দেয় । চাকরি বাকরি ছেড়ে চলে যায় দেশে । মনের দুঃখ মনে চেপে বৈতল খুশি হয় । হেডমাস্টার তার কথা রেখেছে । তাকে বই-এর উপমা খুঁজে দিয়েছে, দুখুর মুখ বন্ধ হবে এবার । তাই খুশি মনেই সে হেডমাস্টার নিয়ে যুগেন্দ্রদার অমতের কথা জানতে চায় লাখুদার কাছে । বলে,

--- আইচ্ছা, কইন চাইন, ই বড়খলার বড়মানুষ এইন হাচারির হেডমাস্টার নি ।

--- আগে কও তাইন যে হেডমাস্টার নায় ইকথা তুমারে কে কইলো ।

--- কেনে, যুগেন্দ্রদা । তাইন কইন মধুরামুখো বলে কুনু মাস্টার অউ থাকইন না ।

--- যুগেন্দ্রয় কইছে নি । চকিদার অইলে কিতা অইব, যুগেন্দ্রর চউখরে ফাকি দেওন যায় না । তার কথা ফালাই কেমনে কও ।

--- অ । আপনেও তান কথাত তাল দিরা । আইচ্ছা কিতা কইছলা মাস্টরর বিয়ার কথা ।
কইন না ।

--- তোমার হেডমাস্টারে এক বিয়া করছিল মুসলমান ছুকরিরে । এর লাগি গাউ থাকি খেদাই
দেয় তারে । ইখানো আইয়া ঘনিয়ালাত বাড়ি লইছিল । মাইনষে কয় হেও বুলে মুসলমান অই
গেছিল । আজারি মাত । তার বউ আঙুর বড় ভালা পুড়ি আছিল ।

--- আছিল মানে কিতা ।

--- তুমি তো তার বাড়িত গেছো, দেখছ নানি তার বউরে ।

--- না ।

--- বিয়ার পর থাকি অউ অসুখ । হাড়ির রস শুকাইয়া অউ পাটকাটি হই গেছিল । লঙ্করর
পুয়ায় কত ডাক্তার দেখাইছে । শেষে সবে জবাব দিলাইলা যখন, তখন বীরেশ ভটর ঔষধ
খাওইয়াইয়া টিকাইয়া রাখছিল । মরি যাইব জানিয়াও কী যত্ন করত বৌরে । ছান করানি
খাওইয়ানি হাগানি মুতানি সব করছে । আঙুরেও বড় ভালা পাইত তারে । আকতা একদিব
মরি গেল । হেও গেল গি । কই গেল কে জানে । হে যাইত নায় আমি জানি, বড়খলাত আর
যাইত নায় ।

--- তে কই যাইবা ।

--- পেটো বিদ্যা আছে, আবার কুন্স ইঙ্কুল খুলব । আবার কুন্স বৈতলর হেডমাস্টর অইব ।

আট

অভ্যাসের বিরতি হলে, অনভ্যাসের নিবৃত্তি হলে বৈতলের দুঃখ হয় । বুকের ভিতর
চুনখলার মার্ভুলের ধুমধুমি হয় । ভেঙে খানখান হয় মন, চোখের দৃষ্টি হয় উদাস । তবু জল
বেরোয় না এক ফোঁটা । হেডমাস্টার চলে যাওয়ায় মন খারাপের সঙ্গী হয়ে আসে বাদ্র মাস ।
অকালে মনের বৃষ্টি উজাড় করে ঝরে চরাচরে । টাইটুম্বর হয় বরাক নদী । আবার শুকোয়,
আবার ভ্যাপসা গরম । গরমে গরমে ঢাঙা গাছে তালের পাকা গন্ধ জানান দেয় শরতের
মাঝামাঝি চলে এসেছে ঋতুচক্র ।

তালগাছেও চড়তে জানে বৈতল । পায়ে দড়ি বেঁধে উঠে যায় গাছে । সুপুরি কিংবা
নারকেল গাছেও চড়ে । বৈতলের ভয়ডর নেই, তালগাছে চড়লে আর নামতেই চায় না ।
পায়ের বেড়ি টুকটুক করে ঘুরিয়ে দেখে সে চরাচর । যা অন্যে দেখতে পায় না । একদিকে
বড়াইল পাহাড়, চারদিকে বরাক আর তার ছানাপোনা নদী । বৈতল গাছের উপর থেকে খোঁজে
নদীর উৎস । কোথা থেকে আসে নদী । সমতলের নদীর গোলক ধাঁধার ভাঙানি খুঁজতে
চোখকে নিয়ে যায় অনেক দূর । কিছুই নেই কোথাও । প্রকৃতি বৈতলের সঙ্গে কানামাছি খেলে
। বৈতল তার গুরু সৃষ্টিধরের চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করে যেমন দেখেছে জৈন্তিয়া পাহাড়

থেকে ভাবে বিভোর হয়ে । দেখেছে কাছাড় দেশ, আর তার রানী নদী বরাক । ওঝা গুরুর
পছন্দ নয় এই নদী । তাই বলেন,

--- অউ হুতার নালির দিকে চাইও না । এইন এক তেড়াভেড়া নদী । এইন মা নায় আমার
সৎ -মা ।

বৈতল বোঝে গুরুর উচাটন । বোঝে দেশ ছাড়ার হিড়িক পড়ে গেছে । সিলেট ছেড়ে
পালাচ্ছে সবাই । বরাক নদীর পারে স্থায়ী ঠিকানা চাইছে একদল মানুষ । গুরুর ভয়, যদি
প্রিয় শিষ্য তাকে ছেড়ে যায় । তাই সত-মার প্রতিরোধ ।

মিরতিঙ্গার পাহাড়ে পাটপাথরের রাজা বৈতল । কিশোর বৈতলকে আবার ডাকে
তালগাছ । তালগাছের আগায় সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার আনন্দে ডগমগো হয় বৈতল । নেমে
আসতে চায় না । চোখ মেলে তাকায়, দেখে ইটখোলা, ঘনিয়ালা, আর্যপট্ট, নসিবালি হাকিমের
দিঘী, নতুনপট্ট, দুর্গাবতীর খোলা বুক, বুকের উপর বিছাহার । নদী বাঁধ অল্পপূর্ণা ঘাট, ঐ
দূরে মাছিমপুর, এদিক ঘুরে, কচুদরম বেরেঙ্গা, ঐ দিকে মেহেরপুর কাঠালবস্তি মানে হাওর ।
জল, চাতলার শুরু, ভাটির দেশের হাওর নয় চাতলা, চাতলার জলে ঢেউ নেই । মাটির ঢেউএ
অনন্য এর রূপ । মন চাইলেও নেমে আসে বৈতল । দুর্গাবতীর শূন্যবুকে খোঁজে মিহিমিছির
বিছেহার । বলে,

--- একদিন তুমারে লইয়া উঠতাম উপরে ।

--- তে বাইচ্ছা পুড়ি ইগুয়ে কিতা দুষ করল । তাইর লাইইয়াউ চলো তুমার তালবাড়িত ।

দুর্গাবতী তার স্বামীর সব উদ্ভট খেয়ালে জেরবার হয়ে যায় । ভয়ও হয় । চালনিতে
পাকা তাল চলে চুন দিয়ে গামছায় বেঁধে সারারাত ঝুলিয়ে রাখে উঠোনে । সকাল থেকেই
তালের বড়ার উপকরণে বাড়িতে গন্ধের ম ম । দুর্গাবতীর মনেও আনন্দ । তিনভাগে বড়া
তৈরি করে । একভাগ পাঠায় জমিদার বাড়িতে । বৈতলকে লুকিয়ে চুপিচুপি, মেয়ের হাত দিয়ে
। জানলে আর রক্ষা নেই । তখন দুর্গাকে হতে হয় রক্ষাকালী । বের করে তার দ্বিতীয়ভাগ,
বৈতলের বন্ধুদের ভাগ । আর নিজেদের ভাগে তিনজনের মহানন্দ । রসে গন্ধে মোহিত হয়ে
বৈতল শোনায়ে কোকিলা কন্যার বারমাসী,

--- 'আইল রে ভাদ্রমাস, পাকিয়া পড়ে তাল

নারী হইয়া লাখের যৌবন রাখতাম কতকাল'

দুর্গাবতীর হাতটাতও দেয় বৈতল খুশিতে । বলে,

--- চলো না বেটি, একদিন তুমি আর আমি উঠি গাছো ।

--- অয় খুব জিলকি অইছে, নানি । ধুমসি বেটিরে লইয়া গাছো উঠতায় ।

--- তে বাদ দেও, তুমি বেটি যাইতায় নায়, আমি আমার পুড়িরে লইয়া উঠমু একদিন দেখিও ।
তাই দেখত নানি ।

--- সাবধান কইলাম । তুমিও উঠিও না, তাইরেও না । জানো নানি, ইনাইৎপুরর বিধু মাস্টর
কেমনে মরল । গাছো চড়ছে না, তলে উবাই রইছে, বাজ পড়িয়া মরল । তাল গাছো খুব বাজ
পড়ে ।

--- আইছা, যাইতাম নায়, চড়তাম নায় তালগাছো । চড়ি যখন লাইছি একবার, পাপ করি
লাইছি, তাল পাড়ি লাইছি । অখন মাপ করি দেও গো দুর্গামাই । পিঠা দেও দেখি আর কয়টা
।

--- আর নাই । কত থাকত এক তালো ।

--- অ 'মুরে যে বুঝাইলে এমতে আর হেমতে

পাইতলা ভাঙ্গি মাছ পালাইল, সুরুয়া রইল কেমনে ?'

আমি বুঝি নানি । তুই বেটি কই দেছ । তর হাইরে দিচছ । ইগুরে আমি কুনদিন মারি ফালাই
দিমু কইলাম তরে । জমিদার ইগু মানুষ নায় । খাওইয়াইছ না ।

--- কেনে কিতা অইছে । থাকতে তো দিছে ।

--- অয় বিনাপয়সার বান্দি পাইছে তোরে । হে ভাবছে আমিও তার চাকর । চকিদার । পুটকি
দিয়া যেদিন বার করমু চকিদারি হিদিন কইছ । আমার বাপেও মারছিল ইলাখান এক
আলদরে, গাছুয়া আলদে আমার মারে দেখত ।

বৈতলের ভয়ডর নেই । জমিদারকে মারতে তার হাত কাঁপবে না । বৈতল জানে পাপ করলে, অন্যায় করলে তাকে মরতে হবে । সোজা হিসেব । প্রথম দিনেই মেরে ফেলতে পারত । তখন তো আর বুঝতে পারে নি যে লোকটা এত বদ । থাকতে দিয়েছে বলে কোনও কৃতজ্ঞতা নেই বৈতলের । সে তো আর বৈতল দাস পাটনিকে থাকতে দেয় নি । দিয়েছে সৃষ্টিধর শর্মাকে, দুর্গাবতী শর্মার স্বামীকে । নীচুজাতির মানুষদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা পোষণ করে এই ক্ষত্রিয়গবী জমিদার । বাড়ির দাওয়ায় উঠতে দেয় না কোন কুলগৌরবহীন মানুষকে । নকল ব্রাহ্মণ বৈতলকে বলে,

--- বুঝছনি বা বাবন বেটা, ইদেশ স্বাধীন অইয়া আপাঞ্জালি বাড়ি গেছে । ছুটলোক হকলর তেল বাড়ি গেছে । কই সব বাঙালরে খেদাই দিতা পাকিস্তানো, না মৌলানা অউলানা ইতারেও মিনিস্টার বানাই দিল । যোগেন মণ্ডল হিপারো গদারি করল হিন্দুর লগে, ইপারোও বুলে মিনিস্টার বানাইব । বাঙাল আর ছুটলোক হকলর খুব আদর কংগ্রেছর কাছে । আগে মানুষ আছলা, বাবন জমিদারর গাত ছায়া লাগলে হুন্ছি বেত মারা অইত, অখন তো ছেইছও উঠি যায় । জগজীবন রাম বেটা মুচি তার ও নামর আগে অখন বাবু । ডোম পাটনি চামার চুনার নমঃশূদ্র ধুপি নাপিত মালুয়া হকলর রাজা । আমার লগে ইতা চলত নায় । দশ হাত দূরে থাকি মাতবায় বেটা । সকালে য়েদিকে উবাইয়া মাতবায় বিকালে উল্টাদিকে । ছায়া পড়তে দিতাম নায় । কতদিন রাখতাম পারমু জানি না । ভোটো উবাইলে তো একটু ছাড়ন লাগব । তুমি থাকবায় আমার ধারো ধারো । তুমি রেবা আমারে বাচাইছ, ইতানি ভুলমু ।

বাঁচানোর গল্পটা বানানো । ওরকম অনেক ঢপযাত্রায় কাজ করেছে বৈতল । সেই কিশোর বয়স থেকেই । লুলা শিখিয়েছে সাপ ধরতে, সাপের দাঁত ভাঙতে, বিষথলি নির্বিষ করে রাখতে, তারপর সেই সাপ দিয়ে ভয় দেখাতে । দাঁতহীন সাপ দেখেই ভয় পেয়ে যায় যম । বৈতলও সাপ ধরে বাঁচিয়ে দেয় ভিতু জমিদারকে । বৈতল ভয় ভাঙিয়ে জমিদারকে বলে,

--- আপনে যম অইয়া মরার ডর ডরাইন কেনে ।

--- আমি ডরাই না কুনুগুরে । আর আমি কুনু যম উম নায় । তুমি কইলায় কইলায়, আর কইও না ।

--- কেনে কইতাম না । আপনার নাম কিতা যম নায় নি । সবুউতো কয় যম জমিদার ।

--- আমার সামনে কয়নি । কইলে নু মাটিত গাড়ি লাইমু ।

--- তে কইতাম নায় । আপনে তো জমিদার, রাজা মানুষ । রাজার কুনু নাম অয়নি ।

বৈতল জানে জমিদারের নাম যমুনা প্রসাদ সিং, প্রজার রোষে যমুনা হয়েছে যম ।
বৈতল জানে জমিদারের অসুখ । জানে তার দুর্বলতা । স্বাধীন দেশে রাজা প্রজার ফারাক নেই
জানে । তবু জমি আছে, অর্থ আছে, জমিদারিও আছে । কমবয়সী জমিদারও নটকোম্পানির
যাত্রাওয়ালা কম নয়, নাটক সাজায় মঞ্চে থাকে না । জমিদার একাই মালিক, কোনও তরফ
নেই । খুড়োমশাই একজন আছেন হাবাগোবা, তার কোনও অংশ নেই । খুড়তুতো ভাই আছে
পাঁচজন । হরিৎবরণের প্রজারা বলে পঞ্চপাণ্ডব । যমুনা প্রসাদের ভাড়াবাড়িও আছে এখানে
ওখানে, ভাড়াটেরাও প্রজা । পাণ্ডবের একজন দুর্যোধন দুঃশাসন রাবণ শকুনি । দাদা
জমিদারের নির্দেশ জমিদারির শান্তি বজায় রাখে । সদাশয় জমিদারও দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার
করেন পরিদর্শনে বেরিয়ে । গরিবের জন্য প্রাণ কাঁদে প্রজারঞ্জনের । ইদানীং রাজনীতির
ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘনিয়ালার মুসলমানদের ভাই এবং চাচা ডাকছেন । ধন্য ধন্য হয় রাজার
। এতদিন যুবরাজার রাজনীতি হয়েছে বৈঠকখানায় । খিলান স্তম্ভগুলি ইদানীং একটু নড়বড়ে,
যেমন এক, দুই বাংলা এক করা, দুই, সব মুসলমানকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো আর তিন
নম্বরে, ___নেতাজিকে ফিরিয়ে আনা । কিন্তু যোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ প্রতীকের কাছে এসব
স্তম্ভ কার্যকারী হচ্ছে না দেখে ইদানীং কংগ্রেসের তাঁবেদারি করার মনস্থ করেছেন । কারণ
স্বাধীন দেশে কংগ্রেস বিরোধিতার কোনও সুখী রাজনীতি এখনও শুরু হয়নি ।

তবে বৈতলেরও মনস্থির করতে সময় লাগে । শুরুতে যম সিংকে অপছন্দ করার কারণ
খুঁজে পায়নি । রাজনীতির একটা ঘন আস্তরণ যে মনের ভিতর রয়েছে বুঝতে পারেনি । যদিও
নেতাজিকেই উদ্ধারকর্তা ভেবেছে । দেশভাগ হয়ে যায় তবু নেতাজি ফিরে না আসায় মনে তার
দুঃখ জমে । সেই সময়টায় সে অনেকটা কাছে চলে আসে যম সিং -এর রাজনীতির । ইচ্ছের
বিরুদ্ধে কোনও কাজ করাতেই অপমান বোধ হয় বৈতলের, যেমন হয়েছে দাড়িয়াপাড়ার
পেশকারের বাড়ির গরু রাখালি করতে । পেশকারের সাদা মেয়ে বুড়ির চাকর বলাকেও ভুলতে
পারেনি । দেশভাগের অপমান ভুলতে পারে নি বৈতল । দেশভাগের অপমান সরাসরি তাকে
বিন্দু না করলেও, জাতিগতভাবে এক বোধ কাজ করেছে । মানুষের এই ধর্মাধর্মের ভেদ সে
মানে না, আবার একই ধর্মে লালিত হওয়া বংশানুক্রমিক সামাজিকতাও উপেক্ষা করতে পারে

না । তাই তো অনেকবার চেষ্টা করেও সে মুসলমান হতে পারেনি । মুসলমানের দেশ হবে বলে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসার অপমান মানতে পারেনি বৈতল । বিভ্রান্তি থেকেই হঠকারী হয় বৈতল । যম জমিদারের উল্টো পথটাকেই সোজা রাস্তা মনে হয়েছে । যম সিং বলেছে,

--- হিন্দুস্থানো ইতা চলত নায় । ইখানো থাকলে হিন্দুর মতো থাকন লাগব । হিন্দুস্থানো খালি হিন্দু অউ থাকব । পাওর তলর বেঙ অইয়া পাওর তলে থাকতে পারলে থাকো, নাইলে ভাগো ।

বৈতল যে – তিজতা নিয়ে দেশ ছেড়ে এসেছে, যে তিজতা দেখেছে দেশভাগের, গণভোটের আগে ও পরে, তাতে মনে হয়েছে জমিদারের কথাই ঠিক । কুশিয়ারা পাড় হওয়ার পর মনে হয়েছে নিজের দেশ ফিরে পেয়েছে । তখন বন্দীশালা থেকে মুক্তির আনন্দ শুধু । মুসলমানি টুপি ‘তকি’ দেখলেই রাগ, মনে হয় ওদের জন্যই পালিয়ে আসতে হলো । এদের জন্যই সাধুমানুষ পিরমানুষ তার বন্ধু লুলা পাণ্টে যায়, হয় নারী শিকারী । নইলে এমন কত খুন খারাবি হয় ওদেশে, মানুষ ভুলেও যায় । জালুয়া মাইমলরা এমনিতেই ক্ষণরাগী, রাগ উঠলে রক্ত না দেখে ছাড়ে না । তার জন্য জেলপুলিশ হলেও কিছু হয় না । কিন্তু দেশভাগ যে হিংসা প্রতিহিংসা আর অবজ্ঞার জন্ম দিয়েছে । মেহেরপুর ক্যাম্পে থাকার সময় বৈতল শুনেছে অনেক করুণ কাহিনী । অজিত চক্রবর্তী নামে এক সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়- এর স্মৃতি লোপ পায় । কোনও কিছুই আর মনে করতে পারেন না । অজিত পণ্ডিতের ছেলের কাছে জানা যায় বৃত্তান্ত,

--- বাবা আকতা বোবা লাগি গেলা । বাবার ছোটবেলার বন্ধু আমজাদ চাচা আইলে বাইরর বেঞ্চিতে বইতা । হিদিন কিতা অইল, বাবা যে আসনো বইয়া পড়াশুনা করইন, পড়াইন, হিঘরো আইলা চাচা । বাবারে রায়টর কথা কইলা । চাচা যাওয়ার পরে বাবায় কইলা ইন্ডিয়াত চলো । তার পরেউ বোবা । কিতা বুঝলায় । বুঝতায় নায়, রায়ট উয়ট কিছু নায়, অউ যে চাচা আইয়া ঘরো ঢুকলা, তেউ বাবার মাথাত বাজ পড়লো । তাইন তান মতো বুঝলা আর মানসম্মান নিয়া থাকা যাইত নায় ।

মানিক দাস নামে এক ভালমানুষ ‘মাটি কামলা’ কোনও তিক্ত স্মৃতি নেই । সে
মনলোভা মানুষ, ক্যাম্পে কাজ পেলে করে, নইলে চলে যায় বরমবাবার মন্দিরে । মন্দিরের
সামনে ভিক্ষে করে । কেউ প্রশ্ন করলে বলে,

--- সাইচান যাইতাম, ভাড়ার পয়সা নাই আমার ।

সাইচান তার বাড়ি । গ্রামের বাড়ির গল্প বলে দাতাকে । টিলার উপর ছবির মতো
বাড়ি, বাড়ির নীচে ঢুপির বিল । বিলের জলে মাছ, পারের গাছগাছালি আর পাখির গল্প বলে
যায় অবিরল । মানিক দাসের গল্পে কোনও মানুষ থাকে না । বিলের গল্প শুনতে শুনতে বৈতল
ফিরে যায় বইয়াখাউরি । ভাল লাগে মানিককে । বলে,

--- তোমার রেবা খালি মাছ গাছ পাখি আর পানির গপ । তোমার কুন্সু বন্ধু উন্সু নাইনি ।

--- আছে আমার কত বন্ধু । একজনের নাম মিতা । মিতারে চিনো নি । হাওয়াত ভাসাই
দেওন লাগে মিতা ডাক । তেউ আইবা ।

--- কেনে, কেউ ছইলেউ তাইন পাথর অই যাইন ।

--- ছেদা নি ।

--- না । তে ছেদার লগেও আমার দোস্তি আছে । আমার মিতা অইলা বনরউ । আমারে ডরায়
না । আর অউ যে কইলায় লজ্জাবতী, তাইন ও খেলইন আমার লগে তান ময়ূরপঙ্খী শাড়ি
পিন্দিয়া । আমার টিল্লার পিছে অউ পারা সপরিগাছ, তার নিচে থাকইন । ছইলেউ অইছে ।
খালি ছইয়া ছইয়া যাও, আর তারার কী লইজ্জা ।

--- ও ইতো ছইতে মরা ।

--- না লইজ্জাবতী । আমি সাচাইন যাইতাম এক পয়সা দেও ।

বৈতল কাউকে কখনও ভিক্ষে দেয় না । মানিকের সঙ্গে কিন্তু বৈতল নিজের মিল খুঁজে
পায় । বৈতল জানে মানিকের ভিক্ষে চাওয়ার ভিখিরির দীনতা নেই । হারানো স্বদেশের খোঁজে
মানিক পথে বেরিয়েছে । ভিক্ষেটাই আসল, ভিক্ষের কড়ি তার কাছে অর্থহীন । তাই বৈতল
তার কাঁধে হাত দেয় ভরসার । বলে,

--- যাইমু, আমরা সব যাইমু আবার দেশো । তুমি সাইচান যাইবায়, আমি যাইমু বইয়াখাউরি ।

কিন্তু একা একা কী করে যাবে বৈতল । কে দেখাবে স্বদেশের অসীম । এখন বর্ডার নামের এক দৈত্য বসে আছে স্বদেশের পারে । লাল লাল পাগড়িওলা এদিকে সবুজ ওদিকে । বন্দুকওলা মানুষ দিয়ে আটকে দিচ্ছে সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো, ভোরের আজান বাড়ির মিনার । বৈতল ভাবে এ কেমন খেলা, মানুষ চাইল বলে ভেঙে দেওয়া হয় দেশ । এখন আবার আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়ার কেরামতি । সত্যি কি তবে আঠায় জোড়া লাগে ভাঙা দেশের ভাঙা মন । এসো ভাই বসো ভাই তোমার ভিটেয় বললে দখলদার ছেড়ে দেবে । তাহলে কি জমিদার যমুনাপ্রসাদের কথাই ঠিক, স্বাধীন বঙ্গ হবে । একবার তো চেষ্টা হয়েছে । গুরু সৃষ্টিধর বলেছেন, করাচীতে পাকিস্তান আর কলকাতায় স্বাধীন বঙ্গের রাজধানী স্থির হয়েছে । নেতারা মানেননি, গান্ধিজি চুপ । নেতারা মানলে বঙ্গদেশ অখণ্ডই থাকে । নেতারা মানে নি, এক পক্ষ ভেবেছে মুসলমান প্রধান হলেও হিন্দুবুদ্দির পায়ের নিচেই থাকতে হবে । ওপক্ষ ভাবে মুসলমান মেজরিটিতে আর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া যাবে না । এখন যদি জোড়া লাগে তা হলে কী হবে বঙ্গদেশ, কী হবে রাষ্ট্রধর্ম, কে হবে রাষ্ট্রপতি । সুরাবর্দি ফজলুল হক । তারা কি এখনও জীবিত আছেন । বিধান রায় । নেতাজি ফিরবেন । নাকি মুখরম্ফার তৃতীয়পক্ষ কৈবর্ত পাটনির যোগেন মণ্ডল । জমিদার যম বলে,

--- রাষ্ট্রপতি হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত আছলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি । এখনও কইয়ার, এক অইল তো বালা, নাইলে সব বাঙালরে ধাক্কা মারিয়া হিপারো খেদাইমু, দেখি লাইও ।

দেশভাগের কটুত্বে জমিদারের শেষ কথাটার প্রতিবাদ করতে পারেনি বৈতল ।

তখনকার প্রকৃত পরিস্থিতিই ছিল এমন । এদেশের হিন্দুর কাছে মুসলমান মানেই পায়ের তলার বেঙ । আসলে সংখ্যাগুরুর দাপট দেখে ছিন্নমূল হয়ে এদেশে এসে সব দুর্দশার শেখড় খুঁজে পেয়েছে ধর্মদ্রোহে । তাই তাদের মারো এবং তাড়াও । বৈতল ধীরে ধীরে বুঝে গেছে বাঙালি হিন্দু মুখেই শুধু বড় কথা বলে, করতে পারে না কিছুই । বাঙালি মুসলমানরাই বা কী এমন করিৎকর্মা যে হিন্দু মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে সব । বাঙালি মুসলমান বাংলার মধ্যে দুই বাংলা চেয়েছে, বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান প্রস্তাব মানে নি । বাঙালির অবাঙালি নেতারা ই উস্কে দিয়েছে । সেই গুরুর সময় একমাত্র নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা, সুরাহবর্দি । এরা কি বাঙালি । এসব কথা বৈতলের জানার কথা নয়, গুরু সৃষ্টিধর শিখিয়েছেন । গুরুর শিক্ষা শুধু

কথার কথা মনে হয় আপৎকালে । মানুষের মধ্যে অবিশ্বাসের মাত্রা বাড়লে মানুষ থাকে না মানুষ । শুভ চিন্তায় কাজ হয় না । আক্রোশ দিয়ে সব ভাল ভাবনার গলা টিপে মারে । বন্ধু লুলার ব্যবহারে বৈতল নিজেকেই অস্বীকার করে । শুধু হিন্দু রমণী বলেই কেন যে দুর্গাবতীর গায়ে হাত দিতে যায় । বন্ধু লুলাকে মেরে ফেলার অনুশোচনাহীনতাও কি তার জাতক্রোধের উপশম । তবে হ্যাঁ, এদেশের নিরাপদ আশ্রয়ে এসে সে অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছে । আবার জমিদার যম সিং –এর নতুন রাজনীতির তত্ত্ব তাকে ততিয়ে দিয়েছে । জমিদারের সুরে সুর মিলিয়েছে । ভেবেছে, পাকিস্তান যদি মুসলমানের হয়, হিন্দুস্থান কেন হিন্দুর হবে না ।

তবে, বৈতল তো বৈতলই । তেলাল শরীর তার, পেক কাদা বসে গেলে ঝরে পড়তে সময় লাগে না । মন্দবুদ্ধি জমিদারের কথার শূন্য বুঝতে তার সময় লাগেনি । যম সিং –এর দুঃস্বপ্নের রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে সে । সত্য মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়েছে সিঁদুরটিপের জমিদারকে । বলেছে,

--- আপনে কেনে জমিদার কইন । অখন বুলে জমিদারি উরি নাই ।

--- কে কইল রেবা তুমারে । তুমি কিতা হিন্দু নায়নি । হিন্দুর রক্ত নাই । জানো না বাবনর পুয়া বাবন হয়, হালুচার পুয়া হালুচা হয় । রাজা হয় নি কুন্সু পাটনির পুত । জমিদারর পুয়াউ জমিদার হয়, হয় রাজা ।

--- কিন্তু জহরলালে তো কইছইন তান নামর আগে যেনে কেউ পণ্ডিত লাগায় না ।

--- ইতা কংগ্রেসি চালাকি । তাইন তো পারলে নামর লগে মুন্স্কা লাগাই দিবা । তারার কথা ছাড়ো । হিন্দুর দেশো হিন্দুর সব উপাধি লাগানি লাগব । মক্কাত গেলে তারা হাজি লাগানি ছাড়ব নি । আমরারও লাগব, রাজা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সর্দার সব । বাঘর বাইচা কও তারাপুরর করর বেটা, নিজের নামর আগে লাগাইছ সর্দার । ডর দেখানিও তো লাগে ।

--- বউত মুসলমানেও নামর লগে বাঙাল লেখরা অখন । তারার কথা, বাঙাল কইয়া বিদ্রূপ করছ অতদিন । অখন আমরা কইয়ার আমরাউ আসল বাঙালি ।

--- বাঙাল কুন্সুদিন বাঙালি অইত নায় । তারার দেশ আরবো । তারা আরবি অইব । গাউ বাকিয়া আরবো পাঠানি লাগব ।

--- তে নায় পাঠাইলা । কিন্তু তারার কাম কে করব ।

--- কী কাম রেবা । কী কামর কতা কইরায় ।

--- ধরইন আপনার মূর্তজা ডাকতর । তাইন গেলে গি দাওয়াই কে দিব ।

--- মূর্তজা আবার ডাক্তারনি । হে অইল কম্পাউন্ডার । আর তার ওষুধ অইল এম এন বি গুল্লি ।
তুমারেউ বানাই দিমু ডাকতর । বৈতল ডাকতর । অইব নি ।

--- আর বেচু মিয়া । মাংস বেচবো কে ।

--- আমরা খাইনা ইতা আড়াই পেচর মাংস । হে ছাগিও মিলাই দেয় । বাড়িত কাটমু পাঠা ।

--- আর বছই গেলে কিতা করবা । লুকাইয়া মুর্গি কাটি দিব কে । কইন ।

বৈতলের আচমকা আঘাতে যম জমিদারের চোখ রক্তবর্ণ হয় ।

বৈতল ভাবে মানুষটার শরীর কেন নীলবর্ণ হয় না । বৈতলের ছোবল যে দুনিয়ার বার । বছই নামের ছোট ছোবল দিয়ে বৈতল তার জাত চিনিয়ে দেয় । হিন্দুবাড়িতে মুর্গির মাংসের চল নেই । বিশেষ করে বড় জাতের হিন্দু, যারা ব্রাহ্মণ যারা জমিদার । অনেক বাড়িতে তো পেঁয়াজ রসুনও বারণ । পাঁঠার মাংস নিরামিষ মশলায় রান্না হয় । একঘেয়েমির আলুনিতে কারই বা ভাল লাগে । যম জমিদারেরও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় অন্যরকম । যমুনা প্রসাদ সিং নামে যম হলে কী হবে, তারও আছে প্রিয় মানুষ দুএকজন, আছে ইয়ার । খুড়তুতো পাঁচ ভাই-এর বড় যে ভ্রম । ভ্রমদা, ভ্রম ভাইয়া । এখানেও একটা ভ্রমের ব্যাপার আছে । যম সিং আর তার পরিবার এখন আদ্যোপান্ত বাঙালি সিলেটি । তার আপন কাকার পরিবার বিহারি, ভাষাও হিন্দি । ভ্রম যমের ভাই বন্ধুও বটে, আর একজন আছেন কলেজের অধ্যাপক । তিনিও বন্ধু । শহরের মানুষ মান্য করে নিষিদ্ধ পার্টির মেম্বার বলে, কম্যুনিষ্ট । ভাই বন্ধু নিয়ে জমিদারের বাগানে প্রায়ই হয় মোচ্ছব । হাকিম দিঘীর পারে হয় বনভোজন, রাতে । এই বাগানবাড়িতেই রাতের সব ধনরত্ন লুকিয়ে রাখে বৈতল ও তার দলবল । সেই অনুষ্ণেই বছই কথার উদয় । জমিদারের দুই বন্ধু, বছই আর বৈতল ছাড়া দুজন জানে এই নৈশ অভিসারের সমাচার । আপদ আর দুখু পায়না প্রবেশ অধিকার, কিন্তু জানে । কারণ আয়োজনের দায়িত্ব থাকে বৈতল । জন স্মীল থেকে বিলাতি মদ কিনে লুকিয়ে রাখে দিনের বেলা । রাতে মুরগি

জবাই করে বছই । মুসলমানের হাতের রান্না খেলে জাত যাওয়ার ভয় তাই বৈতল রাঁধে ।
দুপাত্র গলায় ঢেলেই জমিদার আর তার যুধিষ্ঠির ভাই চড়িয়ে নেয় বাঘের চাদর গায়ে । বৈতল
আর বছইকে বারবার সাবধান করে, মদমুরগির কথা পাচকান না করতে । ভেজা গলায় আর
তুমির মান্যতা থাকে না সিং প্রতাপের গলায় । হয় তুই । বলে,

--- অই বেটা সাপের বেজ । তরে বাবন বানাইল কে । তোর বউএ নি ।

বৈতল সাপের বেজ নয়, বৈতল কুলোপানা চক্করের গোখরা সাপ । লেজ মাড়ালেই দুই
দাঁতে ঝাড়ে বিষ । বলে,

--- অয় । চিনছ না তো আমার বউরে, তরে জমিদার থাকি ভিখারি বানাইয়া ছাড়ব কই দিলাম
।

জমিদারের দাদা ভ্রম সিংও বাঘের চাদর ওড়ে । বৈতলের কথায় গুম মেরে যায় যম । ভ্রম
তেড়ে যায় বদলা নিতে । বলে,

--- অই বেটা রিফুজি । খুব তেল বাড়ি গেছে নানি । ই দেশো আইচছ, থাকরে খাইরে আর
জমিদারর মুখর উপরে কথা কইরে ।

--- অখন তো মুখে মাতিয়ার, এরপরে নু হাত দিয়া মাতমু ।

মদের নেশায় জমিদার তার ভাই আর বৈতলের অবস্থান বদল হয় । বৈতল হয়
জমিদার আর দুই ভাই বৈতলের গোসা সামলায় । ভ্রম বলে,

--- আরে মরদে, কাহে গুস্‌সা করো তারা । ছাড় না । ইতা মাতিছ পরে । অখন হুন ইতা যে
করিয়ার আমরা ইখানো ইতা কেউরে কইছ না রেবা । তাইন কত মানী মানুষ জানছ নানি ।
আর বাঙাল ইগুরেও কই দিছ, মাতলেউ দেওলার পেটো যাই বে ।

এতবড় সাহসের কথা জমিদার নিজের মুখে বলেনি তাই রক্ষা । নইলে জলের
কারিগর সেদিনেই শেষ করে দেয় যমের জীবন । বৈতল তার বাপের মতো নয়, একবারের
অপরাধ মাপ করে দিয়েছে নেশাগ্রস্ত বলে । জমিদারের চাকর ভাই তো তার কাছে কোমরের
ময়লা, মশা মারার মতো টিপে মারতে পারে যে – কোনও সময়ে । যম বড় অপরাধ করেছে,

মদের মুখে বউ –এর কথা বলে । বলেছে বলে মরাকে মারার মতো কাপুরুষ নয় বৈতল ।
জানে বিলাতি খেলে এরকম হয় । যম ও ভ্রম পরদিন কিছুই মনে করতে পারবে না । তবে
অধ্যাপক বন্ধুটির হাসি বলে দেয় নেশা হলেও স্মৃতিভ্রংশ হয় না তার । বৈতল জানে, জমিদার
তার বন্ধুকে বৈতলের বিশ্বস্ততা নিয়ে অনেক কথা বলেছে । নইলে মানী মানুষ কেন এক
রাতের ফুর্তিতে নষ্ট করবে প্রতিষ্ঠা । গরমাগরম কথার শেষে বৈতলের কাঁধে হাত রাখে
দীর্ঘতম মানুষটি । বলে,

--- কান্ধো হাত রাখছি এর লাগি আবার গুসা করিও না, যে ক্ষণরাগী মানুষ তুমি । তুমি
অইলায় আমার কমরেড রেবা, এর লাগি রাখলাম । আর বুঝলাম যমুনার লগে টক্কর দিতায়
পারবায় তুমি ।

--- কমরেড কিতা ।

--- হে, হিদিন নু কইলায় তুমি কমরেড অনন্ত সাধুরে চিনো । তান মিটিংও গেছো ।

--- গেছি, বিয়ানিবাজার থাকতে । বান্ধা আগে ।

--- এর লাগিয়াউ কমরেড । কম্যুনিস্ট বন্ধুরে কমরেড কয় ।

--- ইতা কুনদেশি মাত । বন্ধু কইলে অয় নানি । দোস্তু কইন ।

--- আইচ্ছা রেবা দোস্তু । অত গুসা করলে অইত নায় । ধৈর্য ধরণ লাগব । বিপ্লব আইব ।
যমুনার জমিদারি শেষ অইব । কমরেড নবযুগ আইব । গরিবর শাসন অইলে জমিদার উর
থাকত নায় । ফরাসি দেশো রাজারে রানিরে মারছে মাইনষে, রাশিয়াতও মারছে । ভাবিও না,
অইব ।

--- আপনে মদ খাইয়া কইরা । অখন হুনতাম নায় কিচ্ছু । আপনারে আমি চিনি । থাকইন
বিলপারো । খাসিয়াপটি আইয়াও আপনে চুঙা ফুকইন । আপনে অইলা কমরেড গীতেশ
বিশ্বাস । আমার রিক্সাত আপনে চড়ছইন নানি আগে ।

--- চড়তাম পারি, মনো নাই ।

--- আপনারেও জিগাইছলাম ।

--- কিতা ।

--- আপনার কথা আর কামর লগে মিলে না কেনে । ই যম ইগুর লগে আপনার কিতা
কমরেডি । হে ত রায়ট লাগাইত চায় ।

নয়

গীতেশ বিশ্বাসকে বৈতল অন্য কথা জিজ্ঞেস করেছে । সেই তার পুরনো কথা, দুখ
যাকে বলে পাগলামি । নদীর আকৃতি নিয়ে প্রশ্ন । নদী কোথা থেকে আসে দেখে নি বৈতল,
তালগাছ চড়েও ঠাহর করতে পারেনি । তবে একটু জানে খুরাদিল এই বাটির জন্য শহরের
যত দুঃখ । বছর বছর বন্যা । এত উঁচু বাঁধ । জাহাজ ঘাট থেকে এঁকে বেঁকে অন্নপূর্ণা ঘাটের
অদূরে গিয়ে নদীর জল আর বৃষ্টির জলের একাকার । এর পরেই রেল গাড়ির ঝামঝামি ।

মাছিমপুর শালচাপড়া কাটাখাল পাঁচগ্রাম বদরপুর । একদিকে পাহাড় লাইন সোজাসুজি
করিমগঞ্জ, মহিষাশন । হিন্দুস্থান পাকিস্তান ভাগাভাগি । দুর্গাবতীকে নিয়ে এক জলের দুপুরে
বসেছিল ইস্টিশনে । কখন ছাড়বে করিমগঞ্জের গাড়ি । করিমগঞ্জ থেকে উল্টোপাকে বদরপুর
হয়ে শিলচর । এর আগে বইয়াখাউরি থেকে কইমাছের মতো কানে হেঁটে, জল সাঁতরে আর
ভোরায় ভেসে ওদেশের জল থেকে এদেশের মাটিতে আশ্রয় ।

এদেশে বৈতলের কেউ নেই । কৈবর্তের পুত, ব্রাহ্মণের কন্যা দুর্গাবতীকে সঙ্গে নিয়ে
চলে এসেছে নতুন দেশে । দুর্গাবতী বৈতলকে দিয়েছে নতুন পরিচয় । বলেছে,

--- তুমি পাটনি থাকলে কৈবর্ত থাকলে তুমার কিছু নায় । আমার কিতা অইব কও । আমারে
তো কেউ মাইমলের বেটি কইত নায় । একলা পুড়িরে পাইলে মাইনষে নি ছাড়ব কও, দেখছ
অউত্ত । তুমি আমার কথা রাখো, তুমার বউ অইয়াই থাকমু । খালি তুমি একখান লগগুন
লাগাইলাও । কইও তুমি শর্মা বাবন ।

বেশ তবে তাই হোক । কেউ জানে না, হয়ে যায় বিয়ে । স্ত্রীর পদবি নিতে কোন দুঃখ হয়নি বৈতলের । দেশ ছাড়া মানুষের নামই বা কী, পদবীই কী । তাই গুরুর নামে নাম লেখায় রিফুজি খাতায়, সৃষ্টিধর শর্মা । একা একা শপথ নেয় । বৈতল আর কোথাও জড়াবে না, কাটিয়ে দেবে গরিব মানুষের গৃহস্থ জীবন নিরুপদ্রবে । কিন্তু বৈতলের জীবন কখনও সোজা খাতে বয় না । কোনো শপথ শেষ শপথ হয় না । জড়িয়ে যায় সামাজিক সম্পর্কে । বন্ধুতা থেকে শত্রুতার ধারাবাহিকতায় তার নতুন সংযোজন হয় হরিৎবরনের জমিদার যমুনা প্রসাদ সিং । এছাড়া আসে তার খুশি, খুশির বন্যা, প্রাণের পুত্তলি তার কন্যা মনি । যম জমিদারের উপর রাগ করে বৈতল মেয়ের নাম রাখে মরনি । কী জানি কী সন্দেহের বশে মেয়েকে কোলে নিতেও দ্বিধা বৈতলের । মনের মধ্যেও তাচ্ছিল্য । বৈতলের বাপও তার নাম নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছে । মায়ের মতো এমন গৌরবর্ণা মেয়ে বৈতল কামনা করেনি । তার সন্তান তারই মতো হবে কালোবরনী । জন্মের পর থেকেই বৈতল খুটে খুটে দেখে মেয়ের চোখ নাক কান হাতের পায়ের আঙুল, বৈতল নিজেকে খুঁজে খুঁজে হতাশ হয় । বৈতলের তো সবই বিপরীত, হতাশা থেকেই হয় আনন্দের সূত্রপাত । সেই মরনি কন্যার ‘র’ আর উচ্চারিত হয় না খুশিতে । সেই মনি মেয়েই এখন তার হৃদয়ের মনি । জড়িয়ে যায় বৈতল আবার ।

আরো হয়, তিন বন্ধু হয়, হয় বাপের মতো এক বোবা সাধু । বয়সটাও বাপের মতো, স্বভাবে গুরু সৃষ্টিধরের মতো অবিকল । আবার বিপরীতও অনেকটা । গুরু সৃষ্টিধরের গলায় সর্বক্ষণ কথা আর গান । তিনি তো কথাই বলেন না, কিন্তু এক উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয় তাঁর বিপুল শরীর থেকে । সেই সাধুমানুষকে ঘিরে জড়ো হয় তারা চার বন্ধু । মামুপিরের খিদমত খাটে চারজন ।

গ্রামের ছেলে বৈতল শহরে এসে হাঁপায় । রিক্সার প্যাঁ পোঁর যান্ত্রিকতায় বিরক্ত হয় । নিরিবিলি খোঁজে । সন্ধ্যের আঁধারে জাহাজঘাটের দিকে যায় । দেশভাগ হওয়ার পর জাহাজ কমে গেছে । মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে কয়লার জাহাজ আসে । বিহারী দারোয়ান শামুদা বলে,

--- আভি তো কিছু নাহি, শুনশান । আগে জাহাজ কম্পানিতে কিতনা ভিড় ছিল ।

শামুদা নির্জন রাতে বৈতলকে জলের কাছে যেতে দেয় । বৈতল একা বসে থাকে, বসে থেকে জীবন সাজায় । ফেলে- আসা নদীর সঙ্গে জুড়ে দেয় নিজেকে । ভরাবর্ষার উথাল পাখাল সুরমার সঙ্গে নিজেকে মেলায় শরতের এই বরাকপারে । বৈতল গান গায় গুনগুনিয়ে । মন আনন্দের গানে ইদানীং আর পরিচিতি সুর কাজ করে না । বৈতল এখন নতুন গান শিখেছে । সিনেমার গান গায় যখন রিক্সা নিয়ে তারাপুর রেল গেট পেরিয়ে যায় তখন ‘তুফান মেল যায়’ কেউ যেন তাঁর গলায় তুলে দেয় । নদীপারের একাকী সময়ে এক নতুন শেখা গান গায় ‘ছিরু ভীরু পায় পল্লীর বালিকা বনপথে যায়’ । সুরের যাদুতে পাগল হয়ে যায় বৈতল । একদিন দুখুও শোনে তার একা সময়ের গান । দুখুর কাজ তো শুধু বৈতলের খুঁত ধরা । বলে,

--- ‘ছিরু ভীরু’ কিতা বে । ইতা কিতা গান ।

--- অইব কিচ্ছু, সুর ভালা লাগলে অত অর্থ খুজন লাগে না ।

--- তর পুথির গান থাকি একেবারে আলেদা । তুইন হিন্দু গান গাছ না কেনে । ‘পয়গাম’ আর ‘ইনসানিয়তো’ বউত ভালা ভালা গান আছে ।

--- এখন গাইমু । শ্রীমঙ্গল চা বাগানো শুনছি হিন্দি মাত আর অউ ইখানো আইয়া ইটখলাত । পুদুম, চেম, নুয়া কত কিছিমর নাম তারার । সিলেটর বাগানো অত নামর বাহার নাই । সাত দিনর নামে নাম । শুক্কুরবারে জন্মাইলে নাম রাখি দেয় শঙ্কর ভোলা নায় রামচন্দ্র । এগুর নাম আছিল জানছনি মঙ্গলাল, তে তার বৌরে টিল্লাবাবু এ জিগাইছইন মরদর নাম কিতা । হায়রে কপাল, বেটি ইগু মরি যায় শরমে, আবার টিল্লাবাবুরে নাম না কইলেও নায়, তখন কছাইন দেখি কেমনে কইল জামাইর নাম ।

--- জানি জানি । ইশারা করি কই দিছে আরি ।

--- অয়, তর মগজ ইগু হইল নাগেশ্বরর ছিয়া, সব জানে, জানতে জানতে ছাতু করিলায়, অলাখান ভুতা । কইল কিতা জানছ নি, কইল, তলব দিনে লাল লাগাইকে । এখন বুঝিলাও । মঙ্গলবাড়ে তলব দিন । তেউ মঙ্গলের লগে লাল, মঙ্গলাল ।

দুখুর মত না নিয়ে বৈতল কোনো কাজ করে না, আবার দুখুর সঙ্গেই লাগ সব থেকে বেশি । দুখুর ওস্তাদি বেশি, সব কিছুতেই শেষ কথা বলবে দুখু । বৈতল মানবে কেন । তাই খটাখটি ।

বৈতলেরও এক রগ তেড়া । চুরি করবে ডাকাতি করবে তবু কারো দয়ার দান নেবে না । হরিৎবরণ ইটখোলার জমিদারের আমন্ত্রণ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেয় গোঁয়ারতুমি করে । দ্বিতীয়বার মেনে নেয় । মেহেরপুর রিফুজি শিবির থেকে হরিৎবরণে চলে আসে দুর্গাবতীকে নিয়ে । যম সিং বলেছে থাকতে দেবে, ঘর দেবে পুকুর পারে ঘরের দুয়ারে । দুর্গাবতীকে জমিদারের ঠাকুরঘরে ব্রাহ্মণীর কাজ করবে । আর বৈতল । বৈতলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তখনও ঠিক করে নি উপযুক্ত কাজ । তাই নতুন বাড়িতে এসে এদিক ওদিক ঘুরে, পুকুরে ডুব দেয় । হুগায় একদিন গিয়ে ডোল নিয়ে আসে মেহেরপুর থেকে । একেবারে তো নাম কাটিয়ে আসেনি । বৈতলের মন মানে না বদ্ধ জীবনে । অফুরন্ত জল না থাকলে, গায়ে মাছের গন্ধ না থাকলে কেন সে পাটনির পুত । বৈতল দুর্গাবতীকে বলে দেয় এখানে মন টিকবে না । দুর্গাবতী মানে না । বলে,

--- আর ফিরতাম নায়, পানিত ভাসি থাকতাম নায় আর । আলাদা জীবন অখন ।

বৈতলের আপত্তি নেই । কিন্তু কী হবে তার জীবিকা । তার পরিচয় কী । দুর্গাবতী ব্রাহ্মণীর পতি হয়ে থাকা শুধু । কর্মহীন জীবিকাহীন, পত্নীর উপর নির্ভরশীল । বৈতল বিদ্রোহী হয়, জল ছাড়ে না, চলে যায় চাতলার পারে । হাওরের পাশে গ্রাম রাজপুরে, রাজপুরের কৈবর্ত রবিলাল বৈতলকে বলে সরকারি জমির কথা । মাছ মারবে, হাঁস পালবে ছাগল পালবে । ওখানে পশুপালন করে অনেকেই সচ্ছল হয়েছে । বৈতলের মারও শখ ছিল হাঁস ছাগল পালনের । মা বলে, ‘হাসে উনা কইতরে দুনা, ছাগলে পিন্দায় কানো সুন্য’ । সোনা পরেনি মা, চান্দকপালিকে ঘরে এনেছে । মা মরে গেলে বাপ বেচে দিয়েছে সৌভাগ্যের গাভীটি । বেচে দিয়েছে না যৌতুক দিয়েছে যুবতি বৌ –এর লোভে । সেই বাপও শখ পূরণ না করে মরে যায় এক দুর্যোগের রাতে, গাছ মাচান এর উপর । বৈতল টঙএর উপর বসে বসে দেখেছে জলের দৈত্য বাপের জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে মরে যাওয়া । হিসেবি জীবনে অভ্যস্ত নয় বৈতল, জীবজন্তু নিয়ে আয় দ্বিগুণ করা কিংবা কানের সোনা কল্পনাও করে না । বরং রবিলালের সঙ্গে হাওরের জলে মাছ মারতেই তার আনন্দ । রবির সঙ্গে ভাগাভাগিতে ভার বয়ে নিয়ে যায়

ফাটকবাজার । রবিলালের পাশে বসে । দেখে দোকানদারি । ভাগা করে মাছ বিক্রি করে রবি, টুকরির ডালা উল্টে মাছের ভাগা করার অনেক কেরামতি । গ্রাহক ঠকানোর অনেক কল জানে রবিলাল । উল্টো ডালায় অল্প মাছে ভাগা বড় দেখায় । বৈতল বিরক্ত হয় রবির কার্যকলাপে । তবু শোনে রবির কথা । রবিলাল বলে,

--- ঝলঝলা তাজা মাছ দিবে উপরে, আর তলে জাবড়া জুবড়া পচামাছও দিতে পারছ ।

--- অয় গাউক তর মতো আডুয়া বেভুতা নি । লড়াই চাড়াই কিনব । একদিন নি বেচতে, পরদিন নি আইব কেউ ।

--- আইব, আমার কাছে আইব আমি নু লাগাই দেই । ফাউ দিলাই লে অউ খুশি অই যায় ।

--- বুঝছি ঠগাউরা অইচছ তুই । অখন তর বাং উং ভার ডালা ইতা দিলাইছ আমারে কয়দিনর লাগি । আমি দেখি বেচতাম পারিনি ।

--- তুই কিনিলাছ না কেনে । তরে দিলে আমি লিতা করমু ।

--- তুই মাছ মারবে, আমি বেচমু, পয়সা তোর ।

--- অয় পয়সা তোর । তারপরে আমার ভার ভাগলে । রিফুজি হকল অখন খুব ঠগঠগামি কররা ।

--- তুই আমারে ঠগ কইলে নি । ঠিক আছে, দেখিছ আইজ অউ দেখিছ । ভার লইয়া আর রাজপুর ফিরতে না । ঠেং ভাঙি রাখি দিমু তোর ।

মাছুয়ার সঙ্গে একটু মস্করা করার জন্যই বৈতলের কথা বলা । বলেই হেসেছে । ও হরি, এমন ভিত্তু মানুষ বৈতল দেখে নি জীবনে, বৈতলের কথায় গাড়া গোড়া মানুষটা ভাঁ করে কেঁদেই দেয় । কিছু বলে না শুধু কাঁদে । এরকম ভিত্তু, ছইতে –মরা মানুষ বৈতলের পছন্দ নয়, কোথায় প্রতিরোধ করবে, উল্টো বৈতলের ঠেং ভাঙার শাসানি দেবে তবে না জলের সৈনিক । বৈতলের বন্ধু । লড়াই লড়াই ভাব না থাকলে কিসের পাটনি কিসের কৈবর্ত । আর বৈতলকেও তো জানতে হবে, বন্ধুর স্বভাব না জেনে শুধু কাঁদলে হবে । বৈতল জানে বন্ধুত্বের প্রথম ধাপই হলো লাগালাগি । অকারণ ঝগড়া । গায়ে গা লাগিয়ে পায়ে পা লাগিয়ে শত্রুতা ।

লড়াই করে টিকে থাকতে পারলে দোস্তি, ইয়ারি । লুলা পারে । প্রথম দিনই মিরতিঙ্গার পাহাড় থেকে বৈতলের লাথি খেয়ে পড়েছে নিচে । খিন্তা গাঁও এর বাঙাল কিশোর উঠে দাঁড়িয়ে বৈতলের বিরুদ্ধে ‘তাও’ নিয়েছে, তারপর হেসেছে । হয়েছে প্রাণের মানুষ । গুরু সৃষ্টিধর মানেন বৈতলের বুদ্ধি । বলেন,

--- যারে ভাল লাগে তারে একটু বাজানি লাগে । খালি মিঠা কুন্ডু ভাল নি । পেট মাতলাইব, মধুমেহারি অই যাইব মনো । এর লাগি কিছু তিতাও খাওয়ানি লাগে । তিতাবাখরর ছাল জিবরা দিয়া ঢুকলে নাড়িভুড়ি বারই যায় । কিন্তু শরীর ঠিক রাখে । আমি তো আমার মনসা মাই হকলর লগে অতা করি । খালি লাগি । যারে ইচ্ছা কান্দাই দেই । ছোটজনরে কইলাম, তুমি যে অত কালা, তুমারে কেউ ঘরো নিত নায় । মাইঝলা জনর চুল ধরি এমন টান দিলাম যে তিন দিন ধরি কান্দরা । হেসে বুঝছি ইতা কান্দা নায় আমারে কান্দানির ফন্দি । আদর করতাম গিয়া । বাপ আইছইন, বাপ আইছইন তানে ডরাও, ইলাখান কুন্ডু ভাল নি কও ।

কান্নাকাটি ব্যাপারটাই পছন্দ নয় বৈতলের । রবিলাল যে তাকে এমন অপ্রস্তুত করবে ভাবেনি বৈতল । বৈতল চেয়েছে রবির বন্ধুত্ব । নইলে ছোট ছোট এসব কুয়ার সমষ্টি চাতলার হাওরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই তার নেই । হাকালুকি আর বড় হাওরের পরাণকাড়া হাওয়ার কাছে চাতলা কিছুই না । জল থেকে যদি মায়ের আদরের মতো হাওয়া না বেরোয় তাহলে কী জলাশয় । ছোটমাছ ভাগা করে বিক্রি করার মানুষ যে নয় বৈতল, রবিলাল বুঝতেই চায় না । অকারণ ভয় পেয়ে যায় । যাক, ভালই হয়, তৈরি হওয়ার আগেই খুলে বেরিয়ে আসতে পারে বৈতল নতুন গ্রন্থি ।

বৈতলের মন এখন আর বিল হাওরে মজে না । এখন সে নদী আর তার অবিরল জলধারার রহস্যে মশগুল । কোথা থেকে আসে নদী, তৈরি করে জনপদ । মানুষ কি নদীর টানে আসে না নদী টানে মানুষকে । বৈতল জানে ভালবাসার কথায় শুধু জট লাগানো আর জট ছাড়ানোর খেলা । মানুষ আগে না নদী আগে , এসব কথার জবাব হয় না, তবু মন কথা বলে । নদীর সদাই চলা দেখে ভাবুক হয় মন । বৈতলের মন ও সদা চলমান । তাও তো বৈতল থামে, আবার চলে । সিলেটের গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরেছে, থেমেও থেকেছে । আবার চলেছে, ফিরে এসেছে বইয়াখাউরি । তার জন্মভূমি । একদিন জন্মভূমি জন্মজল ছেড়েও চলে এল বৈতল । দুর্গাবতীর হাত ধরে মেহেরপুর রিফ্যুজি ক্যাম্প । ক্যাম্প

ছেড়ে ইটখোলা, হরিৎবরণ জমিদার বাড়ি । নদী কিন্তু চলেছে অবিরাম । আর আশ্চর্য এক
নদী, একই শহরে নদীর উজানভাটি । এদিকে তাকাও উজান ওদিকে ভাটি । এদিক ওদিক
নদী দিয়ে সুরক্ষিত শহর কি আছে কোথাও । সুরমা গাঙকে বৈতল জেনেছে শুধু তার নিজের
নদী, সিলেটের আপন নদী, তার সুনামগঞ্জে সুরমা শুধু ভাটিতেই বয় । কিন্তু সুরমার উজানেও
যে আছে অন্য এক নদী বৈতল দেখেনি আগে । সুরমার ভাটির কথা বলেছেন শুধু গুরু সৃষ্টিধর
। গুরুর কথায়,

--- সব নদী অউ সাগরো যায় । সব নদী অউ মানুষের মতো, খালি আউগ্গায় । থামে না,
শেষে গিয়া ঝপ করিয়া সাগরো পড়ে । অউ অইল মৃত্যু । মৃত্যু কিন্তু শেষ নায় রেবা, আবার
এক আরম্ভের লাগি সাজিয়া গুজিয়া বই থাকা ।

গুরু সৃষ্টিধর বড়াইল পাহাড়ের কথা বলেননি বইতলকে । গুরুর ভয়, যদি উৎসবের
টানে শিষ্য বেরিয়ে পড়ে । গুরুর ভয় শুধু ভালবাসার আঘাত । অগেরস্থ গুরু ভরসা ভাবেন
বৈতলকে । পঞ্চকন্যার একজনকে দান করার ইচ্ছা থেকে বৈতলকে ধরে রাখার টান । সদা
চলমান বৈতলকে ধরে রাখবে কে । গুরুর হাত ছেড়ে পালায় বৈতল । পালিয়ে চলে এল
জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে দেখা সুতার নালীর মতো নদীর কাছে । নদীর উৎসেরও কাছাকাছি
এখন । চোখ মেলে দেখে বড়াইল পাহাড়, পাহাড়ের কোন গুহা থেকে জানি বেরিয়েছে এই
সুতার নালী, হঠাৎ জলরাশি হয়ে জড়িয়ে ধরেছে বৈতলের নবীন শহরকে । বৈতল একদিন
পৌছে যাবে নদীর জন্মস্থানে । বরাকোত্তরীতে গিয়ে গুরুর পায়ে এক অঞ্জলি জল
দেবে । বলবে,

--- খালি মৃত্যু নায়, জন্মও আসল ।

জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি বসবাসের সময়কালে নদীর বিভঙ্গ বৈতলকে আকৃষ্ট করে ।
নৃত্যপরা রূপ থেকে কত যে মুদ্রার বিচ্ছুরণ । সেই আকর্ষণেই বন্ধু দুখুর সঙ্গে তার লড়াই ।
লড়াই করতে করতে কত রকম আকারে যে সাজায় শহরবাসী নদীকে । গুলতির বাঁট, খুরাদিল
বাটি এমন কি চাঁদের আকৃতিতে সাজাতে সাজাতে বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে । হেডমাস্টার বলে
ঘোড়ার নাল, বৈতল জানে সব কল্পনারই এক সত্য থাকে । দেখার সত্য আর কল্পনার সত্য
মিলেই তো সৃষ্টি; নতুন দেখা । দুখু বহুই আপদ যোগেন্দ্রদা লাখুদা হেডমাস্টার বৈতল সবার

দেখা এক এক করে নতুন চোখের দেখা । একা মানুষের বুদ্ধিতে কতটুকু আর সুন্দর থাকে, সবাই মিলে যে সুন্দর সাজায় সেই তো আসল । মানুষ একা থাকার জন্য ঘরবাড়ি সাজায় না, একলা থাকার জন্য ধর্মকর্ম করে না, মানুষ একা থাকার জন্য সমাজ সাজায় না । জন্ম থেকে মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টাকে সহনীয় করতে মানুষ সুন্দরকে ডাকে । মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে । ভাটির পথে নামে । ভাটি মানে যদি অবধারিত পরিণতি পথ হয় তাহলে কেন দুপার উর্বরা করার এই শ্রম । বৈতল গুরুর কাছ থেকে জেনেছে নদীর শিক্ষা । মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ সাজায় নদী, খৈ ছিটিয়ে যায় নিজেই । মৃত্যুকে জয় করার সব উপকরণ রেখে যায় উপত্যকায় । এক ছুতার মানুষের সান্নিধ্য বৈতলকে অনেক কিছু শিখিয়েছে । গুরু সৃষ্টিধরও তাই হৈ চৈ করে বেঁচেছেন । আট আনা রোজগার করে এক টাকা খরচ করেছেন । বলেছেন,

--- তুমি দেখাত দেখরায় আট আনা । আমার মনের মাঝে নু কোটি টেকার সিন্দুক ।

মনের সিন্দুক খুলে গুরু টাকা বের করেন একা একা । কেউ থাকে না সঙ্গে । মনসামঙ্গল গাওয়ার জন্য সৃষ্টিধর ওঝা ঘোরেন সারা সিলেট । সাকরেদ বৈতলকেও থাকে সঙ্গে স্বাধীনতার মিটিং মিছিল, তেভাগার আন্দোলনেও সবার সঙ্গে । নিয়ম করে কখনও দেবতাঘরে যেতে দেখেনি বৈতল গুরুকে । কিন্তু তিনি একবার দিনের শেষে নিয়ম করে কোথায় যেন হারিয়ে যান । বৈতল ভাবে গুরুর ভর হয় । বৈতল ভাবে সিন্দুক খুলে টাকা বের করেন । গুরু বলেন,

--- না রেবা খালি বার করলে অইব নি । সিন্দুকো না জমাইলে বার করমু কেমনে । দিনো একবার একলা হওন লাগে । নাইলে তো আরি, রান্দা, বাইশর লাখান অন্তর অই যাইবায় । একটু স্বার্থপর না অইলে আর মানুষ অইলাম কেনে । ঔ সময় দেখবায় মগজেদি জ্যোতি বার অইব ।

বৈতল জ্যোতির দেখা পায় নি । বৈতল চেষ্টা করেও একাকী থাকার সুফল পায়নি । লুলার সঙ্গে, দুর্গাবতীর সঙ্গে, দুখু আপদের সঙ্গে, মামুপীর হেডমাস্টার সবার সঙ্গে থাকতেই বৈতলের সুখ । নতুন বান্ধবহীন দেশে রবিলালের সখ্য না পাওয়ায় একবার একাকী হয় বৈতল । মিরতিঙ্গার টিলায় যেমন তার পাথর, তেমন পাটপাথরের খোঁজে অভয়াচরণ ভট্টাচার্য পাঠশালার মাঠে বসে থাকে একাকী । আর এস এন কোম্পানীর জাহাজঘাটার সন্ধ্যায়

‘ছিরুভিরু পায়ে’র শব্দ শোনে । বরাক নদীর উপর নির্মীয়মান পুলের উপরমুখী নির্জনতা থেকে হারিয়ে যায় আকাশনীলের কুলুকুলু ডাকে । সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আলো নেই কোথাও, কিন্তু আভাসে বোঝা যাচ্ছে পাথরের পুল উঠে যাচ্ছে গগনে, নদীর উপর থেকে সোজা গিয়ে থেমেছে, আকাশের গায় । নাকি আকাশ থেকে নেমেছে আকাশগঙ্গা । বৈতল দেখে বাঁশের বেড়া পুলের উঠতি পথে, আগাছার জঙ্গলে পরিত্যক্ত নির্মাণ । ঝোপঝাড় আর বেড়া পেরিয়ে পুলে ওঠা কঠিন কাজ নয় বৈতলের । তেলাল শরীরে গতি আনে বৈতল, বেড়া জঙ্গল পেরিয়ে মেচি বাঘের ক্ষিপ্ততায় অসমাপ্ত পুলের উপর দৌড়য় বৈতল, পেরিয়ে যায় এক নম্বর দুইনম্বর খুঁটি । ভাবে এ কেমন পুল, শুধু উঠছেই উপরে । বাঁশের হাকম দেখেছে গ্রামের ছড়ার উপর বইয়াখাউরির হাতলহীন হাঞ্চ দেখে অভ্যস্ত বৈতলের চোখ বিস্মিত হয় সিলেটের লোহাপুল দেখে । সুরমা নদীর উপর এই বিশাল পুল দেখে বলেছে, বাপরে বাপ । বরাক নদীর উপর পাথরের পুল এত লম্বা না হলেও চওড়ায় বড় । বৈতল শুধু উপরেই ওঠে । তিন চার নম্বর খুঁটির নিচে বসে বলে, আঃ কী আরাম । এমন সুখের ঠাই কোথাও খুঁজে পায় নি শহরে । কিন্তু কোথায় নদী, অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায় না । ঐ দূর কালীবাড়ির দিকে নদীর জলরেখা চিকচিক করে আলোর প্রতিফলনে । নদীর সুবাসে আকুল হয়ে মনে পড়ে তার ফেলে – আসা একাকীর সাম্রাজ্যকথা । প্রথমেই মনে পড়ে মিরতিঙ্গার টিলা পাহাড়, তারপর একে একে সব বিল হাওর চুনা পাথরের টিলা, পিয়াইন সুরমা কুশিয়ারা । বরাক নদীর পারের মানুষের বড় ভূতের ভয় । জল আর জঙ্গলময় শহরে শেওড়াগাছের ঘন ছায়া অন্ধকারে কলাগাছের দীর্ঘ পাতাকে ডাকে আয় আয়, পাতা বলে সরসর । দুখু এসব গাছভূতের কথা শোনায় বৈতলকে । বলে,

--- দেখছি কুনুবাড়ির ঘসামাজা খালবাটিত কিচ্ছু খাইছ না ।

--- কেনে বে ।

--- ইখানো মাইনষে ভূতর ভয়ে রাইত বার অইননা ।

--- তে কিতা করইন ।

--- অখন বুঝিলা । তেও যদি না বুঝছ খাওয়ার সময় বর্তনর গন্ধেউ বুঝি লাইবে ।

সন্ধ্যের পর তাই আধখানি পুলের ধার ঘেঁষে না কেউ । খেয়াঘাটে তখন সাহেব ভূতের
মোচ্ছব হয় । সাদা রঙের সাহেবরা এসে জড়ো হয় পুলের উপর । সাহেব ভূতের জন্যই
নাকি পুল সম্পূর্ণ হয় না । রাতের বেলা ভারিরা আসে হাজারে বিজারে । কত রকমের খাবার
আসে কেক পাউরুটির বাখরখানি রুটি গরু শূয়োর মুরগির মাংস আসে কাছাড় ক্লাব থেকে ।
চিনামাটির বড় বড় বোতলে বিলাতি মদ আসে জন স্মীল থেকে । সদরঘাটে সারসার গাড়ি
জমে থাকে সারারাত । জুড়িন্দায় পারাপার হয় সাহেব মেমে ভর্তি গাড়ি । ঘোড়ায় চড়ে আসে
লাবকের ডাক্তার । বৈতল তাই ঘাপটি মেরে বসে থাকে বিলাতি ভূত দেখতে । দেখার হাওরে,
বড় হাওরেও ভূত আছে শুনেছে মায়ের কাছে । মা বলে,

--- দেওলা ।

বলে,

--- দেখিছ, একদিন আমারেও দেওলায় নিব ।

মাকে দেওলায় নেওয়ার ভয় নিয়ে বড় হয়েছে বৈতল । সন্ধ্যে হলেই মাকে আগলে
আগলে রাখে । হাওরমুখো হতে দেয় না । বাপের মুখ যেদিন ছোট, সেরাতে বৈতল মাকে
ছাড়ে না এক মুহূর্তের জন্য । নৌকোর কাছি খুলে বাপ যে – রাতে ডাকে, বৈতল প্রমাদ গোনে
। একাকী মাকে রেখে যায় কী করে । বাপের কথাও অমান্য করে না বৈতল । বাপ বলে,

--- হেই বৈতল, পানিত লাম ।

নেমে যায় বৈতল বাপের সঙ্গে পানি খেইড় খেলতে । সারারাত ধরে মাছ ধরার খেলা
। জল খেলার রাতে বৈতল বাপের সঙ্গেও খেলে । বন্ধু লুলাকে ডেকে আনে । বলে,

--- মারে দেখিছ ।

বৈতল মাকে শেষ দেখা দেখতে পারেনি । লুলা দেখেছে । লুলা করেছে সন্তানের কাজ
। সর্পদংশনে মৃত মায়ের সৎকার । মাকে নিয়ে লুলার সঙ্গে হিংসার সম্পর্ক বৈতলের । মা
আবার তাদের জুড়েও রাখে । বলে,

--- রাম জন্মাইতে বেটা রইম । দেখিছ ছাড়াছাড়ি অইছ না ।

সেই লুলার শ্বাসনালী টিপে মেরে ফেলে দিয়েছে বৈতল ত্রুন্ধ পিয়াইন এর জলে ।
ছাড়াছাড়ি হয় জীবনের মতো । লুলার যে বুদ্ধিনাশ হয় । লুলা কেন মরে, এখনও হিসাব
মেলাতে পারে না বৈতল । লোকে বলে লুলা বেছে বেছে হিন্দু মেয়ের সর্বনাশ করে, ধর্মনাশ
করে । বৈতল জানে লুলা ওরকম নয় । লুলার মনে মলিন রঙের সব দুঃখ । লুলার মা নেই ।
বাপ নতুন মাকে নিয়ে চলে যায়, লুলা বড় হয় নানার কাছে । বৈতলের মাকে মা পেয়ে লুলা
হাসে । সেই মাও একদিন চলে যায় আচমকা । বৈতলও নেই বইয়াখাউরি, মনসাপুঁথি শেখাতে
রেখে এসেছে বিয়ানিবাজারের রইদপুয়ানি গ্রামে । কালো রঙের পেচকুন্দা পাখির সঙ্গে জড়িয়ে
যায় বৈতল গুরুগৃহে । গুরু সৃষ্টিধরের কনিষ্ঠা কন্যাকে যখন ছেড়ে যায় তখন দেরি হয়ে গেছে
। লুলা বইয়াখাউরি ছেড়ে চলে গেছে পাগলা । লুলা কবিগান লিখতে শুরু করে । সুর করে
পড়ে গ্রামের হাটে বাজারে । লুলা নাম পাণ্টে হয় দিলবাহার বাঙ্গাল । বৈতলকেও বলে নতুন
নাম দেবে সুখবাহার । বৈতলের টানেই লুলা ফিরে আসে এনায়েৎপুর কবরখানায় । সব
হারিয়ে বরাকপুলের চারনম্বর খুঁটিতে বসে বৈতল বুক চাপড়ায় একা একা । অশরীরী লুলাকে
বলে,

--- কৈ দিলে বেটা । নাম দিলে না, সুখও দিলে না, গেলেগি । মার কথা রাখলে না, মায়
কইছলা ছাড়াছাড়ি অইছ না । এক বেটির লাগি মরি গেলে । দুর্গার উপরেউ তর চউখ পড়ল
কেনে । দুর্গায় তো তোরে চাইত না । তে কেনে হাত দিলে তাইর গাত । দুর্গা কথার অর্থ
জানছনা বেটা । দুর্গার গাত যখন হাত দিচ্ছ তর বিনাশ তো অইবউ ।

নির্বান্ধব শহরে এতসব কথার মাঝে কি চোখ দিয়ে টপটপ জল ঝরে বৈতলের ।
বৈতলের চোখ চুনাপাথরের থলা, জলের কোনও উৎস নেই । বৈতল কৃতকর্মের জন্য
অনুশোচনা করে না । কিন্তু বুক ফাটে মাঝে মাঝে । বুক খুলে দেখায় না বৈতল । তবু দেখে
তিনজন । অন্ধকারের অতিথি আরো তিনজন তখন চারের উল্টো খুঁটিতে । গাঁজার আসরে
বসে তিন ভূতশরীর । বেয়াদব দখলদারের উপর রাগে ওরা ।

তিনজনের মধ্যে বেঁটে লোকটাই দুখু । দুখুই ন্যাকড়া জড়ানো চিলিম বাড়িয়ে দেয়
বৈতলের দিকে । সন্দেহের চোখে দেখে, বৈতল জানে, বাড়ি হারামজাদার লাটি । সাবধান হয়
। শুনকো নেশার মৌতাতে না করতে নেই, তাই নেয় । কয়েকটানে পেটভরা ধোঁয়া নিয়ে চুলু
চুলু চোখে বলে,

--- ইতায় আমার কিচ্ছু হয় না । আমার লগে কানা পয়সাও নাই যে বেহুশ করিয়া লুটি লাইবায় । খাওয়াইছ, বালা করছ । আমিও খাওয়াইমু একদিন । কও কুনদিন খাইতায় ।

--- আমরা রুজঅউ খাই ।

--- আমিও খাই । তে ইতা নায় । আমি মালা খাই ।

--- মালা কিতা । পানি নি । শরাব ।

--- না, না । মউয়া চিনো নানি ।

--- মউয়া ।

--- অয় আমিও চিনতাম না । তে ইখানো আইয়া জমিদার বাড়ির উঠানো দেখলাম মস্তবড় এক গাছ । সাদা সাদা গুটার লাখান ফুল । খাইলে নিশা হয় । আমার বউএ গাছর তলে যেতা পড়ি থাকে ইতার মালা করিয়া শুকাইয়া রাখি দেইন । আর আমি যখন রিক্সা লইয়া রাইতর টিপো যাই, তখন মালা থাকিয়া ফুল ছিড়িয়া খাই । কী মজা লাগে । পেডেলর আগেউ গাড়ি ছুটে ।

--- ধুর বেটা পগার পগা । তর বাড়ি কই । কোন জমিদার বাড়ির কথা কইরে ।

--- বৈতলরে পগা উগা কইছ না । মারি ফালাই দিমু কইলাম, তিনটায় মিলিয়াও কিচ্ছু করতে পারতে নায় । এখন গাইঞ্জা খাওয়াইছ, কিচ্ছু কইতাম নায় । যদি লাগতে চাছ, কাইল আইছ, হরিৎবরণ জমিদারিত । দেখাইমুনে মউইয়ার তাকত ।

--- বাক্সাউ দেখি শুক্কুর মামুদর পুত । তিন টানেউ বেটা হাতেমতাই ।

--- কইলাম যে ইতার আমার কিচ্ছ হয় না । আমার আসল নিশা পানি ।

--- পানিও খাচ নি বেটা । অত পয়সা পাছ কই । জমিদারে দেয় নি পেদারে ।

--- জমিদারে কেনে দিত । আমি কাম করি নানি । আমার রিক্সা আছে । আরো কাম আছে । রাইত টিপ মারলে বহুত পয়সা ।

সব উল্টোপাল্টা হয় । নেশাডু তিনজনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন খুলে দেয় বৈতল ।
ইশারায় জানায় তার সব কথা । বুঝলে বোঝ, কাছে এসো । দোস্তি করো । দেশ ছাড়ার পর

তো বিশ্বাসের মানুষ পায়নি । অন্ধকারের তিন চুতরা পাতাই সহি । বইয়াখাউরির একমাত্র
বদমতলবি মানুষই হলো বৈতল । আর সব ভাল । বন্ধু লুলা ও সহজ সরল । বৈতলের
পাল্লায় পড়ে সিলেট জুড়ে ধূর্তমি করে বেড়িয়েছে । তখন তো একটাই দেশ, সবাই মিলে
মিশে থেকেছে নিজের নিজের ভিটেয় । এখানে স্থানীয় মানুষ আর ভিটে ছাড়া মানুষে হয়েছে
রেষারেষি । সব শয়তানি শিখেছে । খাদ্য আর বাসস্থান এখন সহজলভ্য নয় । ভালমানুষিতেও
কাজ হয় না । রিফুজি না হয়েও অনেকে ক্যাম্পে নাম লেখাচ্ছে । চাল ডাল নগদ টাকায়
ডোলের সন্ধান পেয়েছে । তাই বৈতল একটু মেজাজ দেখায় । মারামারির ভয় দেখায় । মানে
পুরোপুরি বিশ্বাস নেই এখনও । কিন্তু বৈতলের পছন্দ হয়েছে একটাকে । যেটা খুব
চ্যাটাংচ্যাটাং কথা বলেছে, বেটার নাম দুখু । গাঁজা খায় না কিন্তু সঙ্গ দেয় । মানে, বৈতল
ঠিকই ধরেছে, ঐ ব্যাটাই হারামজাদা । পঞ্চগায়েতির উস্তাদ । বাকি দুটো বহুই আর আপদ ।
তিনটেই বাঙাল, মুসলমান । দুখুই ওদের দাবড়ে বেড়ায় । বৈতলের সন্দেহ, লোকটা অনেক
কুকর্ম করে । যদিও বলে মামুপিরের খিদমতগার । অন্ধকারের ভিতরই বৈতলকে জেরা করে
। বলে,

--- তোর বাড়ি সুনামগাইঞ্জ নি ।

--- তুই কেমনে বেটা, হক্কলতাত উস্তাদি মারছ দেখি ।

--- আউয়া দেখলেউ মারি । তোর পানি নিশা কইলে নানি ।

--- পানি তো হবিগঞ্জোও আছে ।

--- আউয়া নাই হবিগঞ্জো । ছলাইরে নি ।

--- না বেটা, তোর খুব পানিতরাস । শরীল দেখিয়াউ বুঝিয়ার । পানিত নামতে নি । অউত্ত
দেখ আধখানি পুলর মাথা । মাথা থাকি মার এক ফাল, গিয়া পড়বে পানিত । পাইবে মাছ ।
ঘাঘট বোয়াল গজার । ধরিয়া লইয়া আইতে পারলে কইমু বেটা ।

--- হাচানি । আমারে হাচারির আউয়া পাইচ্ছ নি । নদীত গজার ধরতাম । জাল ছাড়া মাছ
মারতাম ।

--- ঠিক আছে, গজার নায় রউ অউ ধর চাইন দেখি ।

--- জাল লাগব ।

--- তে আর তুই বেটা কিওর পাটনি ।

একটু তো নেশা হয় বৈতলের । কিন্তু বৈতলের কাছে সব নেশার রাজা হল জল ।
তাই নদীর জলের কথায় নড়ে চড়ে জলচর শরীর । বৈতল জানে জলকে তার ভয় নেই ।
জলের নাগাল পেলে সে মহাবীর । যদি অর্ধেক পুল থেকে ঝাঁপ দিলে নদী হয়, তাহলে
কোনও ভয় নেই । সে নেবে যাবে ঝপাং । কিন্তু যদি জলের বদলে থাকে শুকনো পাথর ।
বেঘোরে মারবে বৈতল । তবে বন্ধুহীন বেঁচে থাকাও কি বাঁচা । যদি ওরা ভুল বলে, তবে
ওরাই মরবে । একের বদলে তিন । দন্ধে দন্ধে মরবে । লুলা তাকে যেমন মারছে, মারবে
সারাজীবন । তাই নবীন বন্ধুদের বলে, আনবে । মাছ ধরে আনবে । একটা কিছু বাহাদুরি না
দেখালে ওরাই কেন মানবে বইয়াখাউরির মাইমলকে । বৈতল ভুলে যাওয়া দেবীকে স্মরণ
করে, গুরু সৃষ্টিধরের চরণে প্রণিপাত করে, পেছন ফিরে দেয় দৌড় । চারের খুঁটি থেকে
পিছিয়ে তিন দুই এক । বৈতল পালাতে জানে না, বেটাগিরি দেখাতে পেলে ছাড়ে না । তেলাল
শরীর থেকে নিমা খোলে, তফন খোলে, আন্ডার প্যান্টের ফিতে শক্ত করে বাঁধে । অন্ধকার
রাতের স্নগে মিশে যায় বাপের বেটা বৈতল । শরীরে পায় মাইমলি গন্ধ । বাপ যেমন বলে,

--- মাছর লগে লড়তে অইলে, সাপর লগে লড়তে অইলে মাইমলি গন্ধ লাগে । কালা তেলাল
শরীর লাগে । শত্রুরে ডর দেখানি লাগে আইছলা গন্ধে ।

কে কার শত্রু । কাকে বৈতল ভয় দেখাবে তার আঁশটে গন্ধে আর কালো শরীরে ।
বৈতল এখনও জানে না পাগলার মেয়ে দুর্গাবতী তার কালো শরীরকে ভয় করে না ভালবাসে ।
দুর্গাবতীর কাছে সে অবলম্বন না ভরসা, জানে না বৈতল । দুর্গাবতীর দুধের শরীরটায় লোভ
আছে বৈতলের, তাই দুর্গার পায়ের তলায় পড়ে থাকে । রহস্য করে বলে,

--- আমি অইলাম ভোলানাথ । তুমার পাওর তলে পড়ি থাকমু ।

বিয়ানিবাজার রইদপুয়ানির চায়নার রঙ নিকষ কালো । বৈতলের রঙে রঙে মেলানো ।
মনটা যে ধলা ফক্ফকা । মন দিয়ে বসে রয়েছে, শরীরও যে দিতে চায় । নেয় না বৈতল ।
কেন, কালো বলে, গুরুকন্যা বলে । সৃষ্টিধর ওবা কাঠমিস্ত্রি বৈতলকে শেখান পুঁথির মন্ত্র,
মনসামঙ্গল । শেখান জাতিধর্মের বিভেদ ভুলতে । বৈতল জানে চায়নার গায়ের রঙই বিভেদ

করে । আবার সেই গায়ের রঙই মনে পড়ে রেল গাড়ির কামরা । টেলিগ্রাফের তারের উপর দেখা লেজঝোলা ফিঙে পাখি । চায়নার কাছে ফিরে আসে । বলে,
--- অউ পেচকুন্দির টানেউ আইলাম আবার ।

ফিরে আসে বৈতল চামেলির কাছে । থাকে কই । গুরুকে অমান্য করে চলে যায় বইয়াখাউরি আবার । ধলাবরণ দুর্গাবতীর জন্য খুনখারাবিও হয় । দেশ ছাড়বে না বলে শপথ করেছিল । জেল ফাঁসির ভয়ে পালিয়ে যায় ইন্ডিয়া ।

নতুন শহরের এমাথা থেকে অমাথা রিক্সা চালায় বৈতল । ‘যাইতায় নিবা’ বললে সেও মাঝে মধ্যে বলে ‘যাইতাম নয়’ । শহরের প্রতিটি গলিঘুঁজি বৈতল চেনে । দিনের বেলা, রিক্সা চালাতে চালাতে সে দেখেছে পুলের অবস্থান । বৈতল জানে কোনখানে জল, কোনখানে চোরাপাথর । তবু সে দৌড়য় । সাহেব ভূতের মোচ্ছব দেখতে এসে তারও সাধ হয় ভূত হওয়ার । মহাবীরের মতো দৌড় শুরু করে বৈতল । আত্মহত্যা করার মানুষ নয় সে, তবে কেন সে দৌড়ে পৌঁছে যায় শেষ সীমায় । বৈতল জানে তার মনে কী আছে । বৈতল জানে বন্ধুরা জাপটে ধরবেই । নইলে যে মরণ । ভাঙাপুলের শেষ সীমানা থেকে অনেক দূরে নদী । ঝাঁপ দিলেই পাথুরে পথের উপর থেঁতলে মরা । বেঁটে লোকটা, যার উস্কানি সবচেয়ে বেশি, সেই আটকে দেয়, আপদ অন্ধকার জড়িয়ে ধরে কাঁদে । বছই সাজায় আবার চিলিম । বৈতল হাসে রহস্যনয় । নাকি কাঁদে ভিন্নধর্মী তিন বন্ধুর বুক মুখ রেখে । বুক কাঁদে, বৈতলের চোখে দুষ্টুমি ছাড়া কোনও ছাপ নেই ।

দশ

শুকনো ভুতুড়ে রাতের পর রাত কেটে যায় অনেকদিন । জমিদারের দেওয়া বাড়ির চৌকাঠ পেরোয় বৃষ্টির জল । অবিশ্রাম বৃষ্টির শব্দ বৈতলের রক্তে দোলা দেয় । বৈতলের মাথার ঠিক থাকে না । বর্ষা এলে মানুষের কষ্ট হয়, দুর্দশা বাড়ে, বৈতলের ধরে নেশা । ঘরে থাকতে পারে না । তবে যে যাই বলুক দুঃখ দুর্দশার মধ্যেই গরিব মানুষ কিন্তু বর্ষা ঋতুকে রানি বানিয়ে রাখে । বাকি পাঁচ ঋতুর খবর এখানে কেউ রাখে না । বর্ষাকে মন রাখে, এত সুখের কষ্ট তো কেউ দেয় না বর্ষার মতো । সারা বছর ধরে চলে শুধু প্রস্তুতি । উৎসবের মালাগাঁথা । সুখ সওয়া জলের সঙ্গে । ঘর বাঁধা হয় শক্ত করে শন বাঁশ বেত দিয়ে ছাওয়া হয় চাল । জলের সঙ্গে লড়াই এ কোনও প্রতিরোধ টেকে না । উঁচু করা হয় ভিটে । রূপসী বর্ষার ছলাকলার কাছে হার মানে সব । দুঃখী মানুষ হয় আরো দুঃখী । ঘাটিবাটি সব ভেসে যায় জলে, বেহায়া মানুষ যে জল শুকিয়ে গেলেও সুখী হয় না পুরোপুরি । আর বছরে আবার এসো বলে আগাম আমন্ত্রণও জানিয়ে রাখে ।

সুখের সঙ্গে ভিজে সময়ের একটু মন খারাবিও আছে । একলা থাকলে হয় । মন ভাল করতে বৈতল তিন বন্ধুকে ডাকে বাঁধের উপর । ভেজা মনকে ওম দিতে বন্যা জলের ছপ ছপাশ কাটিয়ে সবার আগে পৌঁছে যায় সংকেত স্থানে । আধভেজা তফন এর খুঁট থেকে বের করে বিড়ির বান আর দিয়াশলাই । নাসিরউদ্দিন আর ঘোড়ার মাথা ।

ভেজা শলই খটখট করে । একটার পর একটা কাঠি থেকে বারুদ খসে । বৈতলেরও জেদ চাপে । দাঁতের চাপে বিড়ির ক্ষত গভীর হয় । নেশার ঘোরে বৈতল জলবন্দি শিল্পি মাছের মতো ঘাই মারে বাঁধের উপর । দাপিয়ে বেড়ায় ডাইনে বাঁয়ে । কোথায় যাবে

আগুন আনতে । ভেজা মনকে চাঙা করতে গরিবের একমাত্র ওম বিড়ির ধোঁয়া । এক টানেই রোদে ঝলমল করবে মনের আকাশ । দিয়াশলাই যদি না জ্বলে বিড়ির বান দিয়ে কী হবে । কী আবার হবে, উপায় বের হবেই, দুঃখে থেমে থাকার মানুষ নয় বৈতল । জল ডিঙিয়ে যাবে লোকালয়ে, নিয়ে আসবে ইন্ধন । আবার যাওয়া আসার ভাবনায় গতি আনতে এদিক ওদিক তাকায় বৈতল । এমন সসাগরা সন্ধ্যা সে দেখেনি অনেকদিন । দুদিকেই অঁঠে জল । একদিকে ঘোলাজলের ভরভরাট বরাক নদী, ওপারে দুধপাতিল গ্রামের আভাস শুধু জলে ভাসা বাড়ির চাল আর সুপারি গাছের বামন অস্তিত্বে । অন্য দিকে, যে-জল দিয়ে সে এল ছপছপিয়ে, সেদিকে বৃষ্টিজলে মগ্ন শহুরে মানুষের সংসার । সংবৎসরের জল উৎসব ।

অতিবর্ষণের বিকেল বেতলা শলইর মতোই মনমরা । কানি কাপড়ের মানুষ খাদ্য ও বাসস্থানের খোঁজে যাচ্ছে উঁচু জায়গায় । কিছু থাকল পড়ে, কিছু মাথায় নিয়ে হারাধনের দল চলে, কাছাড় হাইস্কুল, নর্মাল স্কুল, গভর্নমেন্ট স্কুলের দিকে । সারাদিন বৈতল অনেক টিপ দিয়েছে । একবারও যাইতাম নায় বলেনি । এমন কি ত্রাণ শিবিরের গরম খিচুড়ির গন্ধও বৈতলকে আকুল করেনি । বর্ষায় টেলটোলে জলের মতো গরম খিচুড়ি বড় প্রিয় তার । মানুষের দুর্দশায় বৈতল ভুলেছে তার প্রিয় । শরীরে এসেছে অমানুষিক শক্তি । সপসপসপ জলের ভিতর প্যাডেল ঘোরে আর বৈতলের মনে পড়ে আর এক প্রলয়রাতের কথা, মালির ভিটা কালিবাড়িতে জড়ো হয়েছে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত এক মানুষ দল । ভাটির দেশের বন্যায় শহুরে বৈচিত্র্য নেই । ডুবে গেলে ত্রাণের কোনও ব্যবস্থা নেই । এর মধ্যেই বৈতল আর লুলা প্রলয় জলে ঝাঁপ দেয় । লুটপাট করে, এক কথায় ডাকাতি করে রসদ সংগ্রহ করে । সর্বহারা মানুষের মুখের হাসি দেখে মনে হয়েছে এরকম লুটপাট সে বারবার করতে পারে । ভুল ঠিক কিংবা পাপ পুণ্যের লড়াইএ থাকে না বৈতল । বৈতলের মনে এক বিচারশালা আছে, যেখানে সওয়াল হয় না জবাব মেলে তৎক্ষণাৎ । লুলাকে দন্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত বদল হয়নি তাই । এরকমই এক দুর্যোগের মাঝে উথালপাথাল পিয়াইনের জলে লুলাকে সমর্পণ করে বলেছে বৈতল, পবিত্রোপবিত্রবা । যেমন করতেন দুর্গাবতীর বাবা ভুড়ুং ঠাকুর । ঘাটব্রাহ্মণ মরা মানুষকে পবিত্র করে স্বর্গের দ্বার খুলে দিতেন । পিতার মৃত্যুর পর দুর্গাবতীও হতে চায় তিলকাঞ্চন করার অধিকারী । পাকিস্তান হয়ে-যাওয়া দেশেও তাকে দেয়নি অধিকার । নারীর অধিকার বড় শক্ত মানুষ সমাজে । তবে বৈতল তার বুদ্ধি দিয়ে দুর্গাকে দিয়েছে অধিকার । হরিৎবরণ ঠাকুরবাড়ির পূজারিণী হয়েছে বৈতল পাটনির ঘরনী ।

বৈতলের বাপ বলে মাইমলের বুদ্ধি থাকে নৌকোয় । বলে,

--- ‘তেলির বুদ্ধি চুঙ্গাত আর পাটনির বুদ্ধি ডিঙাত’ ।

তাই জল আর ডিঙা দেখলেই বৈতলের বুদ্ধি চড়চড় করে । দুষ্টবুদ্ধিও খেলে । গৃহস্থ বাড়ির গরুর ‘ডিগরা’ খুলে নেওয়ার মতো অচেনা মাঝির নৌকাও খুলে দেয় বৈতল । ভরা নদীর মাঝখানে গিয়ে বৈঠা উঠিয়ে রাখে গলুইএ । মনপবনের নাওকে বলে, যথা ইচ্ছা তথা যাও । কুডুলাকে ডাকে । বলে,

--- আয় দেখি তোর কত শক্তি, বৈতলরে নে । দেখি তোর কুডুলার ভিত্তরে কত কুচক্কইর ।

মাঝনদীতে নৌকা ছেড়ে ঝাঁপ দেয় জলে । ঘাটে এসে ওঠে আবার নদীর জলে থপথপায় । নদীকে সাবাশি দেয় । বৈতল জানে জল তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় । জল তার শক্তি । পুকুর হোক খাল হোক হাওর বিল নদীর জল সুন্দর হয় বর্ষার নতুন চাদর গায়ে জড়ালে । জলভরা নদীতেও তাই বৈতল ফিরে পায় তার রাজ্যপাট । কৈশোরের মিরতিঙ্গা যেমন, নতুন দেশের অসমাগু পুলের চার নম্বর খুঁটি যেমন । যেমন এই বর্ষণ সন্ধ্যায় বরাক নদীর মাটি বাঁধের দুপার গঙ্গা ।

বিপর্যস্ত মানুষের অসংখ্য নৌকা বাঁধা আছে বাঁধের গায়ে । বৈতল একটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে ডিঙা ভাসানে । একবার মুখোমুখি হওয়া নদীজলের । থপথপিয়ে সাবাশি দেওয়া নয়, থাবড়া মেরে ধমক দেবে এবার । বলবে থামাও এবার । বলবে,

--- থামাও বেটি । তুমি বুলে মা, ইতা কিতা কর । দুর্গাবতীয়ে তুমারে পূজা করে, তেল সিন্দুর দেয় । কত বৌ বেটি হকল আইন তুমার কাছে, তুমার বর চাইন । মা বাপ জামাই পুয়া পুড়ি নাতি নাতন লইয়া সুখে থাকার আশীর্বাদ চাইন তুমার কাছে । তুমি ইতা কিতা কর । মাইনষর ভালো দেখতায় পার না নি ।

বৈতল এককোষ ঘোলা জল হাতে নিয়ে ঢালে নদীর বুকে । ভক্তি ভরে প্রণাম করে নদীকে । বলে আবার ।

--- থামাও বেটি ।

বৈতলের মন ভাল হয়ে যায় । দাঁতের ফাঁকে ধরে রাখা বিক্ষত বিড়ি মুখ থেকে জলে ছুঁড়ে ফেলতেই আবার বিরক্ত হয় । বান খুলে নতুন বিড়ি নেয় মুখে । শেষ চেষ্টা আবার । ফুসফাস করে সবকটা বারুদ ভাঙে কাঠের কাঠির গা থেকে । আগুন যন্ত্রের প্রতারণায়, অসহায় আক্রোশে ঘোড়ার মাথা ছুঁড়ে ফেলে জলে । কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসে বৈতলের পায়ে । অগ্নিদৃষ্টিতে জলের কৌটোয় তাকায় বৈতল । জলে আগুন জ্বলে । বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয় তাকে । ক্রুদ্ধ বৈতল বলে,

--- শালা বেইমান ।

পিটির পিটির বৃষ্টির সঙ্গে পুটুর পুটুর বিড়ি ফুকতে ফুকতে এসে জড়ো হয় আরো দুই বন্ধু । একজনের মুখে জ্বলন্ত বিড়ি আর একজনের মুখে হাড় জ্বালানো মুচকি হাসি । বহুই আর দুখু ।

বৈতল জানে মুশকিল আসান এসে গেলে আর চিন্তা নাই । দুখুর উপর বৈতলের ভরসা যেমন, লাগও বেশি । বৈতল যে-কোনও কারণেই ভুবনের রাগ নামিয়ে দেয় দুখুর উপর । দুখুর কথায় মিষ্টতা নেই । কাঠ কাঠ কথায় যে-কোনও সময়ই আগুন লাগতে পারে । তাই বৈতলও দুখুর সঙ্গে ব্যবহারে অকারণ নিষ্ঠুর । রেগে যায় কথা না শুনেই । এতক্ষণের মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি আর বন্যার কল্যাণে রাগ বাড়ে । ঘোড়ার মাথার আগুন নষ্ট হওয়ার ক্রোধ জ্বলে ওঠে বহুইর মুখের বিড়ির আগুনে । বহুইর উপর জমা রাগও গিয়ে পড়ে দুখুর হিসিবে । রাগের সঙ্গে যোগ হয় বেঁটে মানুষটির ফিচেল হাসি । বৈতলের দুর্দশার খুশি । তার মানে, ওর বিড়ম্বনা লুকিয়ে দেখেছে দুজনে । দুখুর গায়ে অপরিসীম শক্তি, তাই পারতপক্ষে গায়ে হাত দেয় না বৈতল । মুখেই চলে লড়াই । বলে,

--- শালা, এগুয়ে বিড়ি ফুকের আর ভাবের দুনিয়া কিনি লাইছে । আর এগুয়ে ভাবের হে টানে না এর লাগি সাধু । ইগুয়ে খায় আরো বেশি । সবর ধুমা একলগে টানে । ডুব দিয়া জল খাছ বেটা ভাবছ একাদশীর বাপেও টের পাইন না । হালার হালা ।

এবার মুচকি হাসিতে বহুইও যোগ দেয় । আঙুল আর হাতের তালুর মধ্যে নিপুণ প্রক্রিয়ায় লুকিয়ে রাখে বেহেশ্তের আগুন । বৈতলকে দেয় বিড়ির টুকরো । বলে,

--- নে ধরা ।

ধরে না তিতা ভিজা বিড়ি । বৈতলের রাগ আবার ওঠার আগেই বহুই নিয়ে নেয় বিড়ি
। ভাঙা চেয়াল ফুকফুকিয়ে ধরিয়ে দেয় বৈতলকে । তিনজনের মুখ তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জ্বল
হয় । দুখুটা অতি হারামজাদা । খুশির মধ্যেই মারে চিমটি । বলে,

--- অখন ক । কারে কইলে বেইমান ।

--- কারে আবার কইলাম । তুই বেশি শুনছ ।

--- শেওরা গাছর তল থাকিনু আমরা দেখলাম তোর ফালাফালি ।

--- দেখচ্ছ তে কিতা অইছে । পয়সা কিতা গাঙে দি ভাইয়া আয় নি । দুই পয়সার শলই ইণ্ড
গেল । এর থাকি শ্যাম কম্পানির সূর্যমার্কাউ ভালা । আগুন ছাড়া বিড়ি ধরে নি ক । আর
দেখলেউ যখন, তখন আর মুশন মারলে কেনে লুকাইয়া ।

--- দেখলাম কিলাখান ধুমাগাক্তা বেটা তুই । ধুমার লাগি পাগল অই গেলে । কেনে খাচ ।
ছাড়ি দেছ না কেনে ।

বিড়ির ওম পেয়েও বৈতলের মাইমলি রাগ কমে না । দুখুর উপদেশ শুনে আবার
তেলেবেগুনে জ্বলে । বলে,

--- ছাড়তাম কেনে । তোর মতো নি ডুব দিয়া পানি খাওরা । তোর মতো রাড়ি বেটির জীবন
নায় আমার ।

দুখুর বৌ মরেছে অনেক কাল । দুখুকে নিয়ে সত্য মিথ্যা অনেক কথা । খুন ছিচকেমি
গুণ্ণামি সব ক্রেছে । বৌকে মেরে এখন আধা পির । আর বিয়ে করেনি । মামুর খেদমতি করে
মনে প্রাণে । বন্ধুদের সঙ্গে দেয় সব অপকর্মে । বৈতলের সঙ্গেও বাসনের ঝনঝনি চালায় ।
বৈতল কিংবা দুখু কেউই কড়া কথা হজম করে না বলে কড়া কথাই বলে দুজন দুজনকে ।
দুখু প্রত্যুত্তরে বলে,

--- অই পুঞ্জির বাই । বৌ নাই তে কিতা অইছে । তোর তো হালার হালা থাকিয়াও নাই ।

--- কিতা কইলে হালা বাঙাল । আবার ক । কল্লা লামাইলিমু কইলাম ।

বৈতল রাগলে তার শরীর থেকে মাছের গন্ধ বেরোয় । মাছের তেলের আঁশটে গন্ধে
ভরে যায় চারপাশ । বেঁটে মানুষ দুখুরও আঁতে লাগে ঘা । বিষ ঝাড়ে কথায় । বলে,

--- আমি কইতাম কেনে । হক্কেলেউ কয় ।

--- কিতা কয় ।

--- কয় তুই ধ্বজভঙ্গ । তর বউ তোর লগে হয় না ।

--- কার লগে হয় । তোর বাপের লগে নি ।

--- বাপ তুলিয়া মাতিছ না বেটা রিফুজি । ভালা অইত নায় কইলাম । আমার বাপ নায়, তোর
বাপ অউ জমিদারর কুলো হয় । আর শুনতে নি । মাইনষে কয় পুড়ি ইগুও তোর নায় । আর
কিছু ।

--- আর সব কথা কইছ, পুড়ি লইয়া মাতিছ না দুখু । আমার মাথা ঠিক থাকত নায় ।

ক্ষীণকায় বৈতলের রাগ দেখেনি দুখু । আলদসাপের বিষ ঝাড়ে টুপটাপ । তখন দুখুর
গায়ের জোরের কথাও ভুলে যায় । শুধু গায়ের জোরে কিছু হওয়ার নয় জানে বৈতল ।
শক্তিমান দুখুকে কাবু করতে জানে বৈতল । মনের জোরে বৈতল সব পারে । কিন্তু দুখুর সঙ্গে
তার লড়াই যে সমানে সমানে । কম সেয়ানা তো নয় মামুপিরের খিদমতগার । লড়াই
ঝগড়ায় ডাকাত মানুষটা মন দিয়ে প্যাঁচ কষে । অকারণে শরীরকে বেগার খাটতে
পাঠায় না । বিশ -মেশানো হাসিতে প্রতিপক্ষকে কাবু করে । লুলার সঙ্গে এই অমিলটা
কিছুতেই মেলাতে পারে না বৈতল । লুলাও হাসে, তবে লুলার হাসি যে অনাবিল । লড়তে
লড়তে লুলা দান ছেড়ে দেয় । দুখুও তাই করে । তবু কেন যে দুখুকে বড় রুক্ষ মনে হয়
বৈতলের । মনে হয় রহস্যময় । দুখুর মনের নাগাল পায় না । আবার দুখু কাছে থাকলে মনে
হয় সে নিশ্চিন্ত । বন্ধু থেকে অভিবাবক বাশি । বড় বেশি মাতব্বর । লুলা বৈতলকেই ওস্তাদ
মানে । দুখু দুখুর মতো, বৈতল বৈতলের মতো । দুজনেই রাজা, দুজনেই নেতা, আর দুয়ে
মিলে একও । বৈতলের কোনও পিছুটান নেই দুখুকে নিয়ে, যে যার মতো চলে ওরা । লুলাকে
নিয়ে সব আতান্তর বৈতলের, লুলা যে তার খেলার পুতুল । লুলার মনটা বড় নরম । তাই

হয়তো বৈতলের মায়ের পক্ষপাত বেশি লুলার প্রতি । লুলা বাড়িতে এলেই মায়ের মন খুশি হয়ে যায় । ঝলমলানো খুশি নিয়ে মা বলে,

--- দুই ভাই মিলামিলি থাকিছ রে ।

বৈতলকে পাঠিয়ে দেয় মকবুলবাড়ি । লুলা যে মুরগি খেতে ভালবাসে । বুঁটি বুলিয়ে বাচ্চা পাখি এনে ফেলে দেয় বৈতল মায়ের উঠোনে । কঁকর কোঁ করতে করতে বাচ্চা মুরগি দৌড়য় আবার মকবুলের বাড়ি । দুই বন্ধু দৌড়ে গিয়ে ধরে আনে । বৈতলের বোকামি দেখে মা রাগে না, হাসে শুধু । লুলাকে বলে,

--- নে বেটা বিসমিল্লা করিলা ।

বৈতল বিসমিল্লার অর্থ বুঝে না, লুলাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে । মা বলে,

--- আমার সামনে কাটিছ না । লই যা গি হাওরর পারো, বিন্না খেতর ধারো জবাই করি ধইয়া উইয়া লই আইছ ।

রান্না ঘরের মাচান থেকে মাটির হাঁড়ি বের করে দেয় লুলার হাতে । লুলাও অতি উৎসাহে খুলে ফেলে তার লুঙির গাটি । গাটিতে থাকে বিচিত্র সব সরঞ্জাম । লাল কালো সুতোয় বাঁধা ছোট ছোট সব গাছের জড়ি । কাচের শিশিতে সাদা রঙের তেল । লুলা হাসে আর বলে,

--- ‘ঘরে ঘরে গিয়া বেজ নানা গীত গায় ।

পেটের কারণেতে রুল আমিন সারিন্দা বাজায় ।

মুর্দা দিলে জিন্দা করে কুদরতে রব্বানি ।

--- তুই সারিন্দা বাজাছ নি, গানও গাইতে পারছ নি বে ।

--- না বে । ধান্দামি করলে কততা কওন লাগে । বাজানে বুলে আরো কিতা কিতি কইত আর জড়িবুটি বেচত । ইতা নানার কাছ থাকি শিখছি । সাপের বিষ একরতি আট আনা ।

সাপের বিষের কথা শুনে বৈতলের মার মুখে হাসির উদ্ভাস দেখে ভয় পায় বৈতল । মা লুলাকে বলে,

--- আমারে দিছ চাইন একটু রাখমু নে । কত নিবে ।

--- তুমারে মাগনাও দিতাম নায় । এমনেউ খাইলাও, মরতায় নায় । ইতা মিঠা, নাইরকল তেলো তেতই বিচির গুড়া মিশাইয়া বিষ বানাইয়া মানুষ ঠগামি । আমিও ঠগাই ।

--- তুই কেমনে ঠগাইবে । আমারেউও ঠগতে দিলে না ।

--- তুমারে কেনে ঠগাইতাম । তুমি আইলায় মা বেটি ।

লুলার মা নেই, তাই বৈতলের মার আদর আদায় করে । বৈতলকে বোকা মাও পটে যায় লুলার মিষ্টি কথায় । বৈতলের হিংসা হয় । লুলার গাউতে আরো কত ধনরত্ন । তিন চারটে খাগের টুকরো কাগজের ‘তাও’ কয়েকটা, সাদা এবং ছেরেং ভেরেং লেখায় । একটা কালির বড়ি, চিনামাটির সাদা দোয়াত । লুলার আছে চটি চটি বই । একটায় আকাশের জিল্কি টুকরো করে সাজানো । লুলা বলে,

--- ইটা আমপারা । কুরাণ পড়ন লাগব নানি বেটা, আল্লাপাকে নবিরে যে লাখান কইছইন সব লেখা আছে আরবি ভাষাত ।

ছোট বৈতল লেখা পড়া জানে না । কিন্তু বাংলা বই, বাংলা লেখা দেখেই বুঝতে পারে । লুলার অন্যান্য বই দেখে বলে,

--- তুই বাংলা জানছ নি ।

--- আমি কিছু জানি না বেটা । আমিও শিখতাম ।

--- আমারে শিখাই দিবে নি ।

--- দিমু নে ।

--- জানছ নি, আইর পুথি লেখা অইছে বাংলাত । করিমগইঞ্জ থাকি আয় । আমি শিখতাম । বাংলা শিখিয়া আমি একদিন মনসামঙ্গল গাইমু দেখিছ ।

মুরগি জবাইর অস্ত্রও আছে লুলার পেটিকায় । দুই ইঞ্চির এক ভাঁজ করা ছুরি । অতি উৎসাহে নখের টানে খোলে লুলা । চার ইঞ্চির ভোঁতা অস্ত্রে মুরগির গলা ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করে লুলা । বৈতল বলে,

--- কিতা মাতরে বে ।

--- চুপ যা । ইতা মাতন লাগে । আল্লাপাকর নাম নেওন লাগে ।

--- মন্ত্র পড়বে নি । জরৎকারমূর্নিপত্নী বাসুকি ভগিনীস্তথা মনসা দেবৈব্য নমঃ ।

বৈতলের মায়ের যে কত রূপ । মাটির হাঁড়িতে মা রান্না করে দেয় লুলাকে । বৈতলকে দেয় না । চান করে এসে বৈতলকে ভাত বেড়ে দেয় । বৈতলের জন্য মুরগি বরাদ্দ নয় । মিষ্টি কুমড়ো আর ঘাঘটশুটকির ঝোলও বিস্বাদ লাগে । বৈতল রাগে । মার উপর রাগে থালা ছুঁড়ে দেয় । বলে,

--- ইগুরে মুরগি খাওয়াও, আমারে কেনে দেও না । ইগুকুনু তুমার পুয়া নি ।

--- অয় হেও আমার পুয়া । খা রে বাবা খা । হারা বছর যখন পাঠা খসি খাও, হাস কাঠুয়ার মাংস খাও, তারে দেওনি । তার নু মা নাই । হে আইছে দুই দিনর লাগি, আকতা যাইব গিয়া ।

--- ইগুয়ে কিতা খায় জানো নি । ইগুয়ে গরু খায় ।

--- খাউক, তার ভালা লাগলে খাউক ।

--- আমারে তুমি মুরগিউ দেও না । জাত যাইব গি নানি । জাত কিতা ।

--- জাত উত কিছু নায়, খাইতে নি । তার ভালা লাগলে সব খাইছ । শরীলো শক্তির লাগি খাইছ । মন চাইলে খাইছ বাপ । অউ কইয়া গেলাম ।

সেদিন আর কিছুই খায় নি বৈতল । মার উপর রাগ কমেনি । মা কেন বলে, ‘অউ কইয়া গেলাম’ । কোথায় যাবে মা । বৈতলের মা সব উল্টোপাল্টা কথা বলে । লুলার কাছ থেকে সাপের বিষ কেন চায় । বৈতল সব জানে, মা মরে যেতে চায় । বৈতলকে ছেড়ে যেতে চায় । মার মনে অনেক দুঃখ । বৈতল তো মাকে দুঃখ দেয় না । বাদিয়ার বাচ্চা লুলাকে স্নেহ

করে মা, মুরগির মাংস রেঁধে খাওয়ায় । মায়ের আদর টুকরো হয়ে যায় । তাও তো মেনে নিয়েছে ছোট বৈতল । মায়ের মনে কখনও দুঃখ দিতে চায় না বলেই সেদিন মুরগির মাংস খায়নি । মা তো মত অমত করে নি । অমত করে নি বলে লুলার দিকে তাকাতে পারে গর্ব ভরে । বলে,

--- দেখ বেটা, আমার মা ।

লুলাও কী বুঝে কে জানে । মুঞ্চচোখে তাকিয়ে থাকে বৈতলের মার দিকে । মার প্রশংসায় একই কথা বলে বারবার । বলে,

--- অয় বে, একেবারে দেবী মার লাখান ।

এরপর দুই বন্ধুতে মিলে সব খেয়েছে । মন্দিরের খিচুড়ি লাবড়া, মহাপ্রভুর বাড়িতে কচুর শাক খেয়েছে লুলা দাস । গরুর গোস্তু খেয়েছে রুল আমিন বেজ এর বন্ধু বৈতল মিয়া । অবস্থা বুঝে জাত পাঁটেছে । মায়ের কথা মনে রেখেছে বৈতল ।

--- মন চাইলে খাইও বাপ । যেতা খাইলে শক্তি বাড়বে, খাইও ।

বৈতল আর লুলা শরীর মনে বেড়ে উঠেছে । বাড়তে বাড়তে এমন যে বাড়বে লুলা, বৈতল ভাবতেও পারে নি । লুলার শরীর ফালাফালি করে, তাই না লুলা অসময়ে মরে ।

দুখুর শরীরে লুলার মতো অকারণ ফালাফালি নেই । আর বৈতল, শরীর চাইলে বৈতল দুর্গাবতীর কাছে যায় । দুর্গাবতীর কাছে পায় না বৈতল । মনটা পায় । শরীর চেয়ে রাগারাগি করে বৈতল নাগাপট্টি যায় । বৈতলের বাঁধা মানুষ আছে মধুবালা । দিলীপ কুমারের নায়িকার নামে ডাকে চার টাকার রমণীকে । বৈতলের একটা মনের মানুষও চাই । মনের মানুষ দুর্গাবতী তো মেয়েমানুষ । মেয়েমানুষ মনের মানুষ হলে বেটাগিরি থাকে না । লুলার মৃত্যুর পর তাই শিথিল হয়ে থাকে বৈতল । মনের আঘাত সয়ে যেতে সময় লেগেছে । উদভ্রান্তের মতো দুর্গাবতীর কথা মতো চলেছে । পুরুষ যা করে না বৈতল তাই করেছে । পত্নীর পদবি নিয়েছে । রিফুজি ক্যাম্পে সরকারের দয়ায় জীবনযাপন করেছে । স্ত্রীর প্ররোচনায় হরিৎবরণ জমিদারের আশ্রিত হয়েছে । বৈতল তার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে । দুখু শারীরিক শক্তি আর মনের বলে বৈতলের মনের মানুষ হয়েছে । বৈতল আবার জেগে উঠেছে । দুখু বৈতলকে তার

রক্ষতা দিয়ে ঘিরে রাখে । বৈতলের পৌরুষকে সজাগ রাখে । বৈতলের প্রতিটি পদক্ষেপেই দুখ পথ কেটে দেয় । পথ পরিষ্কারও করে ।

বৈতলের চাই পরিপূরক শক্তি । ওকে দুর্বল করে দিতে চাইলে মানবে কেন । দুখ বৈতলের দুর্বলতা নিয়েও খেলা করে । বৈতল তার স্ত্রী দুর্গাবতী, মেয়ে মণিকে নিয়ে কোনও কথা শুনতে চায় না । তেলে জলে বৈতল যেমন আছে ভালই আছে, তার জীবনকে তো গুছিয়ে রাখছে এই দুটি প্রাণী । এর মধ্যে যদি ব্যাথা থাকে তা শুধু বৈতলের । দুই দেশ আর দুই নদীর সংযোগকারী জলমাটিও ওরা দুজন । বৈতল কখনও দুঃখ পুজো করে নি । বৈতল তার দুঃখের নিরাময় করে নিজে । একান্তে । ওখানে দুখুর মতো চোর ডাকাতির মধ্যস্থতার দরকার নেই । বৈতলের দুঃখে মধ্যস্থতাকারী আছে একজনা । আছে তার জল, তার পানি । বৃষ্টির ঝঝঝামি । বন্যাজলের ছলছলাৎ । জলের তড়পানি দেখলে বৈতলেরও তৎপরতা বাড়ে । হয়ে ওঠে সে মহাবীর । পাহাড় ভাঙা জল আর ঝড় বৃষ্টির অপরিসীম শক্তির সঙ্গে লড়াই এখানে নেই । তবু জলকে মান্য করে বৈতল । জলের কোনও জাত নেই ধর্ম নেই । জলের কোনও ছোট নেই, বড় নেই । জলের কাছে সব শক্তিই নির্বল । বৈতল জল থেকেই শক্তি আহরণ করে । জলের সঙ্গে খেলতে খেলতে জলের ধর্ম আয়ত্ত করতে হয় শিখিয়েছে বাপ । তাই তো বৈতল বাপ ডাকলেই নেমে যায় জলে । বাপের ডাকে থাকে অজানার ইশারা । বাপ ডাকে,
--- হেই বৈতল পানিত লাম ।

বৈতল নেমে যায় । জলের সঙ্গে খেলে । উত্তাল জলে, ভরাবর্ষার হাওর আঁধারে নেমে যায় বাপ । অন্ধকারেও বৈতলকে প্রলুব্ধ করে বাপ । বলে,

--- পানি খেইড় খেলতে নি বৈতল, চল ।

বৈতলের বাপ বৈতল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির । জলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাপ ভুলে যায় তার পরিচয় । ভুলে যায় মৎস্যজীবীর জীবিকা । লড়াই করার মানসিকতা আছে । জয়ের উদ্যম নেই । বাপের কোন 'তিক' নাই । জলের সঙ্গে দাপাদাপি করে শূন্য হাতে উঠে এলেও লজ্জা নেই । খালি হাতে ডাঙায় উঠে বৈতলের সামনে হাসে । বলে,

--- খেইড়ো হারনও লাগে বেটা ।

হেরো বাপের মুখে তখন খেঁ ফোটে । জয়ের দিনের গল্প বলে পুষিয়ে নেয় হারের দুঃখ
। বাপ বলে সেই মহাপ্লাবনের কথা আবার । মহাসমুদ্রের মতো চরাচর, সব জলের তল ।
জলের উপর ডিঙি নৌকোর মতো এক গাছের ডালে বসে আছে বাপ তিন দিন তিন রাত ।
সেই গাছের অন্য বাপের সঙ্গী আর এক পালোয়ান । বাপের বন্ধু বজরি দাস । মাছ ধরার
কাজ না থাকলে লাঠি খেলে, জমিদার বাড়ি পাহারা দেয় । জমিদারের চাকরকে দুচোখ দেখতে
পারে না বাপ । বাপ বলে ‘গাছুয়া আলদ’ । বাপ তাকে গাছের উপরই গলা টিপে মারে ।
ফেলে দেয় হাওরের গর্ভে । অসহায় আক্রোশে বাপ বিলাপ করে বৈতলের কাছে । বলে,
--- অউ বেইমান বেটিরে দেখত বজরি হালার হালায় । এর লাগি শাশি রগো টিপিয়া মারি
ফালাই দিছি ।

সেই বাপের ছেলে বৈতল । বৈতলের স্ত্রী কন্যা নিয়ে কথা বললে বজরি দাসের হাল
হয়ে যাবে । সে তুমি যতই লেঠেল পালোয়ান হও না কেন । বৈতল বেঁটে দুখুর হাটাগাটা
শুকনো শরীরকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে । সত্যি কি পারে । দুখুর দশাসই চেহায়ায় কিল
মেরে দেখেছে, পারবে না সহজে । কলের কাজ বলে হবে না । তাই বলে,
--- দেখিছ রে বাটিবেটা তোরেও একদিন পানিত ডুবাইয়া মারমু ।

বৈতল বেশি রাগলে দুখু শান্ত হয় । শান্তিবর্তা দেয় । বলে,
--- আমারে মারিয়া কিতা করতে দোস্ত । আমরা গরিব মানুষ এমনেউ মরি রইছি । মরার
উফরা যে হালার হালা মরলে দুনিয়াত শান্তি আইব, ইগুরে তো মারতে পারতে নায় ।
--- মারমু মারমু । সব বেটারেউ মারমু ।

--- অয়, হুয়ার গুমগুমি নালিয়া খেতো, খালি দুখুরে দেখলেউ রিঙ্গো উঠি যাছ । দুখুর কথাও
ঠিক । বৈতলের মনে একটা কাঁটা খচখচ করে । একটা মানুষকে শান্তি দিতে পারলেই তার
শান্তি । কিন্তু বৈতলের দুঃখ আর তার নিরাময়ও যে তার নিজের । ওখানে কেউ নেই
আশেপাশে, দুখু নেই বহুই নেই আপদ নেই, এমনকী তার দুর্গাবতীও নেই । গায়ে কাঁটা
ফুটলে সে নিজেই তা উপড়ে ফেলবে । কাউকে ডাকবে না বৈতল । জলসমাধি দিতে হলে
দুইমনি পাথরে বেঁধে ফেলে দেবে নসিবালি হাকিমের দিঘীর গভীরে । কেউ জানবে না হৃদিশ

। তারপর সে আবার ফিরে যাবে আপন দেশে । গ্রামে বইয়াখাউরি, পরগনা ছাতক, মহকুমা
সুনামগঞ্জ জিলা সিলেট । দেশ পাকিস্তান (পূর্ব) । লুলা খুনের মামলা এতদিনে শেষ হয়ে গেছে
। জেল পুলিশের ভয় নেই । নতুন করে মাছুয়া মাছুয়ার মতো জীবন শুরু করবে । আর রিক্সা
চালাতে হবে না জাতব্যবসা ভুলে । জলের পোকা জলে নামবে বৈতল । রাতের পর রাত
কাটাতে বিল হাওরের জলে । পেশির গুলি পাকাবে গাছপাকা ফজলি আমের মতো ।
ভদ্রলোকের রান্নাঘরে মাছ যোগাবে বছরভর । নতুন বন্ধু হবে আবার । চুরি চামারি ছেড়ে
দেবে । শ্রাবণ মাসের কটা দিন শুধু গুরু সৃষ্টিধরকে স্মরণ করবে । মনসা পুঁথি পড়বে, নাচবে
গাইবে । ওদেশে তো আর কেউ নেই বৈতলকে শপথ ভাঙার কথা মনে করিয়ে দিতে ।
বিষহরির কালনাগিনীর ছোবল মায়ের মৃত্যুর পর যে আড়ি করেছে বৈতল সে-কথা এখন আর
কেউ জানে না । ঢলানি জিয়ানির নেশার ঘোরে কাটিয়ে দেবে শ্রাবণী । গোঁসা ভাঙিয়ে আইর
গোঁসা সামাল দিলে আর কাকে ভয় বৈতলের ।

সাপিখুপির ভয়ডর নেই বৈতলের । বৈতলের জলকেও ভয় নেই । জলের সঙ্গে খেলায়
বৈতলের সর্বসুখ । সেই জলের ঋতুতে মা মনসার পুঁথি পড়তে, পুঁথি গাইতে, নাচতে নাচতে
বিভোর হয়ে যেতে চায় বৈতল । বাপের বেটি বেটে আই মনসা । যা চাই, তা চাই । যে -
কোনও উপায়ে হাসিল করা চাই । নীতি নৈতিকতার কোনও ইঙ্কল খুলে বসে নি মা মনসা ।
দরকারে প্রতিপক্ষের দুনিয়া ছারখার করে দিতেও পিছপা নয় বেটি । তেমন মাকে না ডেকে
কি পারা যায় । বৈতলের পুঁথি পড়ার ধুম দেখে দুখু আজাব বকে । বকে বকে বৈতলকে
তাতায় । বলে,

--- তুইন বেটা সাপের ডরে পুঁথি পড়ছ ।

--- তুই ডরাছ নানি । ডরাছ, দেখছি আন্ধাইর রাইতো ইশ আশ হ্নলেউ দুই হাত এক করি
লাছ । তুই কুন্ কীর্তিনিয়া নি । ক না কারে ডাকছে ।

--- আল্লারে ।

--- জানি মনে মনে তুই আস্তিক মুনিরে ডাকছ ।

--- ডাকিতো ডাকি, সাপরে হক্লেউ ডরায়, তোর মতো গাটামি করি না ।

এই এক ভয় বৈতলের অন্য বন্ধু বহুইরও । তারও আছে অন্তর কাঁপুনি । বহুইর খুব ডর সাপকে । নদীকে পারে ঘর । সারা বছর জল আর জলের ভিতর লতা নিয়ে বাস । রাতে নাম করতে নেই । বৈতল দিনেও নাম নেয় না । গুরু সৃষ্টিধর শিখিয়েছেন যে । বলেছেন,

--- এমনে যারারে দেখরায় তারারে না ডরাইলেও চলব, কিন্তু বেরা পুঁথির নাগ অইলা দেপতা । তারারে মানিও ।

দেবদেবী নিয়ে বৈতলের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই । তাই মান্যতার প্রশ্নও নেই । কিন্তু গুরুবাক্য যে অমান্য করে না বৈতল । বহুই বাঙালের মতো দুখুর আর এক খাদিম আপদও মনসাপূজার সময় জমিদার বাড়িতে ভেটর চাউল দিয়ে যায় । বলে,

--- অউ বেটির বড় গুসা ।

--- তুই নু কছ তোর মজবো ইতা নাই ।

--- মজবর তুই কিতা জানছ । কিচ্ছু জানছ না । সব অউ আল্লার ফরিস্তা । ইতা লইয়া বেশ মাতিছ না ।

--- মাততাম না কেনে । হুন, এক গপ হুনতেনি ।

--- বাদ দে অখন ই পানির মাঝে তর হুকনা গপ ।

--- হুকনা নায় বে, ভিজা তিতা, পেকর গপ । হিগুরে ডাক, ইমাম সাহেবের ডাক । তান নি পছন্দ হয় দেখি ।

বৈতলের কাছে গল্প শোনার প্রস্তাবে দুখু ভুলে যায় গোসা । ইমাম সাহেব বলার বিদ্রপও হজম করে । বৈতলের গল্প মানেই মজা, আর মজার ভিতর কী একটা আছে । বেশ ভাল লাগে । গুরু সৃষ্টিধরের নাম নিয়ে বৈতল শুরু করে কথা,

--- দুই বন্ধু সনা আর মনার গপ, বুঝলে নি । দুইটায় অউ নাগাপটি থাকি খাইয়া বার অইছে, তখন রাইত বারোটো । আর খাইলেউ তারার আল্লা আর ভগবানের কথা মনো পড়ে । কে বালা কে খারাপ ইতা লইয়া তর্কাতর্কি মারামারিও অই যায় । তর অউ দামা ইগুর মতো, অউ যেন

বে বেটি ইণ্ড, কিছু বুঝে না বেটা তিন কড়ার বালিগড়া, কিন্তু তান কথায় কথায় থুতা করন লাগব ।

কথার ভিতর এত দুখুকথা শুনেও দুখু রাগে না, তাতে না । বরং হাড়জ্বালানি মুচকি হাসি দিয়ে বৈতলকে রাগায় । বৈতলের দু লাইন কথা মাঠে মারা যাওয়ায় মূল গল্পে ফিরে যায় আবার । বলে,

--- তারপরে বুঝছস নি হিরাইত আক্কা দুইজনে কয় আর তকরার ঝগড়া করত নায় । কয় ইবার চিংপটাং অউক । যে চিং অইবা তাইন অউ ভালা । মানন লাগব । অয় অয় । আট আনি এণ্ড বার করল সনায়, সনাউর । দিল মনারে, মনোরঞ্জন । কইল নে কর চিং, আমার চিং । মনায় আটানি ইণ্ড নিয়া রাখল নউখর উপরে, মারল ঠেলা । ঠুংঠাং করল না । পয়সা গিয়া পড়ল নালাত । আর আটানি হারাইয়া ইণ্ডয়ে হিণ্ডর গলাত ধরিয়া নি অউ কান্দা । ইণ্ডয়ে কান্দিয়া ডাকে পিসিমারে । আবার কয় আমার আপন পিসি নায়, তাইন পিওনহড়ি । ইণ্ডর দেখাদেখি হিণ্ডয়ে ডাকে খালারে, কয় আমার আপন খালা । কান্দতে কান্দতে মনায় কয়, উবা তর আটানি আমি বার করি দিমু । নালাত হাত দিয়া মদুয়ায় পয়সা খোঁজে, পায় না । সনায় কয়, তুই কান্দিছ না হর, আমি বার করমু । আর এক মদুয়ায় হাত দেয় পায় না । খালি পেক উঠায় । তখন ইতা পেক উক দেখিয়া তারার আল্লা আর ভগবানর কথা মনো পড়ে । কয় এক কাম করি হন, আমরা তারার নাম লইয়া খুঁজি । সনাউরএ ভগবানর নাম লইয়া খোঁজে, মনোরঞ্জে আল্লার নাম লইয়া খোঁজে । খুঁজতে খুঁজতে তারা দেখে হারাইছিল এক আটানি পাই লিছে দুই আটানি । কেমনে পাইল ক ।

ধর্মপ্রাণ দুখু ধর্মধর্মের বিভিদেরে নিজেকে জড়াতে চায় না । বলে,

--- উপর আলারে লইয়া তোর ইতা ফাত্তরামি আমার ভালা লাগে না । বাদ দে ।

--- কইতে পারলে না ।

--- কেনে পারতাম নায়, আল্লায় খুশি হইয়া দিছইন । তোর তো খালি ইতা ভাইয়াপির গপ । রুন্দা যে খাইয়া আইচছ পাকিস্তান থাকি তেও পেট ভরছে না ।

--- ইণ্ড ভাইয়াপির গপ নায় বেটা পুঞ্জির ভাই ।

--- তে কিতা ।

--- উপরআলায় খুশি অইয়া দিছইন ঠিক অউ । ভাবছইন কী ভালা মানুষ, উপরআলা বদলাবদলি করি আধলি খুঁজের এর লাগি দুইজনরে দিছইন দুই আধলি । উপর আলাও ঠগছইন, তারা কেউ নিজর ঈশ্বররে পেকো লামাইত না করি ইতা কইছে । বুঝাছনি মানুষ কত শয়তান উপরআলা থাকি । অখন ক, তুইনি পেকো লড়াচড়া দেখিয়া আস্তিক মুনি ডাকছ ।

ওদিকে শুকনো নেশার টানে বছই মিয়ার তর সয় না । বৈতলের সম্পর্কে আর দীর্ঘ হতে দেয় না । ইতি টানতে বলে,

--- ঠিক অউ কইচ্ছ । আপনা থাকি বেগ্না ভালা, পানি থাকি পেক ভালা । অখন ক আনচ্ছ নি ।

--- কিতা আনতাম । মশল্লা তো । ইতা তো আনব আপদে ।

এবার রাগে বছই । বলে,

--- অউত্ত মালাউন হকলর এক দুষ । কথার ঠিক নাই হলার ভাইর ।

চার বন্ধুর একজন শুধু ভিন্ন ধর্মের । সে বৈতল । তাকে নিয়ে, তার ধর্ম নিয়ে মস্করা করে বাকিরা । রিফুজি বাঙ্গাল মালাউন হলার হালা এসব যেমন তাদের গালাগালির ভাষা তেমনি ভাইয়াপির ভাষাও, দোস্তির ভাষাও । হিন্দু বন্ধুকে যেমন ধর্ম নিয়ে গালাগালি দেয় আবার বন্ধুত্বের প্রয়োজনে বৈতল মিয়া সাজিয়েও নিয়ে যায় বেরাদরিতে । গালাগালির আঠা দিয়ে ওরা বন্ধুত্বের জোড় শক্ত রাখে ।

ইতিমধ্যেই চতুর্থজনের প্রবেশ । শ্রীমান আপদ আলি মোল্লা । চারবন্ধুর শারীরিক গঠনের কোনও মিল নেই কারো সঙ্গে । বৈতল যেমন মাঝারি লম্বা টিঙটিঙে বাতাস দিলে উড়ে যায় । দুখু বেঁটে মোটা আম গাছের গাইল, ‘হাজার টেকার মরিচ খাইয়া আরো খাইত চায়’ । বছই লম্বা মোটা ‘আঠালি’ কলার গাছ আর আপদ শুধু নামেই আপদ, রং কালো কিন্তু বৈতল থেকে লম্বা, এক থাবা বেশি । সবুজ লুঙির অনেকটাই কোমরের উপর, তার উপর লাল গামছা

। গামছায় বাঁধা পুটুলি । বৃষ্টির ছাট বাঁচিয়ে, শরীরকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে দৌড়ে এসে আসরে ঢোকে । বেতের শরীরে কোন হাঁফ নেই হাঁসফাঁস নেই । বলে,

--- কই বইতে চল ।

বছইও লম্বা কম নয়, তবে বৈতল থেকে কম । শরীরে লম্বা কিন্তু মাথায় মোটা । বলে,

--- কেনে চল, হাকিম সাহেবের কবর সব থাকি উচা ।

কবর বিশারদ দুখু মিয়া জানে জলের হৃদিশ, হাল হকিকৎ । দুখু কয়েকটি বড়লোক পরিবার থেকে টাকা পয়সা পায় কবরের বেদি পরিষ্কার রাখা দেখাশোনা করার জন্য, বিশেষ দিনে ধূপকাঠি জ্বালানোর জন্য । হাকিম সাহেবের কবরও তার । তাই বলে,

--- কই তোর কবর, সব পানির তলে । অখন অউ সরকারি বান্দা আর কালভাট । বইলে বও নাইলে উবাই উবাই মারি দেও ।

--- কেনে ছাতনি গাছোর আগা আছে নানি । চল উঠি যাই ।

দুখু বাধা দেয় । বলে,

--- না, আমি ই পিছলা গাছো উঠতাম নায় ।

বৈতল দুখুকে মেজাজ দেখায় । বলে,

--- তোরে কে উঠত কইছে রে হালা, তুই বান্দর উপরে থাকবে । পারা দিবে ।

দিশেহারা চার নেশাডু সমাধানের পথ পায় না । কোথাও একটু না বসলে মৌতাত হয় না । হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা কালভার্টের কিনারা পায় ইট সিমেন্ট বাঁধানো । আশেপাশে কেউ কোথাও নেই । নিশ্চিন্তে হাওয়ায় ওড়া যাবে ।

কিন্তু ওরা পৌঁছনর আগেই একজন ঘাপটি মেরে বসে থাকে জল আর স্থলের সীমানায় । দুখু আর বছইর দুজোড়া হাত ভয়ে জড়ো হয়ে যাচ্ছে । মাথামোটা আপদ কিছুই দেখেনি, এগিয়ে যাচ্ছে জায়গা নিতে । বৈতল লম্বা মানুষটিকে এক ঝটকায় টেনে এনে ফেলে দেয় অন্য

দুজনের গায়ে । মুখে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বলে । বৈতল এগিয়ে যায় জলের সীমানায় ।
দৃশ্যমান লেজের উপর কৃশ হাতের ছায়া পড়তেই লতাদেহ নড়ে ওঠে । ক্ষিপ্ৰতায় অতুলনীয়
বৈতল লেজ ধরে নেয় তার বজ্র আঁটুনির মুঠিতে । তারপর সেকি ঘূর্ণন মহাদেবের তাণ্ডবও
এমন ধীর স্থির নয় । নির্ভুল পদচারণা, নির্ভুল হাত ঘোরানোর মুদ্রা । ঘোরাতে ঘোরাতে
একসময় সাউৎ করে ছুঁড়ে দেয় ডান দিকে, মাঝনদী তাক করে । বৃষ্টির জল, না ঘামের জল
বোঝা যায় না, তবে রাগে কাঁপে ভেজা বৈতল ।

আপংকাল কেটে যাওয়ায় দুখু ফিরে পায় তার স্থৈর্য । স্বভাবসিদ্ধ মন্তব্যে তাতিয়ে দেয়
বৈতলকে । বলে,

--- কাজিমরা এগুরে খেদাইয়া অখন তড়পাইরে কেনে ।

--- তারা কুন্‌দিন কাজিমরা অয় না ।

দুখু জানে না বৈতলের ক্রোধের কারণ । লুলা বেজ তাকে শিখিয়েছে সাপের বংশ নাশ
করার কৌশল । দুখুকে বলে বোঝাতে পারবে না বৈতল তার ক্রোধের কারণ । বৈতলের
মাকে মেরেছে যে, তার প্রতি কোনও দয়ার সম্পর্ক নেই বৈতলের । দুখু বুঝবে না, মেলাতে
পারবে না মনসামঙ্গলের গায়ক সৃষ্টিধর শর্মা ওঝা ওরফে বৈতল আর সাপের শত্রুতার
পরস্পর-বিরোধিতা । তাই বৈতল দুখুর কথার চিমটি ঝেড়ে বীরবিক্রমে আপদের দিকে তাকায়
। বলে,

--- মরি গেলে নে বেটা যেলা আউগ্‌গাইছলে ।

--- ছাড়ি দিলে কেনে তে ।

--- না ছাড়লে তর অউ ইমামে কইত হালাল কর, এক ছেদে মারিছ না । ইতা না হিতার
ঝগড়ার মাঝে অলগর্দা ইগুয়ে আমরারেউ ডংশি লাইলনে ।

--- ঠিক অউ করচ্ছ । আলদ ইগুও ডরাইছিল । আমরার কিতা আমরা তো কুন্‌খানো জাগা
পাইলিমু । পানি বাড়লে গরমেন্ট ইস্কুল, টাউন মাদ্রাসা নায় নর্মাল ইস্কুলো জাগা পাইমু । তারা
কই যাইত । ঠিক অউ অইছে মরারে মারিয়া লাভ নাই ।

--- অই মরা কিগুরে কছ । ইতা কুনু সময় মরে না । খালি মারে ।

--- তে ছাড়ি দিলে কেনে ।

--- ইতা তুই বুঝতে নায় । দাত ভাগি দিছি । বিষদাত গেলে ইগু আর সাপ থাকল নি । ইগুর হালত পাকিস্তানোর হিন্দুর লাখান । লেংটি খুলি গেছে, ইদিকে খালি বেটাগিরি । সুভাষ বোস আইয়া দুই বাংলা এক করবা ।

--- অই হালার হালা । সাপ মারচছ না বালা করচছ, অখন ইতা কাবিলাতি ঝাড়রে কেনে ।
তর কথাত নি চলত দেশ । তুইন অইলে রিফুজি, তর কুনটা হাচা কুনটা মিছা, কেমনে বুঝতাম । তুইন একবার কছ বাবন, একবার কছ মাইমল, অখন কইরে তুই বেজ । বাদিয়ার লাখান সাপ নাচানি শিখলে কানো ।

--- তর বাপর কাছ থাকি । এক লাথ মারমু গুওরর জনা ।

বৈতলের বিচারশালার জবাব যে এত তড়িঘড়ি হবে কেউ ভাবেনি । মুখের কথা বেরোতে না বেরোতেই বৈতল সত্যি সত্যি লাথি মারে দুখুর পেছনে । বৈতলের হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়ার হতভম্ব বছই আর আপদ । অপ্রস্তুত দুখুও আচমকা আক্রমণে লাটুর মতো গিয়ে ছিটকে পড়ে বাঁধের উল্টোদিকে । যেখানে বৃষ্টির জলের শেষ সীমানা । দুখুও কম শক্তিদর নয় । জল আর স্থলসীমার এক বিপরীত কোণে দাঁড়িয়ে সে বৈতলকে দেখে । চোখে তার আগুন । লুঙিতে গিঁট দেয় নতুন করে, দুপায়ের ভিতর ঢুকিয়ে কষে দেয় টান । দেয় হায়দরি হাঁক । অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে উঠে আসে বৈতলের কাছে । বৈতলের চোখে চোখ রাখে । চোখ সরিয়ে নেয় । দুখুর ওঠানো হাত থেমে থাকে । কাকে মারবে দুখু । এ যেন ঘোর লাগা এক মানুষ । এক অচেনা মানুষ, কিন্তু মিথ্যে নয় । অতি পরিচিত । দুখু বৈতলের অজানা দুঃখ সহ্য করে । পাল্টা মারের ওঠানো হাত দিয়ে এক ধাক্কা মারে সজোরে । সরে আসে । বৈতলও গিয়ে বসে নদীমুখে কালভার্টের উপর । নদীর দিকে তাকায়, নদীকে প্রশ্ন করে কিছু । নদী তো উপলক্ষ । আসলে বৈতল দুখুকে চায় । দুখুর মধ্যে বৈতল লুলাকে খোঁজে । একা, আপনমনে পাশে এক কল্পনার দুখুকে বসিয়ে তার কাঁধে হাত দেয় । বলে,

--- আইচ্ছা দোস্তু ক চাইন, তোরে কেনে মারলাম । তুই তো আমার প্রাণর বন্ধু । তোরে দোস্তু
নায় নি আমি । আমি কিতা বেটি পাগল অই গেছলাম নি রে । দুর্গার লাগি নি । কী জানি
কিতা ।

ভরা নদী আর তার অছল তছল জলের ডাকাডাকিতে বৈতলের বিভ্রম হয় । মনে পড়ে
কৈশোর সহচরকে । মনে পড়ে স্বদেশ । দুখুর উপর অভিমান হয়, কেন তাকে অবিশ্বাস করে
দুখু ।

দুখু বৈতলকে বুঝিয়ে দেয় শুধু গায়ের জোরে শক্তির নয় । মনও আছে তার । দুখুই
শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দেয় । আপদকে তাড়া দেয় । বলে,

--- নে ইতা ছাড়, অখন বার কর তোরে মাল । সাপ ঘুরাইতে ঘুরাইতে তো হিঙয়ে হাইঞ্জা
লামাই লিলো ।

সত্যি মেঘ বৃষ্টিতে অন্ধকার সন্ধ্যা নামে । তাড়াতাড়িই নামে । বৃষ্টিরও থামার নাম নেই,
আকাশ কালো ও ঘুটঘুটে হয়ে আসে । চারপাশে মুখ গোমড়া ঘোলাজলের মাঝখানে কালো
রঙের চারজন লুঙিপরা মানুষকে ভূতের মতো লাগে । সিমেন্ট বেদির একদিকে নদীর সঙ্গে
কথা বলে বৈতল । অন্যদিকে দুখুর নেত্রে নেশার প্রস্রুতি । ওরা কেউ কালভাটে বসে না,
বসে আপদ আলির লাল রঙের গামছা । গামছা বাঁধা পুঁটুলি । বৃষ্টির ঝামঝামিতে পুঁটুলি ভেজে
। আপদ আবার উঠিয়ে নেয় তার প্রাণের ধন । আবার পেটের নিচে চালান দেয় । দুখু ধমক
দেয় । বলে,

--- অই বেটা, কইলাম নু ধনুরাশি হইয়া থাক । ভিজত নায় ।

আপদ দুখুর কথামতো ধনুর মতো পিঠ বেঁকিয়ে থাকে । বহুই মিয়া বাঁকা জায়গার
শূন্যস্থান পূর্ণ করে । আপদের পেটের নিচে ঢুকে যায় । জলের হাত থেকে বাঁচে পেটিকা ।
কিন্তু বৈতলের মান তখনও ভাঙেনি । দুখু আবার রাগে । বলে,

--- অই বচই । তুইতো লাম্পাও গাটীও ইগুর পেটো থাকতে পারতে নায় । নেশাখোর হিঙরে
ক আইয়া বানাইত । নাইলে ইবার আমিউ লাথ মারি ফালাই দিমু গাঙ্গো ।

ধমক খেয়ে ওস্তাদ তখন সুরসুরিয়ে নামে আসরে । দুখুকে সরিয়ে দেয় একপাশে ।
বলে,

--- সর সর রাড়ি বাটি । ইতা তোর কাম নায় ।

বৈতল ঢুকে যায় আপদের বাঁকানো শরীরের বাঁকে । নিপুণ প্রক্রিয়ায় আপদের গামছার
গিঁট খোলে । বহুই খোলে দ্বিতীয় গিঁট । তৃতীয় গিঁট খুলতেই বেরোয় গুপ্তধন । ক্যাপস্টান
সিগারেটের কৌটো । পরিচিত ঘটনার দৃশ্য চার জোড়া চোখে । আপদের কোমরকশি থেকে
বেরোয় গাঁজার চিলিম । বৈতল দুখুকে ডাকে,

--- নে ধর ।

দুখু ধরে পোড়ামাটির কঙ্কে, বহুই দেয় এক টুকরো ন্যাতা । কারো লুঙির ছেঁড়া টুকরো
। দুখু চিলিমের নিচে জড়িয়ে দেয় । সিগারেটের টিন থেকে বেরোয় চিলিমের গুলি । বৈতল
এবার আসল কাজের জন্য দুখুর হাত থেকে কেড়ে নেয় চিলিম । দীর্ঘাঙ্গ আপদের নুয়ে পড়া
পেটে থাবড়া মেরে বলে,

--- বাক্লাউতো বেটা ঘাসকাটা কাটিয়া আনচ্ছ । জল দেওন লাগত নায় । এমনেউ ভেতলা
অই রইছে । শলই জ্বলব তো ।

--- জ্বলব জ্বলব । সব নিচে রাখছি শলই, ভিজাত নায় । ঘোড়ার মাথা এমনেউ নষ্ট হয় না ।

--- আর কইছনা তোর ঘোড়ার মাথা । আপদ ভাই যদি একটু আগে আইতে, দেখলে নে
ঘোড়ার ফালাফালি । বিড়ি ধরাইত না পারিয়া হেশে শলইরে কয় বেইমান ।

দুখুর তেড়া বেঁকা কথা উপেক্ষা করে বৈতল । এবার তার পালা । সে এখন আগুন
জ্বালাতে ব্যস্ত । একবারেই কাঠি ফড়ফড়িয়ে উড়তে থাকে ফুলকি । জ্বলেছে, ফুটেছে গাঁজার
ফুল । ঘুরছে এ হাত থেকে ওহাত । মৌতাতে মজে যায় তিন বন্ধু । বৈতল গান ধরে
শিবনাথের,

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা

বম বম বাজে গাল ।

এক এক টানে শেষে তিনবন্ধু মিলে বৈতলের প্ররোচনায় দুখুর কানে গিয়ে হাঁক দেয়
'শিবো হে' ।

বন্ধুদের কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে দুখুর মুচকি হাসি বড় হয় । বৈতলও দুখুর থুতনি
নেড়ে দেয় । বলে,

--- দেখো দেখো, শিব ঠাকুরে গাইঞ্জা খাইন আর বলদবেটার নেশা হয় । বাড়ি বেটা ইগুয়ে
উণ্ডায় দেখো, হালার হালা শয়তানর লাড়ি । দে না এক টান, এক টানে কিচ্ছু অইত নায় ।

এক অদৃশ্য ভেক্‌বিজিতে তখন চরাচর থেকে মেঘ উধাও, বৃষ্টি উধাও, ছলছলাৎ জলও
উধাও । চার বন্ধুর প্রাণে শুধু আনন্দ । বৈতলের প্রাণে আনন্দ এলে গুরু সৃষ্টি ধরকে মনে
পড়ে । জৈন্তিয়া পাহাড়ে গিয়ে নেশা করেন গুরু । দেশি মদ খেয়ে বিভোর হয়ে তার পাঁচ
কন্যাই দান করে দেন বৈতলকে । বৈতলেরও চোখ ঢুলুঢুলু । খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে
গুরু আনন্দের ব্যাখ্যা দেন । বলেন,

--- বুঝালায় নিবা, গরিবর আনন্দ উৎসবো কুনু চান্দোয়া টাঙানি লাগে না । দুই পয়সার নেশা
দিলাও হে এক বছরর লাগি খুশ । কাইল থাকি আবার রান্দা টানমু । কিন্তু আইজ তো আনন্দ
।

গুরুবাক্য শিরোধার্য করে বৈতল দুখুকে বলে,

--- দে নাবে একটান । আইচ্ছা কাম নাই টানাটানি করিয়া । তোর অউ হাসি খান অউ
থাকউক । হাসিত অউ আনন্দ রে বেআক্লল । তুই খামোকা খামোকা তিনবার বেআক্ললর হাসি
হাসিয়া দেখাছ না । নে তোর অউ হাসির লাগিয়াউ ফরমান উঠাই নিলাম । যা, আর তোরে
জলো ডুবাইয়া মারতাম নায়রে হালা ।

ওরা শালা ছাড়া পরস্পরকে দেওয়ার মতো গালিও খুঁজে পায় না । দুতিন বার চারবার
দম দেওয়ার পর নেশাকে আটকে রাখতে ওরা ধোঁয়া বেরোতে দেয় না একটুও । দমবন্ধ হয়ে
থাকে যতক্ষণ পারে । এবং এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় হজম করে ফেলা ধোঁয়া বেরোতে থাকে কান
দিয়ে নাক দিয়ে কিছু চোখ দিয়ে । লাল হয়ে যায় চোখ । লাশছাড়া অবস্থা হতেই কাজ গুরু
হয় দুখু মিয়ার । কলকে ন্যাকড়া ধুয়ে নেয় বন্যার জলে । সিগারেটের টিনে সব গুছিয়ে রাখে

। কক্কে বেঁধে দেয় আপদের কশিতে । বৈতল সব দেখে । গোছগাছ হয়ে গেলে গতর ভাঙে ।
বলে,

--- এর লাগিউ তোরে লাগে । তুই বেটা পাক্কা পিরর চেলা । তুই মজিদো থাকলেও ভালা
ইমামতি করতে পারলে নে ।

দুখু মিয়ার হাসি চওড়া থেকে চওড়া হয় । বলে,

--- আমি ইমাম অইলে তরে পয়লা মুসলমান বানাইমু ।

--- আমি অই যাইমু, অই যাইমু মুসলমান । দেখিছ তুই । আমার খালি একখান কাম বাকি রে
দুখু । ই ধুড়া সাপ দুইটায় বুঝত নায় কিছু । তুই পারবে ।

--- কিতা পারমু । আমি কিছু পারতাম নায় । তুইনতো হলা আমারে পানিত মারতে । মার ।

--- না বেটা, তোরে নায় তোরে নায় । তুই তো আমার দোস্ত । জান বাচাইচ্ছ ।

--- অই তুই আমারে ধুড়া সাপ কইলে ।

--- কইলে ।

একযোগে প্রতিবাদে দুই নেশাখোর জেগে ওঠে জলের অতল থেকে । বলে আবার,

--- যা তোরে আর ইখান থাকি লইয়া যাইতাম নায় । আমরা তিনজনে তোরে পানিত
ফালাইদিমু । আর অউ আলদ যেগুরে ফালাইচ্ছ, হিগুরে আইয়া খাইব তোরে । তারা সব চিনি
রাখে । ফুশ করি মারব এক কামড় । আর কইতে নি ধুড়া ।

--- অ বুঝছি, তিনজনে মিলিয়া বুদ্ধি করচ্ছ । হিন্দু ইগুরে মারিলাইতে । মার ।

--- অয় মারমু । এগু অইলেও তো কমল ।

--- মারিছ না বেটা । কমত নায়, বাড়ব । আমিও বাঙাল অই যাইয়ার ।

চার বন্ধুতে এবার হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ে লেপ্টে যায় । তিনজনের নেশায়
অন্যজনও গ্রস্ত হয় । শরীরের উত্তাপে বন্ধুত্ব গরম হয় ।

এগারো

বজরি দাস বাপের বন্ধু আর লুলা বেজ বৈতলের বন্ধু । দুজনেরই মৃত্যু অপঘাতে ।
প্রথম জনকে চেনে বৈতল, দেখনি, তার জন্মের আগেই ঘটে গেছে অঘটন । বাপ মেরেছে গলা
টিপে । আর লুলা তো বৈতলের প্রাণের বন্ধু, রুল আমিন বেজ । বৈতলের বাপ বলে,
--- পাপে বাপরেও ছাড়ে না । হিণ্ডয়ে পাপ করছিল, তোর মারে দেখত হালার হালায় ।
লুকাইয়া না সন্নি দেখত । এর লাগি মারি ফালাই দিছি ।

কেউ বুঝতে পারেনি । প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে তখন সুনামগঞ্জ মহকুমা । হাজারে
হাজারে মানুষ মরছে সিলেট জেলায় । এর মধ্যে এক বজরি দাসকে জলে মারে না মানুষে
মারে সে- খবর কে রাখে ।

লুলাও দুর্গাবতীকে দেখে, হাত দেয় । তাই পিয়াইনএর জলে জলসমাধি হয় লুলার । এক
দিকে বন্যা, একদিকে দেশভাগ আর রায়টের রেশ । এক গ্রাম্য কবি গায়কের মৃত্যু নিয়ে
তোলপাড় তোলার অভিযোগ জানানোর মুক্ত সময় কি পেয়েছে এনায়েতপুরের খণ্ড মানুষেরা ।
বৈতল এখনও জানে না ।

বৈতলের মাও যে কৈবর্ত বাড়ির সুন্দরী বৌ । বৈতলকেও চায়ের মতো করে গড়েছে
কারিগর, দুধ দিতে ভুলে গেছে । বৈতলের ঘরেও দুর্গাবতী আগুনবরণ রূপসী । আগুনে আঁচ
নিতে চায় দুই সময়ের দুই পরপুরুষ । জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া হয় তাদের ।
বিশ্বাসভঙ্গ হয় । বন্ধুত্বের শর্তভঙ্গ হয় । বৈতল জানে না বন্ধুত্ব কারে কয় । জলের সঙ্গে লড়াই
করে করে শুধু লড়াইতেই শিখেছে, মিত্রতা জানে না কারে কয় । বৈতল জানে লুলা একটাই হয়,
প্রাণের মানুষ বন্ধু দুটো হয় না । বৈতলের জন্য সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে , বৈতলের মাকে মা
ডেকেছে । বৈতলের অনুপস্থিতিতে, মায়ের অন্তিম সংস্কার লুলাই করেছে, সুরমার জলে
ভাসিয়েছে মায়ের নীল হয়ে যাওয়া দেহ । সর্পদংশনে মৃত মায়ের শরীর জলে ভাসিয়েছে বলেই

বৈতল এখনও শুধু নদীর পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ায় । বর্ষার নদীতে কলার ভোরা ভাসতে দেখে এখনও বৈতলের মন ছাঁৎ করে ওঠে । লুলা বৈতলকে সান্ত্বনা দেয় । বলে,

--- দেখিছ, একদিন এইন আবার জি উঠবা । তাইন তো বেটা আমার মা ।

সেই বন্ধুকে সে মারে এক অপরিচিত নারীর ইজ্জত রক্ষায় । তার বাপ মারে বৌএর ইজ্জত রক্ষায় । মালিরভিটা কালিবাড়িত দেখেছে বৈতল কয়েকদিন, কথা হয়নি । লুলা যদি হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করতে চায়, বৈতল কেন হিন্দুর ধর্মরক্ষা করবে । এক অপরাধেই কি দুজন অপরাধী নয়, তবে কেন শাস্তি হয় শুধু লুলার ।

বন্ধু ছাড়া ইয়ার ছাড়া বৈতল থাকতে পারে না । এদেশে এসেও যোগাড় করেছে ছালচামড়াহীন কয়েকটা । একেবারে নিজের মাপে । এখানে হয়েছে তিনজন । দুখু বহুই আর আপদ । শেষ দুটো নিয়ে ভাবে না বৈতল, ওরা নামেই দোস্ত, আসলে ওরা দুখু আর বৈতলের ছায়া । আলাদা অস্তিত্ব নেই । যেমন আছে দুখুর । তাই দুখুকে চোখে চোখে রাখে বৈতল । দুখুর চরিত্রের খুঁত খুঁজে বেড়ায় বৈতল । খুঁত যার যত কম সে তত বড় । বেঁটে মানুষটাকে বড় দেখতে সুখ বৈতলের । বৈতল নিজের মাপে সাজায় দুখুকে । মন খারাপও করে বৈতল, লুলাকে নিয়ে তার অসুবিধা হয় নি । প্রায় শৈশবের বন্ধু তো, মাপ নিয়ে ভাবে নি । মা যা খেতে দিয়েছে, খেয়েছে । খিচুড়ি লাবড়া মন্দিরে খেয়েছে মসজিদের মুসাফিরখানায় গরুর গোস্তও খেয়েছে । আলাদা কিছু ভাবেনি । কিন্তু এদেশের বাঙাল অন্যরকম, নিরামিষ খায় না । আদা রসুন আর পিঁয়াজ গন্ধ ভুরভুর না করলে খায় না । দিনে একবার আমিরিয়া হোটেলের এক বাটি মাংস চাই । বৈতলের কোনও বাছবিচার নেই । পাঁঠা খাসিও খায়, গরুও খায় । বলি দেওয়া খায়, আড়াই পোঁচ-এরও খায় । দুখুকে বলে,

--- মরার পরে ইণ্ডিয়ে জিগার নি কেমনে মারলায় । আর বেটা চাইরপা আলা চকি টুল ইতা আমি খাই না, এছাড়া চাইঠেংর সব খাই । ছাগি আর গরু ইতা হক্কল তাউ এখতা । একদিন এক সায়েবে সরসপুরর বাঘ মারিয়া ছাল ছাড়াইছলা বান্দোর ধারো, তালগাছর তলে । অলা ভালো থকথকা মাংস রে দুখু কিতা কইতাম । বাঘর মাংস বুলে তিতা । হাচা নি বে ।

--- তেউ কিতা খাইলে নি বাঘর গোস্তর দাওয়ত । তুইন তো নাগাপটি গিয়া মেথর হকলর লগে কুত্তাও খাছ ।

--- হিস, দুখু ইগুর কুনু ঘিনাপিত্তা নাই । হে খায় এর লাগিয়া হক্কলরে কয় । তোর বাপ
আছিল নাগাপত্তির মেথর হালার হালা । শুওরর জনা ।

ওর বাপের নামে গালাগালি দিয়ে কখনও হাসে, কখনও রাগে । দুখু সবসময় রাগে না,
বৈতলের নাকের ডগার রাগ দেখে হাসে । বৈতলও দুখুকে রাগিয়ে দেওয়ার খেলা খেলে ।
বলে,

--- আইচ্ছা রে দুখু ভাই । তুই যদি শুওর খাছ, কেমনে খাইবে । কল্লা লামাই খাইবে । না
ঘেচ ঘুচ করি পেছ মারবে ।

দুখু নয় শুধু, ওরা তিনজনই রাগে । বলে,

--- হক্কলতা লইয়া ফাতরামি করিছ না বেটা ।

--- আইচ্ছা আইচ্ছা করতাম নায যা । পাপ অই গেছে, মাফ করি দে । মাতে কিতা হয় ক
চাইন । তে ত মাতঅউ বন্ধ করি দেওন লাগব । আমরা তো বন্ধু । যেতা ইচ্ছা মাততাম পারি,
পারি না নি ।

--- পারছ পারছ, দিল ছাপ থাকলে হক্কলতা মাতা যায় ।

--- কইরে তো ।

--- এ, জিলকাইরে কেনে ।

--- আমিও কইছি জানছ নি ।

--- কিতা কইচছ । কারে কইচছ ।

--- দুর্গারে কইছি ।

--- তুইন হালা তসলার তলর মাটি আর ঈ লিলির গয়নার লাখান বৌ পাইলে কেমনে ।

--- আমার মা বেটা দুর্গা থাকিও সুন্দর আছলা ।

--- হক্কলর মাউ সুন্দর থাকইন । তোর একলার নায ।

--- মাতন যায় না কিচ্ছু তর লগে । বাদ দে, বাদ দে । কুণু বাঙাল বাড়ির বৌ আমরার লাখান
নায় ।

--- হিন্দু হকলর ই এক গুমগুমি । তারার হক্কলতা ভাল। মাও ভাল। কিতা ভাবছ বে,
বাঙাল হকল কিতা পাড়ার তলর বেঙনি । তোর হক্কলতাউ ভাল, গুও ভাল। এর লাগিউ
অইছে পাকিস্তান ।

--- আইছা বা বাড়িবেটা, ইতা মাত বাদদেও । হুনবে নি আমার একখান কথা ।

--- কওরেবা বাদিয়ার বেটা । তোমার পরস্তাব আরম্ভ কর । কিতা কইলা তুমার জমিন্দারে ।
কছ না বে ।

--- আমি বাদিয়া উদিয়া নায় । বাদিয়া আছিল...। থাক অউক । আমি অইলাম মাইমল ।
মাইমল নায়, আমরা কৈবর্ত । আমরাে রাজা বানাইবা কইছলা যোগেন মণ্ডলে । তাইন
শিমূলঘর পর্যন্ত আইছলা, হবিগঞ্জর গাউ । কইলা জমিদারর জমিদারি চলত নায়, আমরােও
জমিন দেওন লাগব, পানির ভাগ দেওন লাগব । মন্দিরো যে ঢুকতে দিলো না হিতা নিয়া বেশি
মাতলা না । তে কিতা পাটনি কৈবর্তের কুণু জাত নাইনি, ধর্ম নাইনি । যোগেন মণ্ডলে কিতা
করলা আমরা লাগি, মন্ত্রী অইলা পাকিস্তানো । খেদা খাইয়া আইলা ইন্ডিয়াত, মন্ত্রী অইলা
আবার, গেলা । অখন তো দিল্লিত বাবু একজন মন্ত্রী অইছইন । রিফুজি মন্ত্রীর লগে সবে ফটো
উঠাইন । তাইনওতো এক বাঙাল । কইলো রিফুজির লাগি কলেজ বানাই দিব । রিফুজি এ
কলেজে দিয়া কিতা করত । মুলো নাই ঘর, আর পুবেদি দুয়ার । পুন্দো নাই চাম, রাধাকৃষ্ণ
নাম । আমরা ই জমিদার ইগুও তালর গুড় । এমনে হিন্দু হিন্দু করিয়া নাম জপ করে আর
মিনিস্টারর লগে হাত মিলায় গিয়া সার্কিট হাউসো । কলেজর লাগি জমিন বেচত । ইতা বুঝে
না নি মাইনষে । আর বেটা বাড়ি তুই কইরে জমিদারর মাত মাতমু আমি । ইগুর মুখো আমি
মুতি ।

--- দেখিছ ছিটকাইয়া আইয়া পড়বো তর উপরেউ । অখন ক তুইন কিতা করতে ।

--- আমার বৌর কথা কইয়ার আরি ।

--- তর বৌ এ আমরা লগে মাতে না । অত কিতা ফুটানি ।

--- ফুটানি অলইদর । বাবন বাড়ির পুড়ির ইতা থাকে । লগে কাচা অলইদর রঙ । আমার লগেউ কম মুশন মারে নি ।

--- তর মাত উত বেটা কিচ্ছু বুঝি না । তুইন কিতা, তুইন বাবন কইবর্ত মাইমল না বাদিয়া তুই হাচারির কিতা ক ।

--- আমি বাবন । সৃষ্টিধর শর্মা অইল আমার ভাল নাম । মাইনষে গাইল্লাইয়া ডাকে বৈতল ।

--- তুইন যখন সাদা রঙর বেটিনতর কুর্তা পিন্ধিয়া ছাতির লাখান কমর ঘুরাইয়া নাচছ তখন তরে হাচারির গুর্মি লাগে ।

--- আমি গুর্মি অইলে তুই কিতা । তুইও গুর্মি । কিতা করচছ তুই বেটাগিরি । যাইতে পারচছ নি পাকিস্তানো । ইখানো সবুজ এক টুকরা তেনা লইয়া ফালাফালি । ই চান্দ তেরায় তরে রাজা করব নি । পাকিস্তানে আর হিন্দুস্থানে তোর কিতা । অউ মেহেরপুরো যে অত মানুষ ছাগি ভেড়ার লাখান পড়ি রইছে তারার লাগি কিগুয়ে কিতা করেব । নেহেরুয়ে নি কিচ্ছু কররা না লিয়াকত আলিয়ে কররা, তারা খালি চুক্তি করইন, আর পুলিশর পেট ভরাইন । ইখানো রাজা আইয়া কইয়া গেলা কলেজ করি দিবা, তেউ খুশি । আনন্দর আর সীমা নাই । চাষীরে জমি দেও, মাইমল কৈবর্তরে পানি দেও, তেউ না মানমু রাজা । মানমু জমিদার । হাচা কথা কইলেউ লাইন ঘুরাই দেয় । মজিদো ফালাই দেয় শুওরর মাংস, মন্দিরো গরুর মাথা । অউত্ত আডুয়া গুর্মির বেটাগিরি । এগুয়ে কয় লাঠির বাড়িয়ে পাকিস্তান বানাইব, এগুয়ে কয় নেতাজি আইবা সব এক অইব । আমি বুজি লাইছি । আমি ভাগমু ।

--- কই ভাগতে । পাকিস্তানো নি । তোর বইয়াখাউরি ।

--- থু, বৈতল ছেপ ফালাইয়া ছেপ চাটে না । আর নায় ।

--- তে, কই ভাগতে ।

--- কই আর ভাগতাম ।

বইয়াখাউরি ছাড়া বৈতলের যাওয়ার জায়গা নেই । দিনে একবার হলেও যে ঘুরে আসে তার জলাভূমি জন্মভূমি । বড় হাওরের জলে অবগাহন না হলে বৈতল পাগল হয়ে যায় । বৈতল যায় মিরতিঙ্গার পাহাড়ে । চলে যায় চুন কামলা হয়ে ছাতক পাহাড়ে । রইদপুয়ানিতে

কালো রঙের মেঘের সুন্দরকে দেখে আসে । দেখে আসে তার পেচকুন্দা পাখিকে । এক এক দিন সারারাত ধরে ঘুরে বেড়ায় । বিছানায় শুয়েও ঘুম আসে না । কিছুতেই চায়না সুন্দরীর কালোবরণ মুখখানা মনে করতে পারে না । মাচানে বসে চুল টেনে মনে করার চেষ্টা করে । বাইরে পুকুরপারে দেখে ফকফকা জ্যোৎস্না । বৈতল জীবনের এক বিস্ময় এসে মাঝরাতের অন্ধকারে তার গায়ে হেলান দেয় । পরীর দেশের সুন্দরী দুর্গাবতী বলে,

--- কও কিতা অইছে ।

বৈতল নিজের রমণীকে কাছে টানে । বলে,

--- যাইতাম পারতাম নায় আর । কও ।

--- কেনে পারতায় নায় । অখন মানুষ যায় সুতারকান্দি বর্ডার পার অইয়া ।

--- কিতানু কয়, পাশপুট লাগব ।

--- তে আর বাদ দেও । ইনো আর খারাপ কিতা আমরা ।

--- কিন্তু আমি যে সবরে ভুলি যাইয়ার । কেউর মুখ মনো করতাম পারিয়ার না ।

--- আইজ আবার কারে পাউরি গেলায় ।

--- পেচকুন্দা এগুর মুখ মনো করতাম পারলাম না হারা রাইত ।

--- পেচকুন্দা কে ।

বৈতল রহস্য করে । বলে,

--- আছে এগু । তুমি কিতা দেখছ না নি টেলিগ্রাফর তারো লেইঞ্জও লটকাইয়া বই থাকইন ।

উপরে নিচে নাচইন খালি । মনো অয় পড়ি যাইবা পড়ইন না । কী কালো রঙ ।

দুর্গাবতী ত কোনও বোকা রমণী নয় । সব বোঝে, বোঝে বলেই অন্য কথায় যায় । বলে,

--- তোমার পেট গরম অইছে । আরো খাও গুটকি পুড়া । পুটকি পুড়া ঝাল দিও, কী কথার ছিরি । অখন বুঝো ঠেলা । হুউ বেড়ার গাত আছে কুমারর চাক, ভাঙ্গিয়া আনো দেখি, পেটো লেপি দেই । ঠাণ্ডা লাগব ।

দুর্গাবতীর সব ঘরোয়া চিকিৎসাই শরীর জড়ানো । তাই বৈতল কাবু হয় । বলে,

--- দেও তে দেখি । নাইলে তো কইবায় মূর্তজা ডাকতরর কাছে যাওয়ার কথা ।

দুর্গাবতীর দেওয়া মাটির প্রলেপ উচাটন মন শান্ত হয় । ফিরে আসে নতুন স্বদেশে ।
বৈতল আবার বৈতল হয় । না, আর ফিরে যাওয়া নয় । জন্মভিটার জন্য মনটা টনটন করলে
দুর্গাবতীকে বলবে পেটগরমের প্রলেপ দিতে । লুলার হাতছানির হাতটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়
পিয়াইনের জলে । বলে,

--- যা বেটা । তুই থাকলেও নায গেলামনে একবার । হিনো আমার আর কেউ নাই । কিচ্ছু
নাই ।

কুমোর পোকার ঘর ভেঙে বৈতলের পেটে প্রলেপ দিতে দিতে দুর্গাবতী সব শোনে । বলে,

--- কিতা নাই তুমার ।

--- কেউ নাই । আমি একলা ।

--- আমরাও নাই নি । আমি । তুমার পুড়ি ।

--- ছি ছি, কিতা কওনানি তুমি । তুমরা আছো এর লাগি অউ বৈতল আছে ।

--- বৈতল কিতা । কইলাম যে অখন তুমার নতুন নাম ।

--- অয় অয় । সৃষ্টিধর উঝা ।

--- উঝা কিতা আবার । তুমি শর্মা ।

--- না, আমি বৈতল । বৈতল বৈতল তিন বৈতল ।

--- অ, আমার কথা তুমি হনতায় কেনে । আমি তো দেশো থাকতেও আছলাম বান্দি, ইখানো
আইয়াও একতা । বেটির কপাল আর বান্দির কপাল, বিধাতায় নি খন্ডাইতা পারইন ।

--- কিতা কিতা যে মাতো । ই কুনু আমার কথা কইলাম নি । ইতা দুখুয়ে বানাইছে । বৈতল
বুলে তিন রকম । বইনর বাড়ি ভাই বৈতল । আমার তো ভইনঅউ নাই । মামার বাড়ি ভাইগ্না
বৈতল, আমার মামার বাড়ি খুব ভালো । মিরতিঙ্গার মামীয়ে খাওয়াইতা কম, কিন্তু মারতা উরতা

না । আর কইছে শ্বশুর বাড়ি জামাই বৈতল, আমার ই কপালও ঠনঠন । আমার হক্কলতাউ
তুমি । তুমি যেলা কইবায় অলাউ চলমু ।

--- ঠিক তো ।

--- ঠিক । তে আমার একখান কথা রাখবায় নি কও ।

--- রাখার অইলে রাখমু নিচ্চয় ।

--- চলো ই জমিদার বাড়ি ছাড়িয়া যাই ।

--- অউ নু কইলায় আর যাইতায় নায় ।

--- না না । বইয়াখাউরির কথা কইয়ার না । চলো না আমরা ঘনিয়ালাবস্তি যাই গিয়া ।

--- ছিস্ । ঘনিয়ালা সব বাঙাল থাকইন ।

--- এ, ইতা কিতা মাতো । বাঙাল কিতা মানুষ নায় নি ।

--- না, তারা পেরত । হাগিয়া ছচে না । মুরগির গুয়ে বাড়ি ভরাই রাখে । লম্বা লম্বা দাড়ি
দেখলেউ আমার ডর লাগে । অউ যে তুমার লগে ঘুরে এগু, আপদ না বিপদ নাম, মুরগি বেচে
ফাটক বাজারো, ই বেটায় তো আবার দাড়ি রাখছে লম্বা, মুচও কামাই লাইছে ।

--- অ, এর লাগি নি । হিগু আপদ নায় বছই । আমিও তো বাঙাল অইমু, দাড়ি রাখমু, কলমা
পড়মু ।

--- তুমার যেতা ইচ্ছা করো, কে না করছে । তুমি দেখিয়ার সব ভুলি গেছ ।

--- কিতা ভুলতাম । বৈতলে কিচ্ছু ভুলে না । হিখান থাকি তো ভাগিয়া আইছি । ইখান থাকি
কেমনে ভাগতাম । নাইলে এক উপায় আছে, তুমার অউ যম জমিদাররে মারিয়া জেলো
যাইতাম ।

--- কেনে, তাইন তুমারে কিতা করছইন । তুমারে ঘর দিবা কইছইন, তুমার পুড়ির নামে
জমিন লেখি দিবা কইছইন । আর কিতা চাই ।

--- কিতা চাই, ইগুয়ে ইতা দিতো কেনে । ইতা আমার লাগে না । আমি তুমারে চাই ।

--- অউ আরম্ভ হইল তান কবিগিরি । ঘুমাও অখন । পেট ঠাণ্ডা অইছে ।

পেট ঠাণ্ডা হলেও মনের অশান্তি কমে না বৈতলের । বৈতল পরদিন আর ঘরের বাইরে যায় না । দুর্গাবতীকে বলে,

--- পেটো কামড়ার ।

রাতের বেলার স্নেহময়ী দুর্গার সঙ্গে দিনের দুর্গা মেলে না । দুর্গার এখন শুধু কাজের তাড়া । মন্দিরের কাজের সঙ্গে জুড়েছে জমিদার বাড়ির রান্নার কাজও । নিজের ঘরদোর স্বামী সন্তান পড়ে থাকে । দুর্গাবতী যায় যম জমিদারের হাঁড়ি ঠেলতে । সারাদিন খাটুনির পর কী জোটে দুর্গাবতীর । মাস পুরতে আরো দশ টাকা । জমিদারের স্ত্রী এটা ওটা দিতে চায়, দুর্গাবতী আনে না বৈতলের ভয়ে । কিছুই যখন নেয় না দুটো টাকা বেশি দিতে পারে, দেয় না । কথায় আছে ‘অমৃতর মার মুখখানি মিঠা, হারাদিন কাম করাইয়া আধখান পিঠা’ । বৈতল ঘরে বসে দুর্গাবতীর খাটাখাটুনি দেখে । দুর্গাবতীর মতিগতি ভাল না লাগলেও মুখে কিছু বলে না । তবে জমিদারের প্রতি তার রাগ আক্রোশের কথা একবার শুনিয়ে দেয় । বলে মানুষটা চরিত্রহীন । বলে সে মানুষের শত্রু । বৈতল তাকে ছাড়বে না । দুর্গাবতীকে বলে এমন অনেক দশ টাকা সে রোজগার করতে পারবে । নতুন এক দালান বাড়ি হচ্ছে নদীর পারে, তিনতলা বাড়ি, ওখানে জুটে যাবে কাজ । চা বাগানের মালিক, কালো রঙের মোটর গাড়ি চড়ে কাজ দেখতে আসে ধুতি পরা মানুষ । এত সুন্দর রাশভারি ভদ্রলোকের নাম ভুতু চৌধুরী । আদি বাড়ি সিলেটের ধর্মদা । তারাপুর গেলেও রান্নার কাজ জুটে যাবে, সতী দেব মন্ত্রীর বিশাল বাড়ি ব্যবসা । বৈতল তার বুদ্ধি খাটিয়ে ঢুকে যাবে । পদ্ম বিলের রজনী শার বাড়ি এক মাথায়, যাবে না বৈতল । অম্বিকাপাট্টি জেল রোড ঝালুপাড়ায় বড় মানুষ কোথায় । সবই মাঝারি । বড়লোক বাড়ি কাজ করে দুর্গাবতীর মেজাজ হয়েছে, যাবে না মাঝারি বাড়ি । আর বৈতলও দুর্গাবতীকে কিছুতেই জোর করে না । রাগে, কিন্তু হাসিমুখে মেনেও নেয় বৌর কথা । ছড়াও কাটে বলে,

--- ‘বেটিনতর এক রগ তেড়া ভেড়া

কইবা আদায় না করি ছাড়ত নায় ।’

--- অয় । চিনছ তো । মানিয়া চলিও ।

--- আমারও কথা মানন লাগব কিন্তু ।

--- কুন কথা মানছি না কও ।

এবার যেন বাগে পায় বৈতল তার আদরের বৌকে । বলে,

--- তুমি কিতা বালিগড়া মাছ নি ।

--- কেনে ।

--- একবারেউ জির গিলি লাইলায় । বরি কিন্তু কইলাম আটকি গেছে গলাত । তুমি কইছ আমার কথা মানবায় । তে চল যাই ঘনিয়ালাত ।

--- না যাইতাম নায় ।

--- দেখো, ইখানো কেনে থাকতাম কও চাইন । কে আছে ইখানো আমরার । ই এক জেলখানা, ঘর একখান দিছে যেন কিনি লাইছে । বৈতলরে কিনা অতো সহজ নায় কই দিলাম । তুমার যমে পারত নায় ।

বৈতলের মনে আবার ছায়া পড়ে । বৈতল না শুনতে পারে না, আবার দুর্গাবতীর ইচ্ছার বিরোধিতাও করতে পারে না । বৈতলের আর ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না । বন্ধুদের কথা মনে পড়ে । দুখুর সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে একবার ঝগড়া না করলে কিসের শান্তি । দিনে মুরগিওলা রাতে সিঁদকাটা চোর বহুই এর মতো নির্বিবাদী মানুষ দুটো দেখে নি বৈতল । রাজমিস্ত্রির যোগালি আপদের মতো মিচকে শয়তানও দুটো নেই । কথার ঠিক নেই, কেউ বিশ্বাস করে না বলেই নাম আপদ । দুখুর চেলা, বৈতলকেও ভয় পায় । দুখুর শয়তানি তো দুনিয়ার বার । বৌকে মেরে সাধু হয়েছে । রিক্সা চালায় ইচ্ছে হলে, সিঁদকাটার সঙ্গ দেয় কিন্তু লোভ নেই হারামজাদার । দুখু রিক্সা করে মামুকে নিয়ে যায় মানুষের কাছে । দুঃখী মানুষের দাতাকে নিয়েই তাদের সময় কাটে । চার ইয়ারের বন্ধুত্বের সুতো ধরা আছে মামু পিরের তফনের গিঁটে । মামু একহাতে পেটের উপর লুঙির গিঁট ধরে রাখে । অন্যহাতে যখন মারে, তখন মার খাওয়া মানুষের ভাগ্যের দরজা খুলে যায় । সবাই পায় না মার খাওয়ার অধিকার, দুখু প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হলে যেতে পারে মামুর কোমল হাতের নাগালে । দুখু বলে সে খিদমতগার, মানুষের সাহায্য করে । বহুই আপদ মেনে নেয় । বৈতল মানে না । বলে,

--- তে আমরা কিতা ।

--- তুইন কিছু নয় । তুইন কাফের । মুসলমান অইবে নি । তে তোরেউ বানাই দিমু খাদিম
। ক, রাজি নি ।

--- রাজি । তোরে খেদাইয়া পয়লা নম্বর হইতাম পারমু তো ।

এই তো কথা । দুখুর সঙ্গে লড়াই তাকে জিততেই হবে । তাই তো দুর্গাবতী বৌকে
রাজি করাতে এত কাঠ খড় পোড়ায় । বলে,

--- ঘনিয়ালা নাইলে চলো যাই গি হিপারো । দুধপাতিল যাইবায় নি ।

--- না । যাইতাম নয় ।

--- হুনো না । হাইলাকান্দির কন্টেকটার হুসেন হাজিয়ে কইছইন আমারে টেম্পু কিনি দিবা ।
আর রিক্সা উক্সা চালানি লাগত নয় । আর তুমারও অতো খাটাখাটনি লাগত নয় । ঠেঙর
উপরে ঠেঙ উঠাইয়া বিবি বেগম অইয়া থাকবায় হারেমো ।

--- বুঝলাম, তে আক্তা হি বেটায় তুমারে টেম্পু কিনি দিতো কেনে ।

--- এমনে কুনু দিব নি । মুসলমান হওন লাগব ।

--- তুমি কইছো অইবায় !

--- কইছি, কইছি তুমিও অইবায় !

--- এর থাকি গলাত দড়ি দিলাইমু । পাকিস্তানো উ অইলাম না, ইন্ডিয়াত আইয়া নি জাত
গওয়াইতাম । বাবায় কইতা হুনো, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ ।

--- বাদ দেও বেটি তুমার ই সসঙ্গ কিড়িমিড়ি । আমারে বুঝাইয়া কও না বাঙ্গাল অইলে ক্ষতি
কিতা অইব । আমি যেমন তুমার লগে থাকিয়া বাবনামি শিখছি, মামুর লগে থাকিয়া
মুসলমানিও শিখছি । দেখছ নানি আমি কথায় কথায় হয় আল্লা কই ইনসাল্লা কই । নদীর
হিপারো দুধপাতিল মজিদো বহুতে বাঙাল অইছে । জমি জমাও পাইছে । আর মামুর খাদিম
অইয়া তান লগে থাকতাম পারমু সারাজীবন । তাইন তুমার পুড়িরেও ভাল পাইন, খুব খেলইন

। তাইরে পাইলে তাইন আরো বাইচা অই যাইন । আমার আর কিতা লাগে কও, ইবেটা
জমিন্দারর পাড়ার তল থাকি বার অইতাম । মুসলমান ধর্মত জানো নি কুনু ভেদাভেদ নাই ।
বাবন পাটনি নাই । ছোটবড় নাই । সবে সবরে দেখে ।

--- আর কিতা করে । গরুর মাংস খায় । পাচ বেটিরে বিয়া করে, আর করতায় নি । বিয়া
করতে নু ইওর জোর লাগে ।

--- অই বেটি আমারে ছলাইছ না হনতে নি তে মুসলমানে আর কিতা করে । মুসলমান অইলে
ছিনালিগিরি করত পারে না, পাথর মারি শেষ করি দেয় পঞ্চগইতে ।

বৈতলের রাগ চঞ্চল । রাগলে পরে সে মানুষ থাকে না । হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর । কী
থেকে কী বলে ফেলে । এত যে রাগ তার, দুর্গাবতীকে আঁচ পেতে দেয় না । যদিও বা কখনও
ফুঁসে ওঠে, সামলে নেয় তৎক্ষণাৎ । দুর্গাবতী তার পৌরুষ নিয়ে কথা বলায় মাথার ঠিক
রাখতে পারেনি । রাগের মাথায় বদকথা বলে অনুপাত হয় । মাথা নুইয়ে থাকে কিছুক্ষণ ।
ফণা নেমে যায় আপনা আপনি । মন খরাপের কথায় দুর্গাবতীর পায়ের কাছে হাত রাখে ।
বলে,

--- তে জানো নি, শ্রাবণ মাসো বড় কষ্ট হইব । পুঁথি গাইতাম পারতাম নায় । ঢলানির রাইত
কী কষ্ট হয় তুমি জানো না নি । ঢলানির পরে জিয়ানির কী সুখ ।

‘মূলমন্ত্র পাইয়া যদি বিষ নষ্ট হইল

চান্দের সুন্দর লখাই বর্তিয়া উঠিল ।

জিয়াইয়া দিলা পদ্মা চান্দের সুন্দর ।’

কও তুমি অউত্ত আমার মা মনসা । উঝার কষ্ট তো তুমি বুঝো, আনন্দও বুঝো ।
মাঝখানো কত ভাল মানুষ বদ মানুষে বেউলার লগে লাগালাগি করলা, আদরও করলা ।
গাঙের পারোর মাইনষর জয় অইল । বেউলা এক বেটিঅউ, তাই এর লাগি পারছে, অখনকুর
বেটি অইলে অউ মরার হাড়ি লইয়া বই থাকল নে নি । ভাগল নে আর এক বেটার লগে ।
আমি তো ভাবছি ইবার তোরে দিয়া ধামাইল দেওয়াইতাম । ‘সোহাগ চন্দ বদনি’র লগে
নাচাইতাম ।

যতই কেন সোহাগের কথা বলুক, পায়ের কাছে হাত রাখুক, অগ্রদানী ব্রাহ্মণের মেয়েও
অপমানিত হতে জানে না । বলে,

--- থু ।

বন্যার জল বাড়ছে, বাঁধের কোণ ঘেঁষে এপার ওপার । এপারের নদীর জল ওপারের
বৃষ্টির জল জমে জমে সাগর । স্থলভূমির এক আঁকাবাঁকা ক্ষীণ রেখায় শুধু বাঁধের মাটি ।
কালো জল – শেলেটের উপর যেন খড়িমাটির দাগ, যা কেটে দিয়েছে বৈতল কন্যা মণি ।
ঘোলা জল বৈতলের কথার বিলাপ শুনতে শুনতে ততক্ষণে কালো হয়ে গেছে । বিকেল গড়িয়ে
রাতের দিকে এগোচ্ছে । বৃষ্টির ঝামঝামিয়ে বাড়ছে । এক কথক আর তিন শ্রোতা যেন
দুর্যোগের রাতের এক দুর্লভ ভাস্কর্য ।

দুখুর চোখ মুখে সব সময় এক চাতুরি খেলা করে । একটা হাসিও লেগে থাকে । যে-
হাসির অর্থ সবসময় খুঁজে পায় না বৈতল । সে তার বৌকে খুন করে ও কি এমন রহস্যময়
হেসেছে । দুখুর মুখে তাকিয়ে কি বৈতল তবে তার প্রতিবন্ধ্যই খুঁজে পায় । দুখু কি তাহলে সব
জানে । দুর্গাবতীর যম জমিদারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা জানে । কেন সে ব্রাহ্মণকন্যা
হয়েও জমিদার বাড়ির দাসীবৃত্তি করে । সেই হাসি মুখ দুখুই এবার হয়ে ওঠে মমতাময়, তার
ভিজে গামছা দুহাত দিয়ে নিংড়ে ঝেড়ে বৈতলের মাথা মোছে মায়ের আদরে, আবার নিংড়ায়,
মুখের ঘাম ও বৃষ্টির জল মোছে । বলে,

--- চল, অইব নে । অখন তো যাই কুনাখানো ।

--- না, কুনাখানো যাইতাম না । তুই বাদ দে তোর পণ্ডিতালি, কিতা অইব । তুই কিতা জানছ
। হউ যে ‘থু’ কইল, তখন মনে লইছে বুঝছ নি কানপট্টি ফাটাই দেই বেটির এক চড়ে ।
পারছি না রে বেটা, পারছি না । দুর্গার গাত কুনা সময় আমি হাত দিছি না । মাইনষর কথা
আমি মানি না । তুই হাসছ, ভাবছ তুই হক্কলতা জানছ । না, দুর্গারে হাজার অসতী কইলেও
আমি মানি না । দুর্গা দেখিছ আমার কথাত রাজি হই যাইব । না অইলে যম ইগুর গরজনা
থাকি কল্লা লামাই লিমু । অইব, অইব রে । তাই রাজি অই যাইবো । অইব নানি ক দুখু ।
ঘনিয়ালার মজিদো অইত না । ইতায় কেংড়া করবা । জমিদারর চেলা চামুণ্ডা অখন বাড়ি

গেছে, তারা বলে হিন্দুর দেশ বানাইতো । বানাউক, আমরা দুদপাতিল যাইমু গি, ইমাম
সাহেবর লগে কথা কইবে তুই । অউ একখান কাম করি দিবে তুই ।

দুখুর গলা জড়িয়ে এবার আন্দার করে বৈতল । দুখু আবার গামছা নিংড়োয়, ঝাড়ে,
বৈতলের চোখ মুখ মুছে দেয় । বলে,

--- তোর বাঙাল হওন লাগত নায় বেটা হালার হালা । তুই যেতা কইরে অতাউ অইব ।
আমরা সব করি দিমু । ক কিতা কাম ।

বৈতল সহসা আকাশের দিকে মুখ তোলে । দুখুর গালে খুশির টুসকি মারে । বলে,
--- হাগো আর পানি নাই, তোরও কুন্স কাম নাই ।

সে-রাতের মতো বৃষ্টি ধরে যায় ।

উপন্যাস

বারো

শহরের যে-অংশটিকে বরাকনদীর অশ্বক্ষুরের আকার দিয়ে ঘিরে রেখেছে, সেই অংশের একটি খণ্ডনাম হরিৎবরণ । এই অশ্বক্ষুর নিয়েই যত ধন্দ বৈতলের । ঘোড়া নেই দেশে ঘোড়ার ক্ষুরের আকার । মানুষ চিনবে কী করে ।

বৈতল দেখেছে এক ঘোড়া । অলৌকিক তার চালচলন । বৈতলের মার অশান্তি দূর করতে দুই কিশোর বেরিয়েছে তীর্থ দর্শনে । কত মন্দিরের চরণামৃত, ফুল বেলপাতা জমিয়েছে, পিরবাবাজির পানি পড়া এনেছে । মাকে বলেছে শাহি ইন্দারার পানি । মা খেয়ে সুস্থ থেকেছে একদিন । আবার বেরিয়েছে, গেছে মৌলভী বাজার । পথের কষ্ট বিস্তর । শুধু নদী আর নদী । নদীপথে গিয়ে পৌঁছেছে পিরের গ্রামে । ভটরখাল মহামায়া আর চন্দনী নদীর মাঝখানে এক অপরূপা গ্রাম জগৎশ্রী । নদীঘেরা গ্রাম সিলেটে অনেক আছে, গ্রাম থেকে বেরোনোরও কোনও স্থলপথ নেই জগৎশ্রীর । গ্রাম পেরোনোর একমাত্র সাধন তিন নদীতে তিনখানা নৌকা । কিন্তু পিরবাবাকে কেউ কোনোদিন নৌকা চড়তে দেখেনি । দিনের বেলা তাকে কেউ কোথাও যেতেও দেখে নি, দেখে নি তার ঘোড়া মনা রায়কেও । দানিশপিরের নাম নিলেই জগৎশ্রীর দুর্গত মানুষ নিরাময় হয় । দানিশপিরের মর্জি হলে শবদেহ জেগে ওঠে শ্মশানে, কবরের মাটি ফুঁড়ে মূর্তিও বেরিয়ে আসে । হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পিরের আশীর্বাদ জলঘেরা গ্রামে । পিরবাবা আলাদা করে মানুষে মানুষে ভাগ করেন না । এলাকার সবকটি গ্রামেই তিনি মনা রায়কে নিয়ে ছুটে বেড়ান নিরাময়ে । কুশালপুর চমৎকার আমতইল কদুপুর সূর্যপাশাম মাসকান্দি গ্রামের মানুষ স্মরণ করলেই পিরবাবা পৌঁছে যান তার জড়িঝুটি নিয়ে । ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া আসা গ্রামে গ্রামে । পানি পড়া, জড়িঝুটি আর পিরের ছোঁয়াতেই মানুষ সুস্থ হয়ে যায় । মানুষ কৃতজ্ঞতায় মনা রায়কেও প্রণাম করে সালাম জানায় । মনা রায় আরবি ঘোড়া হলেও খুব তেজিয়ান নন, কিন্তু যখন টগবগিয়ে ছোটেন তখন এক অলৌকিক জ্যোতি বেরোয় তার দেবদেহ থেকে । ঘোড়ার উপর সাদা আলখাল্লার পিরবাবাকেও দেবদূত মনে হয় । মানুষের অসুখ করলে মনা রায় দুরন্ত হয়ে ওঠেন । দুর্গম পথ পেরিয়ে যান নিমেষে । বর্ষাকালে সুরমার উপর ছলছলাত দৌড়ান । কালনি বিবিয়ানা ভেড়ামোহনা পারাপার করেন সপসপিয়ে । যারা দেখে তারা ভাগ্যবান, তারা দুহাত তুলে ঈশ্বরের গুণগান করে । দুহাত

জোড় করে প্রণাম জানায় অলৌকিক তেজি আর তার সওয়ারকে । একটি অতিরিক্ত নমাজ আদায় করে মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশে ।

সেই মহালয়ের রাতে, যখন গ্রামের পর গ্রাম ডুবে গেছে আর ভেসে আছে শুধু এক মাটির নৌকো, মালির ভিটা কালিবাড়ি শুধু জেগে আছে কিছু ভক্ত শরণার্থী নিয়ে । নিচে দুই ত্রুন্ধ নদী পিয়াইন আর সুরমার সঙ্গমে হুলস্থূল । উথালপাথাল গেরুয়া জলের উদ্গীরণ শুধু । টিলার মন্দিরের উপর একদল মানুষ তখন আপন গোষ্ঠীকে নিশ্চিত আশ্রয় দিতে পারার স্বস্তিতে একমনে জয়কালী জপছে । দুর্যোগের মধ্যেও মহা বিপদের মধ্যেও মানুষ মানুষের জন্য ভাবেনি । এমন ঘৃণা । সম্ভাব্য পরাধীনতার জ্বালায় বৈতলের মনেও ক্রোধ । মন্দির আক্রমণের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বৈতল । রামদা নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে । মেয়েদেরও বলছে দা বটি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে । চাচার দল অনেক দিন থেকেই মন্দির দখলের অজুহাত খুঁজছে । মালির ভিটাকে মোল্লার ভিটা করার তোড়জোড় । গিরিরাজ মহন্তও বলছেন,

--- দিলাও বা তারার জিনিস তারারে দিলাও । প্রাণে তো বাচউকা হকলে ।

বৈতল এতসব ভাবে না । সওয়াল করার সময় নেই, সময়টাই যে তীব্র অবিশ্বাসের । দু দুটো জাতি মুখোমুখি । চাচা ভাই মাসি ফুফু খালা এমনকি লুলা বৈতলও আলাদা মানুষ হয়ে গেছে । একদলের হাতে রামদা আর একদলেরও লাঠি সড়কি দা । মুখে জিগির জয়কালী আর আল্লা হো আকবর । বৈতলও হাঁক দেয় ‘বোম বোম বম্বালে’ । বাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও বৈতল একবার থমকায় । যখন ওরা জিগির দিয়ে এগোয় তখন মাথায় থাকে সার সার টুপি । দুর্গতির সময় মানুষ বানানো ধর্মকর্মের প্রাত্যহিকতা ভুলে যায় । একমাত্র মুরব্বি মানুষ করিম চাচা ছাড়া কারো মাথায় তো বৈতল তকি দেখে না । তাহলে ওরা কী চাইছে, মন্দির দখলের না আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে উঠে আসছে উপরে ।

হিন্দুর মন্দির সেদিন পবিত্র হয় । কলঙ্ক যুক্ত হয় । বানভাসি মানুষ জাতিধর্ম ভুলে এক হয় টিলার দেবালায়ে । মহন্ত গিরিরাজ আর করিম বক্সের কোলাকুলি দেখে বৈতলও লুলার হাত ধরে টানে । এক উজ্জ্বল আলোর জ্যোতির দিকে দিক নির্দেশ করে । বলে,

--- অউ দেখরে নি বেটা পিয়াইনের উপরে ।

--- কিতা দেখতাম, আন্ধাইরো কিচ্ছু দেখা যায় না, কেউ নি লুকা জ্বালার বহুত দূর । ভোরা
উরা বার আরি ।

--- না বেটা দেখ মনা রায় আইরা । আর দেখ অলা নি ধলা ফক্ফকা পির সাহেব । তর মনো
নাই নি দানিশ পিররে । তোর মা বেটির লাগি কিতা বানাইলা । এক ডাবরো কত জড়িবিটি
ঢাললা, ঢালিয়া তরে কইলা বিচরা থাকি গোলাপ ফুল আনার লাগি । ফুল ও ছিড়লা সব
মিলাইয়া মধু উধু দিয়া কিতা যে বানাইলা । পয়সাও নিলা পাচ আনা । আমার মা ভালা অই
গেছিল নানি ক ।

বৈতলের সন্দিহান মন অলৌকিককে কাটা ছেঁড়া করে । দোহালিয়ার কানা ফকিরের
গান ভুলতে পারে না বৈতল । লুলার প্ররোচনায় বৈতলকে ঠকানোও ভুলতে পারে না ।
দাড়িয়াপাড়ার সাদা মেয়ের কান ছিঁড়ে পালানোর যন্ত্রণা বৈতলের মনে । ফর্সা মেয়েটা সব
সময় খিল খিল করে হাসে আর পড়শিবাড়ির মেয়ে হাসির সঙ্গে কথা কয়, আমলকী চিবোয় ।
ওরা ভুলভাল বকে আর হাসে । ধলা মেয়ের হাসিতে রাগি মাছের ঝাঁক উঠে আসে বৈতলের
গামছা জালে । বৈতলও যোগ দেয় খলুই পিঠে পুকুরের জল থেকে । বলে,

--- তুমি বাশপাতা মাছ চিন নি ।

সাদা মেয়ে বলে,

--- চিনতাম না কেনে । আছে নি আমার পুকইরো ।

--- না গো মাই, ইতা কুন্ পুকইরোর মাছ নি । পাবিয়া চিনো নি ।

--- চিনি, কিতা কইতে ক ।

--- তুমার হাসি নানি অউ বাশপাতা আর পাবিয়া মাছর লাখান ।

--- ছি, আর কিচ্ছু পাইলে নানি বেটা মিলাইবার ।

পাশেই ছিল ফর্সা মেয়ের বন্ধু হাসিনা । বলে,

--- আইছা আমার হাসি কিলখান কও ।

--- তুমি তো হাসি অউ । তুমার আবার হাসি কিতা ।

--- তেও কও, কোন মাছর লাখান ।

--- তুমার হাসি গজার মাছর লাখান ।

বলেই দিয়েছে পুকুরে ডুব খলুই সহ । রাগি মাছের দল আবার ছাড়া পেয়ে পুকুর ভরে দেয় খুশিতে । মেয়ে দুটি তো ভালই । সুন্দরী মেয়েটার জন্যই মাছ ধরে দেয় বৈতল নানানি বিনানির । বৈতল জীবনে সদিচ্ছার কোনও অর্থ নেই । সেই মেয়েটাই বৈতলকে বলে চাকর । বৈতল দেখিয়ে দেয় চাকর বলার মতো তুচ্ছ নয় সে । কান ছিঁড়ে সোনার মাকড়ি নিয়ে দৌড়েছে । সোজা হাকালুকি, গ্রাম খিত্তা । বন্ধু লুলা তাকে বাড়ি নিয়ে যায় । সব শুনে বলে,

--- খুব বেটাগিরি দেখাইলে নানি । ছুকরির গাত হাত দিলে ।

লুলা যখন বলে সে অন্যায় করেছে তখন বৈতল আরো মনমরা হয়ে যায় । বৈতল জীবনের প্রথম অনুতাপ, যা তাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে জীবনভর । পেশকারের মেয়েটিকে তো সে পছন্দ করেছে । ভাল লাগার স্মৃতি নিয়ে চলে যেতে চেয়েছে । মেয়েটির নিষ্ঠুরতায় বৈতল ক্ষুণ্ণ হয়েছে । এক অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে হেথায় হোথায় । নীতিপণ্ডিত লুলারও সহমর্মিতা পায়নি সেদিন । গুনা আর গুনাগার বলে বলে বৈতলকে উদ্ভ্রান্ত করেছে । তবু বন্ধুকে নিয়েই বেরিয়েছে দেশ ভ্রমণে । দেশ বলতে এতদিন জেনেছে গ্রাম বইয়াখাউরি পরগণা সুনামগঞ্জ জিলা সিলেট । জিলা সিলেটের এমাথা থেকে ওমাথা ঘুরে বেড়ায় বৈতল । বেড়াতে বেড়াতে বড় হয় । লুলাও বাড়ে, একদিনও বলেনি ছেড়ে যাবে । বৈতলের মনের অবস্থা বুঝেই কানা ফকিরকে সব কথা আগেভাগে বলে দেয় । সাদা মেয়ের কথা, কান-ছেঁড়া মাকড়ির কথা, বৈতলের মনখারাপ কথা । ফকিরের গান শুনে বৈতল যে গুরু খুঁজে পায়, অলৌকিকত্ব আরোপ করে । রাতের আঁধারে জারি গানে যখন সুর লাগায় ফকির, তখন আর মানুষটাকে মানুষ মনে হয় না । বৈতল তখন মায়ের কাছে চলে যায় । মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে শোনা মালসী গানের সুরও যে অবিকল এক । লুলা বৈতলের সব কথা শোনে, বোঝে মন দিয়ে । প্রশ্ন দিয়ে পরিস্কার করে নেয় । লুলার খটকা হয় । তাই বলে,

--- জারি গান আর মালসী গান এক অইল কেমনে বেটা ।

বৈতল বোঝে লুলার সংশয় । কিন্তু কী করে বোঝায় কানের ছন্দ । বৈতলের মার কণ্ঠ সব
সুরেই যে বিষাদের কান্না ঝরে । মা গাইলেই মনে হয় দুঃখের এক মলিন আলো একটু একটু
করে জ্যোতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে । তখন মাকে ছুঁয়েও দেখা যায় না । ঘোর ভেঙে গেলেই যদি
প্রভা হারিয়ে যায় । দোহালিয়ার অন্ধ ফকিরের গানেও চরাচর আলোয় উদ্ভাসিত হয় আঁধার
রাতের গানে । হায় হাসান বলে মায় কান্দে বিনাইয়া বিনাইয়া...’ । গান থামলে ফকিরের পায়ে
হাত দেয় বৈতল । বলে,

--- তুমি আমার গুরু অইবায় নি ।

অলৌকিক ফকিরের জ্যোতি নিভে যাওয়ায় বৈতল আবার শুরু করে পথ চলা । বন্ধু
লুলা বৈতলকে ছেড়ে যায়নি তখনও । সাধু ফকিরের অলৌকিকত্বে আর বিশ্বাস করেনি বৈতল
। বৈতল বুঝেছে অলৌকিক হয় না । অলৌকিক তৈরি করতে হয় । মনের সুখ দিয়ে আনন্দ
দিয়ে গভীর বিষাদ দিয়ে সাজাতে হয় অপার্থিব । তখন অমিল সুরেও সুর মিলে যায়, তখন মন
বলে, আঃ ।

তবু বৈতল স্পষ্ট দেখতে পায় পিরবাবার ঘোড়া মনা রায়কে, আর তার আরোহী দানিশ
ফকিরকে । বৈতল দূর থেকে প্রণাম জানায় । পিরবাবাকে দেখেছে বৈতল তার ছোটবেলায় ।
আর সব ধর্মমানুষ থেকে আলাদা এই পুন্যপুরুষ । তুকতাকের গান্ধীর্ষ কোথাও দেখেনি বৈতল
। মায়ের দুঃখে কাতর বৈতলের সঙ্গে কত কথা তাঁর । বলেন,

--- ইতা ভাবিও না আমি ফুকিয়ার । ফুকিয়া উকিয়া কিচ্ছু অয় না রে বাপ । মন ছাপ রাখো
তেউ এগারো আনা ভালা । আমাকে যে দিলায় পাচ আনা, পাচ আনার জড়িঁবুটি আমি বানাইছি
না, খোদায় বানাই রাখছইন সব । তুমিও চিনো, অউত্ত দেখ সাদা ভেড়োলা, হাড়জোড়া, খুনি
জবা, পানি পদ্মর শুকনা জড় হাতো অলাখান বান্দি দিমু যে শয়তান ভাগার পথ পাইত নায় ।
মাইরে কইও গিয়া পিরে কইছইন সব ভালা অই যাইব । আর অউ যে ডাবরো বানাইছি
দাওয়াই এর লাগি লাগব আরো পাচটা গুলাব । কাইল পতাকালোও যদি আনতায় পারো অইব
। বছরাই গুলাব লাগব । আমার বিছরার ইতায় অইত নায় কিন্তু ।

--- আমি ইতা কই থাকি পাইতাম । কই বছরা ।

--- তে আর কেমনে বনব দাওয়াই । হেকিমি দাওয়াই বছরাই গুলাব ছাড়া অয় না । যাও ।
বইয়া বইয়া খাও বইয়াখাউরিত ।

দুই বন্ধুর মনোদুঃখ দেখে পিরবাবার মুখে বিস্তৃত হয় হাসি । বলেন,

--- আমি কুনু বেটা দাওয়াই উয়াই বানাইতাম পারি নি । তুমরা কইয়া কইয়া আমারে পির
আর হেকিম বানাইছো । খাওয়াই দিও মাইরে, ভালা ভালা জিনিষ দিছি । একটু খাইয়া
দেখিলাও তুমরাও বছরা উছরা কইলে হেকিমের দাম বাড়ে এর লাগি কইলাম । ঢঙও বুঝো না
নি ।

ডাবর থেকে এক খাবলা ক্লাখ উঠিয়ে দুজনকে চাখতে দেন পিরবাবা । বৈতল অমৃতের
স্বাদ জানে না, ইচ্ছে হয় আর একটু নেয় । লুলা বারণ করে । বলে,

--- কিতা কছ বে, মা বেটির দাওয়াই কম পড়ব ।

লুলার কথামতো পিরের পা ছুঁয়েছে বৈতল, মনা রায়কেও এক আঁটি ঘাস খাওয়ায় ।
বন্যার রাতে ধর্মাধর্মের বাঁধভাঙা মন্দির টিলায় দাঁড়িয়ে আবার বৈতল অলৌকিকের উদ্দেশ্যে
প্রণাম জানায় । দানিশ পিরকে বলে,

--- তুমি তো অমৃতবড়ি বানাইতায় পারো । তে কেনে সবরে অলাখান একখানো থাকার বড়ি
খাওয়াই দেও না । সবরে তারার ধর্মউর্ম ভুলাই দেও । কও তারা সব সিলেটি অউকা । তারা
মানুষ অউকা ।

নিজেকে ভোলায় বৈতল । বৈতলের স্বদেশ একদিন পরবাস হয়ে যাবে বলছে সবাই ।
মনের জোর না গায়ের জোর জানে না, বৈতল বলে দুটোই । মা কালীর পূজা করে বলে,
ঈদের দিন নামাজ পড়ে না বলেই দেশ বিদেশে হয় না । মাটি কামড়েই পড়ে থাকে বৈতল ।
যারা ইন্ডিয়ায় যায় তাদের বলে কাপুরুষ । ভিত্তু মানুষ সবার জন্য বৈতল একদলা থু থু ফেলে
। বলে,

--- থু ।

যাদের জন্য দেশটা পাকিস্তান হবে, তারা কি সবাই হিন্দুর শত্রু । শত্রু হলে তো দখল নিতে পারে মন্দির । বলতে পারে যাও ভাগো । ভাগিয়ে দেয়নি, বরং আশ্রয় ভিক্ষা করেছে । মহন্ত গিরিরাজ ফিরিয়ে দিলে ওরা ফিরেই যাবে বলেছে । অস্ত্রহীন ভেজা কাপড়ের পুঁটলিতে যা পেয়েছে গরিবের মহার্ঘ তা নিয়ে চলে এসেছে । সব দেখে শুনে গিরিরাজ বাবাজির চোখের জলে বৈতল নতমস্তক হয় । বৈতলের নতুন জিগিরে অন্ধকারে আলো উদ্ভাসিত হয় । বৈতল হাঁকে,

--- জয় বাবা দানিশ পিরের জয় । জয় মনা রায়ের জয় ।

সমবেত দুর্গত জনের কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে । বৈতলের ইচ্ছে হয় জয়কালীর ধ্বনি দেয়, আবার বলে বোম বোম বম্বালে, ইচ্ছা হয় আই মনসার ধ্বনি দেয়, দেয়নি, বৈতলের বুদ্ধিমান মন বলেছে পির সাহেব আর দেবতা ঠাকুরে ফারাক অনেক । দানিশপীরের স্থান ধর্মাধর্মের উপর ।

উপন্যাস

তেরো

নদীর উপর দৌড়য় যে ঘোড়া ছলছলাৎ, তার কি কোনও ক্ষুর আছে । বৈতল জীবনে
দ্বিতীয় ঘোড়া দেখা হয়নি মনা রায় ছাড়া । ইন্ডিয়ায়, এই দেশে কনোকালে ঘোড়দৌড় হয়েছে,
ঘোড়া খেলার মাঠ আছে বিশাল । দুনিয়ায় ঘোড়ার পিঠে বল খেলাও শুরু হয় কাছাড় জেলায় ।
সাহেবদের ক্লাব সিনেমা হল হোটেল দোকান সবই ঘোড়দৌড়ের মাঠ লাগোয়া । মাঠের
মাঝখানে আছে এক কুলগাছ । কনোকালে এক তেঁতুল গাছও মানুষ দেখেছে গায়ে লাগা ।
জামাই বউ গাছ নিয়ে অনেক কথা । বৈতল দুখু আর আপদ বহুই ধোঁয়া ওড়াতে আসে বরই
গাছের নিচে । নেশার ধোঁয়ায় রাত কালো হতেই বৈতল দুখুকে ভয় দেখায় । বলে,

--- অউ গাচো কিন্তু ভূত আছে । বাড়ি মানু দেখলেউ ঘাড় ভাঙ্গি দেয় ।

--- তুইন তো হালার হালা অত কালা ভূতর বাপেও খুজি পাইত নায় ।

--- তুই চঙ্ ভাবরে নানি । দেখ ভূত আছে কইয়ার । তোর ধারোউ আছে ।

--- তুই অউত্ত ভূত ।

--- নাবে না, দেখছ না । অউ আমি, অউ তুই অউ বহুই আর আপদ গেল কই । আপদ দুগু
অই গেল কেমনে । অউত্ত আপদ । তে হিগু কিগু ক । পাইলে নি ভূত ।

অবাক বিস্ময়ে চারজন এক ঠাঁই এসে দাঁড়ায় । এক সাথে দেয় ধমক । বলে,

--- অই, তুই কিগু বে ।

পঞ্চমজনের গায়ের রং বৈতলের বিপরীত । ফক্ফকা ধলা । সাহেবের মতো । বৈতল দুখুর
গায়ে কিল মেরে বলে,

--- ইগু দেখি সাহেব ভূত । অত ধলা অয় নিবে ভূত । ইগুর গাত শ্বেতি নিবে চা চাইন ।

দেশলাই জ্বালা দেখি, আন্ধাইর না জমলে তো ভূত অইত নায় ।

দুখু ভাল করে জরিপ করে । নিশ্চিত হয়, সাহেব নয়, শ্বেতীও নয় । বলতে বলতে
বৈতল দুসুম করে হাত চালায় । মাটিতে গড়াগড়ি যায় ভূত । বৈতল ওঠায় । বলে,

--- তুই কেবে ।

--- আমি কালু, কালুরাম হাজাম । আমি নাউঠাকুর ।

--- নাউঠাকুর তে সিলেটি মাতরে কেনে ।

--- আমরাও সিলেটি ।

এবার দুখুও মারে এক থাবড়া । বলে,

--- তে ক নাপিত । তর ই সাহেবের লাখান রং কেনে ।

--- আমি সাহেব কেলাবো কাম করি ।

--- কিতা কাম করছ । তুইন কিতা রং মিস্ত্রি নি ।

--- চুল কাটি দাড়ি কাটি । ইউ কাটিং মারি ।

--- অই বেটা কাটিং যে মারাইরে, চুরর লাখান ইখানো অইলে কেনে । তোর গার যে রং, তরে কেউ চুরিতও নিত নায় ।

--- কালি মাখি লাইমু ভুয়া । তেউত নিবায় আমারে ।

--- বাক্সাউতো জানছ কথা । অখন ক কিতা চুরি করতে আইচছ ।

--- তুমরা যেতা খাও । দেও না এক টান, অতো মারছো ।

--- গাইঞ্জা খাইতে ।

এবার বৈতলের বাঁ পায়ের লাথি খেয়ে মাটিতে পড়ে কালুরাম গৌরাঙ্গ । গড়াগড়ি থেকে উঠে সাদা মুখের কালো দাঁত বের করে হাসে । বলে,

--- বিলাতি বিড়ি খাইতায় নি । সিগারেট ।

সবারই চোখ চিকচিক করে । আপদ আর বছই কালুর গায়ের ধুলো ঝেড়ে দেয় ।
বলে,

--- দে তেখি তোর বিলাতি মাল ।

সেয়ানা দুখু ভোলে না । বলে,

--- কেনে খাওয়াইতে, মাগনা নি ।

--- মাগনা, একেবারে মাগনা ।

--- ঠিক আছে বার কর ।

কালু তার লাল কালো পায়জামার পকেট থেকে বের করে বিচিত্র সব আধপোড়া সিগারেটের টুকরো । বহুই নেড়ে চেড়ে দেখে, গন্ধ নেয়, পোড়া গন্ধের সঙ্গে একটা সাহেবি ব্যাপারও আছে । মুখে লাগায় আপদও । বৈতল কালুরামের ক্ষীণকায় চেহারার দিকে তাকায়, কুচা মারার আগে যেমন মাছের আকৃতি জরিপ করে শিকারি । বন্ধু দুখুকে বলে,

--- এখন তুই হাত লাগা । মুখো মারবে । হালার হালার কালা দাত কয়টা ভাঙ্গিয়া আমার হাতো দিবে । আমরাই ইগুয়ে পথুয়া পাইছে নি । খাওরা বিড়ি খাওয়াইত । অউ মুখ দিয়া বেটাইন্তে গরু খাইছে গুওর খাইছে, অউ ছেপ দিয়া চাটছে । থু ।

দুখুর হাত চালানোর আগেই অবস্থা বেগতিক দেখে কালুরাম ভাগে । অন্ধকারে বিদ্যুতের আলোর মতো শুধু পায়জামা পরা ওর সাদা শরীরটা এঁকে বেঁকে ছুটে যায় টাউন ক্লাবের দিকে । ওখান থেকে ইন্ডিয়া ক্লাবের দিকে গিয়ে মিলিয়ে যায় হঠাৎ ।

এই দেশের বেশিরভাগ নগর পত্তনের কৃতিত্বই সাহেবদের । শাসন শোষণের সুবিধার্থে নিজেদের জন্য নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা, বিনোদনের একটা ঠিকানাও তো চাই । বরাক নদীর পারের এই শহরও সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে । কত মানুষের কত ধানী জমি দখল নিয়ে মাঠ বানিয়েছে । বাড়িঘর অটালিকা বানিয়েছে । ক্লাবঘর হয়েছে, মাঠে ঘোড়া ঘোড়সওয়ারির ব্যবস্থা হয়েছে, অদূরে একটা উপাসনালয়ও করেছে সাহেবরা ।

কালুরাম হাজাম এরপরও এসেছে । দুখু বৈতলের কিল চড় খেয়েছে । গাঁজাও খেয়েছে । বৈতল জেনেছে তার পরিচয় । কালুর নেশা আছে অনেক, নাপতেগিরিতে সব হয় না । তাই ওদের দলে ভিড়তে চায় । দুখু সাফ বলে দেয়,

--- আমার কুণু দলউল নাই । আমরা আমার মতো । তুইন কিণ্ড । ভাগ ।

কালুরাম ভাগেনি । একদিন খাইয়েছে গোটা সিগারেট একটা বৈতলকে । বৈতলের
কানে কানে বলেছে কথা । বলেছে,

--- আমার নানিয়ে কইছে অউ গাছোর নিচে মোহর আছে ।

বৈতল ডাকে দুখুকে । বলে,

--- আবার গাইঞ্জা মারের । কর, ইখানো বুলে গাছোর নিচে মোহর আছে । দে এক রুন্দা ।

--- মারিও না, আছে কইলাম, আমি মাটি কাটছি । মাইনষে দেখিলায় আবার ভরিয়া রাখি দেই
। তুমরা পারবায় ।

--- আমরা আউয়া পাইচছ, ছাবাল নি । কেউ কইছে না কুণুদিন আর তর নানিয়ে জানে সব
। নানিয়েও খায় নি ।

--- আমার নানিরে দেখলে বেটা ইতা কইতে নায় ।

--- তাইন কিতা মেমসাহেব নি ।

--- আমার নানি বহুত বিলাতি মাত জানে ! নানি ডাকলে গুসা করে, কয় গেনি ডাকিছ । আমি
কই না ।

বৈতল কালুরামের কথা শুনে হাসে । বাকিদের দিকে তাকায়, সবাই হাসছে ।
ফিসফিসিয়ে হাসছে বহুই, হাসছে আপদ, দুখুর কাঁধে হাত রেখে ঢলে পড়ছে । দুখুও তার
হাড়জ্বালানি মুচকি হাসির প্রশ্নয় দিচ্ছে কালুরাম হাজামকে । বলেছে,

--- অই বেটা, তুইন তো কইরে খুব কামলা তুই ।

--- আমি কামলা উমলা নায়, আমি নাউ ঠাকুর ।

--- বুঝছি, কামলা বেটা, মাটিকামলা কইয়ার না, তুইন খুব কামর মানুষ । অখন আমার
একখান কাম করি দে দেখি । এক বদনা পানি আনি দে ।

--- বদনা পাইতাম কই ।

--- তুই যেতা পাছ অতাত অউ লই আইছ । যা ।

দুখু আপাতত তাড়িয়ে দেয় কালুরামকে । বৈতল জানে এবার ভাষণ শুরু হবে । কী বলবে তাও জানে । বলবে, আল্লার তৈরি দুনিয়ায় সব মানুষ সমান, কারো শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে হাসতে নেই । কালুরামের কণ্ঠস্বর সাধারণ মানুষের মতো নয়, মেয়েলি, খোনাখোনা আল্লাদি কণ্ঠস্বরে পুরুষ মহিলার মাঝামাঝি একটা অবস্থান নির্ধারিত হয় । আর তাই নিয়েই ওদের মজা । বৈতল বুঝতে পারে না মজা করতে বাধা কোথায় । দুখুর সব তাতেই বাড়াবাড়ি, সে যখন বৈতলকে নিয়ে যা নয় তাই বলে তখন কোথায় থাকে নীতিপণ্ডিত মানুষ । আসলে দুখুর সব তাতেই মোড়লি । নেশা ভাং করে না বলে সব নীতিকার মালিক হয়ে গেছে । কথায় কথায় সে আল্লাকে খদাকে ডেকে আনে, একবারও তো সে ভগবানের কথা বলে না, রাধামাধবের কথা বলে না । বছই আপদ আবার সাপের ভয়ে মাঝে মাঝে মনসা আইকে ডাকে । না ডাকুক, না ডাকলেও দুখু বৈতলকে তো ডাকে । যতই রাগারাগি করুক বৈতলকে তো ছাড়ে না । মনটা তো ভাল । বৈতলের গুরু সৃষ্টিধর ওঝা বলেছেন, ধর্মপ্রাণ মানুষ বড় শান্তিপ্রিয় হয় । দুখুও বলে, কোরাণ বইতেও নাকি লেখা আছে প্রতিবেশির প্রতি সম্মানের কথা । বৈতল বোঝে না, সব গ্রন্থে, সব বইএ কিতাবে যদি শান্তির কথা থাকে, প্রতিবেশীর প্রতি সম্মানের কথা থাকে তবে কেন তাড়িয়ে দেয় পাশের বাড়ির রবিলালকে, শান্তি কৈবর্তকে, মানুষকে মারে শ্রীমঙ্গল, ধর্মপাশায় । দুখুর সঙ্গে তর্ক করা যায় না । ওর ইচ্ছে হলে ভাল ভাল কথা বলবে, ইচ্ছে হলে পাকিস্তানের পতাকা ওড়াবে । তবে এবার কালুরামকে তাড়িয়ে সে ভিন্ন কথা বলে । বৈতলকেই উদ্দেশ্য । বলে,

--- দেখ, তুইন যেতা ভাবরে ইতা অইত নায় । ই বেটিমুখা বেটা ইগুরে লইয়া আমরার কিছু অইত নায় । ইগু অইল জাত চুর, পারলে হে তরে আমারেউ চুরি করি লাইব । দুই দিনর লাগি ঢং ঢাং করিয়া ছাড়ি দে ।

দুখুর ওস্তাদি কথায় রাগ হয় বৈতলের । বৈতলকে সে ভেবেছে বোকা । দুখু থেকে বেশি বুদ্ধি ধরে সে । কালুরামের গল্পকাটা গল্পার কথা নিয়ে মজায় মজেনি বৈতল । বৈতল জানে ও ব্যাটা সঙ্গে থাকলে অসুবিধা নেই, ফাইফরমাশ তো খাটতে পারবে । আর গায়ের রং । সে তো বলেইছে ভুষোকালি মেখে নেবে গায় । চুরিবিদ্যা কতটুকু জানে সেসব নিয়ে ভাবে না বৈতল । তবে ওর সঙ্গী টিকরবস্তির খন্ডল আর বেরঙ্গার সোনাওর দাগী চোর । বোবা

খন্ডলের গায়ে অপরিসীম শক্তি, আর শুঁটকিওলা সোনাওর চোরাই মাল বিক্রিতে ওস্তাদ ।
বছইর ঘনিষ্ঠ । ফাটকবাজার শুটকির ছত্তর থেকে মাল পাঠিয়ে দেয় কুকিতল, ওখান থেকে
সোজা পাকিস্তান । বৈতল জানে এদের নিয়ে তার কোনও কাজ নেই, কিন্তু কালুকে সে সহজে
ছাড়ছে না । কালুর মধ্যে কিছু একটা আছে, যা বৈতলকে টানে । গাঁজায় দম দিয়ে কালু কথা
বলে । কথার দম এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় । ঘোড়দৌড়ের মাঠে ভূতের কণ্ঠস্বর নিয়ে ওর
উদয় থেকে কুলগাছের পাশে এক তেঁতুল গাছের গল্প, জামাই বৌ গাছের নবপ্রস্তাবনা । এখন
জামাই আছে বৌ নেই, নাকি জামাই নেই । কালু হাজাম বিহারি ভাষায় বলে, ইমলি । ইমলি
গাছটাই উধাও, কেউ জানে না কেউ বলেনি এমন তেঁতুল গাছের কথা । মোহরের গল্পটাও
একেবারে গাজাখুরি কি । বোকা তো নয় প্রায় কিম্পুরুষ কালু, বোকা হলে নয় মাটি কাটার
একটা যুক্তি হয় । কোথাও একটা কিছু আছে । বৈতল এতদিন নদী আর তার আকার নিয়ে
লড়ে গেছে দুখুর সঙ্গে । এবার তার নতুন লড়াই কালুরামকে নিয়ে । নদীর পাশে শহর, আর
তার মাঠ, মাঠের মধ্যে গুপ্তধন । দুখু বিশ্বাস করে না মোহরের গল্প । মাটির ভিতর থেকে
মামলত বেরোয় না জানে বৈতলও । তবু সে কালুর গাঁজাখুরিকে গুরুত্ব দেয় । হেডমাস্টার
বৈতলকে শুধু ভুগোল শেখায় নি, ইতিহাসের হাতছানি ধরতেও শিখিয়ে গেছে ।

রাত অন্ধকার । চার মালিকের আশ্চর্য প্রদীপসুন্দর জিন ফিরেও আসে মুহূর্তে । ক্লাবের
পিছনের কাঁটাতার ডিঙিয়ে ভাঙা বালতিতে জল নিয়ে ফেরে কালু । দুখু মিয়া তফনের গিঁট
কোমরের উপর উঠিয়ে নেয় । গোড়ালির উপরে ওঠে লুঙি । বালতির জলে কনুই ভিজিয়ে
নেয়, মুখে জল দেয়, পা ধুয়ে জল রাখে আপদ বছইর জন্য । কোমর থেকে গামছা খুলে ঝেড়ে
নেয় । দুভাঁজ করে মাটির উপর বিছিয়ে নেয় । দুখুর সময়জ্ঞানও নিখুঁত । হাঁটু গেড়ে
নামাজের শুরু করতেই দূর থেকে ভেসে আসে ইটখোলা মসজিদের আজানধ্বনি । দিনের শেষ
প্রার্থনা । দুখু বলে আল্লার গুণগান । একবার করলেই হয় । আপদ আর বছইর উপর রাগে ।
বলে,

--- ইতা কুনু বাঙ্গাল নি । ইতা মুসলমান নায় । ইতা দেখানির মুসলমান । খালি ইদর দিন
ইদগাত গিয়া দেখাইয়া আইল । ফজরর নমাজ পড়লে কিতা হয় রে বেটা, ঘুম তো ভাঙব ।
কিতা কছ তুই বৈতল ।

বৈতল প্রমাদ গোনে । কী বলতে কী বলবে আর রেগে যাবে দুখু । সে নিজেই কি ধর্মাচরণ করে ঠিকঠাক । শুধু শ্রাবণীর সময় আইর পুঁথি পড়া ছাড়া কখনও কোনও আখড়া বা মন্দিরে যায় না । যদিও আখড়া তার খুব প্রিয় জায়গা । কীর্তন ভাল লাগে গান বলে । আর ভাল লাগে আখড়ার প্রসাদ, পঞ্চব্যঞ্জন । শ্যামাসুন্দর আখড়ার মতো ভোগ সে কোথাও খায় নি, বইয়াখাউরির শ্যামচাঁদের আখড়ার লাবড়ার গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে, পাগলার আখড়ার খিচুড়ি ভোগের মুলো আর কচুরমুখিতে শীতকাল ম ম করে । মালির ভিটা কালিবাড়ির ভোগে কোনও আলাদা গন্ধ থাকে না । মাছ মাংস আর কারণ সেবাই প্রধান গিরিবাবার মন্দিরে । দুখুর সালিশিতে বিব্রত বৈতল তাই বহুই আর আপদকে ধাক্কা দেয় । বলে,

--- অই বেটা যাছ না । আল্লারে ডাকি লা একটু । মৌলবি ইগুরে ঠাণ্ডা করি লা ।

ব্যাস আর যায় কোথায় । বৈতল যা ভেবেছে তাই, বৈতলের দিকে ঘুরে যায় নিশানা । মাটিতে পেতে রাখা জায়নামাজ, তার সব কাজের কাজি গামছা কাঁধে বৈতলের দিকে ঘোরে । বলে,

--- অই মৌলবি কছ কারে । মৌলবি হওয়া অতো সহজ নায় । যেতা জানছ না ইতা মাতিছ না । নমাজর সময় আছে, সময় গেলে গি অইত নায়, বক্তর কাম বক্তো করন লাগব । ইতা তোর অংবংচং নায় ।

--- এ আমারে হুনাইরে কেনে বে ইতা । আমি কিতা করতাম । হাইর উপরে গুসা, পাড়াপড়শির উপরে নি ঝাড়বে । হে । তে কইলেউ যখন কই । আমি অখনো যোয়ান ধাক্কাড় আছি, অংবং করন লাগে না । ই দুগুও তোর মতন থুড়থুড়া বুড়া অইগেছে না যে খালি উঠবইশ করব হারাদিন । আর তুইও কিতা আছলে আমি জানি, অখন বেশি ইমামতি দেখাইরে, দুইদিন আগেও কসবি লইয়া ঘুরচছ অখন তসবি ঘুরাইবে । আর তুই আমারে হিকাইছ না আল্লার মহিমা । আমার গুরুয়ে ইতা সব শিখাইছইন । তাইন খালি গান গাইতা । গান গাইয়া শিখাইতা । তর মানো অখন খুব গুসা । গুসা ঠাণ্ডা করার এক সুর হুনাইয়ার হুন ।

অনেকদিন পর বৈতলকে গানের নেশায় পায় । গুরু সৃষ্টিধরকে প্রণাম করে রাতের আঁধার ভেঙে গায় ভানু শেখের গান,

--- ‘মন তুমি জপ না ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ জপিলে যাইরে রে মন তোর হৃদয়ের জ্বালা

মন তুমি জপ না ইল্লাল্লাহ ।’

আল্লাকে ডাকলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়োবে দুখু মিয়ার । বৈতলের কী হবে তবে ।
বৈতলের রাগ জুড়োবে কোন গানে । বৈতলের রাগ ঠাণ্ডা হয় না । খোনা নাপিতকে নিয়েই
যখন সব উৎপাত, দুখুর রাগ, ও ব্যাটাকেই তাহলে তাড়াবে এবার । কালুরামকে পিছন ঘুরিয়ে
দাঁড় করায় বৈতল, আর মারে এক লাথি । ছিটকে গিয়ে পড়ে তিনহাত দূরে । মার খেয়ে
হাসে কালু । বৈতল এবার তাকায় দুখুর দিকে । বলে,

--- ইগু কিতা দেখরে নি । মাইর খাইয়াও হাসের । তুই খেদা ।

--- হাসব অউও । শয়তান খালি হাসে । ইগু ইবলিশর বাইচা ইগুরে মারিয়া কিচ্ছু অইত নায়
।

--- বুঝছি, উবা । অই কেন্ কেনাউরা । একদম সাফসাফ কইলা, তুই আমার লগে
আঠাইলর লাখান লাগি রইচছ কেনে । কেনে ইতা মোহরর গফ বানাইলে । আমারে দিয়া নি
মাটি কামলার কাম করাইতে । তোর ভকা বোবা ইগু আছে নানি খণ্ডল, আর গুটকির
দোকানদার সোনা । তারারে লইয়া মাটির তল থাকি বার কর তোর নানিহালি সম্পত্তি । অখন
ভাগ তোর বাল্টি লইয়া । আর কুন্‌দিন আমার ধারো কাছো দেখলে কিন্তু তোর একদিন কী
আমার একদিন । মোহরর মাটিত তোরেও গাড়ি লাইমু ।

--- ঠিক তো । তোমরা অউ কতা কইলায় । নানির কথা মানলায় নায় তো । মোহর আছে,
মেকুর সাহেবের মোহর । সোনার চাক্কা, আমি দেখছি । সব গাড়ি রাখছে সাহেবে বরই গাছোর
তলে ।

--- মেকুর সাহেব ।

আবার সমবেত হাসি । হাসতে হাসতে রাগে বৈতল । বলে,

--- আবার ঝাড়রে, নানি । মেকুর আবার সাহেব অয় নি । মেকুর তো বিলাই ।

--- বিলাই নায় ঘুড়া । ঘুড়ার নাম লিলি ।

--- আবার উল্টাপাল্টা মাতরে । দেখি তোর অউ চক্রবক্রা পেণ্ট অণ্ড খোল । তুই ঘুড়া না
ঘুড়ি দেখি লাই । লিলি কুনুদিন ঘুড়া হয় না বে আউয়া ।

--- আইচ্ছা তে ঘুড়ি অউ বালা । ঘুড়ি লইয়া আইত সাহেবে কেলাবো । হনো কাম করত এক
বিলুফুল ছুকরি । খুব সুন্দর ।

--- হিগুর নামও নি লিলি । সাহেবে বিয়া করি লই গেছে বিলাতো । অউত্ত গপ । ইতা আমরা
জানি ।

--- না বিয়া করত পারছে না, এর আগেউ মরি গেছে । সাহেব মরল তেতই গাছর তলে, মনর
দুঃখে ঘুড়াও মরি গেল । ইমলি গাছও মরি গেল ।

--- ভালোউত্ত সব মরি গেল, সব সাফ । মরল না কেউ মারল ।

--- কে মারত । ভৈরব বাবার শাপ ।

--- তুই কালু কই থাকি যাইরে, থামাইতে পারবে নি ।

--- আমার বাপে কইছে । আমার ঠাকুরদাদা সাহেবর দাড়ি কাটত । লিলির পাও নাল পিন্দাই
দিত । আমার বাড়িত অখনও আছে ঘুড়ার নাল ।

--- ঠিক নি, আছে নি । আনিছ চাইন, দেখমুনে ।

বৈতলের মন টগবগ করে ফোটে । আবার সে বরাক নদীর জলের ছলাছলাৎ শুনতে
পায় । শহরকে নদীর সঙ্গে জুড়ে দেয় এবার । কালুকে যখন বলে দিয়েছে তখন নিয়ে আসবে
নিশ্চয় ! দুখুকে দেখানো যাবে নদীর আকৃতি ।

শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে সাময়িক ঢেউ খেলে জায় দূর সরসপুর জঙ্গল থেকে বাঘ মারার
খবরে । মিয়াবাড়ির ছেলের সঙ্গে হিন্দুবাড়ির মেয়ে নন্দার পালিয়ে যাওয়ার খবরে । সেন্ট্রাল
রোডের চন্দবাড়ির সামনে কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হয়ে শোকপ্রকাশ করে অরুণ কুমার
চন্দর প্রয়াণে । কাছাড় জেলায় কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতার বিদায় । জোয়াল কাধে
জোড়া বলদ প্রতীকে তারপর রইলেন সতীন্দ্রমোহন দেব যতীন্দ্রমোহন দেব লস্কর
দ্বারিকানাথ তেওয়ারি ময়নুল হক চৌধুরী । বিরোধীপক্ষে আর কে কোথায় । অচিন্ত্য

ভট্টাচার্য বীরেশ মিশ্রা তো সরকার -বিরোধী তাই লুকিয়ে । তারাপদ ভট্টাচার্য কাছাড় হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন, গোলাম ছবির খান শহরের বিবেক হয়ে হিন্দু মুসলমানের মিলন সেতু গড়ে চলেছেন । শান্তির শহরে সাহেবদের রমরমা ধীরে ধীরে শেষ হচ্ছে । পুতুল দত্ত ভুতু চৌধুরীরা শহরের নতুন সাহেব, চা বাগানের মালিক । সেন্ট্রাল রোড থেকে সাহেব রুটির সবচেয়ে বড় যোগানদার ইসমাইলের দোকানও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে । সাহেব চলে যাচ্ছে, রুটি খাবে কে । খাসিয়া পট্রিতে একঘর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শুধু । জন স্মীল ও ক্রোজিয়ার কোম্পানির মালিকানাও বদল হয়ে গেছে । শিলচর থানায় তিন চোর ধরা পড়ায় শহর একটু সরগরম এখন । এর মধ্যে দুজন দাগি । দাগি দুজনের একজন বোবা অন্যজন ফাটকবাজার শুঁটকি ছত্তরের দোকানদার । নতুন চোর কালুরাম হাজাম সাহেব ক্লাবের সেলুন কর্মী । কালুরাম বন্দী হওয়ায় মন খারাপ হয় বৈতলের । দুদুটো উত্তেজক বিষয়ের সমাধান পিছিয়ে যায় । ঘোড়ার নাল দেখা হয় না বৈতলের, মোহর রহস্যেরও কোনও সূত্র পাওয়া যায় না । তবে বৈতল নিশ্চিত সে কালুরামকে ছাড়বে না । চুরির আসামি বেশিদিন হাজতেও থাকে না, জেলেও না । ছাড়া সে পাবেই অচিরে, খোনা গলায় এমন নাটক করবে যে জজ পুলিশ কেউই ধরে রাখতে পারবে না । বৈতলও তক্কে তক্কে ঘোরে তার রিক্সাগাড়ি পঙ্খীরাজ নিয়ে । তবে জেল রোড আর জানিগঞ্জ আর ফাটকবাজারের মুখেই সদর থানা । জেল রোডে জেল । বৈতলের চোখ কালুরামকে খোঁজে ।

চার্ট রোড এর তিনমাথার উপর জেলার এর সরকারি বাড়ি । বৈতলের রিক্সা সওয়ারিসহ থেমে যায় জেলটিলার মুখে । গোপালগঞ্জের মনিহারি দোকানের পাইকার গোষ্ঠ পাল-এর বাড়ি ইটখোলা ঘাট । বৈতলের বাঁধা সওয়ারি । দোকানে দোকানে ঘুরে তাগদা দেয় । বৈতল সর্বক্ষণের সঙ্গী থাকে । গোষ্ঠ পালের এক ভাড়ায় চৌকিদারও হয়ে যায়, পালকাকু জানে বৈতল সঙ্গে থাকলে তার খুতি নিরাপদ । কিন্তু আজ বৈতল কাকার সঙ্গী হতে পারে না । টিলার দিকে রিক্সা উর্দ্ধমুখি রেখে ব্রেক চাপে । বলে,

--- পাম বারই গেছে । আর যাইতাম নয় । আপনে দেখিলাইন আর একটা ।

--- অখন আমি কও চাইন ই মাঝপথো কই পাইতাম ।

--- পাইবা তিন মাথার মুখো উবাইন ।

--- তুমার আকতা কিতা অইল বা । পাম উম তো ঠিক অউ আছে ।

--- আপনে কুনু রিক্সা ড্রাইভার নি । পাম বুঝি আমরা । লামইন, যাইন পয়সা দেওন লাগত নায় ।

গোষ্ঠ পালকে নামিয়েই মুচকি হাসে বৈতল । পাওয়া গেছে, তার অভীষ্টে পৌঁছে গেছে । কালুরামকে পাওয়া গেছে । লোভী কালু বৈতলের কথা শোনেনি । চা বাগানের সাহেবকে বাংলায় গিয়ে দাড়ি কেটে আসতে বসেছিল । সাহেব বাড়ির ফাঁক ফোঁকর ট্রান্সক সিন্দুকের হদিশ আনতে বলে । বেটার আর তর সয় না । চণ্ডীঘাট বাগান থেকে ধরে আনে পুলিশ । এখন জেল দারোগার চুলদাড়ি কাটে আর সজিবাগানে খুরপি চালায় কালো ডোরার নিমা আর আগুরপ্যান্টে । বৈতলকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারে কালুরাম । বৈতলকে কে রোখে, সোজা ঢুকে যায় জেলবাগানে । কালুর মাথায় মারে এক কিল । বলে,

--- খাওয়াইতে নি আর বিলাতি সিগারেট । এখন তো তুই অউ অই গেচছ কাঞ্চির বাক্স । বিচরা আলা অইচছ । হালার হালা জানছ না, অতি লোভে তাতি নষ্ট । কুনদিন ছাড়ব জানছ নি ।

--- জানি না । আগে তো ধরা খাইছি না । ছাড়ব নিবা তাড়াতাড়ি ।

--- তরে তো ছনছি চুরির লাগি ধরছে না । হিতায়তো ছাড়া পাই লাইছইন । তুই তো খুনির আসামি । তর হাতো খুর আছিল । মেমসাহেবরে মারতে গেছলে ।

--- ইতা মিছা কথা ।

--- আমি জানি, কিন্তু পুলিশে যখন ধরছে ছাড়ব নি । খুন আর ডাকাতির লাগি যাবজ্জীবন অই যাইব ।

--- হে, আমারে বাচাও রেবা ।

--- কেনে, তোর জেল অউ ভালো, বিচরাত কাম কররে । খাইরে দাইরে চিত সুখে গান গাইরে আর কিতা । বউত পয়সা পাইবে বারনির সময় । তর আর কে আছে ক ।

--- কেনে, বাপ আছে, নানি আছে ।

--- মোহর আছে । ঘুড়ার নাল আছে । হালার হালা খালি নি গাইঞ্জা ঝাড়ুছ । তর লাগি দারোগারে কইতাম পারি । কইতেও ডর লাগে ।

--- তুমি চিনো নি দারোগারে । কও না ।

--- কইতাম পারি । আমার রিক্সাত অউত ভৈরব বাড়ি যায় ।

--- তে কও রেবা ।

--- কেনে কইতাম ক চাইন । বার অইয়া অউত্ত ঢুলা মারবে আবার । নানির গপ করবে, মোহর গপ করবে, ঘোড়ার নালর গপ করবে ।

--- আছে সব আছে, নানি তো মোহর বেচিয়াউ খায় ।

--- আর নাল । বেচি দিছে নি লুয়ার টুকরা ।

--- আছে ।

--- কই আছে কই দে, সব তোরে দিলাইমু, খালি লুয়ার টুকরা নিমু ।

--- পারতায় নায় । আমি নাতি অইয়াউ পারছি না ।

--- তর বাড়ির ঠিকানা ক দেখি । বৈতলে পারে না কিতা । দেখিছ । ডরাইছ না, ছাড়াইয়া আনমু যা ।

বৈতল ইমলিবাড়ি খুঁজে পায় । তারাপুর মেথর পড়ির গা-লাগোয়া বাড়ি । সর্বক্ষণ দুর্গন্ধ । লোকে বলে মালগুদাম । বিদ্রূপ করেই বলে, আসল মালগুদাম তো মালুগ্রামে । চাউল গুদাম । এত চালের বস্তা যে কোথা থেকে আসে । কয়েক বিঘা জমির উপর লাল বাড়িটার কোনও দরজা জানালা নেই । দুর্গাবতীও দেখেনি এমন বাড়ি । বৈতলকে বলে,

--- ই বাড়িত মানুষ থাকে নি । অত উচা করছে কেনে ।

--- জানো নানি, ইখানো বেঙে মূতলেও পানি অই যায় এর লাগি উচা করছে । সারা জিলার উগার । চাউল থাকে ।

--- অত চাউল কই থাকি আয় ।

--- কী জানি, ইছপল্টু দিয়া চাল রে ই চান্দর লাখান তেড়া করছে কেনে ।

--- চান্দ তেড়া না অইলে সুন্দর অইন না । চান্দ সবসময় তুমার লাখান, এর লাগি । লাল রঙ করায় আরো সুন্দর লাগের নানি ।

প্রশংসা করলে দুর্গাবতীর লজ্জা হয় । লজ্জায় লাল হয় । গ্রামের মেয়ে দুর্গাবতী শহরের কিছুই দেখেনি । তাই ওর অবাক-করা চোখে বৈতলের গর্ব আর ধরে না । বৈতল নিয়ে এসেছে বলেই না দেখা । রেলগাড়ির ঝমঝমি দেখেছে দেশে থাকতে । তিন চাকার রিক্সা দেখেনি কখনও, শিলচর রেল স্টেশনে সার সার রিক্সা দেখে অবাক হয়েছে । দুর্গার বিস্মিত চোখে চোখ লাগিয়ে বসে থাকতে পারে বৈতল । সুনামগঞ্জ সিলেট বিয়ানিবাজার করিমগঞ্জে রিক্সা দেখেছে বৈতল । রিক্সা দেখে বিস্মিত হওয়ার কারণ খুঁজে না পেলেও দুর্গাকে বলেছে,

--- তিন চাকার গাড়ি । মাইনষে চালায় ।

--- একেবারে রথর লাখান ।

--- রথ দেখলায় কই ।

--- ইতা শুনিয়া শুনিয়া ভাবি লাইছি । রামায়ণ মহাভারতো ছবিও দেখছি ।

--- চড়তায় নি ।

--- না, পয়সা লাগব । বাদ দেও পরে চড়মু নে ।

--- পরে কেনে তে । তুমার হাউস অইছে, অখন অউ চড়তায় ।

বৈতল মেয়েদের তুষ্ট করার ঔষধ জানে । অল্পেতেই খুশি হয়ে যায় মেয়েরা । ইমলি বুড়ির জন্য ইসমাইলের দোকান থেকে এক আনার গরম বানরুটি চারটে কিনে নেয় । গরম রুটির গন্ধে লোভ হয় বৈতলের । চারটে থেকে দুটো কমিয়ে রাখলেই হয় । কিন্তু মালগুদামের গন্ধে সব ভুলে যায় । ওয়াক আসে পেটের ভিতর থেকে । শহরে এমন মালগুদাম কয়েকটি আছে । খাসিয়াপট্টিতে একটা, একটা তারাপুর আরো আছে হয়তো জানে না বৈতল । গ্রামে তাদের এসব নেই । মাটির গর্তে পড়ে কালে কালে মাটি হয়ে যায় গু । বিষ্ঠা সংগ্রহ, জমানো

তার পর পোড়ানোর এত সব প্রক্রিয়া বৈতলও জানে না । বৈতলের যখন দুর্গন্ধে বমির ভাব
হচ্ছে তখন নালার পাশে বাচ্চারা খেলছে । বৈতল একদল বাচ্চার সামনে কিড়িং কিড়িং ঘণ্টি
বাজায় । বলে,

--- অই বাইচ্চা । কালু নাপিতর বাড়ি চিনছ নি ।

--- চিনি না ।

--- ইতা কিতা খেলরে বে ।

--- ডাগ্গি, তাস দিয়া খেলি ।

--- ইতা নি তাস । সিগারেটর বাক্সর কাগজ ।

--- অতাউ আমরার তাস । আর অউ পাথরর টুকরা ডাগ্গি । খেলতায় নি । এক পয়সা দেও
দশ পাতি দিমু ।

বৈতলের লোভ হয় খেলায় নামার, কিন্তু এক কাজে এসে অন্য কাজে জড়িয়ে যাওয়া
স্বভাব নয় তার । বলে,

--- খেলমু, অখন নায় । রিক্সা ইণ্ড দেখিছ রেবা । আগে নানির বাড়ি বার করি । এবার নানির
নাম শুনে বাচ্চারা খেলা থামিয়ে ছড়া কাটে,

--- মারমু ঘুড়া চড়মু গাড়ির বুড়ি নি ।

--- হে ।

--- তে আগে কইলায় না কেনে ইমলি বুড়ির বাড়ি ।

--- অখন তো কইলাম ।

--- তুমার হাতো কিতা ।

--- বনবিস্কুট ।

--- মেম খায় বিস্কুট । অউ বাড়ি ।

কালুরাম এক মহা ঢপবাজ । মাঝে মাঝে কিছু সত্য কথাও মিশিয়ে দেয়, বোঝা যায় না । কালু বৈতলকে বলেছে ওর নানির বয়স একশ বছর । বুড়ির চামড়া বুলে গেছে, মুখের শত কুণ্ডনেও অপরূপ রূপের ছটা হারিয়ে যায়নি । বস্তিবাড়ির ঘর এত পরিপাটি করে রাখে কে । সারা বাড়িতে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট । কিন্তু বৃদ্ধার এক চিলতে ঘরে যেন সব বৈভব সুন্দর করে সাজানো । সবচে বড় সম্পদ বুড়ি নিজে । সাধারণ তক্তপোষ থেকে একটু দামি খাট বিছানা । বৃদ্ধা শুয়ে আছে রানির মতো । ধবধবে সাদা কাপড়ে কালো রূপের ছটা ছিটকে বেরোচ্ছে ।

বৈতল যত দেখছে, তত অবাক হচ্ছে । একের পর এক প্রশ্ন জড়ো হচ্ছে মনে । অশক্ত এই মহিলাকে সাজিয়ে রাখে কে । বাচ্চাগুলো যে ছড়া কাটে, তার কই কোনও রহস্য আছে । বুড়ির নাম কেন এমন । ইমলি মানে তেঁতুল, কালুরাম তো তাই বলেছে । বৈতল শেষ প্রশ্নটাই করে বুড়িকে । বলে,

--- তুমার নাম ইমলি নি । ইমলি কিতা ।

--- আমরা বিহারী আছলাম । ঘুড়দৌড়র মাঠর মাঝখানো তেতই গাছর নিচে আমার জন্ম । আমার মাও কাম করত কেলাবো ।

একশ বছর বয়স হলে কণ্ঠস্বর খোনা ফোকলা হয়ে যায় । বুড়ির স্পষ্ট দাঁতো স্বরের কথায় ষোল বছরের বালিকার বেণী দোলে । বৈতল বুড়িকে লোভ দেখায় । বলে,

--- নানি, বনরুটি খাইতায় নি । ইসমাইলর দোকান থাকি আনছি ।

--- ইসমাইল কে । পাউরুটির কারখানা আছিল কেলাবো । কি গন্ধ রে ভাই । দে দেখি তর বন থাকিও গন্ধ বারর ।

বৈতলের মনের ধন্দ যায় না । বুড়িও কি কালুর মতো ফন্দিবাজ না সরল মনের । তাই মোহরের কথায় না গিয়ে অন্য কথা বলে,

--- তুমারে কে দেখে নানি ।

--- কালু এ দেখে ।

--- কালুরে দেখার কেউ নাই, হে তুমারে দেখব ।

--- আমার পুয়া আছে, কালুর বাপ ।

--- মাইনষে কয় হেও মদ খাইয়া তুমারে পিটায় ।

--- আমার পুয়ার মন ভালা ।

--- হাচা কথা কইলায় না নানি । তুমার বউত টেকা । মাটির তলে গাড়ি রাখছ । মোহর উহর ।

--- কালু আর তার বাপে নিয়া শেষ করছে ।

--- আমারে দেও না একটা ।

--- পাইবে । জামাই-বৌ গাছ চিনছনি । আছে মাটির তলে । সাহেবে রাখি গেছে আমার লাগি ।

--- আইছা বাদ দেও ইতা গাইঞ্জা গপ । তুমার কাছে বলে ঘুড়ার নাল আছে । ইন্তো লুলার টুকরা, দিলাও ।

--- আছে, দিতাম নায় ।

--- বস্তির পুয়াইন্তে ‘মারমু ঘুড়া’ কইয়া তুমারে চিড়ায় কেনে ।

--- কিচকামি করে । তোরে আমি চিনি, তুই বৈতল ।

বুড়িকে রাগিয়ে দিতে চায় বৈতল । সব রহস্যের দরজা জানালা খুলতে চায় । বুড়ি রাগে না । একশ বছর বেঁচে থাকার রহস্য জেনে নিতে বৈতল নানির গলা জড়িয়ে ধরে আদরে ।

দিনের শেষে দুখুকে সব কথা না বললে বৈতলের পেটের ভাত হজম হয় না । তাই ইমলি বুড়ি সন্দর্শনের তথ্য ও সত্য মিথ্যা মিলিয়ে জানায় তিন বন্ধুকে । বলে,

--- দেখিয়া আইলাম বেটা ঘুড়ার নাল । ঠিক যেলাখান তেড়া আমরার মধুরামুখো বরাক নদী । মাস্টারে কইছলা ঠিক অউ ।

--- আনচছ নি তে ।

--- আনছি ।

---দেখছ না ।

--- বাসাত রাখি দিছি ।

--- বালা করচ্ছ, দরজার উপরে লাগাই রাখি দিছ । বুৰা নজর থাকি বাঁচবে । তর বউ আবার অলা সুন্দর । কেউ হাত দিতো পারত নায় ।

--- হাতাইশ মন ঘি দি মাঞ্জিলেও কুত্তার লেঙ্গুর সিধা অহিত নায় । ভালা কথা মাতিয়ার ইখানো ঘরর বৌরে কেনে আনলে বে কুত্তা । আর ঘুড়ার নাল কেনে নিছি তুই বুঝতে নায় । তর খুপরিত ঘিলু নাই ।

--- অয় সব ঘিলু দিয়া তুই বিরিয়ানি বানাইবে । মাদরেছা খুলবে । ফাজিল পরীক্ষাত পড়াইবে ঘুড়ার নাল । নদী কিলাখান । বৈতল ছাবে কইছইন, ঘুড়ার লেইঞ্জর লাখান । তেউ ফাশ ।

--- তুই তো বেটা আধাখান জিন আধাখান ভূত । তোর গতি কই অইব ক । তুই ফাশও করতে না, ফেইলো করতে নায় । লটকি থাকবে, অউ মেকুর সাহেবের লাখান বরই গাছো ।

--- বরই গাছ দেখাইরে তুই আমারে ।

--- অয় দেখাইয়ার কিতা করি লাইবে ।

--- আধা বেটি কালুর লগে আর এক বিয়া দিলাইমু তোর । অতউ যখন পিরিত ।

--- অ, অখন বুঝলাম হালার হালার গুসার জড় । মোহর নি আমি একলা খাইলাই । দোস্তি দেখাছ বেটা ।

--- কালু ইগু ঠগ জানছ নি ।

--- কেমনে কইলে ।

--- মেকুর সাহেবের গপ বানাইছে । নাপিতে সাহেবের চুল দাড়ি কাটত । আর ছুকরি ইগু আয়ার কাম করত কেলাবো । সাহেবের লগে লেট পেট অই গেছিল । নাউয়া ইগুয়ে মানত কেনে, তার নু বউ । সাহেবের গলাত খুর লাগাই দিল, ঘুড়াও মারল । দুই লাশ লইয়া আইল

তেতই গাছর তলে । এমনেউ মাইনষে রাইত আয় না মাঠর মাঝখানো । গাছ কাটিয়া নাপিত
ধুনি জালাই দিল । অউত্ত গপ ।

--- তুই কিচ্ছু জানছ না ।

--- তুইন কিতা জানছ ।

--- নাপিত ইণ্ড একলা আছিল না ।

--- তুইন হক্কলতাউ খালি টানিয়া লম্বা করছ ।

--- অই বেটা বাড়ি, কওয়া কওয়ার কিতা । বেটি ইণ্ড লগে আছিল । ইমলি, তেতই । অউ
বুড়ির বাড়িত গেছলাম আইজ । একুশ বছর বয়স । কী সুন্দর বে বুড়ি, কিতা কইতাম ।
আমারে দিত নায় কইল ঘুড়ার নাল, দিল অউ না ।

--- তে নু কইলে ।

--- কইলাম আরি ।

দুখুর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার দুঃখ নেই বৈতলের । আসলে বৈতলের ভিতর যে
আবিষ্কারের আনন্দ টগবগ করে ফুটছে তার ভাগ নিতে পারে ঐ বেঁটে মানুষটাই । ঢপবাজ
কালু হাজামের ঠাকুরমাকে দেখেও বিস্মিত হয়েছে বৈতল । মনে হয়েছে শহরের জ্যান্ত
ইতিহাসের নড়াচড়া দেখে এল । মেকুর সাহেবের উপকথা সত্য হলে এক প্রজন্ম পরে সাদা
চামড়া ফিরে আসার বিস্ময়টাও কম নয় । বুড়ির মোহরকথায় গা করে নি বৈতল । কিন্তু
ঘোড়ার নালটা সে হাতিয়েছে । দুখুকেও মিথ্যে বলেনি একবর্ণ । ইমলি বুড়ির সৌভাগ্য বৈতল
ঘরে রাখে নি । বরাক নদীকেই সমর্পণ করে অল্পপূর্ণা ঘাটে । তাই বুড়ির মৃত্যুসংবাদে
আত্মীয়বিরোগের দুঃখে কাতর হয় । দুখুকে বলে,

--- শ্মশানো যাইতাম নি ।

দুখু না করে । কিচ্ছু একটা বুঝতে পারে । বলে,

--- বাদ দে, যাইছ না । এর থাকি চল নদীর পারো বই থাকি ।

দুখুর এই বন্ধুমন বৈতলকে আকৃষ্ট করে । বৈতল দুখুর হাত ছুঁয়ে দেখে । মনে হয় এই লোকটা থাকলে বৈতল নিশ্চিন্ত । বিপথগামী হলেও টেনে তুলবে । বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে । লড়তে লড়তে বৈতল বন্ধুত্ব মজবুত করবে । লড়াই কি কম হলো । এই নদীর আকার নিয়ে কত কথা । বৈতলের কোনও কথাই দুখুর পছন্দ নয় । ঘোড়ার ক্ষুরের বইকথা আর মানতে হবে না দুখুকে, নদীর আকার বৈতল নদীকেই দিয়ে দিয়েছে । খুরাদিল বাটি গ্লাস, গুলতির বাঁট, ভাঙা হাঁটুর উপমা কিছুই মানেনি । বৈতল বলে চাঁদের মতো, শিব ঠাকুরের মাথায় যে-চাঁদ, মসজিদের মাথার যে-চাঁদ । তাও বেটা মানে না । কাঁখে কলসীর উপমা তো বলেইনি । আসলে বৈতলই বুঝতে পারেনি তার সব উপমা, দুখু তার সব কথাই মানে, বৈতলের ছেলেমানুষিকে শাসনের মান্যতা দেয় । তাই দুখুকেই সত্য মানে, দুখু যখন নদীকে ডাকে ‘বড বেকা’, তখন মনে হয় আর সব নাম মিথ্যে, উপমা অর্থহীন ।

উপন্যাস

চৌদ্দ

শোনা যায়, নদীর ওপারে দুধপাতিল থেকে এপারে যখন চলে এল জেলা শহর, গুরু হয় নগরায়ন প্রক্রিয়া । তখন এই হরিৎবরণের মাটি পুড়িয়ে তৈরি হয় ইট । কলকারখানা বলতে চুন ভাটা এ মাথায় বরফ কল ও মাথায় প্রকাণ্ড দিঘীর পারে সাহেব বাংলো আর দুএক ঘর বসতি । হরিৎবরণ আর ইটখোলায় স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে সুন্দর বিহার আর পশ্চিম দেশের শ্রমিক কারিগরের । শহরের সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক অনুন্নত এই ভাগকে কিন্তু বরাক নদী পলিমাটি দিয়ে উন্নত করে বছরের পর বছর । বাৎসরিক প্লাবনেও বিধ্বস্ত করে ।

রাজব্যবস্থাও কিছু পাল্টায়নি স্বাধীনতার পর । হিন্দুস্থানি প্রজা আর জেলার চা শ্রমিকদের একচ্ছত্র নেতা হয়েছে হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন নেতা জমিদার যমুনা প্রসাদ সিং । প্রায় একদলীয় শাসনে গণতন্ত্র এবং আইনের প্রয়োগ কম, ফাঁকফোকর বেশি, সুবিধাভোগীর স্বার্থ রক্ষায় তৎপর । জমির উর্দ্ধসীমা আইন ও বিনোবা ভাবের ভূ-দান আন্দোলনের ভয়ে বিশাল জমির মালিক বাড়ির চাকর গৃহপালিত কুকুর বিড়ালের নামে জমির ভাগ বাঁটোয়ারা করে রেখে আইন রক্ষা করে । হরিৎবরণের জমিদারও যার ব্যতিক্রম নয় । স্বাধীনতার শিক্ষায় প্রজানুরঞ্জনের নবপাঠে দীক্ষিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও শ্রমিক কৃষক বান্ধব ভাবমূর্তি গড়তে তৎপর হয়েছে যম নেতা । স্বাধীন দেশের প্রজার উল্লাসে গলা মিলিয়েছে । বলেছে,

--- বন্দেমাত্রম কইয়া দেশ স্বাধীন অইছে । স্বাধীনতার অর্থ বুঝেনি । আর বৃটিশ নায়, রাজা মহারাজা জমিদার নায়, অখন রাজা অইল আমজনতা । কৃষক আর শ্রমিক ।

যম জমিদারের নতুন প্রজা বৈতলও শোনে প্রতিদিনের ভাষণ জমিদারের বৈঠকখানায় । বৈতল এ নিয়ে দুর্গাবতীর সঙ্গে হাসিতামাশা করে । বলে,

--- আম তো জানি চুকা নায় পুকড়া অয় । ই নতুন আম ইণ্ড কিতা কও চাইন । আমজনতাও কানা আম অইব । নাইলে আকতা বেটারে মানি লাইল সবে । হিন্দুর দেশ বানাইত যে বেটা, ঘাড় ধাক্কা দিয়া মুসলমানরে পাকিস্তান পাঠাইত হে নি আকতা কামলা দরদি অই গেল । ছাপার অক্ষরে কয় কৃষক শ্রমিক । কত দরদ হালার ।

বৈতলের জম-বিরোধিতা দুর্গাবতীর পছন্দ হয় না । বৈতলকে বলে,

--- ইতা কও কেনে, তারা বড় মানুষ ।

--- বড় মানুষ না আমার ইও । মুখ ছলাইছনা খামোকা ।

--- কেনে ইতা কও । তুমারে থাকার জাগা দিছইন ।

--- অখন আর ই ঘর আমার নায় । অখন হে তোরে দেখে । আমারে খেদানির তাল খুজের ।

দুর্গাবতী বৈতলের জমিদার-সংবাদ মজা দিয়ে শুরু হয়, শেষ হয় ক্রোধে আক্রোশে এবং দ্বৈরথে । এত সবেের পর বৈতল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই দরজায় শব্দ । দুর্গাবতী ঘরের বাঁশের দরজা আগলহীনই থাকে, তবু দুর্গাবতী খুলে দেয় । পুনা, কেতুমামার মেয়ে পুণ্যবতীকে দেখে দরজা আগলে দাঁড়ায় দুর্গা । ঘরে ঢুকতে দেয় না । কিন্তু পুনা দুর্গাকে ঠেলে ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর । দুর্গার পছন্দ নয় পুণার চালচলন । এমন খাড়ি মেয়ে, এখনও ফ্রক পরে ঘরের বাইরে যায় কলেজ-পড়া মেয়ে । বুকে দুটো শরীরকে বলে, তুই থাক আমি যাই । বৈতলের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো আর দাদা ডাকের বিপরীত ব্যবহারে দুর্গার রাগ হয় । বৈতলও ভাবে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত এমন ভরা যোয়ান মেয়ের কী কাজ জমিদারের বৈঠকখানায় । পুণা দুর্গাকে উপেক্ষা করে বৈতলের গায়ে টোকা দেয় । চোখ নাচিয়ে বলে,

--- যমুনাদায় তোমারে ডাকছইন, যাইতায় ।

--- কেনে ।

--- চা বাগানো বনাছ দিব নানি । আমরার ইউনিয়নের মেস্কার সব ।

--- বনাছ কিতা বে ।

--- বনাছ কিতা জান নানি । বৌদিরে জিগাও । হিহি । বৌ নাচ । গেলে পয়সা পাইবায় কুড়ি টাকা । আইয়া বৌ নাচাইবায় ।

বলেই হাসতে হাসতে চলে যায় নাচনি মেয়ে পুণ্যবতী । পুণ্যকে নিয়েও ধন্দ বৈতলের । যম জমিদারের কালো শেড্রলে গাড়ির ড্রাইভার কেতুমামা । সাদাসিধে মানুষটার মেয়ে-অন্ত প্রাণ । গুরুচরণ কলেজে মেয়েকে আইএ পড়তে ভর্তি করেছে । মেয়ে পড়াশুনায় ভাল । জমিদারের বৈঠকখানায় হরিৎবরণের গরিব বাচ্চাদের বিনাপয়সায় পড়ায় । বলে অবৈতনিক

শিক্ষকতা । জমিদারেরও মনে ধরেছে, তাই বাড়িতেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে । পুণার সঙ্গে নেতার নামও হবে । পুণার সঙ্গে যমুনাপ্রসাদের মাখামাখিটা ইদানীং বেড়েছে । তবে বৈতল জমিদারের স্বভাব নিয়ে ভাবে না । দুর্গাবতীর সঙ্গেও তার সমান মাখামাখি । সে-হিসেব বৈতলের নিজস্ব । তবে পুণ্যবতীর শরীরে একটা টান আছে, ভাল লাগে বৈতলের । মেয়েটার অনেক গুণও আছে । দুর্গাবতীর অকারণ শত্রুতা বৈতলের ভাল লাগে না । দুর্গাকে বলে,

--- তুমি দেখতায় পার না কেনে পুড়ি ইগুরে ।

--- কে কইল । তাইত বালাউ । তে জমিদার বাড়িত যেলা আওয়া যাওয়া শুরু করেছে কতদিন বালা থাকব ।

--- অউ মানলায় তো । নিজর মুখে কইলায় । জমিদার ইগু বাদুয়া । মাগিবাজ হালার হালা ।

--- ছিঃ কী মাতর ছিরি । আমি ইতা কইয়ার না, অত কষ্ট করিয়া, কী লেজারতি করিয়া পড়াইরা মামায় । আর তাই খালি ভুটর কাম করে । বিনাপয়সায় ছাত্র পড়ায় । চান্দা উঠাইয়া মানুষরে চশমা দেয়, আরো কততা করে । ঢঙটাঙ করে, তুমারে নাচাইয়া গেল । যাইতায় নি ভুবনডর । কইছে লাবকও যাইতায় পারো, ডারবি যাইতায় নি ।

--- এ তুমিও দেখছি ইউনিয়নআলি হই গেছো । অউহালারে জিতানির কাম কররায় নি ।

--- যাও না । ভাল পয়সা দিব ।

--- কত দিব ।

--- এমনে বুলে দশ টেকা দেয় । পুণায় কইছে তুমারে বিশটেকা দিব ।

--- কেনে, আমারে বেশি দিত কেনে ।

--- কথা না হুনিয়াউ নাচ কেনে । তুমারে কেশিয়ার করি নিব । এর লাগি বেশি ।

ক্যাশিয়ার হওয়ার লোভে বৈতল যায় পাতিমারা চা বাগান । কাছারির মাঠ থেকে সকাল সাতটায় রওয়ানা হয়ে যায় গাড়ি । সারিসারি জিপ গাড়িতে নাম ধরে ধরে উঠিয়ে দেয় ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক । পুণ্যবতী বৈতলকে বুঝিয়ে দেয় কী করতে হবে , টাকার হিসেব থেকে বড় কথা নিরাপদে নিয়ে আসা । সদরঘাটের জুড়িন্দায় পার হয় গাড়ি । সব

যাত্রী নেমে যায়, ওপারে গিয়ে আবার ওঠা । ড্রাইভারের পাশে হরিৎবরণেরই নানুক আর ভোলা বসে এসেছে কাছারি থেকে, ওরা কাজ করবে বৈতলের সঙ্গে । ক্যাশিয়ারের উপরে তো নয় ওরা, তাই বৈতল দৌড়ে উঠে যায় সামনের সিটে । একজনকে যেতে হবে এবার পিছনে কাঁঠালঠাসা হয়ে কিন্তু তিনজনেই যেহেতু টিঙটিঙে তাই অসুবিধে হয় না । শুধু ড্রাইভার গিয়ার বদলাতে গিয়ে বিরক্ত হয় । আর বৈতলরা হাসে । নানকুর উদারবন্দ পর্যন্ত খুব চেনাপথ । মধুরামুখ থেকে হাতিছড়া পর্যন্ত গরুর গাড়ি চালায় । বাঁশের গাড়ি । জিপগাড়ি কাঁচাকাণ্ডি মন্দিরের সামনে এসে থামে । সবাই ভক্তি ভরে প্রণাম করে, ড্রাইভার নেমে গিয়ে প্রণামী দিয়ে আসে । হাতিছড়া থেকে ভোলা পথ দেখায় । বলে,

--- যমুনাদা যখন দিল্লি গেলা, আমি আইছি তান লগে, অত মাল কে টানত, খালি ছোট ছোট চা-র পেটি তিন বাক্সত, এমপি মন্ত্রী বহুতর লাগি । ইদিকে একবার উল্টা রাস্তাত ঢুকিয়া যাইন । অউ দেখ সীতানাথ গোসাইর মন্দির, তান গুরু । গুরুরে প্রণাম না করিয়া কুনুখানো যাইন না ।

বৈতলকেও শুনেছে এই গুরুর নাম । গুরু শিষ্যের জন্য সব করেন । শহরের বেশির ভাগ মান্যগণ্যরাই তাঁর শিষ্য । গরিবেরও গুরু তিনি । গুরু পূর্ণিমার সময় মন্দির লোকে লোকারণ্য হয় । তিন বিঘা জমির উপর মন্দিরে কেউ প্রসাদ না পেয়ে যায় না । ভোলা বলে এক ভিন্ন গল্প,

--- যমুনাদার লাগি রসগোল্লা বড় বড় রাজভোগ । আর আমরার লাগি কড়া কড়া বইর বিচির লাখান । তে পুড়ি রেবা তুমরার পুণ্যবতী । দাদার লগে আইছিল তো, আমরা কইল, খাইও না তুমরা । গুরুরে নায়, যেতায় ইতা দেইন ইতারে কি ধমকানি ধমকাইলো । কইল, আইজ থাকি ইতা চলত নায়, খাইলে হক্কলে খাইব একতা, নাইলে কেউ কিচ্ছু না ।

--- অখন কিতা ঠিক অইছেনি ।

--- অইত না কেনে । পুণার কথা না মানিয়া উপায় আছে নি ।

--- হাচাউ কইচছ, পুড়ি ইগু বাঘর বাইচা ।

--- আইচ্ছা বা বৈতলদা । আইচ্ছা ড্রাইভারদা ডাইনে ঘুরাই নেও না, খাসপুরেদি আইয়া গেলে
পাতিমারা তাড়াতাড়ি পড়ব ।

--- চুপ মারি বও না কেনে, আমার চালানি আমি চলাইয়ার । আরো তিন বাগানো নামানি
লাগব তার পরে তুমরার পাতিমারা সবর শেষে ।

কিছু দূর যাওয়ার পর বৈতলের ঠাণ্ডা লাগে । ভোলাকে বলে,

--- ঠাণ্ডা লাগের কেনেবে ।

--- পাহাড়ো উঠছ নানি ।

--- অয় জয়ন্তিয়া পাহাড়োও অলাখান ঠাণ্ডা আছিল ।

--- না, ইখানো হাফলং পাহাড় ।

--- অ এর লাগি অউ । অনো লামতাম নি আমরা । অত উচাপাড়ো যে চা অয় দেখছি না ।

--- তুমি আবার চা বাগান কই দেখলায় শর্মাদা ।

--- কেনে বেটা, ইতা চা বাগান তো পুয়া । চা বাগান দেখছি আমার শ্রীমঙ্গলো । একবার
সাজাইল বাগান । চাঘরের ধারে দি গেলে মনে লয় সারাজীবনের চা খাই লিছি । অলা সুন্দর
গন্ধ । ইতা আর দেখতাম নায়'রে জীবনে ।

বৈতলের দুঃখ আনন্দে বদলে যেতেও সময় লাগে না । পাহাড় ঘেঁষা পাতিমারা চা
বাগানের সৌন্দর্য ওর মনকে আক্লুত করে । চা ঘরেও ফিরে পায় সেই ঘ্রাণপানের আস্বাদ ।
চাঘরের সামনেই অফিস ঘর, যেখানে তলব হয় । তলব ঘরের সামনেই বসেছে বোনাসের বাবু
টেবিল । ইউনিয়ন নেতা রামচন্দ্র কৈরি একটা টেবিল এনে জুড়ে দেয় বোনাস বাবুর পাশে ।
ভোলা লেখাপড়া জানে, সে খাতা নিয়ে বসে পড়ে টেবিলের পাশে বেঞ্চিতে । আর বৈতল তো
কিছুই জানে না, সে ক্যাশিয়ার । যম জমিদার বলে দিয়েছে, টাকা যেন অন্য কারো হাতে না
যায় । রামবাবু বৈতলের জন্য একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করে । কিন্তু বোনাসের কোনও খবরই
নেই । দশটা থেকেই বসে আছে সবাই । এগারোটা বাজে, বারোটা বাজে টাকা আসে না ।
ঐদিকে রামচন্দ্র খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ওদের জন্য । বলেছে দুপুরে মুরগি হবে ।

পুরুষ মহিলার একটা অংশ নেচে যাচ্ছে মত্ত হয়ে । মাঝে মাঝে উত্তাপও ছড়াচ্ছে অকারণ ।
মালিকের নাম ধরে গালাগাল দিচ্ছে নেশাডুরা । রামচন্দ্র কৈরি নেতাসুলভ দাপটে কথা বলছে
বাবুদের সঙ্গে । বলেছে, হাঙ্গামা হলে ওরা দায়ী নয় । মিনমিনে বাবুরা আর কী করে, বলে
শিলচরের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আসতে আসতে দুপুর হয়ে যায় । রামচন্দ্র বৈতলকে বলে
এরকম হয় । উঠবস করে করে বৈতলের ভাল লাগে না , নানকু আর ভোলাকে বলে
দুগ্ধাস হাড়িয়া মেরে আসতে । ভোলা নানকু বৈতলকেও সঙ্গে চায় । বৈতল রাজি নয়, একসঙ্গে
দুই কাজ হয় না তার, পুণ্যবতী তাকে বড় মুখ করে পাঠিয়েছে ক্যাশিয়ার করে । মান রাখতে
হবে মেয়েটার । এদিক ওদিক একা একা ঘোরে বৈতল । অনেকের সঙ্গে কথা হয় । এরা বড়
গরিব, বৈতল থেকেও হতচ্ছাড়া দশা । একজনের নাম লক্ষ্মীমনি, লক্ষ্মীমনি নামের পুরুষ আগে
দেখে নি বৈতল । যার নাম তাকেই বলে,

--- লক্ষ্মীমনি আবার বেটা নি । আমারে আউয়া বানাইরে নি ।

--- সচ বলছে, আমি লক্ষ্মীমনি বটে । লক্ষ্মীমনি রাউত । হামার বউ আছে সুখিয়া । চল
হামার ঘরে, দেখবি ।

--- ঘরো কিতা আছে । হাড়িয়া খাওয়াইবে নি ।

--- হাড়িয়া খাইবু । চল, দোকান থেকে খাবু ।

--- না না, দোকানো খাইতাম নায় ।

--- আমি পয়সা দিবে । হেই দেখ ।

--- অত টেকা কই থাকি পাইলে বে ।

--- হুহু । হামার বহুত পয়সা আছে । অউর ভি আছে একটা গাউরি । বিচে দেব ।

--- গাউরি কিতা ।

--- শুওর শুওর । তোকে খাওয়াব । আইজ আমি ঘরে যাবেক নাই । সুখিয়া লেড়কির শাদির
জন্য শুওর পালছে দুটা । আমি একটা বেইচে দিলাম ।

--- আইছা বাপ তো তুই । একটু পরেউ তো বনাচর টেকা পাইবে । তে কেনে বেচলে ।

লক্ষীমনি রাগে, হাসে, আবার হাসে । চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ । তারপর আবার হাসে । বলে,

--- হামার লেড়কির উমর একসাল । বাপ বলে না, খালি মা মা করে । আর বোনাসের কিসসা কী বললি । বোনাস উনাস কুছু না । বোনাস তো দেয় একবার দুর্গাপূজার টেইমে । দুই সাল আগে মজদুরি বেড়েছিল তিন পয়সা হণ্ডা । তখন দেয়নি এখন এরিয়া দেবে । টিপ দেব, পয়সা পাব নাই । তুই সব লিয়ে যাবি । ইউনিয়নের লেভি লিবি । দুই টেকা বকেয়া হলে হামি পাব আঠআনা । বাকি সব রামবাবু লিবে, তর বেগ মোটা হবে, চলে যাবি শিলচর । বিলাইতি দারু খাবি, মাংস খাবি, শালার লেতা হয়ে ফুর্তি করবি মেয়ে ছেলা নিয়ে । হামার টেকা ঠগিয়ে লিয়ে যাবি । থু ।

হয়তো লক্ষীমনির নেশা চটকে যায় । তাই বৈতলকে ছেড়ে চলে যায় তার নিজের মানুষের দিকে । হয়তো বকেয়া টাকার জন্য লাইন দিতে যায় । কারণ ততক্ষণে টাকা এসে গেছে । বৈতলও তার ব্যাগ নিয়ে বসে পড়ে লেভি আদায়ে । বকেয়া পাওনা বা এরিয়ার শব্দে কোনও উৎসব হয় না । তাই অকাল বোনাসের ধুম লাগে পাতিমারা বাগানে । আরো সব বাগানে । লক্ষীমনির কথাকে সত্য করে একজনের পাওনা ষোল টাকায় সতের টাকা আট আনা লেভি ধার্য হয় এক উদ্ভট নিয়মে । এক টাকা আট আনা তিনটে তলবদিনে আট আনা আট আনা করে কেটে নেবে রামচন্দ্র কৈরি । কৈরি নেতার হাবভাব চালচলনে বৈতল যম প্রসাদ সিং জমিদারের মিল খুজে পায় । যেন দুই হারিয়ে – যাওয়া ভাই এর একজন পাতিছড়ায় অন্যজন তার সৌভাগ্যকে সঙ্গী করে হরিৎবরণের বৃহৎ পরিসরে বড় নেতা । বড় সুখের ভাগীদার ।

জমিদার যমুনাপ্রসাদ শহর থেকেও শহরের নিয়ম মানে না । গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ধার ধারে না । নিয়ম মানলে নেতা কেন । কেন রাজসম্মান । শহর পুরোনো হলেও নাগরিক মানুষের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয় । একতলা দোতলা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রশস্ত ফুল ফুলের বাগান সাজিয়ে থাকে সচ্ছল পরিবার । আর খাসিয়াপট্টি টিকরবস্তি ঘনিয়ালাবস্তির একাংশ এবং নাগাপট্টিতে থাকে কায়িক পরিশ্রমের বৃত্তিধারীরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে । নগরোন্নয়নের পরিষেবার দায়িত্বে আছে একটি পুরসভা, নদীর পাশে পুরসভার আছে সুদৃশ্য ভবন । গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনেরা নির্ধারণ করে সুখ-সুবিধার মাত্রা । হরিৎবরণের

জমিদার ওসবের ধার ধারে না । নবীন জমিদার তথা জননেতার কথাই শেষ কথা, তাই পার্শ্ববর্তী খাসিয়া পট্টিতে থাকে খানাখন্দ কাঁচারাস্তা, রাজবাড়ির পথে পাথরকুচি আর পিচের ড্রাম নামে রাজপথ তৈরির জন্য ।

পণ্ডিতদের মতে শহরটি অর্বাচীন না হলেও স্থায়ী কোনও জনগোষ্ঠীর পরিচয় মেলে না । নদীর ডান দিকের নাথ লস্কর মনিপুরি ছাড়া বাকি সবাই সিলেটি । পাশাপাশির বড় শহর বলে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে মানুষ এসেছে শিলচর । নামের মিল করার জন্য শ্রীহট্ট নামটিও পাল্টে গেছে সিলেটে । ধ্বনিসাদৃশ্য সিলেট আর শিলচরে আত্মীয়তা হয়েছে । পশ্চিমের বিহার যুক্তপ্রদেশ থেকে এসেছে নগণ্য কিছু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ । বাঙালি ব্যবসা বিমুখ জাতি বলে ভিনদেশি মাড়োয়ারিরাও জাঁকিয়ে বসেছে নদীর বাঁকের কাছাকাছি জানিগঞ্জে গোপালগঞ্জেও । সিলেটি বাংলার আত্মীয় হয়ে গেছে মুখের কথায় । নদীর ভাটির দিকে একটু এগোলেই সদরঘাট, জুড়িন্দায় নদী পারাপার । নদী না পেরোলে বিমানবন্দর যাওয়ার উপায় নেই । গৌহাটি আর কলকাতার দুটি মাত্র উড়ান । বিশাল আকারের নদীসেতুটি অনেকদিন থেকেই অর্ধসমাপ্ত ।

লেভির টাকা আদায় করতে গিয়ে বৈতলের অনেক শিক্ষা হয়েছে । শিখেছে কী করে গাছে বসে গাছের গোড়া কাটতে হয় । ভোলা রজকের সঙ্গে একদিনের সঙ্গ তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে । ভোলার মতো ছেলেরা সব জানে সব বোঝে কিছু বলে না । একটু হাঁড়িয়ার টোপ দিলে উগরে ফেলে । যম জমিদারের অনেকের মধ্যে এক দেহরক্ষী সে । লেখাপড়াও জানে কিছু কিছু । জানে অনেক কিছু । বৈতল তো শহরের এমাথা থেকে ওমাথা, এদিক শ্রীকোনা ওদিকে ফকির টিলা পর্যন্ত, চামড়া গোদাম থেকে মালুগ্রাম শিববাড়ি টিকরবস্তি থেকে বিলপার নাগাপট্টি কোথায় না গেছে । তবু ভোলার মতো এত জানে না । উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে ভোলা তাকে সব শোনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ । ভোলার গর্ব তার শহর নিয়ে । বলে,

--- দেখো রেবা উঝাদা, মাল খাওয়াইছ এর লাগি কইয়ার না, তুমি বড় ভালো বেতর লাখান সপাংসপাং কথা কও, কেউরে চুকো না । তেও কই যেখানো থাকবায় হিকানরে ভালো পাওন লাগব । মাটিরে চিনন লাগব । কও চাইন দেখি আমরার সিনেমা হল কয়টা ।

--- তিনটা, ইতা জানি, গীতশ্রী ওরিয়েন্টল আর মাঝখানো কিতা একটা আছে রবি লালার ।

--- কলাবতী । ইন্স্কুল কলেজ কয়টা আছে কও ।

--- কলেজ একটা জানি । ইন্স্কুল জানি কাছাড় ইন্স্কুল নরসিং ইন্স্কুল অধরচান্দ বিদ্যাপীঠ
পাবলিক ইন্স্কুল পুড়িত্তর স্বদেশি আর শিলংপট্টিত একটা ।

--- টাউন মাদ্রাসা কইলায় বা । সূর্য কুমার তর্কসরস্বতী টোল আছে নানি । ইস্টিশন একটা
ডাক্তারখানা সিবিলা হাসপাতাল ।

--- কেনে আমার মূর্তজা ডাকতর ।

--- ই ত ভর্তি । হে তো কম্পাউন্ডার । বিভট কত বড় ডাকতর । অমূল্য হালদার নলিলাক্ষ
চধরি এরাও বড় ডাকতর । ফাটক বাজারর লাখান অতবড় বাজার দেখছ নি কুনাখানো, কত
ছত্তর ।

বৈতল বড়বাজার দেখেছে অনেক । সিলেটেই কত, জিন্দাবাজার বন্দরবাজার বড়
হলেও ফাটকবাজারের বিশালত্ব দেখা যায় বৃহস্পতিবার বাজারবারে । ভোলা আরো যে – কথা
বলে না সে হল দেহব্যবসার ঠেক নাগাপটি লাগোয়া । বৈতল গ্রামের মানুষ, উকিল ব্যারিস্টার
জজ শিক্ষক ডাক্তার ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশাদারের জন্য জনপদের এমন বিন্যাস দেখেনি এর
আগে । উকিলপটি নাজিরপটি সঙ্গে সঙ্গে প্রেমতলা যে কেমন নাম । তবে নিম্নবর্ণের বৃত্তি
বিন্যাস দেখেছে গ্রামে । চাষীদের আলাদা মাছুয়াদের আলাদা লুহারু হাপর চালায় যারা তারা
থাকে গ্রামের শেষে সীমায়, কর্মকার কুম্ভকারদের আলাদা আলাদা বসত থাকে একই গ্রামে,
যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থরা থাকে । শহরের পাইকারী ব্যবসা মূলত মাড়োয়াড়িদের হাতে, নাহাটা
গুলগুলিয়া ভুরা সারদা । কিছু সাহা বণিকও আছে, মিলে মিশে । মারোয়ারিরা জুতোর ব্যবসা
করে না, সাহারাই প্রধান ফ্লেক্স বাটার বাইরে । কুমিল্লার বটুক দত্তর ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল রোডে,
নদীর পারে ইম্পিরিয়াল । ভুইঞাদের বিশাল কারবার, বাৎসরিক ঝুলন উৎসবের জন্য
বিখ্যাত, বিলপারের রাধামাধব আখড়ায়ও হয় ঝুলন । খান সাহেব গাভরু মিয়ার বিশাল ব্যবসা
দেওয়ানজি বাজার বেরেঙ্গা মধুরবন্দে । শহরের অন্যান্য এলাকায়ও আছেন ধনাঢ্য তথা
বুদ্ধিজীবী মুসলমান । আর আছেন যারা বহুকষ্টে পয়সা জমিয়ে দীর্ঘ জলযাত্রার শেষে মক্কা
থেকে হাজি হয়ে ফিরছেন তেমন ধর্মপ্রাণ । বৈতলের বন্ধু দুখুরও খুব ইচ্ছে একবার হজ করে
আসে । সে ধর্মাচরণের প্রতিটি পুঞ্জানুপুঞ্জ পালন করে । আর বৈতলের সঙ্গে ঝগড়া লড়াই

করে । বৈতল জানে দুখু ওর সঙ্গে লড়াই করে সমকক্ষ ভেবে, বন্ধু ভেবে । বিধর্মী বন্ধুর প্রতি একটা টান আছে তার । বৈতলও তার সব দুঃখ ভুলে থাকে দুখু সঙ্গে থাকলে । ইমলিবুড়ির ঘোড়ার নাল চুরি করে বৈতলের দুঃখ হয়নি, বরং এক আবিষ্কারের আনন্দে বরাক নদীতে বিসর্জন দিয়েছে তার অদেখার দেখা সত্য । এক লোহার টুকরো দিয়ে একশ বছরের রমণী কী করে । মোহর তো চুরি করেনি বৈতল । কিন্তু ইমলিবুড়ি মরে যাওয়ার পর বৈতলের কষ্ট হয়েছে, তবে কি ঐ লোহার টুকরোর শোকে মরে গেল । বৈতলের মন খারাপ হয়ে যায় । বন্ধু দুখু বুঝতে পারে সব । নিয়ে যায় নদীর পারে । দুই বন্ধু অনেক সময় কাটিয়ে দেয় কথা বলে, চুপ করে বসে থাকে । অনেক কথার পর দুখু নতুন কথা বলে,

--- অউ দেখরে, পানি আর পানি যার । আওয়া পানি যাওয়া পানিরে মনো রাখের নি ।
দুনিয়ার নিয়ম বদলাইতে পারবে নি ।

বৈতল তার স্বভাবসিদ্ধ ত্রুষ্কতায় বন্ধুর কথার জবাব দেয় । বলে,

--- অই বেটা হুন, ইতা পিরাকি মাত বৈতলর লগে মাতিছ না । তুই আমারে কিতা জানছ ।
মরা মানুষ লইয়া কান্দিয়ার নি । অউ পানিত আমি মানুষ মারিয়া ফালাই দিছি, হিগুও আমার
বন্ধু আছিল । তোর মতো বাঙাল এগুরে আমি মারছি জানছ নি ।

--- তুইন । মানু মারচছ । কে মানব ক ।

--- তুই তো আমারেউ মানছ না ।

--- মানি নাতো । তুইন বেটা গুণামি করছ, বেটাগিরি দেখাছ তুইন ইতা কিচ্ছু নায় ।

তোর মন লরম । তুইন কিচ্ছু মানছ না কেনে ।

--- কিতা মানতাম । তোর আজারি মাত নি ।

--- কেনে তোর ভগবানরে তো মানতে পারছ ।

--- কে কইল মানি না । আমি সবরেউ মানি । আমি পাকিস্তানো কই থাকতাম জানছ নি ।
কালিমন্দিরো থাকতাম ।

--- ইতা জানি, গাইঞ্জা খাওয়ার লাগি ।

--- মদও খাইছি বাবাজির লগে । তুই কিতা ভাবছ তুই কিচ্ছু খাছ না এর লাগি তুই সাধু,
আল্লা পাইলাইবে । তুই বউ মারচছ সবে জানে । তুই অখনও লুকাই লুকাই বেটিনতর কাছে
যাছ । যাছ না । বছইর বৌর লগে তোর ইও নাই ।

--- ইতা বাদ দে । যে কথা কইয়ার হ্ন ।

--- ক !

--- মনর শান্তি পাওন লাগব ।

--- কিতা করতাম এর লাগি । অউত্ত তুই আচছ শান্তির মা, বছই আপদ ইগুইন্ত থাকলেও
শান্তির নাতিপুতি । বাড়িত বউ আছে । পুড়ি আছে আর কিওর শান্তির বাড়ি ।

--- আরো লাগে বেটা । আমার কুনু ভয় ডর নাই জানছনি ।

--- আমারও নাই, এর লাগি কিতা ।

--- আমি চউখ খুলা রাখলেও দেখি, বন্দ রাখলেও দেখি । আমি সব সময় আল্লাপাকর ভরসা
পাই ।

--- আমার ইতা নাই । ভগবান উন থাকলে তোমরা আছো, থাকো । খাও দাও ঘুমাও আমার
কিতা ।

--- নারে, মানন লাগে । অখন মানিলা, ভাল লাগব ।

--- কারে মানতাম । শ্যামসুন্দর আখড়াত যাইতাম নি । ঘনিয়ালার মজিদো গিয়া নমাজ
পড়তাম নি, রোজা রাখতাম নি । কাছারির গির্জা ঘরো গিয়া বই থাকতাম নি ডনাল সাহেবের
লাখান । আমি হক্কলতাউ পারি, ইতায় আমার কিচ্ছু হয় না, পুতায় না । অত যে মদ খাই
গাইঞ্জা খাই আমারে দেখচছ নি পাও টলতে । তে টলে । আমি কইয়ার তোরে, মামুর পাওর
তলে বই থাকলে টলে, আমার দুনিয়া হিলি যায় । তাইন মাইনষর মতো মাতইন না এর লাগি
তাইন আরো ভাল । তান কুনু পিরাকি ভাও নাই । ভাল থাকিছ, ভাল চলিছ ইতা কইন না
। কিন্তু আমি তানে ডরাই । তান আদররে ডরাই । আদর পাইলে বেটা সব হয় ।

--- মামু আমার দাতা । তান কথা আলেদা । যেতাউ কছ আমার নানি খুব হাউশ একবার মক্কাত যাইতাম ।

--- যাছ না কেনে, কে আটকাইছে ।

--- একবার কাবা দেখতাম, ইসতিসলাম করতাম । একবার মিনাত যাইতাম । জমজমর পানিত হাত দিতাম । পারমু নিবে ।

--- পারতে না কেনে বেটা ।

--- বলত টেকা লাগে নু ।

--- কত লাগে ক । এক রাইতেউ মারি দিমু । নছিবালা হাকিমর পুকইরো যে অত হলইদ রাখছি ইতা কিতার লাগি ।

--- ছি, ই পয়সা লইয়া যাইতাম নায় । পাক পয়সা ছাড়া অইত নায় ।

--- পয়সাত আবার পাপপুণ্য লেখা থাকে নি । ঠিক আছে আমি রিক্সা চালাইয়া পয়সা দিমু তোরে, দিনে রাইতে চালাইমু । হাউস অইছে যখন তুই যাইবে । আর কেউরে কইছনা । তুই যাইবে । বৈতল থাকতে পয়সার লাগি ডরাইছ না দোস্তু ।

বৈতল মনে করে গুরুদক্ষিণা দিচ্ছে । গুরু সৃষ্টিধর চেয়েছেন বৈতলকে নিয়ে কামাখ্যা দর্শনে যাবেন । কাশী যাবেন মথুরা বৃন্দাবন যাবেন নবদ্বীপ যাবেন । অযোগ্য শিষ্য পারেনি, পালিয়ে এসেছে দেশ ছেড়ে । গুরুর মতো এক বন্ধুর শুদ্ধ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে গুরু সৃষ্টিধরের উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রণাম করে বৈতল ।

পাতিমারা চা বাগান থেকে লেভির টাকা নিয়ে ফেরার পথে বৈতলের মুঠো থেকে বন্দুকের গুলি ছোটে । ভোলার মুখে মারে মুঠো করা হাত । পুণার সঙ্গে শয়তান জমিদারের নাম জড়িয়ে কুকথা বলে ভোলা । পুণ্যবতী শুধু কেতুমামার মতো ভাল মানুষের মেয়েই নয়, পুণা তার আদরের মেয়ের মাস্টারনিও বটে । দুর্গাবতী পুণাকে জড়িয়ে বৈতলের সঙ্গে রসিকতা করে । পুণা খারাপ মেয়ে হলে দুর্গাবতীর চোখ এড়িয়ে যাবে না । বৈতল দুর্গাবতীর চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখে ঠকেনি । তাই ভোলাকে শাস্তি দেয় । দুজন সারাপথ কোনও কথা বলে না, একই পথে ফিরে আসে বরাক নদীর ফেরিঘাটে । আবার জুড়িন্দা আবার সদরঘাট । রাত আটটায়

নদীর পারের শ্রমিক কল্যাণ অফিসে টাকা সমঝে দেয় পুণার হাতে । বৈতল নিজের হাতেই
সই করে সৃষ্টিধর শর্মা । খাতায় ওর নাম নেই লেখা আছে উঝাদা । বৈতল নামটা চালু করার
চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউই ডাকতে চায় না অকর্মা নামে । ছোটরা সমীহ করে, উঝাদা ডাকে ।
বড়রাও অপ্রস্তুত হয়, উঝাই ডাকে । হরিৎবরণে বৈতলের পরিচয় যে মনসামঙ্গলের গায়ক
পাঠক, নর্তক তাই হয়তো সম্মানের উঝা, উঝাদা । শুধু তিন বন্ধু ডাকে বৈতল । বৈতল
যতটুকু শিখেছে পড়তে সব লুলার কাছ ঠেকে । সাপের ওঝা রুল আমিন বেজ হয়ে যায় কবি
দিলবাহার বাঙাল । লিখতে শিখিয়েছে বৈতলকে তার কন্যা । বাপ মেয়েতে এক সাথে শিখেছে
অ আ লিখতে । লাল মলাটের বর্ণপরিচয় থেকে অক্ষরের ছবি ঐঁকেছে শেলেটে, খাগ কেটে
কলম বানিয়ে লিখেছে কাগজে, রাজহাঁসের পালকের কলম বানিয়ে, পি এম বাগচির বাড়ি কালি
গুলে বৈতল লিখে চলেছে ওঝা গুরুদের রচনা, মনসাপাঁচালি সংগ্রহ করেছে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ।
বৈতলের সুন্দর হস্তাক্ষরের তারিফ করে সবাই । পুণাও করে । বলে,

--- কাছাড়ি মাইনষে ছাপার অক্ষরে মাতইন কেউ কেউ । তুমারে দেখলাম ছাপার অক্ষরে
লেখতায়ও পারো । অত সুন্দর তুমার অক্ষর রেবা উঝাদা । আমার লেখা যে ছেরেং বেরেং ।
তুমার লাগি হিংসা হয় ।

--- হিংসাইছ না রে বইন, আমি অইলাম মূর্খ মানুষ, আমি লেখাপড়া উড়া জানি না, বই দেখিয়া
ছবি আকতাম পারি খালি ।

--- লেখা তো ছবি আকাউ । ছবি আকিয়া মনর কথা কওয়া । আগে মাইনষে কত কষ্ট করছে,
পাথর খোদাই করিয়া লেখছে ।

--- কেনে চিঠি আছিল নানি, পোস্ট কার্ড ।

--- না, কিছু আছিল না ।

--- তে নু মাইনষে কয় পারোর পাও বান্ধি পাঠাই দিতা চিঠি রাজার পুড়ির কাছে ।

--- ইতা তো হিদিনর কথা

--- আইচ্ছাতে । তুমার কাছে নি আয় পারো উরো ।

--- আমি কুন্সু রাজার পুড়ি নি ।

--- অউ ইটখোলার ভোলা ইণ্ড কিতা ক ছাইন । ইণ্ড বুলে বিএ ফাশ । তোর লগে কিতা ইণ্ডর ।

--- কেনে কিতা অইছে । হে অউত্ত ইতা আমার মাখাত ঢুকাইছে । মাইনমর ভালা করত ।
বিনা পয়সাত পড়াইত, ডাক্তার দেখাইত, চশমা দিত । হে নেতা অইত ।

--- আর ইবায় নাই চাম, জমিদারর বাইচায় চাকর খাটার । হে কিতা লাঠিয়াল নি । তুই কছ
না কেনে ভালা অইত ।

--- আমি কইছি ইউনিয়ন অফিসো চাকরি করত । যমুনাদাও রাজি আছলা । হে করত নায় ।

--- ভালাউত্ত কইছে । হিণ্ডর চাকর অইত কেনে । ই মাত বাদ দে । তার লগে তর কিতা ।

--- উঝাদায় যে কিতা মাতো ।

--- আমিও এক আউয়া, ভকা । খামোকা গাইল্লাইলাম, মারলাম কান কপালো ।

--- অখন খাইয়া আও গিয়া । যাওয়ার আগে টেকা লই যাইও ।

সে এক এলাহি আয়োজন । বিয়েবারিকেও হার মানায় । ডাল ভাজা বাঁধাকপির শুকনো
তরকারি, রুই মাছের কালিয়া আর পাঁঠার মাংস । টক, দই, মিষ্টি । গরিব চা শ্রমিকের
কষ্টার্জিত উপার্জনে ভাগ বসিয়ে রাজভোজ । তবে বৈতলের খাওয়া নিয়ে কোনও মান অভিমান
নেই । চেটেপুটে চেয়েচিন্তে খায় । একটা ঢেকুর উঠতেই মনে পড়ে রাজার কথা, যম রাজাকে
তো দেখছে না কোথাও । সকালে খদ্দেরের পাজামা পাঞ্জাবিতে সেজে এসেছে । লেভি দলের
তদারকি করেছে নিজে । বৈতলের কাঁধে হাত দিয়ে বুঝিয়েছে বিশ্বাস । যতক্ষণ জমিদারের
হাত ওর কাঁধে রয়েছে, বৈতল ওর জানা সবারকমের গালাগালি একের পর এক দিয়ে গেছে
বিড়বিড়িয়ে । তবে খাবারের এই বিশেষ আয়োজন সে খুশি । সব কিছুই বারবার চেয়ে নেয় ।
মাংস চাইতে গিয়েও পারে না । মাংসের বাল্টি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ভোলা । তাই পাশে বসা
নানকুকে বলে,

--- ইণ্ডরে ক ই চন্সামিত্ত দেওন লাগত নায় । বাল্টি উল্টাই দিত ক ।

কিছুক্ষণ আগের গাল-খাওয়া, মার-খাওয়া ভোলা রজক সব ভুলে আবার হাসে । সত্যি মাংসের বাল্টি উল্টে দেয় বৈতলের পাতে । বৈতলও হাসে । হাসতে হাসতে নানকুকেই বলে আবার,

--- ইগুর কিতা গুসা গেল নানি বে অখনও । আমারে কিতা খাওয়াইত মারত চায়নি । আইচ্ছা রে, সবরে দেখলাম তোর যমরাজারে দেখলাম না একবারও । রাইত আয় নানি ।

নানকু বৈতলের কানের কাছে মুখ নেয় । ফিশফিশিয়ে তথ্য দেয় বৈতলের কানে । বৈতল গোপন কথার নির্যাস বের করে তার স্বাভাবিক তির্যক ভঙ্গিতে । বলে,

--- বেটায় নু পানিরে ডরায়, আবার সহিষ্ণ্য অইলেউ নি পানিত ডুবি থাকে । কুন ঘরো রে । তার আবার আলাদা ঘর আছে নি ইখানো । দেখমু চাইন ।

বৈতলের দেখা হয়নি কাচের ঘর । সে যম জমিদারকে দেখতে যায়নি । পুণা বলেছে খাওয়ার পর টাকা দেবে । কুড়ি টাকা ভোজন-দক্ষিণা । নানকুই বলেছে জমিদার যমের ঘরে আছে পুণ্যবতী । কাচের ঘরের পর্দা তাই সারিয়েছে । কী দেখেছে । ঘরের সাজগোজ দেখেনি । তবে এক মিথুনমূর্তি দেখে বৈতল হতভম্ব হয়ে যায় । বৈতল কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি । পুণ্যবতীর খোলা যৌবন কি লুটিয়ে দিচ্ছে, না লুটে নিচ্ছে এক লম্পট যুবক । অসহায় বৈতল বুঝতে পারে নাগরিক পাপপুণ্য ন্যায় অন্যায়ের হিসাব বড় জটিল । যে-বৈতল নারীর অপমান সহ্য করতে না পেরে মানুষ খুন করে, প্রিয় বন্ধুকে গলা টিপে মারে, সেই বৈতল যমুনাপ্রসাদকে বেকায়দায় পেয়েও ছিটকে সরে আসে নীরবে ।

দুর্গাবতীও তো বৈতলের মতো গ্রামের মেয়ে । শহর দেখেনি, তবে কী করে শেখে কথা বলার নাগরিক চালাকি । তাহলে কি জাতিভেদ বর্ণভেদ তত্ত্বই সত্য । হোক না অগ্রদানী ব্রাহ্মণ কন্যা, উচ্চ বর্ণের তো বটে । বৈতল লক্ষ করেছে দুর্গার কথায় অনেক সময় ভূস্বামীসুলভ আদেশ থাকে । বৈতল কখনও মান্য করে কখনও রাগে । পুণ্যবতী নিয়েও সরাসরি কিছু বলেনি, কিন্তু আভাসে তো জানিয়েছে । বলেছে পুণ্যবতীর ঢংঢাং কথা । দুর্গা কেন সংকেত কথা বলে । সে কি জানে না বৈতল কৈবর্ত মারপ্যাঁচের কথা থেকে স্পষ্ট কথা শুনতেই পছন্দ করে বেশি । না হয় একটা লড়ালড়ি হবে । কথা পছন্দ না হলে রাগবে, পছন্দ হলেও তো মাথায় তুলে নাচে । বৈতল ভেবে পায় না এবার কী হবে । ভোলার কী হবে । ভোলাও তা

হলে সব জানে । ভোলার রাজনীতি, নেতা হওয়ার শখ সবই যে পুণ্যবতীর জন্য, সে বুঝতে বাকি নেই তার । শহরের মানুষ বড় জটিল করে ভালবাসে । ভোলার জন্য দুঃখ হয় বৈতলের, মেরেছে বলে নয়, গালমন্দ দিয়েছে বলে নয় । ভোলার মেরুদণ্ডহীনতার জন্য তার দুঃখ । ছেলেটা কি পারে না ভালবেসে পুণাকে শুধরে দিতে । বৈতল জানে পুরুষ কিছুই পারে না । ভোলা শুধু জীবনের অমূল্য সময়টুকু নষ্ট করবে এক ব্যভিচারিণীর ছায়ায় । তারপর হাহকারে শেষ হয়ে যাবে । পুণার প্রতিও বৈতলের কোনও রাগ নেই, পুণা যে বাঘের পিঠে চড়ে বসে আছে । তবে শহর বৈতলকেও কিছু চালাকি শিখিয়েছে, সরাসরি জবাব দেওয়ার ভঙ্গি পাল্টেছে, এখন তার নিজের ভিতরই অনেক প্রশ্নোত্তরের পাঠশালা খুলে বসে আছে । কাচের ঘরে যা দেখেছে তা নিয়ে নিজের সঙ্গেই রক্তারক্তি খেলা খেলে । পুণ্যবতীর সারল্য কেন বদলে যাবে এক রাতে, পুণার প্রগলভতা আছে, পুণা নিজে থেকে কাউকে ভাসিয়ে নেওয়ার মানুষ নয় । মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ হলে দুরকম হয় না কেউ । তবে কি নিজেকে উৎসর্গ করে পুণা । ভোলা রজকের প্রতিষ্ঠার দাম । এক ভাঙা শেত্রলের চালক, দিন আনতে দিন খাওয়া জোটে কি জোটে না পিতার কন্যা দাপটে বেঁচে থাকতে চাইছে, আখের গোছাতে চাইলে কেতুমামার সংসারে সচ্ছলতা আসত । নাকি জম-বিরোধী গুপ্ত সমিতির পুণাও এক সভ্য । তাই যদি হয় তবে অসহায় সমর্পণ কেন । ছলাকলায় ভুলিয়ে বিভ্রাট করার খেলা খেলতে পারে পুণা, পুরুষাঙ্গ কেটে নিতে পারে খচ করে । বৈতলের কোনও একটা কষ্টের জায়গায় নিরাময় দিতে পারে পুণা । এই এক নরকের কীট বৈতলের সাজানো সংসারটাকে ছারেখারে দিয়েছে । বৈতল তার মনের মানুষের মনটাই খুঁজে পাচ্ছে না । দুর্গাবতী তেমন রমণী নয় জানে বৈতল, তবে কেন যখন তখন যায় যমের বাড়ি । শুধু সংসারের আয় বাড়াতে । বৈতল তো চায়নি বৌ-এর রোজগারে প্রতিপালিত হতে । গুরুবাক্য প্রয়োগ করে বৈতল সবার জন্য, নিজের জন্য খাটাতে পারে না । গুরু বলেন, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর । দুর্গাবতীকে বিশ্বাস করে বৈতল, কিন্তু মানুষের চোখ, মানুষের মুখ কী করে সামলাবে । তার মেয়ের গাত্রবর্ণ নিয়ে, মেয়ের জন্ম নিয়ে কেন মানুষ চারকথা বলে । বৈতলের কষ্ট গাঢ় হয় । কষ্ট হলেই বৈতল মহুয়ার মালা থেকে শুকনো ফুল ছিঁড়ে খায় একা একা । পুকুরের জলে তাকিয়ে থাকে । চোখের একাগ্রতা দিয়ে জলের গভীরতা মাপে । যমকে নিয়ে জলের নিচে একটা কাল্পনিক দ্বৈরথে নামে । আর জলের কাছে বৈতলের মতো শক্তিদ্র কেউ নেই ।

নীরব হাসির আয়োজন হয় বৈতলের ঠোঁটে , হাসির আবেশ নিয়ে বৈতল ঘুমিয়ে পড়ে পুকুরপারে ।

বৈতলের মন যখন উতলা হয় চলে যায় বিয়ানিবাজার । বৈতল কি আর যেতে পারে স্বদেশ । বৈতলের মন যায় । গুরু সৃষ্টিধরের সঙ্গে কথোপকথনে মন শান্ত হয় । প্রথমদিনই গুরু বন্দনা শিখিয়েছেন সৃষ্টিধর । তাই মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করে বৈতল,

‘আগে বন্দি মাতা পিতা আর শিক্ষাগুরু

এ জগতে যারা হন বাঞ্ছা কল্পতরু ।’

গুরুর পায়ের কাছে বসে বৈতল । জোড় হাতে প্রণাম করে । বলে,

--- অখন আমি কিতা করতাম কইন । আপনারে কই পাইতাম ।

--- মনে মনে যে কও ডাকরায় । মনসামঙ্গল গাও মনসা কথার অর্থ জানো নানি । ইতা পাঁচালির কথা উতা সব আমার মনের কথা । মনসা বেটিরে ডাকবায় সবরে পাইবায় ।

--- অখন কইন ইগুরে মারি ফালাই দিতাম নি । বৈতলে ইতা ডরায় না, জমিদার উর চুকে না ।

--- চুকন লাগে । তোমার বাড়িত বৌ আছে পুড়ি আছে । অখন কুন্সু আর বড় হাওরর ডেকাগরু নি তুমি ।

--- এর লাগি অউও । ইগু মানুষ নায় । আমার বউর লগেউ কিতা করে জানি না । পুড়ি ইগুরেউ ছাড়ব নি । ই গরিবর পুড়ির কুন্সু দোষ নাই । তাই কিতা করত, লোভ দেখাইছে । অখন আপনেউ বাঞ্ছা কল্পতরু ।

গুরু সৃষ্টিধর কোনোদিন মাথায় হাত দেননি বৈতলের । গ্রামের ছুতোর মিস্ত্রির সাদামাটা জীবন মানুষের । সৎপথে থাকেন, সারাদিন করাত রান্দা চালিয়ে অবসরে মনসামঙ্গল সুর করে পড়েন । মানুষ দূর-দূরান্তের পাঁচালি শুনতে নিয়েও যায় । বৈতলের উৎসাহ দেখে তাকেও সঙ্গী করেন গুরু । শুধু আম শিশু আর গামারির জাত নির্ণয়ে নয়, মানুষমনের সবরকম বিদ্যায় পারদর্শী এই কাঠকারিগর । যে-কোনও বিষয়কেই তিনি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বদলে দিতে

পারেন, মুখের কথা থেকে গানের সুরে বদলে দিতে পারেন মানবমন । দেশভাগের মতো
নিষ্ঠুর সত্যকে পর্যন্ত তিনি মেনে নিয়েছেন নিরুদ্বেগ । বলেছেন,

--- কার্জন সাহেব যেদিন বাংলা দুইভাগ করা মনস্থ করছইন, হিদিন অউ দেশ ভাগ অই গেছে
। হিন্দু মুসলমান দুইজাতির চিন্তা ঢুকাই দেওয়া হইছে বাঙালির মনো । চল্লিশ বছর ধরি ধিকি
জ্বালিয়া মরার দরকার আছিল না । তখন অইলে অইন্য নাম অইলনে, নিজর মতো । অখন
অইল ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান । বাঙালির ভাষাত আছে নি ই দুই নাম । বঙ্গ নামটাউ হারাই
গেল ।

গুরু গুরুভার কথার সঙ্গে গান সংযোগ করেন । গেয়ে ওঠেন,

‘খন্ড হইল বঙ্গদেশ

খন্ড কাইব্য অইল শেষ

বঙ্গের মঙ্গল আজি করিল কর্জন

শ্রী বঙ্গ-মঙ্গল গায় বঙ্গবাসীজন ।’

গুরুগিরিতে বিশ্বাস নেই যে গুরুমহাশয়ের, সেই সৃষ্টিধর ওঝার বরাভয়ে বৈতল দেয়
নির্ভয় ডুবসাঁতার । সাঁতরে পেরিয়ে যায় পাথার । গুরুর পায়ের সামনে রাখে তার যন্ত্রণার
উপাচার । ব্যভিচারী শ্রমিক নেতা ভূস্বামী যমুনা সিংকে হাতে নাতে ধরেও যে ছেড়ে দেয়
বৈতল, তার কী উপায় । পুণ্যবতী নিশ্চয় যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি । মেয়েটা তো
ভাল, মন্দ নয় মোটে । বুঝতে পারে দারিদ্র্যের চাপ । তাই কি জমিদারকে শরীর দিয়ে নিতে
চাইছে কোনও প্রতিশোধ । নাকি আত্মপ্রতারণা করে কাউকে দিতে চাইছে পুরস্কার । সে কি
ভোলা রজক । বৈতল জানে প্রত্যেকের যুদ্ধ আলাদা আলাদা, কৌশলও ভিন্ন । তবু এই প্রথম
কোনও নির্বাস নারীর শরীর দেখে দুঃখ হয় বৈতলের । ধর্ষণকারী লোকটাকে তাই তৎক্ষণাৎ
কোনও শাস্তি দিতে পারেনি । বৈতল মনের উচাটন গুরুপদে রেখে গুরুর করস্পর্শ পেতে চায়
। তার প্রশ্নের জবাব চায় । গুরু সৃষ্টিধর হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিতেই বৈতলের চোখ বুঝে আসে ।
গুরু বলেন,

--- বুঝছ নি রেবা, তুমারে কওয়ার আমার কিছু নাই । তুমি অউ অখন বাঙ্গা কল্পতরু । তুমি
পুড়ি ইগুরে দেখিও । আর তুমারে আমি মহাভারতের গপ কইছি নানি । তুমি অউ অইলায়
চক্রধর শ্রীকৃষ্ণ ।

--- ছিছি কিতা কইন আপনে । আমি এক চুর, হারাদিন মিছাকথা কই আর রিক্সা চালাই
পকথিরাজ ।

--- অউ পঞ্জীরাজ অউ তোমার কপিধ্বজ । অর্জুনের রথ । কেশবেও বহুত মিছা কথা
কইছইন । নিজে কিছু করছইন না । তুমি রেবা নিজে হক্কলতা করতায় চাও ।

--- তে কিতা করতাম । ইগু তো অত পাপ করে তেও বাচি যার ।

--- তার পাপর ভরা পূর্ণ অইছে না এর লাগি ।

--- কুনদিন ভরব ।

--- এর লাগি উপায় বার করন লাগব ।

--- এ আপনে ইতা কিতা কইন । উপায় তো ঠগামি । মিছা কথা ।

--- করন লাগব । শ্রীকৃষ্ণ না অইলে কিতা কুরু বংশ ধ্বংস অইলনে নি । শিখন্ডিরে
আউগ্গাই না দিলে কিতা ভীষ্ম মরলা নে । অশ্বথামা হাততিরে না মারলে দ্রোণরে মারা গেল
নে । অর্জুনের মারার লাগিয়ে অস্ত্র রাখছিলা কর্ণয়, হি অস্ত্র দিয়া ঘটোৎকচরে মারলা । রথর
চাক্কা উঠানির সময় কইলা, মারি দেও । শয়তান রাজা দুর্যোধন যুদ্ধ থাকি ভাগল একলা
একলা, বিলর পানিত লুকাই থাকল, হিখানোও উপায় করলা মাধবে । গাইল্লাইয়া বার
করাইলা । স্যমন্তপঞ্চকর নাম হ্ননছ তো । হিখানো অইল গদাযুদ্ধ, দুর্যোধনরে হারানি কাম নায়
ভীমর । আবার মাধবে অর্জুনরে উরাত দেখাইলা । গদাযুদ্ধত নাইর নিচে মারার নিয়ম নাই ।
তাইন কইলা আর অর্জুনেও দেখাই দিলা উরাত মেজভাইরে । এর লাগি কিতা কেউ
শ্যামসুন্দরে গাইল্লায় নি । তারা যেতা করছইন তার থাকি বেশি করছে দুর্যোধনে আর তার
বাপে । ননীচোরায়ে তো খালি ডাকতরি করছইন । তারার শয়তানির জবাব ঠিকঠাক দিছইন !

--- ইতা কুনু ধর্মস্থ অইল নি !

--- ধর্ম কিতা রেবা ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরেও মিছা কথা কইছইন । জুয়া খেলছইন । তে কৃষ্ণর ভাই আছলা সাধু মানুষ । তাইন কইতা সাধুয়ে ধর্মকর্ম করে । আর টেকার লোভে আর বেটির লোভে মানুষে ধর্ম নষ্ট করে । ধর্ম টেকা আর বেটি যে ঠিক করি রাখতে পারে, হে উ বেটা ।

--- ই তো ধর্মকথা কইলা, তখন কইন আমি কিতা করতাম ।

--- অখনও বুঝলায় নানি । দেখো, হে বাড়উক, তার বানাইল গাতা তুমি আর একটু নিন করিয়া রাখি দেও । দেখবায় নে আপনেউ পড়ব ! হে অইল জিয়া বেঙ, তারে পাল্লাত মাপিও না । কলর কাম কেনে বলে করতায় চাও । তুমার অউ এক দুষ । ধর্মর ঘণ্টা আপনেউ বাজব, তখন নিমিত্তর ভাগী কে অইবা ইতা কেমনে কইবায় । উরাত দেখাইয়া ঘণ্টা বাজাইলা সারথি শ্রীকৃষ্ণ, দেখলা অর্জুনে । তাইন আবার দেখাইয়া বাজাইলা দেখলা ভীমে, পাপীরে মারলা । মাঝখানে অর্জুন পড়ি গেলা, বাসুদেবে তো কইয়াউ রাখছইন, তান হাতো সব মরি গেছে । অখন নিমিত্তর ভাগ । অউত্ত গপ, অউ মহাভারত ।

--- তার পরে । শেষ হইল কেমনে ।

--- শেষ হইত কেনে । পাপীর শাস্তি হইত, কিন্তু সৃষ্টি চলত । যুদ্ধ শেষ । অর্জুনের কপিধ্বজ রথ তো পুড়িয়া ছালি ।

--- হে, জয় জয় দেই ।

--- বুঝছি, তোমার মন ভরি গেছে । মহাভারতর কথা কুন্ শনিপূজা নি । যে জয় জয় দেওন লাগব, জয় শনিপ্রীতে জয় । মহাভারত গাওন লাগে । তুমি যেলাখান মনসামঙ্গল গাও । বাংলাতে মহাভারত লেখছইন কাশীরাম দাসে । দিলে তান জয় দেও । গাও দেখি আমার লগে ‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান’ ।

বৈতলের মন ভরে গেছে সত্যি । গুরুবাক্যে কোথাও যে অদৃশ্য শক্তি আছে অলৌকিক এই কথোপকথনের সূত্রে কি বৈতল কোন এক দায়িত্বভার গ্রহণ করে । কোনো এক পংখ নির্দেশ । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন ভীম এবং সাধুপুরুষ রোহিণীনন্দন । এদের থেকেই বৈতলকে গ্রহণ

করতে হবে রসদ । হলধর বলরামের মতো ভালমানুষ হবে না বৈতল । ভগবানের মতো
কুচক্রী হতে পারবে তো । তার চেয়ে মনসা মায়ের গোঁসা তার পক্ষে বোঝা সহজ । আইও
সোজাপথের পথিক অনেকটা, চৌদ্দ ডিঙা ডুবিয়ে দেব তো দেবই, লক্ষীন্দরকে মারব তো
মারবই, কথার মারপ্যাঁচে ভুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নেই । এক ছোবলেই কলার ভেলায় ।

উপন্যাস

পনেরো

বৈতল ভুল করেছে । প্রথম দর্শনেই ছোবল ফিরিয়ে দিয়েছে । মেহেরপুর রিফুজি কলোনি থেকে বেরিয়েছে ভাগ্যান্বেষণে । শুনেছে ইটখোলা আর হরিৎবরণের জমিদার বাড়ির কথা । শুনেছে বাড়ির বিশাল উঠানের মাঝখানে এক মহুয়া গাছের বৃত্তান্ত । জমিদারের কোন উর্ধতন পুরুষের লাগানো গাছটিই আজ পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে সিংসদনের শোভা । পশ্চিম দেশের নেশাধরা ফুলের গাছ । সেই ফুলের গন্ধে নেশা ধরেছিল সিংপুরুষের অন্তরমহলে । ঘুন ধরেছে পরিবারতন্ত্রের বরগায় । লোকশ্রুতি এই, প্রজন্মে প্রজন্মে সিংবংশে বদল হয়েছে পুরুষকার । স্থির থেকেছে পদবি ও উত্তরাধিকার । যুবা রাজার অপঘাত মৃত্যু এখানে নিয়তি । কালো রাজার পর শ্যামলা রাজা, তামাটে রাজা, বর্তমানে রাজার বর্ণ গৌর । জমিদার বংশে মহাভারতে ছায়া । রাজার মৃত্যু হলেও রাণিরা বহাল রেখেছেন বংশগতির ধারা । বর্তমান সাদা রাজা । যমুনা প্রসাদ সিংএর অন্তরে আছে আনন্দবাজার । তাই কড়া প্রহরা অন্তরমহলে । পুরুষের প্রবেশ নিষেধ । যুবাপুরুষ তো নয়ই । রাজার মনেও সুখ ভিতরবাড়ির সৌন্দর্য নিয়ে । রাজার মনে আশঙ্কা অন্তরের আগুন নিয়ে । তাই আগুনের প্রতিষেধক করে জলের জাদুকর সৃষ্টিধর শর্মাকে । নিশ্চিহ্ন করতে হবে অন্তর প্রহরা । এমনকি জমিদারের সর্বক্ষণের প্রহরী পুরুষ ভোলা রজকেরও নেই প্রবেশাধিকার । নবীনা মহিষীর নাম ফুলকুমারী, দুর্গাবতীর বয়স্তিনী । রাজপুরীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার বৈতল হেলাভরে পরিত্যাগ করে । বৈতল কী আর বাঁধা কাজের কারিগর । বৈতল দুর্গাবতীকে বহাল করে দেয় অন্তরের তদারকিতে । ভুল করে বৈতল । বৈতল প্রতিপক্ষকে দুর্বল, নির্জীব ভাবে । যার উপর থেকে ছোবল সরিয়ে এনেছে সে কি আর আঘাত করতে পারে । হতে পারে অকৃতজ্ঞ । গুরু তো বৈতলকে সব বিষয়ে গুঢ় কথা বলতে পারেন না । নারীলোভ যে মানুষকে নরকের কীট থেকেও অধম করে, সে-সত্য জেনেও ভুল করে বৈতল ।

হরিৎবরণে জমিদারবাড়ির উঠোন তিনটে । অন্দরউঠোন সবচেয়ে ছোট, রান্নাঘর আর পিছনবাড়ির যোগাযোগ রক্ষা করে । উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ । বড় উঠোন ঘিরে রেখেছে বাড়ি । যার একদিকে বড়ো নাটমণ্ডপ যেখানে বছরে দুবার উৎসব হয় একবার শ্রাবণ মাসে বিষ্ণুহরি উৎসব আর একবার আশ্বিনে শারদোৎসব দুর্গাপূজা । নাটমণ্ডপের গায়ে নিত্য পূজার মন্দির । নিত্যপূজায় এক বিশেষত্ব, মনসাদেবী লক্ষ্মীদেবী হিসেবে পূজিতা হয়ে থাকেন । বড়উঠোনের মাঝখানেই সেই মহুয়া গাছ, গাছের ডালে ডালে মাতাল পাখির ওড়াউড়ি সারাবেলা । কিছু পরিণত বলে, কিছু জোর বাতাসে আর কিছু পাখির ঠোকরানোয় সাদা ফুল শিউলির সাজে ছড়িয়ে থাকে উঠোনময় । নাটমণ্ডপ আর পুকুরের মাঝামাঝি সিংহদুয়ার । দুই সিংহ দুদিকে, শহরে একমাত্র সিংহদুয়ারের বাড়ি । মানে ফটক, ফটক থেকে বেরিয়ে উঠোনের শেষমাথায় বৈঠকখানা । জমিদারের বসার ঘর, বাইরের বারান্দা । পুকুরের নাম পদ্মপুকুর, ঐ দূরে পুকুরের একপারে একসার পায়খানা । পুকুরের চারদিক ঘেরা তরজাবেড়ায় । পুকুরের আয়তন দেখে বৈতলের লোভ হয় । মাছ ধরবে মনস্থ করে মাছুয়া বৈতল । নছিবালা হাকিমের পুকুরে মাছ ধরায় সুখ নেই । বিশাল দিঘী হলে কী হবে, বড় অশান্ত । তিনদিকেই ঘনবসতির মানুষ, মাছের শান্তি নেই । তাই মাছও কম জলও অগভীর । জমিদার বাড়ির পুকুর শান্ত, সংরক্ষিত । মেহেরপুর থেকে ভোরের বেলা বেরিয়ে পড়ে বৈতল । মাছ ধরলে মাছ চায় না মাছুয়া বৈতল । আটআনায় এক খেপ । আটআনা শুনে আঁতকে ওঠে অনেকে । বৈতল এক কথার মানুষ । বলে,

--- পুসাইলে মারাইবা, নাইলে আপনার মাছ আপনার । তে আমারে দি মারাইলে ঠগতা নায় ।
আটআনায় নয় আনার মাছ পাইবা ।

বৈতল বলতে চেয়েছে ঠগবে না পুকুরমালিক কম করে একআনার মাছ বাশি পাবে ।
জমিদার যমুনা প্রসাদ তো বৈতলের শরীর দেখে হেসেই কাত । তার উপর কথার ছিঁরি ।

--- অউ বদন নিয়া মাছ ধরতে নি বেটা, নয় আনি দুকান নি ।

প্রেমতলা গোলাদিঘীর পারে এক অভিনব মনিহারি দোকানের পশরা বসেছে । হরেক মাল নয় আনা । ঠাকুরের বাঁধানো ছবি, কাপ প্লেট, ছুরি কাঁচি হাতা খুন্টি দাড়িকাটার রেজার,

জগদীশগুপ্তর পকেটগীতা আরো অনেক কিছু, দরদাম নেই, দাম নয় আনা । বৈতলের কথার কথা আটের পিঠে নয় আনা বলায় বিদ্রূপে বিদ্রূপ করে অচেনা মৎস্যশিকারকে । বলে,

--- আমার পুকইরের রউমাছর উজনঅউ তর থাকি বেশি ।

--- রাজার পুকইর, অইব অউত্ত । তে কলর কাম বলে অয় না, রাজায় তো আর উঠান ঝাড়ু দেইন না, পুকইরো মাছ ধরইন না । জাল একবার ফালাই, দেখইন না । নায় মাগনাউ মারি এক খেপ ।

বিনিপয়সায় জাল ফেলার পাত্র নয় বৈতল । কিন্তু তার শরীর নিয়ে তার কথা নিয়ে বিদ্রূপের জবাব তো দেওয়া দরকার । মাগনা কথায় জমিদার রাজি হয়ে যায় । বলে,

--- মারতে ।

মজা দেখতেই পদ্মপুকুরের পারে এসে দাঁড়ায় জমিদার যমুনা সিং । মাগনার খেপে মাছ ওঠে তিড়িংবিড়িং মকা পুঁটি কাংলা আর মস্তো এক রুই । ইচ্ছে করেই বৈতল রুই মাছ ছেড়ে দেয় জলে । গলা নামিয়ে বলে,

--- নয় আনা বারই গেল দেখি ।

গলার জোর বাড়িয়ে বলে,

--- আইড় ঘাঘটও আছে । মারতাম পারি নাইলে মাগনার মকা উকা থাকল ।

রুই ছেড়ে দেওয়ায় রাগ হলেও আইড়ঘাঘটের কথায় হিসেব চিকচিক করে যুবক সিংএর চোখে । বলে,

--- তুল দেখি ।

ওঠে তিনটে ঘাঘট মস্তো মস্তো । মাছুয়া বলে,

--- মাগুর আছে একমন, তুলতাম নি ।

--- এক মন অউ নি । কেমনে মাপলে ।

--- আমার নাকো আছে বাটখারা । তুলতাম নি কইন । পাল্লা আনাইয়া মাপবা নে ।

--- তুল চাইন দেখি ।

এবার আর জাল ফেলে না বৈতল । যায় পুকুরের উত্তরকোণে যেখানে সার সার
পায়খানা । জলের শেষে এক কিত্তা গাছের জঙ্গল । জলজঙ্গলের সীমানায় নরম মাটিতে ঢপ
ঢপ করে মারে এক বাড়ি । মাটি ভাঙে ঝুরঝুরিয়ে । মাটির গর্তে কিলবিলানো মাগুর দেখে
আবার কাত নবীন পুকুর মালিক । মাছুয়ার কেরামতিতে ভুলে যায় মাগুরের ওজন দেখার কথা
। বলে,

--- আর কিতা মারতে ।

--- মারতাম মারতাম । অখন এক আনা বাড়ানি লাগব । নয়আনি ।

বৈতল মাইমলের তখন ভিন্নরূপ । মাছের কেরামতি শেষে জমিদারবাড়ির দাসী চাকরও
কৌতূহলে ভিড় করে আছে যদি কোনও চমৎকার দেখা যায় । বৈতলের চোখ খোঁজে প্রধানা
রমণীকে । আছে তো কেউ মহারানী । দুর্গাবতীকে বলতে হবে না সব । থাক তবে,
দুর্গাবতীকে কিছু একটা বলে দেওয়া যাবে বানিয়ে । হাতে তার সময় কম, এবার গুটিয়ে
আনতে হবে জাল । ফিরতে হবে এবার । প্রসন্ন জমিদারের দিকে হাত বাড়ায় । বলে,

--- দেইন ।

বাবু জমিদার কিছু বুঝবার আগেই সাপের চেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বৈতলের হাত ।
জমিদার আর বৈতলদাস কৈবর্তের দূরত্ব তখন দশ কদম । সাপ আর জমিদারের এক ।
ছোবল মারার আগেই এগারো পা দৌড়ে এসে বৈতল ধরে নেয় বিষধরের ফনা । শিকার ফস্কে
যাওয়ায় মাছুয়া আলদের চোখে তখন লকলকে হিংসা । পারলে শূন্যেই বমি করে দেয় গরল ।
বৈতলের হাত পেঁচিয়ে ধরে আছে সাপ । সাপের মুখে হাত রেখে জমিদারকে বলে বৈতল,

--- কইন, মারতাম না ছাড়ি দিতাম পানিত ।

জ্ঞান হারানোর আগে সাদা রঙের জমিদারের মুখ ফ্যাকশে হয়ে যায় । বলে,

--- মারো, মারি ফালাও ।

প্রাণ বাঁচিয়েছে যে, তাকে আর তুইতুকারি করার সাহস করেনি যমুনাপ্রসাদ জমিদার ।
বৈতল মনে মনে হাসে । উল্টোমঙ্গল দেখে সাপ সরিয়ে জমিদার পরিচর্যায় হাত লাগায় ।
ঢলানির আগেই জিয়ানি দেখে খুশিই হয় সদ্য রিফ্যুজি বৈতল । খালি হাতে ফেরারই তো কথা
সেদিন বৈতলের । পয়সা যে দেবে তার তো জ্ঞানই ফেরেনি । তাহলে ।

অনেকদিন পর বৈতল তার মনের কাজ করতে পারায় খুব খুশি । খুশিমনে দুর্গাবতীর
ডান হাতের তালুতে দেয় এক সশব্দ চুম্বন । বাঁশ আর চাটাই এর ঘরে আগল বলে কিছু নেই
। বাজার ছত্তরের মতো সারি সারি ঘরের অস্বাস্থ্যকর দমবন্ধ ঘরে সব উদ্বাস্ত পরিবার । কারো
কিছু লুকোবার নেই । তাই দুর্গাবতী হাত ছাড়াতে চায় । কিন্তু বৈতলের হাত থেকে ছাড়া
পাওয়া সহজ নয় । বলে,

--- চউখ মুজো ।

--- কেনে, ই তিন সন্ধ্যার সময় কিতা আরম্ভ করছ, ছাড়ো ।

--- চউখ মুজি লাও, ছাড়ি দিমু । নাইলে সবে দেখব ।

--- নেও মুজলাম । তুমার গাত ইতা কিতা গন্ধ লাগের । কিচ্ছু খাইয়া আইছনি ।

--- অয় । চাইয়া দেখো অখন ।

দুর্গাবতী চেয়ে দেখে তার মুঠোয় এক রাশি সাদাফুল । এ ফুল কোনোদিন দেখেনি দুর্গা ।
বৈতলকে বলে,

--- উঃ কী গন্ধ । ইতা কিতা কও না ।

--- ইতা নানি । কইতাম না গাইতাম কও । গাইলাই, ‘তুমি বনফুল গো’ ।

--- অইছে, উল্টা গান গাওয়া লাগত নায় । বনুয়া ফুল নায়, ইতার নাম আছে কিচ্ছু ।

--- মউয়া । নাম হ্নছ নি ।

--- সুনতাম না কেনে । মছয়া, নদের চান্দর গান হ্নছ না নি ।

--- ঠিকনি, এর লাগি অউ আমার পেটে গুলার ।

দুর্গাবতীকে সব কথা না বলা পর্যন্ত বৈতলের পেট গুলোয় । আজকের ঘটনায় বৈতল খুব পুলকিত । আজ তার দাদন দেওয়ার দিন । মূর্ছা ভেঙ্গে জমিদার খুঁজবে বৈতলকে । তার প্রাণদাতার জন্য উতলা হবে । বৈতলও কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে । ইটখোলার হরিৎবরণের আশে পাশেও যাবে না । বৈতলকে নিয়ে যমুনাপ্রসাদ সাজিয়ে রাখবে ব্যক্তিগত পুনর্বাসন প্রকল্প । বন্ধু লুলাকে নিয়ে বৈতল সিলেটের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছে, অনেক রকম ভেক ধরে জীবিকা নির্বাহ করেছে । বৈতলকে কেউ তাগড়া যোয়ান বলে না । লিকপিকে তেলাল শরীরে তার বয়স ঢাকা পড়ে আছে । কেউ জানে না কিশোর না যুবক সে । তার বয়স কত । মা বাপের সংসার থেকে বেরিয়ে গেছে বৈতল সে কোন শৈশবে । বন্ধু লুলাকে পায় মিরতিঙ্গার পাহাড়ে । সেই থেকে স্বদেশভ্রমণ দুইবন্ধুর । পাটনির সন্তান বৈতলকে ছাড়েনি, যেখানেই হাওর নদী বিল পেয়েছে পায়ের তলার সর্ষে সরিয়ে রেখেছে, জলের ছোঁয়ায় শরীরকে তেজিয়ান রেখেছে, আবার ছুটেছে । ‘তেলে জলে পুয়া বাড়ে’ জলের প্রবাদ শুনিye বাপ ডাকে বৈতলকে । বৈতল শশীরে বাড়েনি ফনফনিye, সুন্দি বেতের মতো শরীর নিয়ে তার কোনও অভিযোগ নেই । দেশের নদীনালা হাওর বাঁওর বন বাদাড় তার এই শরীরকে গড়েপিটে সাজিয়েছে, যুগিয়েছে তার প্রয়োজনীয় রসদ । যোগান কম হলে চুরি করে পেট ভরিয়েছে । ধরাও পড়েছে, মার খেয়েছে, শরীর পেকেছে ।

মানুষকে ভয় পায় না বৈতল । সাপিখুপিরও ভয়ডর নেই । দরকার হলে ইচ্ছাধারী সাপ হয়ে দংশন করতে পারে । ওঝা হয়েও বাড়ে বৈতল । শত্রুর মুখোমুখি তাই বৈতল হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর । ছলচাতুরিতেও কম যায় না মাইমলের পুত । পদ্মপুকুর পারে জমিদারের হাত ধরে যে কাভটা ঘটিয়েছে বৈতল, সেই রাতের ময়লা পরিষ্কার করতেই বৈতল যায় তুলাপাটী । তুলাপাটীতে অনেক সোনার দোকান । বেছে বেছে রাধামাধব জুয়েলারির দ্বিজেনবাবুর হাতে তুলে দেয় সোনার আংটি । এই টুকুনি এক আংটির দাম যে সত্তর টাকা হতে পারে ভাবেনি বৈতল । তিন খেপমারার দাম তো মাত্র দেড় টাকা । তার চেয়ে সত্তর টাকা অনেক । মরে নি ভিত্তু জমিদার, পোষা সাপ দেখে যে এমন ভয় পাবে ভাবে নি বৈতল । যাক, জিয়ানিও হয়ে যায়, বেঁচে যায় লক্ষীন্দর ! আর বৈতল ফিরবে খালি হাতে, খেপ প্রতি আট আনার হিসেব না নিয়ে । এও হয় নাকি । জমিদার যমুনাপ্রসাদের হাত ধরে মূর্ছার পতন থেকে রক্ষা করে বৈতল । হাতের ময়লা যদি কিছু সে নিয়ে থাকে, তাতে কার কী এসে যায় । যার এত আছে,

একটা সোনার আংটিতে কত আর কমবে । বৈতলের কাছে এখন সত্তর টাকাই অনেক ।
একটা আস্তো রিক্সাগাড়ির দাম হয়ে যাবে ।

আংটি আর সত্তর টাকার ঘটনা ছাড়া সবই বলে বৈতল তার রানিকে । আর দুর্বোধ্য মুচকি হাসি দিয়ে দুর্গাবতীর কারণময় কৌতূহলে ইন্ধন দেয় । চেনা মানুষ যখন অচেনার মতো হাসে তখনই সংশয় দুর্গাবতীর । নির্ঘাত কিছু একটা ঘটিয়েছে । কোনও অপকর্ম না করলে এমন খুশি হয় না । বৈতলও জানে এই ব্রাহ্মণ কন্যার কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না । বৈতলকে শায়েস্তা করার উপায় সে জানে । প্রতিদিনই কোনও না কোনও ছলে একটা ব্রত শুরু করে দেয় । আর ব্রতধারিণীর কাছে যাওয়া তো বারণ । যা বৈতল পারে না । তবে বৈতলও নিশ্চিত করে, আংটি বৃত্তান্ত বলবে না দুর্গাবতীকে, যে-কোনও জেরার মুখেই সে চুপ । দুর্গাবতীও উদ্ভিন্ন হয়ে বৈতলকে প্রশ্ন করে এক একটা । বলে,

--- আইজ তুমি হিতা খাইছ ।

--- হিতা কিতা ।

--- ইও আরকি । যেতআ খাও । ইওর মাংস । খাইছ ।

--- গরুর মাংস নি । ইতো খাই, তে কিতা অইছে, সস্তা । ইদেশো আইয়া খাইছি না অখনও । আইজ খাইছি না, যে কুনু কিরা । তুমার যে ইতা কিতা বুঝি না । পাঁঠা খাইলে দুষ নাই, গরু খাইলে দুষ । কেনে, ইগুও চাইর পাও, হিগুরও চাইর ।

--- তে চুরি করছ কুনু বাড়িত ।

--- ছি ছি, তুমার নি অউ মন । আমি বেটা মাইমাল, মাছ মারিয়া খাই, চুরিদারি কেনে করতাম ।

--- তে কুনু বেটির বাড়িত গেছ আইজ । অত খুশির তো কারণ থাকব ।

--- আইজ নানি ... । না বাদ দেও পরে কইমু, অখন তুমি যেলাখান মিঠা আলু চুলাত দিরায়ে টপ টপাটপ । অত গুসা কিতা তোমার, আমি কুনু অত বাদুয়া নি । অখন কও ই লাল পাইড় কাপড় পিন্দিয়া কই যাইরায় আগুনসুন্দরী ।

--- কই যাইতাম । ই কাপড় তো তুমার রিফুজি বাবু হকলে দিছে । ডুলর কাপড় । পয়সা দিছে বারোআনা, চাউল পাচসের । ইস্ ইতা খাওয়া যাইত নায় । চাউলো ও পাথর ।

--- ই কেম্পো উম্পো আমরা আর থাকতাম নায় ।

--- কই যাইবায় । আমি আর পাকিস্তানো যাইতাম নায় । কেউ কেউ তো গেছে গি আবার । শ্রীমঙ্গলর সুধাদা, মলইবাজারোর রমেশ কর্তা গেছইন গি !

--- যা বেটি, তুই গেলেও যাইতে পারছ আমারে ছাড়িয়া, আমি কই যাইতাম । আমি তো খুনর আসামি ।

বৈতলের বুদ্ধিমতী স্ত্রী সব বোঝে । বৈতলের যখন মন ভাল থাকে তখন দুঃখের কথায় বিমর্ষ হয়ে যায় । হয় অভিমানী । তাই দুর্গাবতী চুপ করে উঠে যায় । পিতলের কানা উঠানো ছোটো থালা ভর্তি খাবার নিয়ে আসে । পুজোর প্রসাদ, তার থেকেও বড় কথা প্রসাদের সঙ্গে বৈতলের প্রিয় খাবার, খিচুড়ি আর লাবড়া আছে, মুলোর গুটি কাঁঠাল বিচি মিষ্টি কুমড়ো মুখি কচু আর যা যা সজি পেয়েছে সব দিয়ে রেঁধেছে পরিপাটি । বৈতলের চোখে মুখে খুশি আর ধরে না । বলে,

--- আইজ আবার কিতার বর্ত ।

--- আইজ মঙ্গলবার নানি । মঙ্গলচণ্ডীর বর্ত ।

--- এ হিদিন নু দিলায় একবার ।

--- হি ৭ বিপদনাশিনী ।

--- না না আরো কিতা আছিল । বর্তের কথাও সুনাইলায় । অউ যে এক বানিয়ে কইলা গরুর মাংস দেখতা, তান দাসীয়ে দেখাইলা । রাজায় শুনিয়া খুব গুসা করলা, রানিরে মারি লাওয়ার ভুকুম দিলা । আর রাজায় গরুর মাংস দেখাত গিয়া দেখইন এক থাল ফুল পড়ি রইছে থালো । তেউ আর রানিরও মরা অইল না দেবীর বরে । তাইন কে ।

--- তাইন অউও সঙ্কটা ।

--- তে আর এক গপ আছে আর এক বেটির । এক দুধ আলিয়ে করছিল বর্ত তাইর বউত
পয়সা অই গেল দুধ বেচিয়া । পয়সা অওয়ায় তাইর ঘুম অয় না । তাই ধারোর বাড়ির বেটিরে
কইল, আমারে খামচাই দেও চাইন দেখি, একটু কান্দতাম । কান্দিয়া হুপাই হুপাই ঘুমাইতাম ।

--- না না । বর্তর কথা ইলাখান কয় না । সুন্দর করিয়া সাজাইয়া কওন লাগে । আমি কই
হুনো । না, অখন কইতাম নায় । যেদিন বর্ত করমু, চান উন করিয়া ঘুমটা দিয়া পড়মু, হুনিও
। অখন হাচা কথা খান কইলাও ।

--- হাচা মিছার কিচ্ছু নাই । সীতা মারি রাবণ আনলা, অউত্ত রামায়ণ ।

প্রথম দিন থেকেই জমিদারকে রাবণের উপমায় মানানসই দেখেছে বৈতল । কিছু
একটা দেখেছে বিপরীত । আর সীতার কথাটাও অকারণ নয় । বৈতলের আর ভাল লাগে না
এই সরকারি নরক, বাঁশের খাপ বাঁধা ধাড়ার ঘর । গ্রামের মানুষ হলেও ‘মাইডেল’ পোক্ত
বাড়িতে থেকেছে বৈতল । মেড়ামেড়ির ঘরে আনন্দ ফুর্তির জন্য পৌষ সংক্রান্তির এক রাত
থাকা যায় পুড়িয়ে ফেলার জন্য । বৈতলও উলির ঘর পুড়িয়ে চলে যাবে নতুন ঠিকানায় । তাই
বুদ্ধি দিয়ে রাবণ বধের মিছে খেলা খেলেছে সে । শহরের মানুষকে সরলতা দিয়ে বশ করা
যায় না জেনেছে বৈতল । আর বর্তমান সময়টাও বড় অবিশ্বাসী । অচেনা শরণার্থীরা যে ঠকাবে
না, থাকতে দিলে দখল নেবে না জমিবাড়ি তার কোনও স্থিরতা নেই । ভালমানুষের দলে
ঠগঠগামির ছাঁচড়া দু-একজনও আছে । সর্বস্ব খোয়ানো মানুষের মনুষ্যত্ব নিয়ে গুচিবাই নেই ।
তাই বৈতল রাবণকে কাবু করার খেলার কোনও অনৈতিকতা দেখে না । লঙ্কাবাড়িতে সীতা
দুর্গাকে নিয়েই সে গিয়ে উঠবে । সেই খুশিতে বিভোর বৈতল তাই হাসে । হাসতে হাসতে
দুর্গাবতীকে বলে,

--- এগু শুটকি আলা বুজছ নি, আমি ডাকি বটাই । তার নাম বটকিস্ট, হে হুলাইল এক
আচানকি রামায়ণ গান । হুনতায় নি ।

--- তুমার অউ সীতা মারি রাবণ আনলা অতা নি । হুলাইছ আগে তুমি আইজ কত জাগাত
গেলায় । ইদিকে কও শুটকি বাজারো গেলায় । আবার কও ইটখোলার জমিদার বাড়িত গেছ ।
কুনটা হাচা ।

--- হাচা মিছা দি কিতা করতায় । রামায়ণ ভাল লাগছে নি কও ।

--- পুরা তো কইতায় পারলায় না ।

--- এ লঙ্কাত না গেলে পুরা অইব কেমনে । যাইবায় নি ।

--- জমিদারনিরে কিলাখান দেখলায়, সুন্দরী নি ।

--- উঁ, খুব সুন্দর গো । তুমি আর কিতা সুন্দর, তাইন এক্কেবারে টিকির ছালি ।

--- বাইচা উইচা অইছে নি ।

--- অইছে না, তুমি গেলেউ অইব ।

--- আমি কিতা তারার বাইচা বানাই দিতাম নি ।

--- ছি ছি, কিতা কও নানি । আমি কইয়ার তুমি গেলে তো পাচালি উচালি পড়বায় । কও নানি, নিধনীর ধন অইব, অপুতর পুত অইব । অউকথা কইলাম ।

--- আমি গিয়া পাচালি পড়তাম, না ধাই অইতাম । খুলিয়া কও ।

--- তুমি কেনে ধাই অইতায়, তুমি ধাই অইলে আমার পুড়িরে পালত কে ।

--- অইছে, বেটার মুরাদ নাই, তার অইব পুড়ি । পুড়ি এমনে অই যায় নি । ছলাইও না আমারে ।

--- আইছা রে বেটি, আমার মুরাদ নাই, নানি । আইজরাইত অউ দেখাইমু ।

মুরোদের কথায় বৈতলের রাগ হয় । যে একমুঠো মছয়ার ফুল এনেছে জমিদার বাড়ির উঠোন থেকে সব এক সঙ্গে কচকচ করে খায় । নেশা হয়, কিন্তু মনের দুঃখ যায় না । বমি বমি ভাব হয় । অভিমানে কিছুই দেখায় না, ধাড়ার চাটাই এর উপর একা শুয়ে থাকে বৈতল রাতের মতো ।

ষোল

বৈতলের দিন কেটে যায় বুদ্ধির ব্যবহারিক প্রয়োগে । দিনের শরিক অনেক । সঙ্গীহীন রাতের অসহায়তা কাটাতে রাতের উত্তর খুঁজে বেড়ায় দিনের আলোয় । বৈতলের চাই স্থায়ী আস্তানা । পশরাহীন মেলার দোকান নয় । ক্যাম্প আর রিফ্যুজি শব্দের অবজ্ঞা থেকে বেরোতে চায় বৈতল । আর বৈতল চাইলেই তার উপায়ও বেরিয়ে আসে যথাসময়ে । হয়ে যায় যোগাযোগ ।

ইটখোলার তেমাথায় শৈলেন কবিরাজের ঔষধালয় । কবিরাজি দোকান তো নয়, এক বৈঠকখানা । ঘরের তিনদিকে কাঠের আলমারিতে বৈয়াম । কোনোটা ভর্তি কালো কালো বড়িতে কোনোটা খালি । ছোটখাটো চেহারার কবিরাজ মশাই তার চৌকির মধ্যমণি হয়ে গড়গড়ায় প্রথম টান দিয়ে শুরু করেন সাক্ষ্য আসর । তখন রোগী থাকে কম, সমবয়স্ক বান্ধব সমাজই প্রধান । বৈতলও ঘরের এক কোণে বসে ওদের কথোপকথন শোনে, কখনও মন্তব্য করে আলটপকা । হেড়ম্ব ভট্টাচার্যের গলাটাই থাকে চড়া । ইটখোলা মালুগ্রাম হরিৎবরণের একমাত্র পুজারি ব্রাহ্মণ । বেঁটে মানুষটি এলাকায় বাট্টি ভট নামেই বেশি পরিচিতি । সবার ভিতরবাড়ির অনেক খবরই তার নখদপর্ণে । গূঢ় সংবাদ পরিবেশনে সতর্কতার কণ্ঠস্বর তার কিছুতেই নিচু থাকে । কারণ বাট্টি ভটের গলার আওয়াজ একই তারে বাজে, কোনও ওঠা পড়া নেই । সব সময় ভম্ভম্ মুলি বাঁশের গাঁট ফাটা গলা । তাই সাংকেতিক ভাষার ঘেরাটোপ । বৈতলের বুঝতে অসুবিধা হয় । বাট্টি ভট বলে,

--- রাহুয়ে বুঝছইন নি কবিরাজ মশায়, কেতুরে আর রাখাল না । পুড়ি ইগুরে লইয়া যেতা ইচ্ছা করের, যেখানো ইচ্ছা ঘুরের । অউত্ত গেছেগি এক চা বাগানো, ডার্বি না ভুবনডর ।

পুরনো বই এর দোকানদার বিনোদ চক্রবর্তীও কেচ্ছাগল্লে সমান উৎসাহী । বলে,

--- লগে কিতা ভোলা গেছে না নি ।

--- ভোলায় কিতা করত । ভোলা ইণ্ড তো দালালি করে । বদনাম হয় ভোলার, মাঠা খায়
হিণ্ডয়ে । রাহুয়ে ।

--- কেমনে গেল তাই, বাপে ছাড়ল কেনে ।

--- বাপ ছাড়াছাড়ির কে । কালা চেভরলেট অণ্ড চলাইয়া অউত্ত ডাইল ভাত কেতুর । বাগানো
গেছে তখন তো উপরি ও পাইব ।

--- অ গাড়ি লই গেছে নি । তে আর কিতা বাপ লগে আছে ।

--- বাপ লগে থাকত কই । ইউনিয়নের জিপ লইয়া গেছে । পানি কাপড়ের জিপ ।

কথোপকথনের শেষ পর্যায়ে এসে কিছু সত্য বৈতলের বোধগম্য হয় । কালো গাড়ির
সূত্রে কিছু আন্দাজ করে । বৈতল আপন মনে হাসে, রাবণের উপমাটা তার, আর রাহু ।
দুটোই বেশ জুতসই । কিন্তু পুড়ি কে কেতুই বা কে । অপ্রয়োজনীয় ভাবনাকে দীর্ঘায়িত করে
না বৈতল । জমিদার যমুনাপ্রসাদের এরূপটাও সে ধারণা করেছে, তথ্যে নিশ্চিত করতে
পারেনি । তবে বেঁটে মানুষটার উপস্থাপনাতে বেশ মজা আছে । সব কথা বলাও হয়, নামও
নেওয়া হয় না । উপস্থিত মধ্যবয়সী জনেরাও তাকে রটনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মানে । তাই আরো
তথ্যের খোঁজে বাকিদের হামলে পড়তে দেখে বৈতল প্রমাদ গোনে । সময় বয়ে যাচ্ছে
এককথায় সেকথায় । বৈতলে ফিরে যাওয়ার জন্য তৎপর হয় । কম পথ নয়, সাত আটমাইল
হবে ইটখোলা মেহেরপুরের দূরত্ব । কবিরাজ মহাশয়কে বলে,

--- কাকুবাবু, আমি ইখানো থাকি কিতা করতাম আম্মকর লাখান । পয়সা দিলাইন যাই গিয়া ।

--- তুমি আম্মক অইতায় কেনে রেবা, আমার কবিরাজির বনাজি অইলায় তুমি । ইতা জড়িবিটি
গাছ গাছালি পাতালতা আনিয়া না দিলে অষুদ বানাইলাম নে কেমনে । আইজ থাকিউ যাও,
কাইল তুমারে এক লিস্টি দিমু, আনি দেওন লাগব । তুমি তো কইছ বড় হাওরর পারো তুমার
বাড়ি, তে ত শালুক চিনো, বনতুলসী শিমূল ভুবি লুকলুকি দুরণ কলমী এরেন্ডা আর শটির কিছু
পাতা আনি দিও । তোমারে পুরা পয়সা দিতাম পারতাম নায় একলগে । তুমি তো দেখছউ
সবে পুরা পয়সা দেয় না, পয়সা না দিয়াউ লই যায় অষুদ । গাছ গাছালি নায় তুমি দিলায়,

কিন্তু মধু তো কিনন লাগে, ধাতুও কিনন লাগে । বাড়ির সোনারূপা শেষ অই যার । মার ইতা ভাঙ্গাই দিয়ার । মায়ে তো আর দেখরা না ।

শৈলেন কবিরাজকে গাছ গাছালির শিকড় । পাতা ফল ফুল দেয় বৈতল । কবিরাজ বৈতলকে মূল্য দেওয়ার কথা বলেন কিন্তু দেওয়া আর হয় না । বৈতল দুচার পয়সার জন্য চাতলা হাওরের পারে বনজঙ্গল থেকে লতাপাতা শিকড় বাকড় আনে না । রোগী দরদী কবিরাজকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটা তো আছেই, আর আছে তার স্থায়ী-ঠিকানার খোঁজ, হৃদিশ । জমিদার বাড়ির পুকুরপারে চালা ঘর একটা দেখে এসেছে । সেই ঘরের গেরস্ত হবে বৈতল । তার আগে তো টোপের মুখে ঢালতে হবে মধু । জানতে হবে ভিত্তি জমিদারকে কাবু করার কৌশল । গুণের কথা, চরিত্রদোষের কথাও তো জানতে হবে । আর সে-কাজে ভাল মানুষ কবিরাজ যে তার কোনও সহায় হবে না সে জানে বৈতল ।

জলের জাদুকর বৈতল জানে জাদু দিয়ে কিছু হয় না । জানতে হয় কৌশল । নদী বিল পুকুরে জলের বুড়বুড়ি দেখে, মকা পুঁটি দাড়কিনার চালচলন দেখে বুঝে বড় বোয়ালের হালহৃদিশ, রুই কাতলার ঠিকানা । কবিরাজ কাকুর সভাঘরের ভিতরও বৈতল কৌশলে খুঁজে নেয় তার ঠিকানা । হেডম্ব ভট্টাচার্য ওরফে বাট্টিভটই এখন তার টোপের নিশানা । মোটা গলার মানুষটার শয়তানি তার চোখে মুখে । নিজের সুখ নেই আনন্দ নেই লাভ নেই তবু পরনিন্দা আর পরচর্চায় কাটিয়ে দেয় সময় । যজমান বাড়ি গিয়ে আহরণ করে পারিবারিক আর ব্যক্তিগত কুটকচাল, শৈলেন কবিরাজের ঔষধের বড়িতে মিশিয়ে দেয় কথার বিষ । ভদ্রলোক কবিরাজও মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে বলেন,

--- তাইন যে কিতা মাতইন ।

কথা শুরু করতেও হেডম্ব ভট্টাচার্যর সুতো ধরতে হয় না । সুতো এসে ওর হাতে ধরা দেয় । যেমন বৈতল আহম্মকির কথা । ওই এক কথায়ই তোপ ঘুরিয়ে দেয় বৈতলের দিকে । হুকোর নাইড়চা এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে মুখ লাগিয়ে আয়েস করে দেয় এক টান । ধোঁয়া গেলে একপেট । বৈতলের দিকে ঘুরে ধোঁয়া মিশিয়ে দেয় বাতাসে । বলে,

--- আম্মকির কথা কিতা কইলে বেটা । আমরা কিতা ইনো আম্মকির মাত মাতিয়ারনি ।

--- এ ঠাকুর, ইতা কিতা কইরা। আপনারা তো কিছু মাতলাউ না। আর আমার আশ্মকির লগে আপনারা কিতা কইন। আমি অইলাম আশ্মক ছয়, যে হক্কল কথাত কয় অয় অয়। আপনার যেতা কইবা সবতাতঅউ আমারে অয় অয় করন লাগব। রিফুজি মানুষ তো কিছু চিনি না। এর লাগিউ কইয়ার যাই গিয়া।

--- যাইতায়গি কই রেবা, বাবন বাড়িত আইছ না খাইয়া গেলে আইবনি।

ব্রাহ্মণ বাড়িতে খাওয়ার অভিজ্ঞতা বৈতলের ভাল নয় কিন্তু শৈলেন কবিরাজের বাড়ি অন্যরকম। খাওয়ার ব্যবস্থা এক সিদ্ধ চাল ডাল সজি নুন সব এক সঙ্গে। কবিরাজের পরিবার বলতে এক খোঁড়া কিশোর শিক্ষার্থী। কবিরাজ শিখেছে, বাড়ি ভুবন পাহাড়। ওরা কেউই তার জাত গোত্র জানতে চায় নি। কবিরাজও না তাঁর ছাত্রও না। একসাথে বসে খেয়েছে, নিজেরা নিজের পাত্র ধুয়ে রেখেছে। খাওয়া শেষে এক টুকরো যষ্টিমধু এনে দিয়েছেন কবিরাজ। বলেছেন,

--- খাওরেবা। মিঠা লাগব।

মিষ্টি মানুষের লোভেই আসে বৈতল। দুর্গাবতীর রাগ সহ্য করে থেকেও যায় ভালমানুষের কাছে দুদণ্ড। নির্লোভ সাধু মানুষের জীবনে শখ দেখতে হলে শুনতে হলে থাকতে হবে এক রাত এক ভোর। রাত ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভেঙে যায় কবিরাজ ঠাকুরের। পেছন ঘাটা খুলে ভাঙা বালতি আর ঘটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অনেক দূরে খাটা পায়খানার কাজ সেরে ফিরেও আসেন তৎক্ষণাৎ। আর ঘরে ঢোকা হয় না, চিলিম উল্টে পোড়া তামাকের গুড়ো মুখে দিয়ে কচর মচর করতে করতে শুরু হয় বাটিসাবানে বুরুষ ঘষে গালে ফেনা তোলা। রেজারে ভারত ব্লেন্ড লাগিয়ে ফটকিরি ঘষে একবার ছোট হাত-আয়নায় দেখে নেওয়া গালের মসৃণতা। বৈতল মাটির বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাকাবাবুর কান্ড কারখানা দেখে আর শোনে মিষ্টি মানুষের মিহি সুরের গান।

‘রাইজাগো গো

জাগো শ্যামের মনমোহিনী’

তারপর শ্যামাভোগের মুড়ি বাতাসা আর জল আহার শেষে বেরিয়ে পড়া । দুপুরের
খাওয়া, বলেন, ভোজনং যত্র তত্র । শহরে তো আর আখড়ার অভাব নেই । দুপুর পর্যন্ত
ভ্রাম্যমান ঔষধালয়ের চিকিৎসা শেষে ভোগের প্রসাদ । মেহেরপুর কিংবা শিলকুড়ির উদ্বাস্ত
শিবিরে গেলে হরিমটর । দুর্গার সঙ্গেই প্রথম পরিচয় শৈলেন কবিরাজের রবির বারবেলায় ।
ক্যাম্পে বিনাপয়সায় রোগী দেখা এবং ঔষধ দেওয়ার দিন রবিবার । ইটখোলা থেকে পায়ে
হেঁটে যান মেহেরপুর । সেখানেই পরিচয় এই অকৃতদার চিকিৎসকের সঙ্গে । রোগের লক্ষণ
জেনে কালো বড়ি খাইয়ে বাঁচিয়ে দেন দুর্গাবতীকে । বলেন, অতিসার । সঙ্গে নুন জলের
অনুপান । কৃতজ্ঞতায় বৈতল কাবু হয়ে যায় । তারপর যে-কোনো ছুতোয় চলে যায় অ্যাওলা
হরতুকি ব্রাহ্মীশাক যা পায় তা নিয়ে । বিশ্বাদ হবিষ্য আহারের লোভে থেকেও যায় । প্রথম
রাতে যষ্টিমধু মুখে দিয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলেছে বৈতল । বলেছে,

--- কবিরাজ মশয় একখান কথা কইতাম নি ।

--- কও না, কে না করছে ।

--- না, বাবন বাড়িত খাইতে আমার খুব ডর লাগত ।

--- কেনে বা ?

--- তারা খুব ছুয়াছুয়ি মানইন ত ।

--- আমিও মানি । আমি চিকিৎসা করি । নিয়ম মানিয়া জীবনধারণ করি । তে আমি ছুয়াছুতর
বাবন নায় রেবা ।

--- না, আপনার কথা কইয়ার না । আমরা ছাতকো আছিল এক বাবনবাড়ি ।

--- তুমার বাড়ি ছাতক নি । ছাতকর মানুষ বুলে খুব আডুয়া ।

--- আমি কুনু আডুয়া নি ?

--- না রেবা, ইতা এক কথার কথা । এক ছড়া মনো পড়ল । হুনো,

‘ছাতক তনে আইলা এক আডুয়া, যাইতা বদরপুর ।

সিলট আইয়া জিগার করলা, জৈন্তা কতদূর ।’

নেও কও, কিতা কইছলায় ।

--- না, আমরার ছাতকো আছিল জৈন্তেশ্বরীর মন্দির । অউ মন্দিরর পুকইরো এক মাছ ধরি
দিছি পুরইতরে । অউ বড় বড় কালিয়ারা । বাবনি এইন আছলা বড় ভাল, কইল খাইয়া যাইছ
বেটা । আমি তো আদরর পাগল, খাইলাম । জীবনে ভুলতাম নায় সোয়াদ । পুস্ত বাটিয়া
রান্দচইন কালিয়ার মাছর ঝুল, পিয়াইজ উয়াইজ ছাড়া । অত আদর করি খাওয়াইলা মাসীয়ে ।
খাওয়াইয়া দেখি হক্কলর উছিত উঠাইলা, ধইয়া আনি রাখলা, আমার উছিত উঠাইলা না । শেষে
উঠাইলা, উঠাইয়া ছান করিয়া আইলা ।

--- কেনে ?

--- আমি নু ...

বৈতলের মনে পড়ে দুর্গাবতীর কথা । দেশভাগের কথা, ওপারের বৈতল কৈবর্ত, এপারে যে
শর্মা । ব্রাহ্মণ । তাই বৈতল শুদ্ধ করে নিজের বয়ান । বলে,

--- তারা নু চক্রবর্তী বাবন । সবার উপরে ।

--- তুমার কিতা ?

--- আমার শর্মা । অগ্রদানী বাবন ।

হেড়ম্ব ভট্টাচার্য বা বাট্রি ভট সন্তুষ্ট নয় বৈতলের জবাবে । বলে,

--- আম্মক ছয় কইলে কেনে বেটা । আমরা কুনু আম্মক পাঁচ নি ? বেশ চালাকি করিছ না,
পুরা কতা ক ?

--- পুরা কথা কইতাম কেমনে, আপনারা কে কিতা কুনু জানি নি ?

--- আবার চালাকি কররে । ফকরামি নি ?

--- আইছা, ঠিক আছে কইয়ার, হুন্তাউ যখন হুনইন । গাইল্লাইন না যেন ।

‘আম্মক এক-অল্ল বয়সে লয় ভেক ।

আম্মক দুই-চাল ছাইয়া টুল্লিত থয় খুট ।

আম্মক তিন-যে ছুটলুকর কাছে করে ঋণ ।

আম্মক চাইর-যে থাকে শরিকি বাড়ি ।

আম্মক পাচ – যে শরিক অইয়া মাছ কিনে ।’

আর আমি অইলাম আম্মক ছয় । অউ শেষ ।

--- না আরো আছে আমি জানি । তুই আমারে কইরে, আমি ঘরজামাই এর লাগি কইরে । ক
কইলা আম্মক চৌদ্দ কিতা ? তুইতো বেটা ছয় নায় খালি, তুই আম্মক এগারো ও, তুই পরর
কাম করছ বেগার । ই কবিরাজর বেগার খাটিয়া কিতা লাভ তর । এর থনে জমিদারর বেগার
খাট, পয়সা পাইবে ।

--- পয়সা দিলে খাটতাম না কেনে । কত দিবা ।

--- যত চাছ দিব । ইতা কুনু নাড়ী টিপিয়া জ্বর দেখা আর ছালি দিয়া বড়ি বানানি নি ।
জমিদার বাড়িত সব পাইবে । বিয়া করচ্ছনি, বৌ আছেন ।

বাড়ি ভট দরিদ্র কবিরাজকে অবজ্ঞা করলেও সোজা কথার মানুষটিকে ভয় পায় বিলক্ষণ । তাই
শৈলেন ঠাকুরের সামনে সব কথা বলার সাহস করেনি । বৈতলকে একান্তে ডেকে জানায়
যমুনাপ্রসাদ জমিদারের দুর্বলতা । বলে,

--- সুন্দর সান্দর না অইলেও অইব, গতর থাকন লাগব ।

সতের

উপযাচক শুভানুধ্যায়ীর কুচক্রী কথাবার্তা বৈতল চুপ করে শুনে যায় । সে সব জানে । বৈতল যে জমিদারকে নিজের হাতে ঢলানি দিয়ে এসেছে পদ্মপুকুরের পারে । এত সহজে জিয়ানি দেবে না । এবার শুধু খেলা । ক্যাম্পে বৈতলকে দেখে তো যম জমিদারের খুশি আর ধরে না । সর্পদংশনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বারবার কৃতজ্ঞতা জানায় । বৈতলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে । একা বৈতল নয়, বৈতলের পরিবারকেও মনে ধরে রাছ জমিদারের । বৈতলকে বলে,

--- চলো চলো রেবা । মালউল যেতা আছে উঠাও । তুমার ইখানো থাকা অইত নায় । আমার বাড়িত থাকবায়, পুকইরর পারো একচালা ঘর আছে আমার । হি ঘর তুমরার, থাকবায় নিজর মতো করিয়া । চলো ।

বৈতল ভাবে তার কেরামতি, ভাবে পূর্বাপর । পুকুর পারে মাছধরা, সাপের খেলা, মুচ্ছাও পতন, হাতের আংটি হাতিয়ে নেওয়া, আংটির দাম সত্তর টাকা, পক্ষীরাজ রিক্সার দামও এক । ব্রাহ্মণ কন্যা দুর্গাবতীকে দেখেই যে জমিদারের সব পরিকল্পনা সে বৈতল ভাবেনি । বৈতলের এই এক দোষ, সে যখন ভাবে তখন তার নিজস্ব ছক নিয়েই ব্যস্ত থাকে, বিপক্ষকে গুরুত্ব দেয় না । তাই প্রাথমিক জয়ের আভাস পেয়েই সে ফিরিয়ে দেয় গাড়ি করে যাওয়ার প্রস্তাব । জমিদারের সঙ্গী ভোলাকে জানিয়ে দেয় সে যাবে, তবে জমিদারের ভাঙা গাড়িতে নয়, সে যাবে তার নতুন রিক্সায় ।

বৈতল একবারও ভাবে না শুধু কৃতজ্ঞতার বশে কেন নিয়ে যাবে তাকে যমুনা জমিদার । দশ বিশ টাকা হাতে গুঁজে দিলেই তো কৃতজ্ঞতার শোধবোধ । তা বলে একজন অজানা মানুষকে বাড়িতে ঠাই করে দেওয়া । কিসে এত মুগ্ধতা, কেন কোনও প্রশ্ন করবে না, জানতে চাইবে না দেশ কোথায় । কেন দেশভাগের দুবছর পর এপারে । আর সিলেট তো হরিৎবরণ নয়, ইটখোলা নয়, মালুগ্রাম নয়, অম্বিকাপট্টি নয় যে সবাইকে চেনে । কোন পরগণা কোন গ্রামে তার বাড়ি, জানবে না । বৈতল নাম বলেছে সৃষ্টিধর শর্মা, সিলেট শর্মা ব্রাহ্মণ বললে

কিছুই বোঝায় না । ব্রাহ্মণ মাত্রেই শর্মা । গোত্র কী । বৈতল এত সব ভাবেনি, কৃতজ্ঞতার
প্রতিদানকেই বড় করে ভেবেছে ।

পুকুরপারের খড়বাঁশের ঘরটাকে সারিয়ে তোলে বৈতল । বাঁশের বেড়া গোবর মাটি দিয়ে
লেপে দেয় দুর্গাবতী । নিজের বাড়ি আর লাগোয়া জমিদার বাড়ির উঠোনও সুন্দর হয় লেপনে
পুছনে । দুর্গাবতী মল্লয়া গাছের বেদি লেপে দেয় , লেপে ঠাকুরঘরের দাওয়া ।
বৈঠকখানার বারান্দায় আরামচেয়ারে গা এলিয়ে বসে থাকে জমিদার যমুনাপ্রসাদ । অবাক হয়ে
দেখে দুর্গাবতীর অপরূপ শরীরী বিভঙ্গ । চোখের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে চোখ দিয়ে খোঁজে,
চেয়ার ছেড়ে ওঠে, বারান্দার ওমাথায় যায় । ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে বরতনু । মাটিলেপায়
বিশাল সুন্দর শ্রোণীযুগলের আঁটো বাঁধুনি টানটান হয় । নির্বাধ এমন যুগল বক্ষ আর
উন্নতদরশন । চোখে দেখে আশ মেটে না । জমিদার ডাকে মধুর স্বরে । বলে,

--- ও বউ শোন ।

দুর্গাবতী গোবর মাটির হাত ধুয়ে কাপড় চোপড় ঠিক করে নেয় । হাঁটুর উপর থেকে
গোড়ালিতে নামায় শাড়ি । বুকদুটি আধভেজা কাপড়ে ঢাকে । তা ও কি বাঁধ মানে । জমিদার
ভুলে যায় কথা । দুর্গা বলে,

--- আইজ্ঞা ।

--- উঝা বেটা ইগু তুমার বিয়া করা মানুষ নি ?

দুর্গাবতী চমকায় । এ আবার কেমন প্রশ্ন । কিছু কি ধরা পড়ে যায় । এরকম তো
হওয়ার কথা নয় । বিয়ে টিয়ে তাদের কিছু হয় নি ঠিক । কিন্তু সে তো অন্য দেশের ঘটনা ।
এখানে কেউ জানে না তাদের পূর্বপরিচয় । সবাই জানে ওদের দেশ সুনামগঞ্জ । ভাটির
দেশের মানুষ । গ্রাম বইয়াখাউরি পরগণা ছাতক । শর্মা, ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে দুর্গাবতী ।
বইয়াখাউরি শ্মশানের গায়ে ঘর । পিয়াইন আর সুরমার সঙ্গম যেখানে । অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বাপ
। তিনি তিনকাঞ্চন না করলে মড়া পোড়ানো যায় না । শ্রাদ্ধেও প্রথম ভাগ তার । পিন্ডদানেও
তাই । সেই বাপের একমাত্র কন্যা । মানুষ বলে কটার বাবণ, তুচ্ছ করে ব্রাহ্মণ সমাজও ।
তবুও পিতার মৃত্যুর পর তিলকাঞ্চনের অধিকার চেয়েছে দুর্গাবতী ব্রাহ্মণী । সংখ্যালঘু হয়ে
যাওয়া স্বধর্মের মানুষ দেয়নি তাকে সে অধিকার । সমাজমানুষেরা রক্ষাও করতে পারেনি তাকে

ধর্মকের হাত থেকে । ব্রাহ্মণ তথা বাবুসমাজ যা পারেনি তাকে তাই করে দেখিয়েছে এক নিম্নবর্ণের যুবক । বৈতল রক্ষা করেছে দুর্গাবতীকে । বইয়াখাউরির বড়বিল আর দেখার হাওর । কুচা হাতে কালো কুচকুচে একটা মানুষ শুনেছে নদীর জলেও দাপিয়ে বেড়ায় । হাওর বিলে লড়াই করে সকাল সন্ধে রাতের অন্ধকারে । জলের ফসল নিয়ে যায় মাধবগঞ্জ ঝাউয়া বাজারে । যেদিন নদীর জলে জাল ফেলে সেদিন দুর্গাবতীকে দেয় মাছ । মা নেই বাপ নেই বৈতলের, তাই নিজের বাড়ি ছেড়ে থাকে মালিরভিটায় । বইয়াখাউরির কালিবাড়ি টিলার উপর, নিচে নদীর পারে শ্মশান । কালিভক্ত নয় তবু যায় মন্দিরে, থাকে নেশার টানে, আর বন্ধু লুলার টানে । শ্মশানের গা-লাগোয়া কবরখানার ঘরে থাকে বন্ধু লুলা । দুই বন্ধুতে নেশা করে নদীর পারে । মদফদ খুব একটা খায় না বৈতল, কিন্তু গাঁজার নেশায় বঁদ হয় । আর নেশা গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণকুমারী । দূর থেকে দেখা, এমন নেশার কথা বলার সাহস হয়নি কোনোদিন তেলাল কালো বৈতলের ।

দুর্গাবতীও ছিংলাকাঠির মতো মানুষটাকে দেখে । কালো তেলতেলে শরীরে পছন্দ হওয়ার মতো কী যে দেখে দুর্গা সেই জানে । বৈতলের এক আকর্ষণী শক্তি আছে নিশ্চিত, নইলে সেই সেই ডামাডোলের সময়ে, দেশভাগের আগেও পরে দুই সমাজ, হিন্দু মুসলমানের সমান প্রিয় হয়ে ওঠে কোন মস্তবলে কে জানে । যখন মন্দিরে থাকতে শুরু করে বৈতল, তখন থেকেই মন্দির পুরোহিত ও ভক্তভজন সবার ভালবাসা কুড়িয়েছে বৈতল । দুর্গাবতী তো থাকে অনেকদূরে, একা শ্মশানে যুবতি । কেউ বলতে পারবে না বৈতল কোনোদিন তাকিয়েও দেখেছে ।

বৈতলের চকিত দেখা তার মনে মনে । দুর্গাবতীও জানে ঐ মানুষটি আছে, জালি বেত এর শরীরটা কাছাকাছি থাকলে আর কোনও ভয় নেই । বৈতলেরও ইচ্ছে হয় নি কখনও, বৈতল নিজেকে জানে । বামন হয়ে চাঁদ হাত দিতে চায়নি । সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা তার কামনার বস্তু নয় জানে । আবার ভুড়ুং আচার্য মারা যাওয়ার পর অসহায়া যুবতীর সব ভার যে কেমন করে বৈতলে এসে বর্তায় কে জানে । কখনও মাথা তুলে দেখেনি যুবতীকে, আবার দৃঢ়তার সঙ্গে অভয় দেয় কালিবাড়ির সেবাইতকে, সবার অভিবাবক গিরিবাবাকে । বলে,

--- তাইন থাকউকা ইখানোউ । আমি আছি, দেখমু ।

দিনে একবার দেখা দিয়েছে বৈতল । মাছ দিয়েছে বিস্তর, একবারও ভাবেনি মাছ ছাড়াও কত কিছুর দরকার । চাল ডাল তেল নুন দরকার, দরকার কাপড়চোপড়েরও । তবু দুর্গাবতী

চেপ্টা করেছে ভালভাবে বাঁচতে । পিতার কাজ করার অধিকার চেয়েছে, পুরুষ নয় বলে
প্রত্যখান হয়েছে । বইয়াখাউরি কেন, গোটা ছাতক পরগণাই অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পুরুষের অভাব,
তাই বাসস্থান থেকে উৎখাত হতে হয়নি । বড় বড় মানুষের বাড়িতে গেছে, বলেছে রান্নার
কাজ পেলেও তার চলবে । কেউ দেয়নি । ব্রাহ্মণ কায়স্থ সবার কাছেই সে অচ্ছুৎ । রাধামাধব
আখড়ার পরিচালকরা বলেছে নেবে । তবে বষ্টুমি হয়ে আখড়ায় থাকতে হবে । খেতে হবে
নিরামিষ । বৈতল বলেছে, না । বৈতলের সুপারিশেই বড়বিলের পারে কৈবর্তদের বিষহরি
মন্দিরের লেপাপুছার কাজে বহাল হয় দুর্গাবতী ।

বাপ বেঁচে থাকতে তো ঘরের বাইরে বেরোয়নি দুর্গাবতী । বাপ মরতে ধান্দা শেখে ।
ভদ্রলোক পুরুষরা দুর্গাবতীর সঙ্গে কথা বলে । দুর্গাবতীর প্রয়োজন তখন, কাউকে ফিরিয়েছে,
কাউকে ডেকেছে । দুর্গাবতীর জন্য কিছু করতে পেরে গর্ব হয় বৈতলের । তখনও বৈতল মুখ
তুলে তাকায়নি, কিন্তু নেশা ধরে ।

শৈশবের বন্ধু লুলাও তখন বইয়াখাউরিতে । বাজারে বাজারে কবিগান গায় । দোহালিয়া
বাজারে বৈতলও ওর সঙ্গে যায় । রুল আমিন রেজ ওরফে লুলা যখন কবি গায় তখন তার
নাম হয় দিলবাহার বাঙাল । এক এক জায়গায় যায় আর স্থানীয় মানুষকে মোহিত করে দেয়
ছড়া গেয়ে । প্রচলিত সব ছড়াকে সে তার নিজের মতো পরিবেশন করে টিনের চোঙা মুখে
লাগিয়ে । জলঢুপ বিয়ানিবাজার ঢাকাদক্ষিণ শাল্লা, বংশীকুন্ডা, খুরমা, দিরাই, বালাগঞ্জ, লংলা,
লামাকাজি একসঙ্গে গান গেয়ে বেড়ানোর সুখস্মৃতি ভুলবে না জীবনে । বন্ধু লুলার কবিগান তো
একটুকরো কাগজে পাঁচ মিনিটের গল্প । সব স্থানীয় প্রেম পিরিতির কথা । তবে লুলা বুদ্ধি
করে রূপবান এর গানও গায় । আবার বর্ষায় যখন জলঢুপ বাজার আনারসের ফসলে
স্তুপীকৃত, তখন করে স্থানবন্দনা । গায়,

‘জলঢুপের আনারস জগতের সেরা

শ্রীমঙ্গল ফলায় বুঝি দেখতে যাব মোরা

শ্রীমঙ্গল চায়ের বাগান সবার আছে জানা

কেমন করে বানায় চা দেখব তার নমুনা ।’

বাজারে গাইতে গাইতে সুরের সঙ্গে এমন মিতালি করেছে লুলা যে চা বাগানের গান গেয়েই
সুরকে বদলে দেয় ভিন্নগানে । গায়,

‘ও ধাইমা,

ধাইমা গো, কিসের বাজন বাজে গো আমার ধাইমা ।

বারো দিনের শিশুর সঙ্গে ও রূপবান তোমার হবে বিয়া গো ।’

সোনাউতা বাজারে গিয়ে বৈতল দেখে ভিন্ন রূপ । নদীর পারে বাজার । নদীর উপর
এক লোহার পুল, এপার ওপার । ওপার থেকে হাটুরেরা জড়ো হয় বাজারে । বুধবারের
জমজমাট বাজার দেখতে বৈতল পুলের উপর ওঠে । শুধু সাদা তকিতে ছেয়ে আছে বাজার ।
লুলা এক একদিন এক এক ছন্তরে দাঁড়িয়ে শুরু করে গান । এক পয়সা থেকে বাড়িয়ে
দুপয়সা দাম করে দিয়েছে লুলা এক পাতার কবিগানের । লুলার লেখায় গ্রাম্য কথাই বেশি,
তার উপস্থাপনা আর প্রচলিত ছড়ার গানে শ্রোতা মোহিত হয়ে কিনে নেয় দু পয়সার পাতা ।
সোনাউতা বাজারে গিয়েই লুলা তার ঝুলি থেকে বের করে এক সোনালি জরির কাজ টুপি ।
বৈতলের হাতে দিয়ে বলে,

--- তুইন পিন্দিলা । দেখরে নানি ইখানো সব অউ বাঙ্গাল ।

বৈতল তকি হাতে নিতেই লুলা হাটুরে শ্রোতাদের আদাব জানায় । তারপর শুধু করে তার
অননুকরণীয় গান । গায়,

‘পয়লা বন্দনা করি মালিক ছাত্তার ।

দুছরা বন্দনা করি নবি মছতকার ।

তিছরা বন্দনা করি ছিলটি মানুষ ।

দিলবাহারের কথা ছন দিয়ে ছশ ।

ধন আছে জন আছে, আছে ধান চাউল

হরিণ আছে পাখি আছে, আছে মাছ হউল ।

কি অর লাগি গম কর আল্লা আছইন লগে ।

যত নিয়ামত দিছে আল্লা দুনিয়ার মাঝ ।

বাদশাগিরি করা অইল ছিলটির কাজ ।

আরব দেশর মাটির লগে মিল ছিলটির ।

এর লাগি বাস অইল বাবা শাহজালারর ।

জালালি কবুতর উড়ে কাজল পাংখা দিয়া ।

আল্লা আল্লা জিকির পড়ে তারা সব বইয়া ।’

বৈতল তার বন্ধুর রূপ দেখে গর্বিত হয় । আবার এক কষ্টের অনুভূতিও তাকে করে খায় । তার শৈশবের সাদাসিধে বন্ধু কি তবে পাণ্টে যাচ্ছে । শুধু ধর্মের কথা কয় ধর্মের গান গায় । বৈতল ভাবেও সে ও কি পাণ্টে গেছে, সেও তো আর গ্রামের বাড়িতে থাকে না, মন্দিরে থাকে । মন্দিরে সবাই আসে যায়, প্রাণের বন্ধুকে আনতে পারে না । মন্দিরটির নিচে বসে থাকে লুলা । ধর্ম সম্পত্তির শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে দুজনে চালাচালি করে মনের কথা । বৈতল লুলাকে দিয়ে দেয় তার বসতবাড়ি । বলে,

--- থাক বেটা ভূতর বাড়িত । ইখানো আমি থাকতাম নায । ই বাড়িত আমার মাই আছিল ।

--- তাইন আছইন অখনও । আমি গেলে টের পাই, পাগলার দেবীমার লাখান বই রইছইন ভাত বাড়িয়া । ডাকরা তরে ডাকরা আমারে, লুলা আয় বাপ । তুইন বেটা মাইর লাগি কিতা করচছ । আমি করছি, তানে ভাসাই দিছি সুরমার পানিত । তুইন তখন কই আছিলে বেটা । অখন দিলাইরে বাড়ি ।

মিরতিঙ্গার মামার বাড়িতে মরেছে মা । বৈতল জানতেও পারেনি । লুলা, বৈতলের মুসলমান বন্ধু গেছে, সাপের কামড়ে মৃত মায়ের শেষকৃত্য করেছে, সুরমার জলে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছে মাকে । লুলা এখনও বিশ্বাস করে মা ফিরে আসবে আবার প্রাণ নিয়ে । ইচ্ছে হলে ঠগঠগামির চুরি ডাকাতি সবই করে লুলা, দুই বন্ধুতে মিলে এসব করে । কিন্তু লুলা লোভী নয় । বৈতলের দিয়ে দেওয়া বাড়ি নেয়নি । বলেছে,

--- অয়, তখন সবে কইব, দেখো কিলাখান দোস্তি, পাকিস্তান অইতেউ বাড়ি নিছে গিয়া । ইতা আমি পারতাম নায়, দিলা তুই যে কুনু কালা মিয়ারে । অই হালা, ভিটা ছাড়ন লাগে না, আমি কুনু ছাড়ছি নি, খিত্তা থাকি গিয়া মামাইন্তর কাছ থাকি আমার হিসসা লইয়া আইছি, নানিহালি সম্পত্তি আমার কম নায় । তর ইতা নিতাম কার লাগি । আর অখন নায় তো লেইঞ্জ নাই, কল্লা নাই, কালিবাড়ির ছাগি, যখন বিয়া করবে বউ আইব, কই রাখবে বেটিরে ।

--- কেনে তুই দিতে নায়নি থাকার জাগা ?

--- তুইন কিতা ইন্ডিয়াত ভাগার কথা ভাবিতরে নি বে ?

দেশ ছেড়ে কেন যাবে বৈতল । বন্ধুর কথায় দুঃখ পায় । দুঃখ থেকে হয় রাগ । রাগ করে মন্দিরে যায়, এক চিলিম, দুই চিলিম তিন চিলিম টানে এক সন্ধ্যায় । নেশায় টলতে টলতে নামে টিলার নিচে । লুলাকে মারে এক লাথি, মারে দুই লাথি, তিন লাথি মারতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ে শক্তমাটিতে, পড়ে বন্ধুর গায়ে । পদাঘাত খাওয়া দশাসই বন্ধু মার খেতে বলে,

--- মার হালার হালা । আরো মার, আমিও অইলাম খিত্তাগাউর বাঙাল, গুসা উঠলে কিন্তু আস্তা রাখতাম নায় ।

আর ঠিক তখনই, সন্ধ্যা হয় হয়, পিয়াইন পারের শশ্মান থেকে বেরিয়ে আসে এক লক্ষীপ্রতিমা । দুই বন্ধুর মধ্যস্থতা করে । দুর্গাবতী কিছু বলে তাদের, তারপর দুজন গলা জড়াজড়ি করে বেরিয়ে যায় সন্ধ্যার আঁধারে । এরপর কেটে গেছে আরো কিছুদিন । এসেছে বর্ষা, পিয়াইন সুরমার আবার শুরু হয়েছে মাতলামি । ফুঁসছে জল । তেমনি এক অন্ধকার রাতে প্রলয় চারদিকে । শ্মশানের পাশে মুখোমুখি দুই নদী । কানায় কানায় কানাকানি করে । বন্যাজল শ্মশান থেকে অনেক দূরে । ঘরে একা সাহসিনী দুর্গাবতী কুপিলক্ষ নিভিয়ে শুয়েছে । ঘুমঘোরে বুঝতেও পারে না কী করে ঘরে ঢোকে দুর্বিপাক । একাকিনী যুবতীর তো ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই, সদা জাগ্রত থাকে । কোনও শব্দ না করে কী করে ঢোকে লুলা, সিঁদ কেটে না দরজা ভেঙে । দরজা ভাঙেনি কারণ দুর্গাইতো দরজা খুলে বেরিয়েছে বৈতলকে ডাকতে । একা লুলার মতো দানবকে বশ করার মতো ক্ষমতা আছে দুর্গার, নইলে কী আর একা থাকে শ্মশানঘরে । কিন্তু লজ্জা আর ঘৃণায় দুর্গা ছুটে বেরিয়েছে । লুলার জাপট থেকে বেরিয়ে

বৈতলের বিশ্বাসে আঘাত দিতে চেয়েছে । লুলা যে বৈতলের প্রাণের বন্ধু, বইয়াখাউরির মানুষ জানে হরিহর আত্মা । বৈতল বিশ্বাস করে না । বৈতল জানে তার লুলা এক সাধুপুরুষ । তার বন্ধুত্বের কল্যাণপরশ দিয়ে ঘিরে রাখে । দুর্গাবতীর চিৎকার শুনে হতভম্ব হয়ে যায় বৈতল । ভাবে এ কেমনে আক্রোশ । শুধু বিধর্মীকন্যা বলে ধর্যক হয়ে সর্বনাশ করতে হবে । দুর্গার গায়ে হাত দেওয়ার দুঃসাহস কেউ কখনও করেনি । দুর্গা একাই অসুরনাশিনী হয়ে সংহার করতে পারে, কিন্তু করে না, বৈতলকে ডাকে, বন্ধুর হাতে সৌপর্দ করে দুষ্ট সহচরকে । তখনই দুর্গা তার নামের মহিমায় সংবরণ করে নিজেকে । নিশ্চিত হয়ে ভাবে, সে যদি দুর্গা হয়, তবে গাঁজাখোর বৈতল তার মহাদেব । তার আশ্রয় ।

বন্ধুকে মারতে হাত কাঁপেনি বৈতলের । বইয়াখাউরিতে ফোঁসে জল , দুই নদীর সম্মিলিত আক্রোশে বাড়ে জল । দুর্গাবতীর ভিটা শুধু ভেসে আছে নদীর পারে । বন্ধুর দেহ নদীর জলে ভাসায় বৈতল । দুর্গাবতীর বাবা ভুডুৎ আচার্যের মতো এক আজলা জল, জলের দেহে দিয়ে বলে,

--- পবিত্রোপবিত্রবা ।

বৃষ্টির জল আর চোখের জল একাকার হয় বৈতলের । মনে মনে বলে,

--- শেষ বিচারের দিন দেখা অইব দোস্তু ।

দুর্গাবতী আর সময় দেয়নি বৈতলকে । মালিভিটার বেতখলার জালিবেত বৈতল পাটনির চোখে তাকিয়ে দেখেনি কোনোদিন । কালিবাড়ির সেবাইত গিরিবাবার নির্দেশে বৈতল দেখভাল করেছে অনাথা যুবতীর । ঘনিষ্ঠতার কোনও কারণ ঘটেনি গৌরাঙ্গী আর কৃষ্ণবর্ণের । দুর্যোগের রাতেই প্রথম চোখাচোখি । প্রথম হাত ধরাধরি । হাত ধরে তাড়া দেয় দুর্গাবতী । বলে,

--- চলো চলো আর দেরি না ।

আঠারো

বৈতল কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেয় তাড়া আবার । বলে,

--- চলো ।

--- কই চলো ।

--- আমারে ইন্ডিয়াত দিয়া আও ।

--- কই যাইতায় ইন্ডিয়াত ?

--- আছে, যাইমু । আমার মামা আছইন জালেঙ্গাত । আখড়া করছইন । আমারে আদর করিয়া ডাকইন, দুর্গা মাইকি জয় ।

--- হি তো বুঝলাম । অখন আর জয় দিবা নি ।

--- দিবা দিবা, তাইন এক আচানকি মানুষ । নিজর খানি না থাকলেও ভাগনিরে খাওয়াইবা ।

--- আর জামাইরে ?

--- বিয়া অইলে তো জামাই । বৈষ্ণবী সাজিয়া যাইমু । রসকলি আকমু ।

--- আর আমি । আমি কিতা পুলিশর হাতো ধরা খাইতাম নি আবার ।

--- কেনে । তুমিও অই যাইবায় গোসাই । নাম লই লাও একটা ।

--- আমার নাম নেওন লাগত নায় । যে নাম আছে হউ নামেউ অইব । আমি বৈতল, বৈতলের লগে গোসাই লাগাই দিও লাগব । দাশ লাগাইদিও লাগব, পাটনি লাগাই দিও লাগব, কৈবর্ত লাগাই দিও লাগব, মিয়া লাগাইদিও লাগব । তুমারর ই আচার্য উর্চায শর্মা উর্মা লাগত নায় ।

--- আমারে বিয়া করলে তো লাগানি লাগব ।

--- কেনে আমি কুন্স বেটি নি । তুমি লেখবায় পাটনি । দুৰ্গা পাটনি লেখতে পারলে বিয়া
করবায়, নাইলে না । আইছা নায় দাশ লেখিও । তুমার কিছু করন লাগত নায় । আমারেও
বিয়া করন লাগত নায় । তুমি তুমার বাবনি অউ থাকিও গো মাই, অখন চলো দিয়া আই
বৈষ্ণবীরে মামার বাড়ি । জয় দুৰ্গা মাইকি ।

বৈতল হাত ধরে দুৰ্গাবতীর । কলাগাছের ভোরা বানিয়ে ভাসিয়ে দেয় সুরমার জলে । ভেসে
যায় দুজনে । কুশিয়ারা পেরিয়ে মনে হয় নিশ্চিত । বরাক বেয়ে বেয়ে তারাপুর, শিলচর ।
ওখানেও দুৰ্যোগ । দুৰ্যোগের পাইক পেয়াদা একা আসে না । একের পর এক দুৰ্ভোগ কাটিয়ে
বৈতল বোষ্টুমীকে নিয়ে পৌঁছে যায় মেহেরপুর । পুনর্বাসন দপ্তরের বদান্যতায় ডামধাড়ার এক
ঘরের মালিক হতে না হতেই দুৰ্গাবতী অসুস্থ । ধুমজ্বর আর পেটখারাপ, বারবার পায়খানা ।
বৈতল উতলা হয়, একে ওকে বলে, ডিসপেনসারির লবণজল আর শিবাজল বড়ি খেয়ে কমে
না । কেউ বলে হোমিওপ্যাথি করতে, বীরেশ ভট্টাচার্য ধন্বন্তরির এক পুরিয়ায় ঠিক হয়ে যাবে ।
কেউ বলে, এলোপ্যাথি, বিভট । একজন এসে বলে,

--- আমি শৈলেন কবিরাজ । দেখি কই তুমার পরিবার ।

কবিরাজের বড়িতে সুস্থ হয় দুৰ্গাবতী । কাচকলা দিয়ে চেঙ মাছের ঝোল খেয়ে চনমনে
দুৰ্গাবতী মনে মনে প্রণাম করে কাকাবাবুকে । দুৰ্গাবতী কাকাবাবু ডাকলেও বৈতল ডাকতে
পারেনি । বৈতল ডাকে কবিরাজ মশয় । দাম ছাড়া ঔষদের সুফলে প্রতিদান দিতে চায় বৈতল
। ভিষগশাস্ত্রীর চাই ঔষধের উপকরণ, তাই বৈতল জঙ্গল থেকে পাতালতা যোগাড় করে দেয়
কবিরাজকে । একবার এমনিতে দেয়, বারবার দেয় না, দাম চেয়ে রাখে । বৈতল এরকমই ।

বৈতল জানে জালেঙ্গার গল্প ঢপ । মামা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দুৰ্গাবতী বোষ্টুমি
হতে ওখানে যাবে না । ভেসেই যখন পড়েছে কলাগাছের ভোরায় আর ছাড়বে না সিতপুরুষ
বৈতলকে । মেহেরপুর ক্যাম্প একাকী অসুস্থ যুবতিকে ছেড়ে যায়নি বৈতল । তারও আর
খুনের আসামী হয়ে জেলে যাওয়া হয় না । থেকেই যায় বিদেশ ইন্ডিয়ার যুবতিমায়ায় মুগ্ধ হয়ে
। তবু মাছের ঝোলে সুস্থ হওয়া রোগিণীর মতামতটাও তো জরুরি । গম্ভীর মুখে বিদায় নিতে
যায় । বলে,

--- অখন যাই ।

--- কই যাইতায় ।

--- কেনে বইয়াখাউরি । অখন থাকোইখানো, তার পরে নায় যাইও মামার আখড়াত ।

--- অ, আখড়াত যাওয়ার লাগিনি ক্যাম্পো আইলাম । কিচ্ছু বুঝো নানি ? খালি গাটামি । যাও গিয়া, অখন পাকিস্তানর জেলো পচিয়া মরো ।

--- আমারে কে ধরত ? কেউ দেখছে নি ? বৈতলরে ধরা অতো সস্তা নায় ।

দুর্গাবতী বৈতলের হঠাৎ গভীর হওয়া কালো চোখে তাকায় করুণ দৃষ্টিতে । বলে,

--- যাইতায় গিয়া । আমি অসতী এর লাগি । বইয়াখাউরির মাইনষে আমারে ভালা রাখছে না । একলা পুড়ি কেমনে ভালা থাকত ভাবছনি একবার ।

--- ছিছি, ইতা কিতা কও । বৈতল ইলাখান নায় । তুমি কই আর আমি কই কও ? তুমি বাবনর পুড়ি আর আমি কৈবর্ত পাটনি । তুমি ধলা আমি কালা । কুন্মিল নাই ।

--- কিওর মিল নাই কও । আমি তসলার কালি মাথিয়া বই থাকমুনে । তে অইবনি ? আর বাবন ? তুমিও একটা বাবনাকি নাম নেও গি না, কিতা অইব ।

--- পারতাম নায়, একদিন কইছি নানি । আমি বৈতল বৈতল অউ থাকমু । বৈতল বৈতল তিন বৈতল ।

--- ইতা অইত নায় । বৈতল কুন্মিল নাম নায় । ইতা গাইল ।

--- অউক গাইল । আমার নাম অউ গাইল ।

--- আমি সবরে কই দিছি আমরা বাবন । কাকাবাবুরেও কইছি আমি দুর্গাবতী শর্মা । তুমারে ও জামাই কইছি । অখন কিতা অইব ?

--- এ রাম, আমিতো ক্যাম্পো নাম লেখাইছি বৈতল দাস পাটনি ।

--- ইতায় কিচ্ছু অইত নায়, হরিদারে কইলেউ বদলাই দিব । তুমি আমার লাগি একটু করতায় পারো নানি ?

--- পারি । দেশ অউ ছাড়িয়া আইছি । তখন এক নামর লাগি নি আটকি যাইমু । কও কিতা নাম রাখতায় ?

--- আমি কেনে, তুমি কও ?

--- আমি তো এক নাম অউ জানি ।

--- বৈতল নানি । ই তুমার ডাক নাম থাকউক, ছাড়িও না । ভাল নাম বানাও ।

--- আরে নারে বাবা । আমি আমার গুরুর নামে ভাল নাম বানাইছি ।

--- কী নাম ?

--- সৃষ্টিধর উবা ।

--- উবা উবা নায় । আমি নু কই লাইছি, আমার শর্মা ।

--- বুঝলাম তো, শর্মা বাবন হকল তো ছায়াত থাকইন, ভাল খাইন । আমার লাখান রইদে পানিয়ে ঘুরইন নি, হিদলপুড়া খাইন নি । তুমি তো ধলা, আমারে দেখলেউ ধরি লাইব । আমি ইতা পারতাম নায়, হাচা কথা কই দেও হকলরে ।

--- আমি তো লগ্গুনও আনাই রাখছি তুমার লাগি । অখন যদি উল্টা কথা কই কিতা ভাববা কাকাবাবুয়ে ? ভাববা ইতা ঠগ । অখন একতা তখন একতা মাতে ।

--- অয় বাঙালও ভাবতা পারইন । বউত বাঙালেও রিফুজি সাজিয়া হিন্দু নাম লেখাইছে । এগু হারিছ আলিয়ে হরিশ্চন্দ্র লেখাইছিল, ধরা পড়িয়া অলা মাইর খাইল । বাজারি কিল খাইয়া ভাগল বেবেঙ্গাত । ঠিক আছে তুমি অউ জিতলায়, আমি শর্মা অই গেলাম, যাও । কুল মান সব গেল এক বাবনি বেটির লাগি ।

মেহেরপুর ক্যাম্পের যুবক কর্মচারি হরিদাস গুরুবৈদ্যকে দিয়েই বৈতলের নামকরণ হয় নতুন করে । দুর্গাবতীর চোখের ভাষায় হরিদা সৃষ্টিধর শর্মা নামের নতুন রিফুজি পরিবারকে নথিভুক্ত করে । বৈতলদাস পাটনির পরিবারের নামও থাকে যথারীতি । ডোল বরাদ্দ হয় দুই নামেই, দুই পরিবারে । হরিদাস কর্মচারী ও দুর্গাবতীর মধ্যে অর্থকরী সমঝোতা হয় । কয়েক মাসের মধ্যে শিলচর থেকে পরিদর্শক এসে নাম ডাকতেই ধরা পড়ার উপক্রম । কিন্তু কিছুই

হয় না, হরিদাসের চোখের ইশারায় বৈতল দু নামেই থেকে যায় উদ্বাস্ত শিবিরে । এরকম আরো অনেক নামই তো নেই । রিফুজি অফিসারদের সঙ্গে আসে জননেতা । খাদির পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা বাবু । কংগ্রেস পার্টির । পুজোর সময় জানিগঞ্জের ব্যবসায়ীরা নতুন কাপড় নিয়ে আসে । শীতের কম্বল । তবে শিবিরের ভিতর হরিদার কথাই শেষ কথা । কাউকে ঢুকতে দেওয়া বের করে দেওয়ার একমাত্র কর্তা । অনেকের আত্মীয় স্বজনও আসে, থাকে । প্রথম প্রথম তো ডোলের পরিমাণ বেশিই ছিল । এক হুগুয় পরিবার প্রতি নগদ কুড়ি টাকা কম কথা নয় । চাল ডাল তেল নুনও অনেক, অনেকেরই গরিব আত্মীয়স্বজন এসে ভাগ নিয়েছে । খাতায় লেখা অনেক পরিবারের নিজের বাড়ি আছে তারাপুর শিলকুড়ি শিববাড়ি রোডে, ওরাও আসে । সে এক মোছব । এর মধ্যেই বৈতলকে নিয়ে ক্যাম্পের ভিতর শুরু হয় আতান্তর । বৈতল কিছুতেই হরি শুক্লবৈদ্যর বশ্যতা মানবে না । আর বৈতলও নজরানা না দিয়ে দুই দুগুনে চার জনের রেশন ও ভাতা ওঠাবে । দুর্গাবতীর এসব লড়াই ঝগড়া ভাল লাগে না । বৈতলকে বলে,

--- দিলাও না বেটারে যেতা চায় । হে তুমার লাগি করছে ।

--- করছে, তো করছে । হে আমার মুখ দেখিয়া করছে নি, ভাবছে পাইব । পেট মুটা অইব । অখন বুঝ বেটা ধুড়া সাপের লাখান বেঙ গিলি লাইচছ তর থাকি গাট্টা । না পাররে বার করতে না পাররে গিলতে ।

--- যদি কই দেয়, জানাই দেয় ।

--- জানাইত নায়, চাইট দিলে হেউ মরব ।

--- মানুষ খারাপ নায় হরিদা । আমারে দিদি ডাকে ।

--- কেনে তুমারে দিদি ডাকত । হে কুনু তুমার ছুট নি । বুড়া বেটা । হুনো, ইতারে আমি চিনি লাইদিলেউ ঘাড়ো উঠব । আমি গাইল্লাই, এর লাগি আমারে ডরায় ।

--- খেদাই দিবনে দেখবায় কুনদিন ।

--- খেদাইত উ আমি চাই, ইনো কুনু হারা জীবন থাকমু নি ।

--- কই যাইবায় ।

--- অ, ইতা হনছ নানি । রিফুজি হকল আবার যাইব গিয়া পাকিস্তানো ।

--- আর আমরা ।

--- আমরাও রিফুজি, যাওন লাগব ।

--- কই যাইতাম । কুন মুখে যাইতাম । কে আছে আমার ।

--- আমি বেটা ফাসির আসামি । দুইমুখো করাতর মাঝখানো আছি । রামে মারলেও মারতা
করিম চাচায় মারলেও মারতা । আমি কুনু আর যাইমু নি বইয়াখাউরি । তুমারে দিয়া আইমুনে
বডার পার করি ।

--- অ, নিজর কথা ভাবলায় খালি । আমারে বাঘর মুখো দিয়া আইবায় আবার । বেটাইন্ত
হকল নি অলা স্বার্থপর ।

--- ইতা কইও না । আমি স্বার্থপর নায়, আর হিপারোও সব বাঘ ভাল্লুক নায় । অখন ইতা
অইল কিতর্নর মাইর । না পাইয়া পাইছে ধন, বাপেপুতে কিতর্ন । পাকিস্তান পাইয়া ছলি গেছে
। ইতা ঠাণ্ডা অই যাইব । করিমচাচা যদি বাচি থাকইন দেখবায়নে তুমার লাগি করবা ।
আমরার তো মন্ত্রী ও আছইন করাচিত একজন, যোগেন মণ্ডলরে একবার দেখছিলাম হবিগঞ্জো
। বেটা খুব সাউকাড় ।

--- হে তো ছুনছি কৈবর্ত না মাইমল, কিতা কিজানি । হে বিয়া করব নি বাবনর পুড়িরে ।
করলে তো ভালা আছিল মন্ত্রীর বৌ হই গেলাম নে আর তুমারে বান্দিয়া নেওয়াইলাম নে
পাকিস্তানো । বেটা ডরালুকর পাদ্রাপুক !

--- রিষ চড়াইও না কইলাম । বৈতলে কেউরে ডরায় না ।

উনিশ

ভয় ডর নেই বৈতলের । কোনোদিন কাউকে ভয় করেনি । নির্ভয় থাকাই ক্ষীণদেহী বৈতলের জীবনীশক্তি । এতদিন পর্যন্ত বৈতলজীবনের কোনও পিছুটান ছিল না । নিজের অজান্তেই এখন বৈতলের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে । বৈতল দুর্বল হয়ে যাচ্ছে । দুভাগ হয়ে যাচ্ছে । দুর্গাবতী আর সে, আলাদা করে দেয় বারবার, আলাদা দেখে । এ এক অবাক সম্পর্ক, জড়িয়ে গেছে দুর্গাবতী, তবু বৈতল এক হতে পারে না । পেরিয়ে যাওয়া যাবে না এমন এক বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকে । অলঙ্ঘ্য এক শুকনো নদী শ্যাওলা যেমন দুদেশকে আলাদা করেছে । বৈতলের দিক থেকেই আশঙ্কা বেশি, বৈতল কালো বৈতল নিম্নবর্ণ আর দুর্গাবতীর দুধেআলতা রঙের উপর আছে উচ্চবর্ণের সম্ভ্রম । নৈবেদ্যের উপর কাঁঠালি কলার মতো শোভাময় । তেলে জলে কী করে মিশে খায় । তাই সীমান্ত পেরোনোর মজার কথাও শেষ পর্যন্ত পরিহাসময় থাকে না । অভিমানে বারবার আলাদা হওয়ার কথা শুনিye দেয় বৈতল, বার্তা দেয় দুর্গাবতীকে । কী জানি, দুর্গা বোঝে কী বোঝে না । হয়তো বোঝে তাও বৈতলকে আতান্তরে রাখে । আর ছাঁটকলে পড়লে বৈতলও উল্টোপাল্টা করে । অকারণে হরি গুরুবৈদ্যর সঙ্গে লড়াই করে । আর মনে মনে প্রস্তুত হয় শিবিরে ছেড়ে যাওয়ার । করুণা আর দয়ার পাত্র হয়ে শিবিরবাসী হয়ে থাকতেও চায় না বৈতল । শিবিরবাসীদের প্রতি শহরবাসী মানুষের একটা দূরত্বও লক্ষ করেছে বৈতল । শহরের সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে উদ্বাস্তুদের কল্যাণে । ভিড় বেড়েছে, চুরি ডাকাতি বেড়েছে, জিনিষপত্রের দাম আকাশ ছুঁয়েছে । শৈলেন কবিরাজের সাক্ষ্য আসরে হেড়ম্ব ভট্টাচার্যের মুখের তো রাখঢাক নেই, সরাসরি বিষ উগরে দেয় । পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে । আবার রাজনীতির মানুষের ঘোলা জলে মিষ্টি কথাও বলে, প্রতিশ্রুতি দেয়, হেন করার তেন করার । কেউ কেউ আবার, পয়সাওলা যারা বিশ্বস্ত বেগার শ্রমিক খোঁজে । ইটখোলা হরিৎবরণের জমিদার যমুনা প্রসাদ সিং যেদিন সদলবলে মিটিং করে যায় ক্যাম্পের বাইরে, সভা শেষে ধুতি শাড়ি বিতরণ করে । বৈতলের হাতে হাত লাগতেই চিনতে পারে । আর ছাড়ে না । আসলে বৈতল ইচ্ছে করেই ধরা দেয়, কোনও ব্যক্তিগত দয়ার দান গ্রহণ করার মানুষ নয় সে । চুরি ডাকাতি করবে, হাত পাতবে না ।

জমিদার তার হাত জড়িয়ে ধরে, নিয়ে যেতে চায় তার বাড়ি । প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতায় বেভুল মানুষের ফাৎনা ডুবতে দেয় । কাতর জমিদার বলে,

--- কত খুঁজছি রেবা ।

খুঁজেছ তো কী হয়েছে । শুকনো কৃতজ্ঞতায় চিঁড়ে ভিজবে না । বৈতলের পাতা ফাঁদে পা দিতে হবে, তার পর দরদাম । টোপের মুখে বৈতল অনেক মধু ঢেলে রেখেছে । সাপের ছোবল থেকে বাঁচানোর খেলা এমনি এমনি খেলেনি । হাতের থেকে সোনার আংটি সরানোটা দাদন । সোনা বেচার সত্তর টাকায় বানানো রিক্সা নিয়েই বৈতলের সমস্যা । নিরাপদ জায়গা চাই । রিফ্যুজি শিবিরে অটেল জায়গা, কিন্তু বৈতল খুব কমজনকেই বিশ্বাস করে । সবার সঙ্গে ওর মেলেও না । বাসিন্দারা সবাই তো আর এক গ্রামের নয় এক পরগণার নয়, এক বিশ্বাসের নয় । সুনামগঞ্জ বানিয়াচঙ ছাতক মৌলভীবাজার সদর সিলেট হবিগঞ্জের মানুষজনের কথা বলার ধরনও ভিন্ন । সবাই কিছু না কিছু লুকোয়, মিছে কথা বলে । দেশের জমিদারির গল্প করে ধাড়ার ঘরে বসে ঘুমিয়ে । পান্তাভাতের এসব জমিদারের তাই ভরসা নেই বৈতলের । তাই হরিৎবরণের আসল জমিদার যমুনাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় দুর্গার । বলে,

--- আমার পরিবার ।

বৈতলের পরিবারকে মনে ধরে জমিদারের । বৈতল জানে মনে ধরবেই, লোভ চুক চুক করবে রিফ্যুজির সুন্দরী বৌ দেখে । জমিদার পুকুরে মাছমারার চমৎকার আর সর্পাঘাত থেকে রক্ষা করা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্গাবতীর আগুন সুন্দর । তাও জমিদারের অতিউৎসাহ নাকচ করে বৈতল । দেয় গাটানা, তার তেলাল শরীরকে করে আরো মসৃণ, পিছলে পিছলে যায় । নিরাপদ আস্তানায় ঘাঁটি গাড়ার আগে পোক্ত করে নিতে হবে ভিত । বাড়ঝাপটার হাত থেকে বাঁচাতে হবে পদ্মপুকুর পারের একচালার ঘর । এসব বড় বড় পয়সাওলাদের বিশ্বাস নেই, এরা আজ বলবে এসো বসো নয়নের মনি হয়ে, দুদিন পরেই বলবে ভাগ । গুরু সৃষ্টিধর তাই কারো অযাচিত সম্মান গ্রহণ করেননি কখনও । গুরু বলেছেন,

--- এবার হাত থাকি বাচিয়া থাকিও বাবা । এরা বিনা কামে কিছু করে না । কাম শেষ হইলে তুমিও শেষ । এরা বড় সাংগাতিক এরা কয় দিয়া নেওরা । এরা সব বান্দীর পাতো বইয়াখাওরা । বাঘর চউখ দি চাই থাকলে বাঘেও চউখ লামাই লায়, এরা কুন্ চক্ষুলজ্জা নাই

। এর লাগিউ কয় বড়র পিরিত বালির বান্দ খনে গলাত দড়ি খনে চান্দ । এরা কিচ্ছু দিতে চাইলে লেখাইয়া লইও নাইলে পাঁচজনর সামনে যেন কড়ার করে দেখিও ।

বৈতলও জানে অনেক প্রবাদ । ধান খাইছ মুরগি যাইবায় কই । জমিদার তো প্রাণ বাঁচানোর নাটককে সত্য জানে, সত্য জেনেছে তার সুন্দরী দুর্গাবতীকে । তাই জমিদার পাঁচজন নয় দশজন নিয়েই আসবে তাকে গৃহস্থ করতে । বৈতলেরও তো মন পড়ে আছে ঐ ছোট জলাশয়টির পারে । এখানে এই শিবিরে বেশিদিন থাকলে সেও বদনাম হয়ে যাবে । সাধারণ মানুষের রাগ বাড়ছে রিফ্যুজিদের উপর । শহরে চুরি বাড়ছে আর সব দায় যাচ্ছে উদ্বাস্তু ক্যাম্পবাসীদের দিকে । সন্দেহ দানা বাঁধছে । অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে এই নম্বর দেওয়া ক্যাম্প । একবার এসে ঢুকে গেলে তাকে আর ধরা যাবে না , কারণ ক্যাম্প হলো সংরক্ষিত এলাকা, প্রতিবেশী দেশের নাগরিক খোঁয়াড়, দেশের মালিক এসে চাইলেই ফিরিয়ে দিতে হবে রসিদ লিখে । ওপার থেকে তাড়িয়েছে ডাঙার বাড়ি দিয়ে, এবার নিয়ে যাবে থিথি হৈ করে । বৈতল শুনেছে সবাইকে ফিরিয়ে দেবে তার জমিজমা ঘরবাড়ি । নেতারা তো তাই বলে, ক্যাম্পের ভিতর বাইরে অনেক নেতা, প্রায়দিনই টিনের চোঙায় মুখ লাগিয়ে বক্তৃতা দেয় । বৈতলের ক্যাম্পের নেতা সতীশচন্দ্র দেব এর মুখে দাঁত নেই একটাও, বয়সও সত্তরের উপর, চোঙা ছাড়াই বলেন তাঁর বিশ্বাসের কথা । হবিগঞ্জ শিমূলঘরের এই দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ এখনও বিশ্বাস করেন দেশে ফিরে যাবেন, সবাইকে বলেন প্রস্তুত থাকতে । গৃহহারা এই মানুষের দল তার কথার দৃঢ়তায় আকৃষ্ট হয় । সতীবাবু তাঁর অনুগামীদের বারবার দুটো কথাই মনে রাখতে বলেন । বলেন,

--- নেতাজি আইবা, দুই বাংলা এক আইব ।

আবার কংগ্রেসি নেতারা বলেন, দেশভাগ সত্য, মেনে নিতেই হবে ।

বিভ্রান্ত বৈতল জানতে চায় কোনটা সত্য । যদিও বৈতলের কাছে কংগ্রেসিদের কথাই মান্য বেশি, সে আর কোথাও যেতে চায় না, সম্ভব নয় বলে । দুর্গাবতীর মনের ভিতর কী আছে এখনও জানে না বৈতল, কিন্তু দুর্গার স্বপ্নে সেও বীজ বুনতে শুরু করেছে । নতুন বসতের সন্ধানে তাই তার জালের জগৎবেড় ছড়িয়েছে হরিৎবরণের জমিদার বাড়িতে । তবে হাতের পাঁচ নষ্ট করার মতো বোকাও নয় বৈতল । শিবিরের নিত্যদিনের ভাল মন্দেও মিশে থাকে ।

সাদা সার্টপ্যান্ট আর কোমরে কালো চামড়ার ব্যাল্ট পরা রিফুজি অফিসার এলেই শুরু হয় কথা । সবার খোঁজ খবর নেয় মানুষটা আন্তরিকতা দিয়ে । সবাই ডাকে আর আরও । বাবুও নয় স্যারও নয় সাহেবও নয় । শুধু আর আর ও, উদ্ভাস্ত পুনর্বাসন আধিকারিক । বৈতলও ডাকে তাই । বৈতলকেও চেনে মানুষটা । সম্ভাষণ করে হাসি মুখে । বলে,

--- ভালো নি রেবা ?

সবাইকে নাম ধরে নয় পদবি ধরে ডাকে মানুষটা । বৈতলের বেলা কেন এই তাচ্ছিল্য বোঝে না । নাকি জানে তার দুই নামের রহস্য বৈতল দাস পাটনি আর সৃষ্টিধর শর্মা নামের কথা । তাহলে কি এই লোকটাও জড়িত হরির কেরামতিতে । তাই বৈতলের জবাবও সোজা হয় না । বলে,

--- আমরা ভালো দিয়া কিতা অইত কইন, আমরা আইলাম মাগনা গরু দাত নাই, আপনার খোয়াড়ো আছি, আপনে ঘাস উস দিরা, ইতাউ কে দেয় কইন । ভালোই আছি । তে কত্বারে একখান কথা জিগাইতাম নি ?

--- কও রেবা, তুমি শুনছি খুব রসিক মানুষ ।

--- রিফুজির সব রস পেরাইয়া বার করি লাইছে গণভুটে । আর অখন সবে কাকরা কাকরি কররা । সময় থাকতে কিছু করতা পারছইন না, অখন কইন নেতাজি আইবা, ভাঙা দেশ বুলে জুড়া লাগব । সবে বুলে নিজর দেশো ফিরি যাইবা । আমি যাইমু ছাতকো, অউ সুধা দত্ত যাইবা শ্রীমঙ্গল তাইন বুলে চাঘরবাবু আছলা, কত চাকরবাকর কুলি কামিন আছিল তান, রাজার লাখান থাকতা, পারবা নি অখন । গান্ধিয়ে জিন্মায় ইতা কিতা করলা আমার । আপনারে কই, হাচা কথাখান কইবা নি । আমার কিতা অইব, কই যাইমু না অউ ছাপটা ঘরো থাকিয়া মরমু । শহরর মাইনষে কয় আমরা বলে চুর । আমরা কিতা চুরি করতাম কইন চাইন, কই রাখতাম লুকাইয়া আর লেংটার কিতাউবা চুরি করতাম । আমরা কিতা কইন চাইন, হিনর বাঙাল হকলে কয় বাপর দেশো যা, আইলাম । ইনর হিন্দুয়ে বাঙালে কয় রিফুজি । রিফুজি কিতা হিন্দু না মুসলমান না খেদাখাওরা হকলর নতুন ধর্ম । অখন যে কইরা যাইতাম আবার, গেলে মায় নিবা নি । মা অউ নাই বেটি, যাইতাম কই ।

শেষ কথা কটি বৈতল নিজের সঙ্গেই কয় । কথা বলতে বলতে আরআরওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । কম কথার মানুষটিকে মনে হয় বেশ সাব্যস্তের । শোনার ধরনে মনে হয় একটা সমাধান পাওয়া যাবে । কিন্তু বৈতলকে নিরাশ করে উদ্বাস্ত আধিকারিক । বলে,

--- আমি রেবা চাকরিমান মানুষ । ইতা সব রাজনীতির কারবার আমি কইতাম পারতাম নয়বা । তুমার তো নেতা আছইন, তারারে জিগাইও ।

--- আর নেতা । তারা যে আমরারে নিয়া কিতা করবা, কে জানে । আমরা তো তারারে ভুটও দিতাম নয়, আমরার দেশ অউ নাই, আর ভুট । তেও আমরারে নিয়া খেলরা কেনে । নেতা ভালো অইলে নি আমরা পানিমাটি ছাড়িয়া আই । কে আছইন কইন ।

--- অউ যে আইরা দেখরায় নি, টানে জিগাইও । তাইন সবার লাখান নয়, ভালো মানুষ । ভালো অইলে কিতা অইব, বড় একলা মানুষ । সবে লুটি লার, তাইন একলা রিফুজির লাগি জান দিলাইরা । বড় একরুখা রেবা ।

--- তানে তো চিনি, তাইন কাকাবাবু ।

--- ইনো সব অউ কাকাবাবু । বুড়া অইলেউ কাকাবাবু । তান নাম হরিমাধব ভট । তাইন বুড়া নয় ।

--- অয় অয় জানি । তান বয়স কম, তেও তানে কাকাবাবু অউ ডাকি । তে কিতা হরিদা ডাকতাম নি । চিনইন নানি আপনার হরি চুররে । হে চুর নি, হে ডাকাইত । আমরার পয়সা মারিয়া লাল অই যার । আপনারা জানিয়াও তারে রাখচইন হিয়ালোর হাতো ছাগিবাগি দিছইন । এর লাগিয়াউ, চুরর লগে নাম মিলাইতাম না করিয়া তানে ডাকি কাকাবাবু ।

হরি গুরুবৈদ্যর কার্যকলাপ সব জানা আছে আরআরওর । কিন্তু করার নেই কিছু । পুনর্বাসনের নামে কত টাকা নয় ছয় হচ্ছে, হরি তো ডোলের দুচার টাকা এদিক ওদিক করে । তাই বৈতলের কথার জবাব না দিয়ে হরিমাধববাবুর পদচারণার দিকে নজর দেয় । যত তাড়াতাড়ি তাদের সামনে আসবেন তত তাড়াতাড়ি জোঁকের মুখ থেকে রক্ষা পাবে । বৈতলের সব মোক্ষম প্রশ্নের যে জবাব নেই তার । বা, জবাব থাকলেও দেওয়ার উপায় নেই । একজন আধিকারিক হয়ে এক বাস্তবহারাকে এসব বলে কী লাভ । তাই হরিমাধব বাবুর হাতে বৈতলকে

সুঁপে দিয়ে এগিয়ে যায় হরি গুরুবৈদ্যের অফিসঘরের দিকে জবাব চাইতে । বিবেকবান
আধিকারিক হয়ে অধঃস্তনকে একটা কড়া ধমক তো দিতে পারে আরআরও । বৈতল তার
পালিয়ে যাওয়া দেখে হাসে । সে জানে ধমক টমক দেওয়া এই সাদাসিধে মানুষটার ধাতে নেই
। অফিসঘরে পৌঁছতে পৌঁছতে ইচ্ছে করেই ভুলে যাবে সব ।

কুড়ি

বৈতল ভোলে না কিছুই । উদ্বাস্ত পুনর্বাসন আধিকারিক এড়িয়ে গেলেও কাকাবাবু তাকে
নিরাশ করবেন না । বৈতলের মনের কথা শুনে উতলা হয়ে ওঠেন । বৈতলের প্রশ্নে হরিমাধব
ভট্টাচার্যর মনের ভিতরও তোলপাড় শুরু হয় । তাঁর ছোটখাটো চেহারা ফুঁসতে থাকে । খদ্দের
ধুতির কোঁচা হাতের মুঠোয় ধরে বৈতলের অসহায়তার সঙ্গী হয় দরদী মানুষ । বৈতলের কাঁধে
হাত রেখে বলেন,

--- অয় । কংগ্রেসি হকলে যেতা কইন অতাউ ঠিক । পানি কাইত কইলে কাইত । কিতা
করবায় । এরা কুনু আসল কংগ্রেসি নি । ভালা মানুষ সবরে তো খেদাই দিচ্ছে পার্টি থাকি ।
অখন লিগ আর বড়লোক জমিদারউর এরাউ হইলো কংগ্রেস ।

--- কেনে, আপনে তো আছইন ।

--- আমি তারারে ছাড়ি দিছি । তারা কয় আমারে খেদাই দিছে । দিলে কিতা অইব । আমার
কথা তো হুনানি লাগব । সরকার চালার তারা । তারা জাগিয়া ঘুমার । হকলে ঘুমাইরা, আমার
লগে তুমরা ছাড়া কেউ নাই ।

--- কেনে, সরকারে হুনতা না কেনে । হুনানি লাগব ।

--- লাগব তো বুজিয়ার । তারা একদিকে এক আইন, আর একদিকে এক আইন করলা ।
পাঞ্জাবি হকলে কইল বদলা বদলি করব । ইদিকর সব হিদিকে হিদিকর সব ইদিকে । সবে
শান্তিত থাকবা । আর আমরারে লইয়া অইল খেইড় । বাঙালি হকলরে বুলে পাকিস্তানে
ফিরাইয়া লই যাইব । যেলাখান আছিল সব আবার এক লাখান অই যাইব । হিন্দু রিফুজিরে
বুজানি অর নেতাজি আইয়া তারারে লই যাইবা তারার দেশো । ঘটি বাটি মাটি সব ফিরাই
দিবা ।

--- অউত্ত আপনেও কইরা, তে কুনদিন আইতা তইন । কুনদিন ভাঙত বরগাইট ।

--- কুনদিন ভাঙত নায় । নেতাজি কুনু আছইন নি । নেতাজি নাই কইলে আমাৰেউ আস্তা
রাখব নি । এৰ লাগি ইতা মাতঅউ মাতি না । আৰ তন লাখান অত বড় মানুষ লুকাই থাকবা
নি কও । তইন আইলেউ কিতা, অত শক্তি নি তান, দুই ধৰ্মৰে আবার এক কৰি দিবা ।
ভগবানেউ পারতা নায় । ইতা হয় না । অখন কথা অইল পুনৰ্বাসন । তুমরা ইদেশো থাকবায়
এৰ লাগি জমি দেখা অর । চা বাগানৰ বউত জমি খালি পড়ি রইছে, কাটিগড়া বড়খলাত আছে
। তুমি কই যাইতায় কও ? পাট্টা উট্টা পাইলিবায় । দেওন লাগব সরকারর ।

--- আইছা কাকাবাবু, ইয়ত যে শুনলাম বউত জমিন আছে ।

--- ইওত কই রেবা ।

--- ইওত আৰি, অউ মাছিমপুর শালচাপড়া শ্রীকোনাত ।

--- অ, তুমিও নি পড়ছ অউ চক্করো ? ইতা সব পাথর । ইতাদি বুলে ভুদান অইত ।

--- ভুদান কিতা ।

--- ইতা কিতা আমি জানি না । মাইনষর, বড় বড় জমিদার হকলে, চা বাগানৰ মালিকে বাইঞ্জ
জমি দান কররা, তারার নাম ফাটের, যে পার তারও ফাটের । ইতাত যাইও না । মধ্যপ্রদেশ
যাইরা বউতে দন্ডকারণ্যত পাথরর বাড়িত থাকতা, সুন্দরবনৰ সাপ পানি আৰ বাঘৰ পেটো
যাওয়ার লাগি ।

--- না, আমার জমিন থুড়া অইলেউ অইব, আমার লাগে পানি । দিবা নি ।

--- পানি । ইতো আচানকি মাত মাতলায় । সবর অউ মাটি লাগে কেউ পানি চায় না । তুমি
চাইলায় ।

--- আমি অইলায় পানির পুক ।

--- তুমি কুনু মাইমল নি । তুমি ত শৰ্মা বাবন ।

--- অখন আৰ শৰ্মা কিতা কৈবর্ত কিতা । সব অউ এক, দিবা নি ।

--- দেখ রেবা, জলর জমি তো কেউ নিত চায় না । তুমার লাগি বেবস্থা করতাম পারি ।
তারপরে না করিও না ।

--- না করতাম কেনে । কই কইন ।

--- অউত্ত চাতলার আওরো, কাঠলবস্তি দিয়া ঢুকলেউ খাস জমি আছে । পাঁচ কাঠা জমি
পাইবায়, আওরর পানিও পাইবায় মাগনা । যত ইচ্ছা মাছ ।

মাছের লোভ বড় লোভ । হরিমাধব কাকাবাবুকে হ্যাঁ করে দেয় বৈতল ।

এই নিয়ে দেখা দেয় অন্য দুর্যোগ । দুর্গাবতীর সঙ্গে অবনিবনা । দুর্গা রাজি নয় আবার
অনিশ্চয়ের অতলে তলিয়ে যেতে । আবার সেই জতিলতা, দুর্গার মন বোঝার চেষ্টা করে বৈতল
। ঠিকই তো, দুর্গাবতী কোনো চাষা মাইমল নয় যে চাষ আবাদের কাজ করবে মাছ ধরায়
সাহায্য করবে, ওর সঙ্গে থাকবে জীবনের দৈনন্দিনতায় । তখন টালমাটাল অবস্থায় সদ্য যুবতি
সহায় ভেবেছে সঙ্গ নিয়েছে । এখন দুর্গাবতীর কোনও অনিশ্চয়তা নেই, নতুন দেশে অনেক
বিকল্প নির্ভরতার ঠাই আছে তার । দুর্গাবতীর জীবনে তাহলে এখন বৈতল বাতিল । বৈতল
ভাবে, তাহলে দুর্গাকে একা রেখে চলে যাবে । কোথায় যাবে বৈতল । কে আছে তার
হিন্দুস্থানে । আছে আছে, কেউ একজন আছে, কাকাবাবু আছেন । আছেন দুর্গাবতীর
কাকাবাবুও । যাকে সে ডাকে ‘কবিরাজ মশয়’ । যে – বৃদ্ধ চিকিৎসককে সে জড়িবিটি
পাতালতার যোগান দেয়, হবিষ্যন্ন খাওয়ার লোভে কাটিয়ে আসে ইটখোলায় একরাত । কিন্তু
মানুষটি বড় সোজাসাপটা, কবিরাজি বটিকা বানানো আর চিকিৎসা এছাড়া অন্যজীবন নেই ।
তবু তাঁর চেলা হয়ে কিছুদিন থাকতে চেয়েছে, পারেনি, দুর্গাবতীর টানে চলে আসতেই হয় ।
কবিরাজ মশইয়ের ভাঙাঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুম হয় না ঠাণ্ডায় । বৈতল মাঝরাতে কাউকে
কিছু না বলে চলে এসেছে মেহেরপুর পায়ে হেঁটে । দুর্গাবতীর ঘরেও কোনও লেপ নেই কম্বল
নেই কাঁথাও নেই তবু সে – রাতে দুর্গাবতী দুয়ার খুলতেই ঠাণ্ডা উধাও । বোকার হাসি হেসে
বৈতল বলেছে,

--- তোমার কাকাবাবুর দোকানো অ শীত । তান তো কোথাও নাই একখান । কাপতে
কাপতে মনো পড়ল তুমার কথা, তুমারও তো কিছু নাই শীতর কাপড় । আর অউ
মাইজরাইতো দিলাম হাটা ।

--- ভালা করছ । তে কিতা আনছ দেখি শীতর কাপড় ।

বৈতল হাসে । দুর্গাবতীও হাসে । হাসতে হাসতে কাঁপতে কাঁপতে শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় দুজনের । সেই দুর্গাবতীকে এবার ছেড়ে যাবে বৈতল । নতুন কাকাবাবুর চেলা হয়ে চলে যাবে উদ্বাস্তু কল্যাণে । কত জায়গায় যায় কাকাবাবু । নিন না বুঝে ঝাঁপ দেওয়ার অভ্যাস বৈতলের । জলের অতলকে বৈতল চিনে নেয় ঝাঁপ দেওয়ার পর । তাই রাতের মন কষাকষির পর ভোর হতেই রওয়ানা দেয় কাকাবাবুর বাড়ি অভিমুখে । কাকাবাবুর বাড়িতে অব্যাহত দ্বার । বরাক নদীর পারে মস্তবড়ো ভাড়াবাড়ির বৈঠকখানায় বসেই আছে বৈতল, কাকাবাবুর আর দেখা নেই । ঠিক দুপুরে সূর্য যখন মাথার উপর তখনই হস্তদন্ত হয়ে বাঁধের উপর থেকে নেমে আসেন কাকাবাবু সদলবলে । সোজা বৈঠকখানায়, বৈতলকে দেখে অবাক । অসময়ে বৈতলকে দেখে প্রমাদ গোনেন । আসলে তাঁর অভ্যেস, সব কিছুকে সবাইকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার । আদর্শ জননেতার গুণ । তারপর এই অস্থির সময়ে সব কিছু ঠিকঠাক না চললে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন । এতেই বৈতল বুঝে নেয় মানুষটি তার আপনজন । বৈতল হাসে । বলে,

--- সকাল থাকি বই রইছি ।

--- সকাল কই, আমি তো নয়টাত বার অইছি । ইস্কুলো গেছি, ডিসিএ চিঠি পাঠাইলা ইস্কুলো, গেলাম তান অফিসো । কথা অইল হাওরর জমি লইয়া । কথা তো ঠিক অইছে, অখন মন্ত্রী আইলে কাগজ কলম লড়ব ।

--- মন্ত্রী আবার কই থাকি আইবা ।

--- কেনে দিল্লি ।

--- মন্ত্রী তো থাকইন হুন্ডি করাচিত না রাওয়ালপিণ্ডিত । যোগেন মণ্ডল নাম নানি ।

--- না বা, হেইন তো পাকিস্তানোর মন্ত্রী আছলা । তানে বান্দি রাখি দিছে অখন ।

--- তেউ কিতা অইব ।

--- কিতা আর অইত, বেটা ভাগিয়া আইছে ইন্ডিয়াত ।

--- তে ত আবার দুর্গতি ।

--- দুর্গতি কেনে ।

--- আবার যদি মন্ত্রী হয় । গরিবর দুর্গতি বাড়ব না কমব ।

--- আইচ্ছা ইতা বাদ দেও, অখন কও কেনে আইছ । এমনেউ আপনে কইচ্ছা আইতাম ।

--- ভালা করছ, খাইছ নি কিচ্ছু ।

--- খাইছি, কাকিয়ে খাওয়াইছইন ।

কাকিকে দেখে বৈতল অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে যায় । এও কি সম্ভব । এত সাদৃশ্য কী করে হয় । বৈতল জীবনের এক অমূল্য অস্থির সময়ের নিয়ন্তা সেই কিশোরী কী করে ফিরে আসে । সেই তিনি কী করে আজ কাকাবাবুর ঘরনি । সিলেট দাড়িয়াপাড়ার পেশকার বাড়ির মেয়ে বুড়ি আজ তার প্রিয়জনের স্ত্রী । প্রাণের ভয়ে দৌড়য়নি বৈতল, বৈতল দৌড়েছে রাগে । পেশকারের কিশোরী কন্যার কান ছিঁড়ে দুল নিয়ে দৌড়েছে বৈতল । চুরি করার জন্য কানে টান দেয়নি । বৈতলকে যে চাকর বলার দুঃসাহস দেখায় পুকুরপারের মেয়ে । তারপর থেকেই তো বিক্ষিপ্ত জীবন বৈতলের । শান্তিহীন ঘুরে বেড়ানো এখান থেকে ওখানে, সারা সিলেটে । ঘরে ফেরার কথাও মনে পড়ে না । মনে পড়ে শুধু মায়ের ইচ্ছাপূরণ করার সংকল্প । মনসা পুঁথির পাঠ তাকে শিখতেই হবে । উল্টোপাল্টা ঘুরতে মানুষের অবজ্ঞা সহিতে সহিতে বৈতলের শিখে নেয় বড়বিদ্যা । আবার এক মানুষের আদরও পেয়ে যায় পঞ্চখণ্ডর রইদপুয়ানি গ্রামে । গুরুদেব সৃষ্টিধর ওঝার দর্শন পায় বৈতল বিয়ানিবাজারে । পুঁথি পড়তে শিখে যায় ক অক্ষর গোমাংস বৈতল পাটনি । কত কত গান শিখেছে বৈতল গুরুর সঙ্গে, কত ভাল ভাল কথা শিখিয়েছেন তার কাঠমিস্ত্রি গুরু । এদেশে এসে তো গুরুর নামটাই আত্মস্থ করে নেয় এক নিয়তির টানে । গুরুর প্রতি অবিচারও করেছে বৈতল, নিয়েছে শুধু, দেয়নি একরতিও গুরুদক্ষিণা । গুরুর পঞ্চমী কন্যা চামেলি ওরফে চায়নাকে প্রত্যাখ্যান করে পালিয়েছে, আর ওমুখো হয়নি । এক দুই তিন করে নারী এসেছে বৈতলের জীবনে কেউ দূরের কেউ কাছের । প্রথমা দাড়িয়াপাড়ার কিশোরী বুড়ি, দূরের কিশোরীকে তো ভালই লাগত, দূরস্মৃতির মিঠে পরশ নিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার মতো । বিপরীত প্রকৃতিকে নিয়ে এখনও স্বপ্ন দেখে বৈতল । দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকেও ওঠে । ছাড়ালে না ছাড়ে এক দুঃসহ পীড়ায় কাতর হয় বৈতল । আর দ্বিতীয়া

তার ফিঙ্গাপাখি, বিয়ানিবাজারের পেচকুন্দা, গুরু সৃষ্টিধরের কনিষ্ঠা কন্যা । কথা রাখেনি বৈতল, নেশার ঘোরে গুরু তার হাত ধরে কন্যাদান করতে চেয়েছেন, বৈতলের কালো মন শুধু কালো রঙ বলেই সুমনা কন্যাকে একা রেখে পালায় । আর তৃতীয়া, দুর্গাবতী । দুর্গাবতী তো বৈতলের অর্জন নয়, দুর্গাই বৈতলকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে । দুর্গার হাতের পুতুল করেছে । তেলে জলে মিশ খায় না জেনেও সে উদ্ধার নেই এককুণ্ডে পড়ে রয়েছে । তবে এবারও বৈতল তার তেলাল শরীরকে ব্যবহার করেছে, বেরিয়ে যাওয়ার উপায় বের করেছে । দুর্গাবতী থেকে মুক্ত হয়ে সে চলে এসেছে, মানুষের ভাল করার কারিগর কাকাবাবুর যোগালি হয়েই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন । কিন্তু বৈতলের জীবন কখনওই তার ইচ্ছে মতো চলে না । একমুখী হয় না । সব সময় দুফাল হয়ে দুদিকে ছোটে, বৈতল বিভ্রান্ত হয় । সত্য আর মায়ার বিভ্রমে হতবুদ্ধি হয় । তাই হয়তো পূর্বস্মৃতির আগমন । কাকাবাবু, যাকে সে তার প্রাণপূর্ণ দেহ ভাবছে, যার সে ছায়া, তার সঙ্গে সে কী করে খেলায় মাতে । কাকাবাবুর কাছে অপরাধী হয়ে সে কী করে পারবে তার সঙ্গী হতে । তাই জোড়হাতে বৈতল কাকাবাবুর সামনে এসে মিনতি করে বিদায় দেওয়ার জন্য । বলে,

--- যাই গিয়া আইজ্ঞা । আপনারে দেখার খুব ইচ্ছা অইছিল । দেখি লাইলাম ।

--- যাই গিয়া কিতা । দুপরের খানি খাইয়া যাইবায় আমার লগে ।

--- ছি ছি, আপনার লগে, কিতা কইন ।

--- কেনে ।

--- আপনার লগে কিতা খাইতাম । আপনে অত বড় মানুষ ।

--- বড় কিতা দেখলায় ।

--- সব নেতা হকলে নেতাগিরি করইন, পয়সা কামাইন । আপনারেউ দেখলাম মাস্টরি করইন । ডিসিএ আপনারে ডাকিয়া লই যাইন । আপনার শ্বশুরবাড়ি কিতা সিলেট নি ।

--- অয়, জিলা সিলট, বানিয়াচঙ ।

--- সিলেট টাউনো নায় নি ।

--- না ।

--- দাড়িয়াপাড়ার দাম পেশকার আপনার শ্বশুর নায় নি ?

--- না বা, জাতুকর্ণপাড়াত আছিল তারার বাড়ি । ইস্কুলের মাস্টর আছিল আমার শ্বশুর । অখন নাই, শুনছ নি ভুবনচন্দ্র রায়র নাম । তারা চক্রবর্তী বাবন ।

--- না চিনি না । কাকির নাম কিতা ।

--- তার নাম বুড়ি । ভাল নাম অরুন্ধতী, অখন তো ভট ।

একই ডাকনামের দুজন মানুষ হতেই পারে । ভাল নাম জানে না বৈতল । কিন্তু নামের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য হয় কী করে । বৈতল বিভ্রান্ত হয় । কোথাও ভুল হচ্ছে । হোক ভুল । কাকাবাবু কখনও ভুল বলেন না । কাকির নাম মিলে গেল মানুষ মিলে গেল কিন্তু কেউ কাউকে চিনল না, ঘোমটার ঢাকা থেকে কানের ক্ষত দেখা যায় না । তবে সেই ফটর ফটর কথা বলা কিশোরীকে সঙ্গে আজকের কাকির মুখে কথা খুব কম । বৈতল ভাবে সবার জীবনেই কিছু না কিছু ভুল থাকে । কে জানে কাকাবাবু না কাকি কে ভুল । দুর্গাবতীর কথাও মনে পড়ে বৈতলের, ছেড়ে এসেও কেন মনটা হুঁহু করে । এখন যদি আবার ফিরে যায় শিবিরে কেউ জানবে না বুঝবে না কিছু, দুর্গাবতীও তো জানে না তার পালিয়ে যাওয়ার কথা । এদিকে কাকাবাবুও দুপুরের খাওয়ার পর ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন । কী করে এখন বৈতল । কাকিকে দেখলেই যে তার কৈশোর দুঃখ উথলে ওঠে, নিষ্পাপ কিশোরীর প্রতি অপরাধের পাপ তাকে ঘিরে ধরে । একার দুঃখে বৈতল ভাগীদার পায় না কাউকে, দুর্গাবতীকেও বলা যায় না এমন কথা । শুধু বন্ধু লুলাকে বলেছে । ছোট বৈতলের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে দিয়ে প্রাণের বন্ধুও তলিয়ে গেল পিয়াইনএর জলে । তবে রাগ দুঃখ অভিমান নিয়ে বসে থাকে না বৈতল, জল পাথরের বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যায় মুক্তপথে । দামছড়া হিলাড়ার পাহাড়ি নদী যেমন পাথরের বাধা পেরিয়ে পৌঁছে যায় গন্তব্যে । তাই বৈতল ফিরে যাওয়ার কথা বলেও থেকে যায় তাঁর সঙ্গে । বিহাড়া কাটিগড়া ভ্রমণে বেরিয়ে অবাক হয়ে যান তাঁর ছায়াসঙ্গীকে দেখে । বৈতলের উপর নির্ভর করেছেন দায়িত্ব দিয়েছেন, বৈতলও মনের আনন্দে অবাক মানুষটির সঙ্গে ঘুরেছে আর দেখেছে ছিন্নমূল মানুষের দুর্দশা । পাহাড়ের জমিতে ঘরবাড়ি হয়েছে জলের উৎস থেকে অনেক দূরে । বন্যজন্তুর উৎপাতে জখম মৃত্যুও ঘটেছে ।

মানুষটিকে পেয়ে সবাই দুঃখ ভুলে যায়, তিনি যেন কল্পতরু, যে যা চাইছে সব পাচ্ছে । ঘর বাড়ি খাওয়া পরা সব । মাছিমপুর থেকে শ্রীকোনা বিহাড়া কাটিগড়া দামছড়া পর্যন্ত বিস্তৃত তখন পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড । কাজে যখন রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা, ধর্মীয় বাধা এসে দাঁড়িয়েছে কাকাবাবু থেকেছেন অবিচল । অনেক বড় মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বৈতলের । বড় নেতাদের অনেকেই প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু কানে কানে সাহায্যের কথা বলেছেন । লিগওয়ালারা যারা জিগির তুলেছিল লাঠির জোরে কাছাড় নেওয়ার তারাই এখন কংগ্রেসের শক্তি ভরসা । বৈতলের সব থেকে বেশি রাগ ঐ লিগওয়ালাদের উপর । এখানে ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে সে সিলেটে লিগের অত্যাচারকথা শুনে রাগ বাড়িয়েছে । মেহেরপুরে বৈতলের প্রতিবেশী সুধা দত্তর মুখে তো আগেই শুনেছে শ্রীমঙ্গলের নৃশংসতার কাহিনি । মায়ের কোল থেকে বাচ্চা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে জঙ্গলে । মাধবপুরের বিষ্ণু সাহা এখন কাটিগড়ায় মাটির ঘর বানিয়েছে । বলে,

--- আমরা তো ভালাউ আছলাম । গণভূটর পরেও ভালা আছলাম । আমরা ইন্ডিয়াত থাকমু জানতাম । আক্তা কিতা অই গেল । সব বদলি গেল । গাতর তল থাকি লিগ বার অই গেল । কইল, ভাগ । এক আনা দি এক ভিখারির তফন কিনলাম । লুঙ্গি পিন্দিয়া, ছিড়া তেনার ভিতরে সোনাদানা যেতা আছি বান্ধলাম, তাইনও তেনা কাপড় পিন্দলা । কুলাউড়া স্টেশনো আইয়া উঠলাম গাড়িত । ইদিকে গলাত আমার হাফানির টান, হায় আল্লা হায় আল্লা ডাক হুনিয়া কেউ কিচ্ছু কয় না । কুনুমতে আইয়া পৌঁছলাম ভাঙ্গাবাজার । তার পরে তো হরি কাকায় লই আইলা কাটিগড়া ।

বৈতলও মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প করে । কাকাবাবুকে শোনা কথা শোনায় বাড়িয়ে চড়িয়ে । কাকাবাবু বৈতলের গল্পকথাকে আমল দেন না । বৈতলের মন খারাপ হয় । বলে,

--- আপনে যেতাউ কইন লিগ আলা হকল ভালা নায় । তারার লাগিউ আমার ই লেজারতি । ইখানো আইয়া ভাবলাম হিন্দুর রাজত্ব অইব । ইখানোও দেখি হউ লিগ ।

--- দেখ রেবা সৃষ্টিধর, দেখার চউখ বদলানি লাগব । মানুষরে আলাদা করলে বাচতায় পারতায় না । মানুষরে আলাদা করলে রাজনীতি করতায় পারতায় নায় । রাজনিতিত সব মানুষ সমান, সবর কথা হুনন লাগব । সংখ্যাত যে আধার বেশি হেউ জিতব, ইতা ঠিক নায় । হিন্দু মুসলমান নিয়া রাজনীতির খেলা অইছে, খেলছইন । গান্ধিও জিতছইন জিন্নাও জিতছইন

। যে যেখানো বেশি, দখল নিছইন । অখন আমরা তুমরা মরয়ার । ইলাখান হিন্দু মুসলমান
আলাদা আলাদা দেখিও না ।

--- আপনে আমারে চিনছইন না কাকাবাবু, আমি লিগর কথা কইয়ার, মুসলমানর কথা নায় ।
আমার বন্ধু লুলা, লেংটা থাকি বন্ধু, মুসলমান । আমার মার মুখো পানি দিছে, আমি তখন কই
। বিয়ানিবাজারো রইদপুয়ানি গাওত থাকিয়া পুথিপড়া শিখিয়ার আর আরি রান্দা বাইশ
চালাইয়ার । আমার গুরুয়েও কইছইন হিন্দু মুসলমান আলাদা করলে মানুষ হওয়া যায় না ।

--- আইচ্ছা রেবা, আমার বুঝার ভুল অইছে । কিন্তু মাইনষে কিতা করত কও, লিগ করছিল
একদিন, অখন ত আর লিগ নাই ই দেশো, হে কিতা করত, করের কংগ্রেস, করঅউক । কিন্তু
দুষ্ট বুদ্ধি লইয়া তারারে ব্যবহার করা খারাপ । অতদিন চা বাগানোর নেতা আছলা বাঙালি;
অখন সব অই গেছইন হিন্দুস্থানি । কেনে । অউ লিগ আলা হকলরে দিয়া মুসলমানরে আলাদা
করা ওর । ইদিকে হিন্দুস্থানি দিয়া চা বাগানোর কামলা কামিনরে আলাদা করা অর । টুকরা
টুকরা করি দেওয়া । ই আলি কুলির রাজনীতি বড় সাংঘাতিক রেবা । কংগ্রেস কররা । ইতা
আটকানি লাগব ।

--- আলি কুলি হকলে ত আর আমরারে দেখতা নায় । রিফুজির কিতা অইব ।

--- ছি ছি, তুমি দেখি তিন নম্বর লাগাই দিলায় । আলি কুলি রিফুজি । তেউ আবার কইবায়
বাবন আরো বাড়ব কাইস্ত পাটনি ধুপা । ইলাখান দেখিও না । কত মুসলমান সজ্জন মানুষে
নিজর জমি মাগনা দিলাইছইন উদ্বাস্ত পুনর্বাসন লাগি । হুরমত আলিরে চিন নি । তাইনও চেষ্টা
কররা দেশছাড়া মানুষরে দেশ দেওয়ানির । চা বাগানোর হিন্দুস্থানি নেতায়ও কাম কররা ।
বাগানোর জমি দেওয়ানির চেষ্টা কররা । আসল কথা উদ্বাস্ত পুনর্বাসন অইল এক আন্দোলন ।
আর আন্দোলন চালাইলে চলব । তুমার খিদা নাই খাওয়াইত কে ।

--- আমরা আন্দোলনো দেখিয়ার একজন অউ নেতা । আপনে ।

--- না রেবা । বউতেউ কাম কররা ।

--- আর কররা । সব তেনা ।

--- আইচ্ছা, তুমি বুলে পুথি পড়তায় পার, হুলাইলায় না ।

--- শ্রাবণ আউক, হুনাইমু ।

--- তুমি কার কাছে হিকছ কইলায় বিয়ানিবাজারো ?

--- আমার গুরু শ্রী সৃষ্টিধর উবা ।

--- তুমার নাম আর গুরুর নামও দেখি এক । তুমার তানে যেন চিনিয়ার রেবা । তাইন কিতা কাঠমিস্ত্রি নি ।

--- আইজ্ঞা অয় ।

--- হে, উবাদা তো আমার পার্টি মেস্বার আছলা ।

--- আছলা কেনে ? অখন নাই নি ।

--- না না, হিকথা কইয়ার না, আমি অউ অখন পার্টিত নাই ।

--- আপনে কমুনিস্টও আছলা নি । এর লাগিয়াউ কই ।

--- কিতা কও ।

--- আপনে তো আর রিফুজি নায় । চাকরিবাকরিও করইন । সুখে থাকতা পারইন, তে কেনে গরিব রিফুজির লাগি জান দিলাইতরা ।

--- তুমার গুরু বড় ভাল মানুষ রেবা । মন বড় সাফ ।

--- আপনেও ভাল । রইদপুয়ানি গেছইন নি আপনে ।

--- যাইতাম না কেনে । আমার ওতো বাড়ি হনো ।

--- হনো কিতা । কোনগ্রাম ।

--- পণ্ডিতপাড়া গেছনি । অনিপণ্ডিতর নাম হনছনি ; রইদপুয়ানির আগে ।

--- আমি পণ্ডিত নায় রেবা । আমি অখন জমির দালাল ।

--- কিতা যে কইন ।

--- হে, না তে কিতা । অউ যে অত অত জমি দেখিয়ার, জমিদারর লগে মাতকথা করিয়ার ।
মাগনা নি । সবরে পয়সা দেওন লাগে, তারপরে তুমরার নামে নামজারি অইত । ইতা দালালি
নানি ।

--- অত জমির মালিক আপনে, তে ই ভাড়াবাড়িত থাকইন কেনে ।

--- দালালি পাইলেউ পাক্কাবাড়ি বানাইমু । লোভ কার নাই রেবা ; আমিও তো মানুষ ।

--- হাচারির কইয়ার, আপনার ইচ্ছা হয় না নি ইনতনে এক আধ কিয়ার নিজর নামে করি
লাওয়ার ।

--- না অয় না । ই এক নিশা রেবা । নিশা না থাকলে লোভ অইত ।

--- পরে পস্তাইবা ।

--- পস্তাইতাম কেনে । নিজর লাগিয়াউতো লইয়ার । অউ যে পনর বিঘার মতো জমি
দেখরায়, ইনো আমার ঘর অইব, বড় বড় ঘর হইব বউতটা । আমার পরিবার কুন্সু কম বড় নি
। তাত আনাইমু, তাত বইব । যুগির কাপড় অইব ইনো । নিজে বানাইব, নিজে বেচব ।
সমবায় অইব ।

--- সমবায় আবার কিতা ।

--- সমান মালিক অইব সব । যতজন কাম করব, থাকব বেচব । লাভক্ষতি সব নিজর ।
স্বপন দেবনাথরে দেখছ নি, অউ তালগাছর লাখান লম্বা, তারে কইছি, যারা হাতর কাম জানে
তারারে এক করার লাগি । হে ঘুরের ই কেম্পো হি কেম্পো । মেস্বার অওন লাগব, মেস্বার
অইলেউ একখান ঘর আর একটা তাত ফ্রি । কও অইতায় নি মেস্বার ।

--- আমি তো তাতি নায় ।

--- তে তোমার কুন্সু কাম নাই । অ রেবা বে-আক্কল, তাতি অইলে তাতির ঘরো জন্মানি লাগে
না । কাম শিখন লাগে, সব শিখাই দিব স্বপনে । তুমি যে খালি পানি আর পেলইন জালর
কথা কও, বাবন অইয়া কেমনে শিখলায় মাছুয়ার কাম । অউ যে শিখলায়, অখন যদি খাল বিল

হাওর শুকাই যায়, কিতা করবায় । মাছ দেশো উট দুয়ার মাংস বিক্রি করবায় । বাচার লাগি
কাম ।

বৈতলের খুব ভাল লাগে স্বপ্নের কথা শুনতে । স্বপ্ন বুনতে । ভাবে, তাহলে তাঁত
বুনতেই শুরু করে দেবে । সমবায়ের সভ্য হয়ে যাবে । কী নাম হবে তাদের সমবায়ের ।
বৈতল নাম প্রস্তাব করে ‘কাকাবাবু সমবায়’ । স্বপ্ন দেবনাথ মানুষটা দেখতে লম্বা চওড়া হলে
কী হবে, সবার কথা শোনে । সবার পরামর্শ গ্রহণ করে । বৈতলের কথা অমান্য করে না ।
কাকাবাবু উট দুয়ার কথা বলে আর এক স্বপ্নের দরজা খুলে দেন । লুলা বলে আরব দেশের
মানুষ বড় দুঃখী, জলের বড় অভাব । গাছগাছালিও কম । মাছ নেই শাকসব্জি নেই । উঠ
দুয়ার মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে । লুলা বলে নবীর দেশ আরবে কোনও দুঃখ নেই । আরবে
আছে নবীর আপন দেশ মক্কা, মদিনা, জমজম । বৈতল মনে মনে মক্কা য় মদিনায় য়
শাহজালালের আপন দেশ এমেনে য় । বৈতলের মনের আর একটি সুপ্ত স্বপ্ন হলো
ঢাকাদক্ষিণের ঠাকুর মহাপ্রভুর কর্মস্থল নবদ্বীপ দর্শন, গুরুদেব সৃষ্টিধর ওঝাকে যে বৈতল কথা
দিয়েছে নিয়ে যাবে । আবার এক নতুন প্রভুর স্বপ্নে এখন বিভোর হয় বৈতল । এমন সব বড়
বড় মানুষের স্বপ্নে বৈতলের চোখ রাখা, বৈতলের তীর্থ দর্শন । তবু এককথায় সেকথায় বৈতল
নেড়ে চেড়ে দেখে তার নবীন প্রভুকে । বলে,

--- আপনে কেনে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাইরে বাইরে ঘুরইন । খালি মাইনষর কাম করইন ।
আপনারওনি বাড়িত অশান্তি ।

--- তুমি কিতা রেবা বৌ বেটির লগে ঝগড়া করিয়া আইছনি । ছি ছি ছি, তুমি অখন অউ
বাড়িত যাও ।

--- আমার কথা পরে অইব, আপনে কেনে সোনার সংসার ছাড়িয়া পথে পথে ঘুরইন ।
আপনার কিওর দুঃখ ।

--- ধুর বা । সবে কুনু দুঃখ কষ্টর লাগি নি কাম করে । সুখর লাগি আনন্দের লাগি করে ।
খালি নিজর নিজর ভাবলে অইব নি । সবার লাভ দেখন লাগব ।

--- আপনেও লাভ দেখইন নি ।

--- দেখি নানি তে । তুমুরার লাভ অইলেউ আমার সুখ । তুমুরার মুখর হাসি অউ আমার
বুকের বল । আর কিতা লাগে ।

--- আপনার বাড়িত ত চাইর পুয়া মাইয়া । তারারে দেখইন না কেনে । তারা তো ছুট ।

--- দেখি না কে কইল । তারার মা আছইন ।

--- তাইনও মাস্টরি করইন ।

--- কাম না করলে কে খাওয়াইব ।

--- বাইচা মানুষ করবা কেমনে ।

--- মা ভালা অইলে বাইচা মানুষ হয় এমনেউ । আমার পুয়াপুড়ি ভালা । তারার মাও ভালা ।

--- অয় আমার ছিলেটি কথাত আছে, তামাকাসা মাজলে চিকন, লোহা চিকন তায়, আর
ছাওয়াল চিকন মায় । কাকিরে যে একলা ছাড়িয়া আইন, আপনার কষ্ট হয় না ।

দিনের শেষে যে-প্রশ্ন বৈতল কাকাবাবুকে করে, সে-কথার জবাব যে তার কাছেও নেই ।
দুর্গাবতীকে ছেড়ে এসে তার মনেও যে কষ্টের পাহাড় । নিশ্চুপ বৈতল তাই নিরুত্তর কাকাবাবুর
বেদনার্ত মুখে তাকিয়ে এক দূরান্তরের টান অনুভব করে মনের কোনে । উড়ে যায় পুঁথির
পাতা, নতুন অধ্যায়ের ভিতর তখন তার পথচলা । সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার শুরু হয় তার পথ
হাঁটা । পুরনো পথ চলতে চলতে ফিরে আসে আবার দুর্গাবতীর কাছে । কাকাবাবু চেলাগিরি
শেষ হয় মাঝপথে । আবার ক্যাম্পের বাঁশবাড়িতে কিছুদিন । তারপর হরিৎবরণে পাকাপাকি ।

একুশ

বৈতল কোনও গভীর চিন্তাভাবনায় স্থির থাকে না বেশিক্ষণ । খাও দাও নৃত্য কর মনের আনন্দে, দুর্গাবতীর উপর রাগ করে মাঝে মধ্যে একটু উল্টোপাল্টা । মনের সুখে গান গায়, মন্দ ভাবনায় জুড়ে যায় । ভাল থাকতে চাইলেও বৈতলকে ঠেকায় কে, বৈতলের মনে তখন গুরু মুখ আর তার মুখের কথা । গুরু সৃষ্টিধর তাকে পুঁথি শেখাতে শেখাতে বলেন,

--- যারা হুনের তারা তুমারে দেখের রেবা । তুমারে দেখিয়া যদি তারার ভক্তি না হয় তে কিওর গান আর কিওর নাচ । গাইবায় যখন বিভোর হইয়া গাইবায় । ঘর সংসার ভুলি যাইবায় । শত্রুতা উদ্ধৃত মনো রাখবায় না । দুইশ তিনশ জন মাইনষে তুমারেউ দেখের খালি, সবেউ তুমার মতো অহিত চার, তুমার মাঝে মিলার নিজেরে । তোমার মতো বালা, তুমার মতো সুন্দর । দেখ পারবায় নি ।

বৈতল পারেনি । বৈতল তো আর গুরুর মতো মিষ্টভাষী নয়, দেখতেও সুন্দর নয় । তাই গুরুকে বলে,

--- আমি তো সুন্দর নায় । কালা, চেংড়ার লাখান দেখাত ।

--- ই কিতা কও বাবাজি, তুমি কিতা তুমি অউ জানো না দেখিয়ার । তুমি যখন গাও তখন তুমার ধারো বওয়া যায় না, এক আলেদা জ্যোতি বারয় রেবা । আমি যেতা পারছি না তুমি পার । এর লাগিউ যেতা জানি সব তুমারে দিলেউ আমার সার্থক ।

গুরু সৃষ্টিধর কী জানি কী দেখেছেন বৈতলের মধ্যে । গুরু বলেছেন বৈতলের অনেক নাম হবে । বৈতল নামের কিছুই বোঝে না, বৈতল টার কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক কিছুই বোঝে না । তবে সে যা করে সব কিছুই হয়ে যায় । ভাল মন্দ সকলই সে মনের আনন্দে করে । বৈতল চেষ্টা করে কিছুই করে না । শত্রুর মুখোমুখি হয়েও সে জানে না তার

ভূমিকা । তবে কাউকেই বৈতল ছাড়ে না । দোস্তি যেমন তার জীবন জোড়া, শত্রুকেও সে পাশ কাটিয়ে যায় না । শত্রুর শেষ না দেখে বৈতলের শান্তি নেই । বৈতল ইচ্ছে করে কারো সঙ্গে শত্রুতা করে না । কিন্তু কেউ জড়িয়ে নিলে সে পিছপা হয় না । হরিৎবরণের জমিদার প্রথম দিনই তাকে উষ্ণ দেয় । বলে তার পুকুরের মাছের ওজনও বৈতল থেকে বেশি । বৈতলের রক্তে জোড়াফনা তখন থেকেই ফুঁসছে । তখনই মনে পড়েছে সিলেট দাড়িয়াপাড়ার এক কিশোরীর কথা । বৈতলও কাছাকাছির বয়সের কিশোর, তাকে চাকর বলার দুঃসাহস করে মেয়েটি । এই বিরোধিতার সূত্র এখনও বৈতল খুঁজেই চলেছে, কেন সে ঐ মেয়েটিকে এখনও ভুলতে পারে না । কেন শত্রু ভাবতে পারে না । চোখ বুঁজলে চোখ খোলা রাখলে যখন তখন সেই মেয়েটি তার চোখের উপর পুকুরপারের গল্প বলে । রাগের মাথায় কানের লতি ছিড়ে মাকড়ি নিয়ে পালালেও বৈতল কেন আজও নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারে না । আবার যে খুব সাহসের কাজ করেছে তাও নয় । এ যেন এক অভিজ্ঞান, নিয়ে আসার দিয়ে আসার । আবার সেই বুড়ি কন্যার মুখটি চোখের উপর ভাসতেই বৈতলের মুষ্কিল আসান হয়, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় । তবে বৈতল দৌড়েছিল, সেই দৌড় এখনও থামেনি তার । সেই মায়ামুখ কেন যে আবার কায়া হয়ে দেখা দেয় কাকাবাবুর বাড়িতে । রিফিউজি নেতা হরিমাধব ভট্টাচার্যর স্ত্রী আর দাড়িয়াপাড়া কন্যা যে এক সে-সত্যে ভুল ধরিয়ে দিতে বিভ্রান্ত করতে কেন যে এত তৎপর জনতার মানুষ বৈতল বোঝে না । তাই হয়তো পারিবারিক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে এত রহস্য কাকাবাবুর । তাই আবার বেরিয়ে ফেরা বৈতলের, আবার ঠিকানা দুর্গাবতী । মেহেরপুরে ফেরার পরই বৈতল তার অব্যবহৃত সম্পত্তি, তার উড়াল জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রোজগারের খোঁজে । শহরের আর এক মাথায় ইটখোলা, ইটখোলার হরিৎবরণের জমিদার বাড়ি । বিশাল বাড়ির সিংহতোরণের সোজাসোজি রাজবাটি, ডানদিকে বিশাল পুকুর, নাম পদ্মদিঘী । মাছ ধরে মাছ চায়নি মাছুয়া বৈতল । বলেছে আট আনায় এক খেপ । তাতেই রাগ যুবক জমিদারের । চেংড়া জমিদার বয়সে তেমন বড় নয়, বৈতলেরই সমবয়সী । বলে তার পুকুরের রুই-এর ওজন অনেক বেশি । বৈতলের তেলাল শরীর নিয়ে কটাক্ষ করলে তাকে সামলানো দায় । গুরু নাম জপ করেও বৈতল রাগ সামাল দিতে পারে না । ঝুলির ভিতর থেকে বের করে বিষদাঁত ভাঙা আলদ । কেউ দেখে না বৈতলের চাতুর্য । যথাসময়ে বৈতলের দুর্বুদ্ধির শিকার হয় জমিদার । সাপ দেখে ভিরমি খেয়ে পড়ে পুকুর পারে । বৈতলের কোলেই ঢলে পড়ে ভিতু জমিদার যমুনাপ্রসাদ সিং । বৈতলও ততক্ষণে সেরে ফেলেছে তার কাজ ।

সোনার আংটি সরিয়ে নিয়েছে স্বর্ণবর্ণ আঙুল থেকে । হতভম্ব এবং কৃতজ্ঞ জমিদার পরিকরেরা বৈতলকে পারিশ্রমিক দিতে ভুলে যায় । বৈতলও জনসমক্ষে ঋণী রেখে চলে আসে । বৈতলের মুচকি হাসিতে এক নতুন যুদ্ধের সূচনা হয়, যার জন্য আগে ভাগে বৈতল কোনও প্রস্তুতি নেয়নি । বাস্তুহীন এক শরণার্থী বসতগড়ার কৌশলের সূচনা হয় । তবে এমন সাপের খেলার চালাকি সে দেখায়, দুপয়সা রোজগারও হয় মন্দ না । তবে ঐদিনের খেলায় যে বৈতল নতুন বসতের ভিত দিতে পারবে ভাবেনি । পরপর বুদ্ধির জট খুলেছে বৈতল । আর তাই জিয়ানির আগেই অকুস্থল থেকে সরে পড়েছে । ভয়ের মূর্ছা থেকে জেগে উঠবে জানে বৈতল, কিন্তু বৈতল ওর মনে যে ঢলানির দংশন দিয়েছে তার থেকে জিয়ানির মন্ত্রণ সে ছাড়া কেউ দিতে পারবে না ।

সোনার আংটির দাম সত্তর টাকা দিয়ে কী করবে ভেবে পায় না বৈতল । দুর্গাবতীকেও বলা যায় না । তাই আপাতত একা একাই ঘুরে বেড়ায় ইতিউতি । যদিও বৈতল জানে তার জীবনে সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত । তবু কটুমিয়ার সাইকেল রিক্সা মেরামতির দোকানে গিয়ে বসে থাকে । অখিল পালের চা-দোকান থেকে চা খায় এক গ্লাস, কটুভাইকেও খাওয়ায় । টুসু খায়, কটুমিয়াকেও দেয় । কটু মিয়ার দোকানে অনেক কাজ । বৈতল হাত লাগায় । লিক সারাই, পাম্প দেওয়া, ভুসিং, রিমের টাল ঠিক করা, ফিরিউলে তার ভরে গ্রিজ লাগানো, সব দেখে আর শেখে । কটুমিয়াও অবাক হয়ে দেখে বিনি পয়সার সহযোগীকে । ফুরসত হতেই প্রশ্ন করে,

--- তুমি কে রেবা কও চাইন ।

--- আমি বৈতল ।

--- বৈতল কিতা ।

--- বৈতল আবার কিতা । নাম ।

--- না, কইয়ার তুমার মজব কিতা ।

বৈতলের হাতের কাচের গ্লাসে বাদামি রঙের চা । বলে,

--- আমি অউ গল্লাসর চা ।

--- অ ।

--- চা দিলে আমি চা, হোয়াইট দিলে সাদা । মদ এক গল্লাস দিলাও আমি তুমার বাপ তুমি গাইল্লাইমু, মদে যেতা করে । অখন কও কটুভাই, আমারে একখান রিক্সা বানাই দিবায় নি ।

--- দিমু, দিতাম পারতাম নায় কেনে । দাম পড়ি যাইব লেकिन বাক্সা ।

--- কও না কত ।

--- বেশি কইতাম, না কম কইতাম কও ।

--- আমারে কিতা আউয়া পাইছনি, ঠগাইতায় ।

--- নারে বা না । আমার এক গপ মনো পড়ল এর লাগি কইলাম ।

--- তে কও, আগে গপ অউ কইলাও ।

--- এক ভকা বেটা আইছে গাউ থাকি । হিপারো দুধপাতিলর লাখান এক গাউ থাকি উঠছে নাওও । ইটখলা ঘাট থাকি উঠিয়া আইছে অখিলর দোকানো । চা খাইত । ইবায় চায় হিবায় চায়, তিনচাক্সার রিক্সা দেখিয়া কয়, ই কিতা । কইইয়াউ হাগে দি চায়, দেখে বিজলিবান্তির ভার, টরেটক্সার তার । ইটা দেখিয়া অখিল ইগুতো বিটলা, জিগায় কিতা দেখরায় বাছাই । ভকায় কয় কাউয়া দেখিয়ার । অখিলে কয় ঘাট আলারে পয়সা দিয়া আইছনি । হে কয় দিছি । অখিলে কয় অখন কাউয়া আলারে দেওন লাগব । কতটা গনছ কও কাউয়া । ভকায় ইবায় চায় হিবায় চায়, কাউয়া দেখে না কুনাখানো, তেও কয় গনছি ত বাক্সাউ, ধরি লাও বিশটা । অখিলে কয় তে দিলাওপাচ আনা । হে কয় কেনে ? অখিলে কয় এক কাউয়াত এক পয়সা । কম অইত নায় ।

কটুমিয়ার গল্ল বলার বৈঠকি ঢঙে বৈতলের কৌতুক হয় । কিন্তু হাসে না । কটুমিয়া একটু ক্ষুণ্ণ নয় । বলে,

--- তুমি হাসলায় না দেখি । ইগপ হুনিয়া আমরার গাউআলা মাইনষে খুব হাসইন । তুমি কুনা বাবু নি রেবা । হাসলায় না যে । আইছা তুমার লাগি কম করি দিমু নে । কত পারবায় কও । যাইট বাঘাটি লাগি যাইব ।

পক্ষীরাজ সাজাতে ষাট টাকাই লাগে । ধরম পাটোয়ার দোকান থেকে বেল হর্ণ কেরোসিন ল্যাম্প কিনে আনে কটু মিয়া । রিক্সা বানানোয় জাদুকরি হাত কটুমিয়ার । সিটের উপর আবার একদিকে অশোক কুমার অন্যদিকে কাননবালার ছবি লাগিয়ে দেয় । ইদের দুদিন আগে মিয়া বৈতলকে বলে,

--- এক চিলিম তামাইক বানাইবায় আইজ সেন্টেলরোডর খাম্বিরা দিয়া, সেনবাবুর দোকান থাকি আনবায় । ইফতার করিয়া টানমু ।

--- কেনে গাড়ি বনি গেছে নি ।

--- অয়, দেখবায় নে কিলাখান দৌড়ে । খালি রং করা বাকি । বৈকুণ্ঠরে কইছি করি দিব । গাড়ির পিছে কিচ্ছু লেখতায় নি ।

--- অয় তুমার নাম লেখি দেও, কটু মিয়ার গাড়ি ।

--- ছি ছি রেবা ইতা কিতা কও । তুমার পয়সা, তুমার গাড়ি আর নাম লেখতাম নি আমার । এর থাকি আল্লার নাম লেখি দেও, এলাহি ভরসা ।

বৈতলের মন খুঁতখুঁত করে । আজন্মের সংস্কার, বিশ্বাস । বৈতল ভাবে মনসার পট আঁকবে । এখন কটুভাইকে না করলে মনে দুঃখ পাবে । তাই কটুমিয়ার দোকানে স্কু ড্রাইভার দিয়ে ষোল খুঁটির ঘর বানায়, নালার পার থেকে কচু গাছের ডাটা কেটে আনে ষোলটা ঘুঁটি বানায় । অখিলের বারান্দা থেকে নেয় ষোলটা তেতুল বিচি । কটু ভাইকে বলে,

--- আও খেলি । অখন আর ই মাদানি বেলাত ঘুমাইও না ।

--- ষোলগুটি খেলতে নি, এর থাকি অখিলর শেলেট পেন্সিলটা লইয়া আয় মঙ্গল কাটাকাটি খেলি ।

বৈতলের এই খেলাটাও মন্দ লাগে না । শূন্য আর পূরণ চিহ্নের খেলা । যখন আর পথ থাকে না শেলেট মুছে ফেলা, আবার ঘর বানিয়ে রাখা । তবে বৈতল এখন রিক্সার নামকরণ নিয়ে বিপাকে । কটু মিয়াকে এলাহি ভরসার বিকল্প থেকে সরিয়ে দিতে হবে । তাই আবার অন্য কথায় যায় । বলে,

--- তামাক খাইতায় নি এক চিলিম ? তুমি কওয়ার আগেউ খাম্বিরা আনিয়া রাখছি । আইজ ইফতারর পড়ে দেখবায় নে কিলাখান চিলিম জ্বলে । আইছা বা দাদাভাই একখান পই ভাঙ্গাইতায় পারবায় নি কও ।

--- পারমু ।

--- তে কও, পুয়া নায় পুড়ি নায়, মুখো দেয় চুমা, উন্দাল নায়, চুলা নায়, তেও বারয় ধুমা ।
কও দেখি ।

--- হুকা ।

না । কটুমিয়া জবাব দেয়নি । তার আগেই অখিলের দোকান থেকে লুঙি পরা এক বেঁটে লোক গুডুক গুডুক শব্দ করে ভাঙিয়ে দেয় পইর খাঁধা । বৈতলের রাগ হয় যারপর নাই । খাঁধা কখনও কেউ ভাঙিয়ে দিলে রাগ হয়, পই হলো তার নিজের, প্রশ্ন করবে, ঠেকাবে, বলে দেবে জবাব, আত্মপ্রসাদ পাবে । এর মধ্যে সবজাত্তা দু একজন আছে তাদের মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয় । বৈতল তাও, কটুমিয়াকে সালিশি মানতে গিয়ে দেখে সেও মিটিমিটি হাসছে । বৈতলের ক্রোধ বাড়ে । বলে,

--- তুমি হাসরায় নানি, আমার গা জ্বলি যার, কিগু ইগু । ইগুরে নি জিগাইছি আমি । হালার হালা বাড়ি, হারামজাদার লাড়ি ।

বৈতলের অচেনা নয় বেঁটে মানুষটি । সে দুখু মিয়া, বরাক নদীর অর্ধসমাগু পুলের উপর দেখা হয় একরাতে । গাঁজার আসরের পাভা, নিজে খায় না, কিন্তু আসর পরিচালনা করে দুই বন্ধুকে নিয়ে, বহুই আর আপদ ।

বৈতলকে নিয়ে এক দুরন্ত খেলায় মাতে তিনজন । ভরপুর নেশা করিয়ে বৈতলকে বলে ঝাঁপ দিতে, ঝাঁপ দিলেই নদী, নদীর মাছ রুই কাতলা চিতল । হাওরের প্রাণী বৈতলকে নেশার ঘোরে জল ধরিয়ে দেয় তিন ভূত, শয়তানের দূত । নেশাহীন বাড়ি লোকটাই আবার বাঁচিয়ে দেয় শেষ পর্বে । বন্ধুতের কথা বলেই কিন্তু সখের ভরসা হয় বৈতলের । বাঁচিয়ে দিয়েও লোকটা বৈতলের সঙ্গে সরাসরি মিত্রতা করে না । বোকা বৈতলকে লাথি মেরে ফেলে দেয় । নেশার ঘোর ভেঙেছিল বলে উল্টে চড়চাপড় কষায়নি বৈতল । যেমন করেছে সে লুলার সঙ্গে ।

লাগালাগিতেই খুশি সে, লাগালাগিতেই দোস্তি । বৈতলের পই ভাঙিয়ে দেওয়ার আগে, আবার ডাকে লড়াইএ । বৈতল বলে,

--- আছ না বেটা দেখি তর কত পই ভাঙানির শখ । ক দেখি তিন কুনা মাজে গাত, না ভাঙাইলে খাইবে লাথ ।

অখিলের চায়ের দোকান থেকে কোনও আওয়াজ আসে না । আটকে গেছে দুখু মিয়া । তাই ইটখোলা ঘাটের দিকে যাওয়া গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে অকারণ কথা বলে, যেন শুনতেই পায় নি বৈতলের ধাঁধা । এদিকে সাইকেল মিস্ত্রি কটুমিয়াও মজা পায় । বলে,

--- হুঁ । ছুটি গেছে বেটার পাদুমপুদুম । নদীর পারো থাকে তেও হেওত চিনে না ।

নৌকোর জল সোঁচার এরকম তিনকোণা পাত্র । দুখু মিয়াও এত সহজ জবাবে অবাক হয় । বলে,

--- দেখতাম না কেনে । হে কুনা আমারে জিগাইছে নি । আর ইতা কুনা এক পই অইল নি । তার পই হুনিয়া দেখো অউ হুকনো মাঠো পুয়াইন্ত হকলেও আছাড় খাইয়া মররা । হে নি পারব একখান ভাঙাইত জিগাও । ক ছাইন বেটা, বড়য় খায় শরম পায়, কিতা ।

--- ইতা হকলেউ জানে । তরটার দিমু পরে, আগে আমারটা ক হুনি । কেউ খায় না, হকলেউ খায়, আমি কিতা খাইলাম একদিন ইটখলা ঘাটো, মুখে ভাঙ্গাইবা কিতা পণ্ডিতর অউ গাইড় ফাটে ।

দুখুমিয়া কিন্তু মুরবির মানুষ । পিরের সাকরেদ বলে মানুষ পছন্দ করে । কী জানি কেন বৈতলকে দেখলেই তার ভিতর একটা খুনসুটির মানুষ বেরিয়ে পড়ে । বৈতলও তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে যায় । রাগে, আবার হজমও করে । বৈতল বোঝে দুখু তাকে অপছন্দ করে না । অর্ধেক পুলের উপর থেকে তাকে যেভাবে রক্ষা করেছে, তাতে দুখুরও প্রাণসংশয় হতে পারত । ওর বন্ধু দুটোও দুখুর উপর নির্ভরশীল । বৈতলও বোঝে কিছু একটা আছে নির্ভর করার । বছই রিক্সা চালায় সারাদিন মামুকে নিয়ে ঘোরে ইটখোলা ঘনিয়ালা সেন্ট্রাল রোড । মামুর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয় দুখু । সন্ধ্যার পর মোকামে পিরকে পৌঁছে দিয়ে ভাইয়াপি । এসে মিলিত হয় আপদ, ইদানীং বৈতলকেও সঙ্গী নিচ্ছে । পিরের চড়থাপ্পড় খাওয়ার জন্য ভক্তজন

অপেক্ষা করে থাকে অখিলের দোকানের সামনে, পঞ্চম সিং-এর গ্যারেজের ভিতর, মধু সিং-এর আনাজপাতির আর জমিদার যমুনাপ্রসাদ সিং-এর বাগান এর এদিক-ওদিক । পিরের মার খাওয়ার সৌভাগ্য যার হয় সে আনন্দে দুখুর হাতে আনি দু আনি সিকি আধুলি দিয়ে যায় । জানে এ মারের সুফল ফলবেই, তখন আনি দুআনিই লাখ দুলাখ হয়ে ফিরে আসবে । খুশি গোয়ালার দুধের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতেই মামুর মোকাম নতুন করে গড়ে দেয় । সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজ খুশির । মামুর মার খাওয়ার পরই মাছিমপুর থেকে ডাক পড়ে, সেনাছাউনিতে দুধ সরবরাহের বরাত পায় অন্য এক দেশোয়ালি আত্মীয় মারফত । অন্যের নামে কাজ করেও বেশ দুপয়সা হয় । খুশি দুধের ব্যবসাও গুটিয়ে নেয় । ঔষধের ব্যবসায় অনেক লাভ । সেন্ট্রাল রোডে দোকান খুলতেই শহরের কেন্দ্রীয় ঔষধালয় গোয়ালার মেডিকেল হল । মালুগ্রামের দেশবন্ধু বোসও গাংলাছড়া পুল-এর বরাত পাওয়ার পর পাকা করে দেয় পিরের মাটির বাড়ি । এরকম অনেক মার খাওয়া ভক্তজন আছে মামুপিরের । সেই সূত্রে শহরবাসী জন দুখুকেও চেনে, দুখুর নামে অনেক বদনাম, তবু সবাই দুখুর মারফতেই মামুর কাছে পৌঁছয় । দুখুও যতক্ষণ মামুর সঙ্গে থাকে সাধুর মতো থাকে, কোনও শয়তানি ধান্দামি করে না । মামুকে দেওয়া লিঙ্গার পয়সা সে জমা করে মামুর বাক্সে । মামু টাকাপয়সা ছুঁয়েও দেখে না, খরচ হয় দুখুর তত্ত্বাবধানে । ঘনিয়ালার মানুষ, দুখুর নিজের ধর্মের মানুষই তাকে ভাল চোখে দেখে না । পিরের খাদিম বলে ভয় করে, লোকমুখে প্রচলিত তার পাকিস্তানপন্থী ভাবমূর্তি, পনেরোই আগস্ট পাকিস্তানের চাঁদ তারা ওঠায় সে বাড়িতে । বৌকে গলা টিপে মারার গল্পটাও বেশ মুখরোচক । সব মিলিয়ে দুখু একটা রহস্যময় চরিত্র । সাধু সাধু ভাব আছে, মামুর একনিষ্ঠ চেলা যে, তারও আছে দুই চেলা বহুই আর আপদ । বাড়িঘরও নেই আত্মীয়স্বজনও নেই । নদীর পারে মামুর নামে দখল করা মাটিতে ঘর বানিয়ে থাকে । পুলিশের খাতায় নাম ছিল এককালে । পিরের সঙ্গত করায় এখন সে নামকাটা দাগি । বৈতল মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে আর কোন দেশের ভালমানুষ । খুনের আসামি সেও প্রাণের বন্ধুকে খুন করে ফেরারি হয়েছে । সামাজিক অনুশোচনার ধার ধারে না বৈতল । তবে ব্যক্তিগত শূন্যতার জায়গা তো অনুতাপে ভরাট হয় না । দুখুকে দেখে তাই বৈতল হাসে, বুকে বল পায় । মনে হয় লুলার শূন্যস্থানে ঢুকতে পারবে বেঁটে লোকটা । তাই পই চালাচালি শেষে হতেই কটু মিয়ার বানানো রিক্সা দেখায় । বলে,

--- কটু ভাই-এ কইরা পিছে এলাহিভরসা লেখতাম । কিতা করি ক চাইন । বাউ বেতাইনতর মুড়িত বউত হারামজাদি বুদ্ধি থাকে ।

--- কেনে ভালুউত কইছইন ভাইছাবে । আল্লার নামে লেখি দে ।

--- তর আল্লা কুনু আমার ভগবান নি বেটা ।

--- বুজুর্গ মাইনমর কথা যখন রাখতে নায় তখন আর জিগার কররে কেনে ।

--- আইছা বেটা বাঙ্গাল, বুঝছি, তর পুটকিত পেচ । সিদা রাস্তাত হাটতে নায় তুই । অখন আমার একখান হাউস পুরাইবে নি ক ।

--- পুরাই লা । আমি কিণ্ড পুরানে আলা ।

--- তুই না কইলে অইত নায় । আমি পয়লা দিন মামুরে চড়াইতাম আমার রিক্সাত । তুই রাজি ত ।

--- চড়াইছ ।

--- কইরে তো । বছইরে কই দিছ, রথর দিন আমার রথযাত্রা শুরু অইব । মামুরে চড়াইমু আমার রথ ।

--- দুয়া করতা তো এমনেউ করবা, দুই লাথ মারি দিবা নে, তাইন না মারলে আমারে কইছ মারি দিমু । চড়ানি লাগত নায় ।

--- কেনে, হিন্দুর রথো চড়াইতে নায় নি মামুরে । আমি চড়াইমু, তুই কিণ্ডরে ।

বৈতলের রাগ দেখে দুখু হাসে । হাসতে হাসতে লুঙ্গি উঠিয়ে চলে যায় নালার পারে ।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোতে । ফিরে এসে বলে ।

--- কটুভাই, ইবার মহরম নানি কুনদিন ।

--- অউ জুম্মার পরর জুম্মার দিন ।

--- ইণ্ডরে কই দেও মহরমর দিন হে চাইলে মামুরে চড়াইতে পারব । বৈতল তাতেই খুশি ।
বলে,

--- ঠিক তো । আমি সকালে যাইমু গি মকামো । হারাদিন কিন্তু মামু আমার ।

বাইশ

রথযাত্রার দিন বৈতল মামুর রিক্সা করে শহরের এ মাথা থেকে ও মাথায় ঘোরে ।
তিনসন্ধ্যার সময় বৈতল দুখুকে নামায় রিক্সা থেকে, মামুকেও নামায় হরিৎবরণ জমিদার বাড়ির
সামনে । নতুন রিক্সার সিট উঠিয়ে বের করে কলার কাঁদি বাতাসা আর একগুচ্ছ ভুবি ফল ।
জমিদার বাড়ির বড় রথের সামনে গিয়ে মনিপুরী পুরুতের হাতে দেয় উপাচার, রথের রশি ধরে
টানে, রথের উপর থেকে লুট হয় কলা বাতাসা নারকেল আনারস ভুবি । বৈতল আনারস তাক
করে দেয় লাফ, জাপটে ধরে আনারস অক্ষত । তেলাল শরীরের ধারে কাছেও কেউ নেই ।
লুটের প্রসাদ নিয়ে ফিরে আসে রিক্সার কাছে । মামু পির বৈতলের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে
কুটিকুটি । বৈতল পিরের হাতে দেয় আনারস । দুখু বাধা দেয় । বলে,

--- নিও না মামু । ইগু কাফের ।

পিরের তখন মজা । বৈতলের মতো দুহাতে জাপটে ধরে আছে আনারস । ওদিকে এক
লালপাগড়ি পুলিশ সব লক্ষ রাখছে, বৈতলের কাছে এসে ধমক দেয় । বলে,

--- ইতা কিতা করবায় । হিন্দুর লুট হর তুমি কেনে ধরলায় রেবা, থানাত যাওন লাগব তুমার
। রায়ট লাগাইতায় নানি ।

বৈতল কিছু বোঝার আগে ইটখোলা তেমাথা থেকে আরো কয়েকজন পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে
এগিয়ে আসে । বৈতলের গায়ে লাঠির ঘা পড়ার আগেই দুখু ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠির সামনে ।
বলে,

--- ইতা কিতা কররা । কারে মাররা, ইগু কুনু বাঙ্গাল নি ।

--- তে ।

আসলে মহরম আর রথযাত্রা একদিনে হওয়ায় উত্তেজনাপ্রবল এলাকা ইটখোলা ঘনিয়ালার মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । ভিড়ের জটলা এবং লালপাগড়ি দেখে দুখু মামুপিরের জন্য চিন্তিত হয় । আবার বিনা কারণে বৈতলকেও বাজারি মার খেতে দেওয়া যায় না । দুখু জানে একা তার কথায় পুলিশও ভুলবে না মানুষও মানবে না । তাহলে উপায় । একটুকরি রথের প্রসাদ সহ যুবা জমিদার যমুনা সিং-এর উদয় হতেই দুখু উপায় খুঁজে পায় । বৈতল বলেছে এই জমিদারকে সে বাঁচিয়েছে সাপের কামড় থেকে । জমিদার বাড়ির সিংদরজা আগলে দাঁড়ায় বেঁটে মানুষটি । বলে,

--- অউ এইন চিনইন তারে । হে উঝা, সিস্টিধর উঝা ।

দুখু নতুন বন্ধুর জন্য কাকুতিমিনতি করে । বলে,

--- মালিক, কইন না । চিনইন নানি । হে ত মেহেরপুর কেম্পো থাকে ।

এদিকে বৈতল থেকে জমিদারে নজর পুলিশ আর জনতার । তেলাল শরীর বৈতলও বিপদের গন্ধ পেলে বিচলিত হয় না । সে জানে হরিৎবরণ আর ইটখোলা ঘিরে আছে অনেক জলাশয়, আছে বরাক নদী । মানুষ আর পুলিশ ধরার আগেই সে পালাবে, গিয়ে পড়বে জলে । কিন্তু এবার বৈতলের ধান্দা ভিন্ন, সে নিজেকে বাঁচাতে তৎপর হয় না । সে পিরবাবাজির জন্য উৎকর্ষিত হয় । একা মামুকে আনারস হাতে রিক্সায় বসিয়ে দুখুও চলে গেছে জমিদার বাড়িতে । অকুতোভয় বৈতল পুলিশ কিংবা মারমুখি জনতাকে ভয় করে না । সোজা গিয়ে রিক্সার হাতলে হাত দেয়, কিরিং কিরিং বেল বাজায়, রাস্তা পরিষ্কার করে সে দিব্যপুরুষ নিয়ে বেরিয়ে যাবে । বৈতল জানে মামু সঙ্গে থাকলে তার কোনও ভয় নেই । রিক্সার প্যাডেলে পা রেখে দুখুকে ডাকে,

--- অই বেটা আয়, ঘনিয়ালার তাজিয়া দেখাইতাম মামুরে ।

ওদিকে জমিদার যম সিং তখন একবার বৈতলকে দেখে আর একবার ভিড়ের ভিতর মণিপুরি পুরোহিতের মাথার উপর দিয়ে রথারুঢ় জগন্নাথদেবকে দেখে । আনন্দে ভরে যায় মুখ, প্রসাদী ফলের ঝুড়ি আবার মাথায় ঠেকায় । এগিয়ে যায় পুলিশ ও জনতার দিকে । কথা বলতে বক্তৃতা দিতে হাত খালি রাখতে হয় শিখেছে যমুনা প্রসাদ । ভোলার হাতে টুকরি দিয়ে সামাল দেয় পরিস্থিতি, শান্তি রক্ষা করে । কিন্তু যার জন্য যা, সে কোথায় । বৈতল ততক্ষণে

ঘনিয়ালার মিছিলে মিশে গেছে মামু আর দুখুকে নিয়ে ।হায় হাসান হায় হুসেন করে দুখুকে বুক চাপড়ায়, মামুও বুকে হাত দেয় । কালো পোষাকের মিছিলকারীদের হাতে লাঠি ও তরোয়াল । নিজেরাই নিজেদের মারে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে । বৈতলও বলে হায় হাসান, হায় হোসেন । মহরমের উৎসবে এত মারামারির উন্মত্ততা দেখে বৈতলে গুরু সৃষ্টিধরের শেখানো উৎসবের সত্যে বিভ্রান্ত হয় । গুরু বলেন রথযাত্রা আনন্দেরই উৎসব । সমুদ্রপারের দারুপ্রতিমা জগন্নাথদেব সুভদ্রা আর বলরামের রথে চড়ে মাসীর বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার উৎসব । আবার পনেরো দিন পর ফিরে আসার দিনও হয় উৎসব, নাম উল্টোরথ । কিন্তু গুরু যে বলেন মহরমে আনন্দের লেশমাত্র নেই, মহরম শোক পালনের উৎসব । গুরু বলেন,

--- অখন যে রেবা দেখরায় লাঠি বল্লম তরোয়াল লইয়া যুদ্ধ কররা রাস্তাত কালা কাপড় পিন্দিয়া, ইতা কিন্তু ধর্ম নায় । ধর্ম অইল শহিদ দিবস পালন করা । শহিদর আত্মার শান্তি কামনা ।

--- কে শহিদ, মহরম কথার অর্থ কিতা ।

--- অর্থ না বা । আরবি বছরর পয়লা মাস অইল মহরম । আর শহিদর ও আছে এক কিচ্ছা, হজরত মহম্মদর দুই নাতি, পুড়ির ঘরর নাতি হাসান আর হোসেনে নানার কাছে কান্দতে কান্দতে কইল তারার পিন্দার কাপড় নাই, কাপড় লাগে । হজরত মহম্মদে কইলা কও কী রঙর কাপড় লাগব । একজনে কইলা সবুজ আর একজনে হোসেনে কইলা লাল । তাইন ত কইলা আইচ্ছা, তখন আকতা স্বর্গ থাকি জিব্রাইলে তান কানে কানে কিতা কইয়া গেলা আর নবি দাদুর মন খারাপ অই গেল । আসলে তান দাদুভাই হাসান মরবা বিষ খাইয়া এর লাগি সবুজ রঙ আর হোসেন মরবা ফুরাত নদীর পারো কারবালার মাঠো এজিদর সৈন্যর অন্যায় যুদ্ধত । কল্লা দুই ফাঁক করি লায় শয়তানে । নবিয়ে ইতা সব আগেউ জানি লাইছলা । এর লাগি মহরমর দিন খালি কোরান পাঠ করা হয়, দান দেওয়া হয় । শহিদর আত্মার শান্তি কামনা করা হয় ।

--- ই তো বুঝলাম, কিন্তু সবুজ আর লাল রঙর অর্থ কিতা কইন । সবুজ তো বাঙ্গাল হকলে ঝাঙা থাকি শাড়ি কাপড় হক্কলতাত পছন্দ করে । মুসলিম লিগর পতাকার রঙও সবুজ । আমি এক সবুজ তফন পিন্দিছিলাম, আপনার বাড়ির হক্কলে কইলা আমি বাঙ্গাল হই গেছি । আর

লাল তো দেখি অনন্ত সাধুর পার্টির রং । লালও আমি পিন্দতাম পারি না, মাইনষে কয়
কমুনিস্টর রঙ । রং দিয়া কিতা হয় বুজি না ।

--- আছে রঙর অর্থ আছে । তে রং দিয়া পরিচয় সহজ হয় অনেক সময় ।

বৈতল গুরুকে প্রণাম করে মনে মনে । গুরুর আশীর্বাদে যে কারবালার প্রান্তর থেকে প্রাণ
নিয়ে পালিয়ে এসেছে । যম এজিদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে । ঘনিয়ালা পুকুরের পারে
রিক্সা দাঁড় করিয়ে বৈতল দুখুর কাঁধে হাত দেয় । আসলে দুখু সময়মতো ঝাঁপিয়ে না পড়লে
বাজারি মারের হাত থেকে বৈতল বাঁচত না । দুখুকে বলে,

--- এজিদ ইগুর হাত থাকি বাচি গেলাম । নাইলে তো সবে আইজ হয় বৈতল হয় দুখু করলে
নে ।

--- অই বেটা খবিছর খবিচ নিজেরে ইমাম হোসেন ভাবরে নি । জমিদার বেটাও কুণু শয়তান
এজিদ নায়, তোরে বাচাইত আইছিল । আমি তো দেখলাম হে তরে খুজের । তুইন কানোর
লাটসায়েব, বেটার তর লগে বউত মাত আছে, তোরে কিচ্ছু দিত । আর তুইন ভাগরে ।

--- ভাগিয়ার না বেটা খেলাইয়ার । খেউড় খেলাইয়ার । বরির আগাত টুপ লাগাইয়া রাখছি হে
আইব । ইতা তুই বুঝতে নায় বেটা বাড়ি ।

জমিদারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় বৈতল জমিদারের হাতে দেখে নিয়েছে নতুন আংটি ।
মানে ধরতেই পারে নি তার হাতের কাজ । প্রফুল্লমনে সেদিন বৈতল মামুর মোকামে দুখুর
সঙ্গে খায় বিরিয়ানি । মামুও খায়, মামুকে কেটে দেয় লুটের আনারস । গভীর রাতে উৎসব
সমাপন করে বৈতল পক্ষীরাজ নিয়ে ফিরে আসে মেহেরপুর । ক্যাম্প বাড়ির বাঁশের খুঁটিতে
পাটের দড়ি দিয়ে রিক্সা বাঁধতে বাঁধতে দু-বার দৌড়য় পায়খানায় । বৈতল বোঝে জ্বর
এসেছে, হাত পা মাথা গরম । উৎকণ্ঠায় দুর্গাবতী কী করে শুশ্রূষা করবে ভেবে পায় না, একটু
পরপরই যে দৌড়চ্ছে । দুর্গাবতীকে বলে,

--- আটু কাপের ।

--- কাপব । বুঝছি লবণ জল খাও খালি ।

--- দেও ।

এত রাতে ডাক্তার নেই কবিরাজ নেই হোমিওপ্যাথি নেই, দুর্গাবতীর হেকিমিতে নুন জল খেতে আপত্তি করে, পেট গুলোয় । চিৎকার করে বাধা দেয় । ভোররাতে চিৎকার করার শক্তিও হারিয়ে যায় । একদিন না দুদিন কে জানে ঝোলভাত খেতে খেতে চোখ খোলে । তৃপ্তি নিয়ে তাকায় দুর্গাবতীর সেবাপরায়ণ মুখে । দুর্গাবতীর হাতের শাঁখায় আদরের মুখ লাগায় । বলে

--- ইটাইন হাচারির নি ।

--- কিতা হাচারির আর মিছারির । শাঁখা সিন্দুর আবার মিছা অয় নি ।

--- না কইয়ার ।

--- কিতা কইরায় ।

--- পাকিস্তানো যাওয়ার গির ডর দেখাও কেনে তে ।

--- আডুয়া বেটারে দেখানি লাগে ।

--- আডুয়া নানি । দেখবায় একবার সোজা অইয়া উঠি । তুমার ইতা কয়ফল আর রুজন্ট পাতার ঝোলে অইত নায়, মাইমলর লাগে মাছ । কাইল অউ পলো আর পেলইন লইয়া বার অইমু । আমার দেখার হাওরর মতো মাছ ভর্তি না থাকলে কিতা অইব চাতলাতও মাছ আছে নানানি বিনানি । চেঙ মাছর ঝোল খাইলে দেখবায় নে কিলে ফালাইয়া উঠব ।

--- আর ফালানি লাগত নায় । যে ভব দেখাইছ । আর লড়াচড়া না, বিছনা থাকি উঠবায় না এক্কেবারে । যেলাখান আছলায়, হতেড়ার লাখান পড়ি থাকো ।

--- আমি কুন্সু পুয়াতি নি বেটি ।

--- অয় তুমার পুয়া অইব । খালি হিকড় মাটি খাইবায় ।

--- পুয়া নায়, আমার পুড়ি অইব । পয়লা ঝি অইলে ছিকি বাইয়া ঘি পড়ে । হাচাউ কইয়ার ঢঙ নায়, দিবায় নি এগু পুড়ি ।

দুর্বল শরীরের বৈতল আবেগে আরো দুর্বল হয় । দুর্গাবতীর হাত ছেড়ে পায়ে হাত দেয় ।
কাতর কণ্ঠে বলে,

--- দিবায় নি । কও না ।

--- ই রিফ্যুজি বস্তিত নি তুমার পুড়ি মানুষ অইত ।

--- না, কেনে অইত । তাইরে আমি ইস্কুলো পড়াইমু । মুক্তার মরির বানাইমু । সিলেটো
দেখছি টাউনি পুড়িত্তর কী ফুটানি । ঠিক অউ কইছ । আমার পুড়ি রাজার লাখান মানুষ অইব
। ইবার দেখ আমার কেরামতি ।

বৈতল কেরামতির কথা বললেই দুর্গাবতী শঙ্কিত হয় । মনে হয় গ্রামের সাদাসিধে
পরোপকারী মানুষটা যে অচেনা হয়ে যাচ্ছে । শুধু ধান্দাবাজির ফন্দি মাথায় । কিছুদিন থেকেই
এক জমিদার বাড়ির কথা বলেছে বৈতল । বলেছে আর বস্তির নোংরা বাড়িতে থাকতে হবে না
। রাজবাড়িতে চলে যাবে । জাল নিয়ে বেরিয়েও গেছে, ফিরে এসেছে দশ টাকা নিয়ে, যেদিন
খালি হাতে হাসি মুখে ফেরে সেদিন সন্দেহ হয় । দুর্গাবতী জানে শহরে এসে বদলে গেছে
মানুষটা । দশ টাকা পাঁচ টাকার খেপ মারতে যায় না নরসিংটোলা সাপনালা মালিনীবিল
নসিবালি হাকিমের দিঘী কিংবা পদ্মবিলে । জালের সঙ্গে একদিন বিষধর সাপও ভরে নিয়ে
যায় থলিতে । বলে বেঙ্গল কেমিকেল থেকে সাপের বিষ কিনবে, জ্যান্ত সাপ চাই । অনেক
পয়সা দেবে । যেদিন বিষধর সাপ নিয়ে বেরোয় বৈতল তার পর থেকে জাল নিয়ে বেরোনোও
প্রায় বন্ধ । মুসলমান মিস্ত্রির কাছে রিক্সার বরাত দিয়ে এসে বলে নাম রেখেছে এলাহি ভরসা
। দুদিন পড়ে নাম পাল্টে হয় পক্ষীরাজ । বৈতল কথা লুকিয়ে রাখতে জানে না, দুর্গাবতীকে
সব কথাই বলে, কিন্তু কিস্তিতে বলে । দুর্গাবতীও এক কিস্তি শুনেই আঁচ করে নেয় পুরো
কাহিনি ।

তেইশ

জমিদার যমুনা প্রসাদ বৈতলের মধ্যে এক বিশ্বাসী মানুষ খুঁজে পায় । বৈতল রাগ পুষে রাখে, ফর্সা গায়ের বর্ণের ভূস্বামী কালো বৈতলকে অপমান করে, বলে পুকুরের মাছের ওজন তার থেকে বেশি । তাইতো বৈতল কেউটে ছাড়ে পুকুরপারে আর তার কম ওজনের শরীর দিয়ে রক্ষা করে । হাতের আংটি খুলে নেয় । তারপর লুকোচুরি শুরু হয়, বৈতল যম সিং-এর নাড়ি নক্ষত্রের খোঁজ নেয় । জমিদারও প্রাণপণ বৈতলকে চায়, কেন চায় জানতে সময় নেয় । সে কি তাকে দেহরক্ষী করে রাখতে চায় । নাকি অন্য কোনও প্রয়োজন, ভোলা তো আছে সর্বক্ষণের সঙ্গী । নাকি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে চায় বাড়িরাখাল রেখে । বৈতল তো আর কালো কেউটে নেয় যে বাড়ি রক্ষা করে । একবার ফেরায় বৈতল দুবার ফেরায়, তিনবারের বার দুর্গাবতীকে লোভ দেখায় । বলে,

--- চল যাই গিয়া । আলেদা ঘর দিব পুকুর পারো । দেখিয়া আইছি মস্ত বড় ঘর, দুয়ার পাকঘর উঠান পায়খানা একটু দূর । আমরা কী অসুবিধা কও, আমরা তো নদীয়ে হাওরে হাগরা মানুষ । চলো ।

দুর্গাবতীর মন সায় দেয় না । বলে,

--- ই মানুষ ইগু আর তার দলবল ভালা নায় । কিলাখান চায় বেটায় । মনো হয় গিলি লাইব অখন অউ । বুকে পিঠে নজর খালি । আমি ইতা মানুষ বউত দেখছি মালিরভিটাত বইয়াখাউরিত । যাইও না ।

--- কেনে যাইতাম না । বেটারে উজন শিখাইতাম ।

--- কিওর উজন ।

--- কয়... ।

--- কিতা কয় ।

--- না কিচ্ছু নায় । হুনো গাড়ি চড়িয়া যাইবায়, পছন্দ না অইলে হউ গাড়িত অউ আইবায়
আবার চাটাইর বাড়িত । হরি গুরুবৈদ্যর জমিদারিত আবার । ইগুও জমিদার হিগুও জমিদার ।
এরে গো বুঝলায় নি, যাওয়া গিয়াউ কাম, সাব্যস্তর কাম । না করিও না ।

--- কেনে আকতা সাব্যস্তর কাম দেখলায় । জমিদারনিরে দেখিলাইছ নানি । জিবরাত পানি
আইছে ।

--- এ তুমি দেখি ভেঙ্কিও জান । কেমনে বুঝলায় ঠাউকরাইনরে দেখছি ।

--- আমার থাকি সুন্দরী নানি ।

--- পরমা সুন্দরী, আর গার রং । একেবারে টিকির ছালি ।

--- মিছা মাতরায় ।

--- হাচাউ কইয়ার । জমিদার ইগু যত সুন্দর দেখাত, বউ এইন কালা । বেটার বুদ্ধি আছে,
বাড়ির বউরে যেনে কেউ নজর দিতো পারে না এর লাগি কালা বউ বিয়া করছে ।

--- পুয়া পুড়ি কয়টা ।

--- নাই, অইব নানি ।

--- অ, অউ কথাউ কইছলায় হিদিন, তুমার পুড়ি লাগে । আমারে নি ধাই রাখত বড়লোকর
বাড়িত ।

--- তোরে কেনে ধাই রাখত গো মাই, সূর্যমুখী মিডওয়াইফ আছইন নানি নারীশিক্ষাশ্রমর ।

--- আর আলদ ইগু কই, ঢুকাই রাখছ নি জমিদারর বাড়িত ।

--- রাখছি রাখছি । বৈতলর দংশানির লাগি সাপ লাগে না, বুদ্ধি দিয়া তারে এমনে পেচাইমু যে
চামড়া উমড়া সব নীল অই যাইব ।

--- বুঝছি, আমার থাকি সুন্দরী কেউরে তোমার মনো ধরছে, এর লাগিয়াউ অততা করায় ।
কে কও ।

--- কেউ নায় কেউ নায় । তুমি অউ আমার আনারকলি । তুমার লাগি..., তুমার লাগিউ সব
বেটি ।

--- আমি আনারকলি অইলে তুমি কিতা ।

--- আমি তো শালা শরাবি । দেবানন্দ । তুমারে ই ছাপটা ঘরো আমি রাখতাম নায় ।

--- রাজবাড়িত রাখবায়, নানি । আমার কিতা বদলাইব কও, যে বান্দি হউ বান্দিউ থাকমু ।
লেপাপুছার কাম করন লাগব । কৈবর্ত মাইমলর বৌরে কুন্সু আর বাড়িত ঢুকতে দিব নি ।

--- তার বাপে দিব । হালার হালার নু জান বাচাইছি । হে আমারে নিয়া টিটকারি করছে,
একবার ঢুকি লাই দেখবায় নে ।

--- কিতা করবায় ।

--- অউ দেওয়া জান লইয়া বার অইমু । বৈতল উঝারে চিনে না ।

--- আবার উঝা অইলায় কেমনে ।

--- তুমি অউও কইলায় আমি শর্মা । শর্মাউ উঝা, আমি আইর গান জানি । একবার শ্রাবণীত
যদি গাইতাম পারি, নাচতাম পারি । দেখাই দিমু ঢলানি কারে কয়, জিয়ানিও দিমু । বেটারে
একটু একটু করি ডর দেখাইমু ।

দুর্গাবতী রাজি হয়, খুশি হয় । প্রাণ বাঁচাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বৈতলকে প্ররোচিত
করে । মিথ্যার আশ্রয় নেয়, নইলে ব্রাহ্মণকন্যা এত বড় অধর্মের কাজ করে না । এছাড়া
উপায়ও বা কী । যে মানুষটা তাকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছে, আগলে আগলে
রেখেছে তার মনে সে দুঃখ দিতে পারে না । বৈতল কখনও লোভ করে নি । মনের কথা মুখে
আনেনি । বরং গৌরঙ্গী দুর্গাবতীই তাকে পাঁকে জড়িয়েছে । বিয়ে শাদি না করেও স্বামী স্ত্রীর
পরিচয়ে নতুন জীবন কাটাচ্ছে । বৈতল কিন্তু এতসব ভাবে না, বৈতলের কষ্ট দুর্গাবতীকে
নিয়ে, দুর্গাবতীর সুখ নিয়ে । বৈতল তাই দুর্গাকে বলে,

--- কামটা কুন্ঠিক অইল নি ।

--- কিওর কাম ।

--- এতাকি কই কিতা, চল যাই কামাইখ্যাত । হিনো গেলেউ বিয়া অই যায় ।

--- যাইবায় নি । কিতা করতায় কও পাপ বাড়াইয়া । শর্মা উর্মা হওন লাগত নায় । তুমি যেতা কইবায় অইব । আমি নায় কৈবর্তবাড়ির বৌ হইয়া থাকমু । অখন জান বাঁচানির লাগি যেতা করন লাগে কর ।

--- তে তুমি রাজি ।

--- অয় রাজি । তে কামাখ্যাত নায় ।

দুর্গাবতীর রাজি না হয়ে উপায় নেই । অগ্রদানী ব্রাহ্মণের কন্যা সুখ দেখেনি যৌবনে । গাঁজাখোর শ্মশানচরা ছেলের দল লোভ দেখিয়েছে বিস্তর । দুর্গার শরীরকে যে যেমন পারে মন্দ করেছে । রূপের সঙ্গে যৌবন কাঁটার ঘায়ে জর্জরিত হয়েছে, ফিটের রোগ ধরেছে ।

বৈতলের চতুরালির আস্তানায় দুর্গাবতী দিনে দিনে ধাতস্থ হয় । চাটাইর বেড়া দিয়ে ঘেরা আস্তানা থেকে এত বড় বাড়ি পুকুরপারে । দুর্গাবতী জমিদার বাড়িত লেপাপুছার কাজ নেয় যেচে । উঠোন লেপে দুর্গা উঠোনের মাঝখানে মস্তবড় মল্লয়া গাছের গুঁড়ি লেপে । ফেটে পড়া যৌবনের বিভঙ্গে গৃহদেবতার দেউল লেপতে মাটির সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, শরীরে সয় না এত পরিশ্রম, আলুথালু হয়ে যায় । জমিদার যম সিং-এর চোরা চোখ একদিকে আর যুবা সূর্যের তির্যক কিরণ অন্যদিকে । এফোঁড় ওফোঁড় আলোর তেজে দেবীপ্রতিমার সামনেই মাথা ঘুরে পড়ে যায় ।

চব্বিশ

সিংহ জমিদারের কুলদেবী মা মনসা । কালো পাথরের পাঁচ ফুট উঁচু পটমূর্তি নাকি কয়েকশ বছরের প্রাচীন । মহীশূর মাদ্রাজ না তেলেঙ্গা, দক্ষিণ দেশের পটশিল্পের কারুকাজ দেবীপ্রতিমা ঘিরে । কালো পাথরের মনসাপ্রতিমা ঘিরেই জমিদার বাড়ির অভিজাত্য । আধাআধি সর্পপট, অর্ধেক দেবীমুখ । অভিনব এই প্রতিমা । প্রাচীন পারিবারিক বিগ্রহ ঘিরে জন্ম নিয়েছে অনেক অলৌকিককত্ত্ব । জমিদার বাড়ির পুকুর পদ্মদিঘীতে ঘড়া ঘড়া মনসার ধন আছে, শ্রাবণ মাসে মা মনসা নিজ হাতে উঠিয়ে দেন সিন্দুক জমিদারের কাছারিঘরে । অতি লোভে অনেকের মৃত্যু হয়েছে দিঘীর জলে । হয় দেওলা টেনে নিয়ে গেছে নয় সর্পাঘাতে মরেছে । জমিদার যমুনাপ্রসাদও দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়ার কৃতজ্ঞ বৈতলের কাছে । তাই পুকুরের দক্ষিণ কোণে শনের ছাউনি দেওয়া ঘরে থাকতে দেয় বৈতলকে । বলে,
--- নেও রেবা, তুমারেউ দেওলা করি দিলাম আমার দিঘীত । দেখিয়া রাখিও ।

কী দেখে রাখবে বৈতল । এ কেমন ধারা কথা । শুরু থেকেই যমুনা জমিদারের কথায়, সুর মিলছে না, মেলাতে পারছে না বৈতল । বৈতলকে দেওলা করে রাখবে । এবড় সাহস । বৈতলকে দেওলা করা কর্ম নয় ইটের কারবারি জমিদারের, শ্রমিক নেতা যমুনা সিং-এর । তবু বৈতল রাগ চেপে রাখে । হাসি মুখে বলে,

--- ঘাবড়াইন না যেন । বৈতলে সব দেখিয়া রাখব । খালি চারা ফালাইবা, হারা বছর বড় বড় মাছ খাওয়াইমু । রউ কাতলা কালিয়ারা ঘাঘট, কই মাগুরও খাওয়াইমু । বড় মাছ আমারে দেওন লাগত নায়, পুটি মকা বালিগড়া চেঙউঙ অতা অইলেউ আমরার চলব ।

প্রস্তুত বাড়ি পেয়ে বৈতল খুশি । অনেকদিন পর দুর্গাবতীকেও খুশি হতে দেখে বৈতল । বৈতল দুর্গাবতীকে নিয়ে ঘরে ঢোকে । দুর্গাবতী মাথায় ঘোমটা টেনে ঘর সামলায় । বৈতল বলে,

--- হুঁলায় নি বেটার মাত । হে বুলে আমাৰে দেওলা করত অত নি সাহস । অউ তুমাৰে
কইলাম, তার পুকইৰোউ তাৰে দেওলা বানাইমু আমি ।

--- আইছা বাদ দেও ইতা । তাইন বড় মানুষ, কইলাইছইন এক কতা, এৰ লাগি অত গুসা
করিও না । অখন কও ঘর তো পাইলায়, খাইবায় কেমনে ।

--- রিক্সা ইণ্ড কেনে বানাইছি । রিক্সা চলাইমু ।

--- অয় মাইনষে জিগাইবা যাইতায় নি বা, তুই কইবায় যাইতাম নায় । বুলে কিতা । অখন
আমি গাইঞ্জা খাইয়ার । এৰ থাকি জমিদারৰ ইখানোউ কুণু কাম পাইলিবায় ।

--- আমি কিতা হিণ্ডৰ চাকৰ অইয়া থাকতাম নি । তৰ ইছা অইলে বেটি তার পাও টিপিয়া
দিছ দুই বেলা । দিবনে যেতা চাছ ।

রাগের মাথায় দুৰ্গাবতীকে তুইতুকারি করে বৈতল । দুৰ্গা বৈতলের রাগ নিয়ে খেলা করে,
হাসে । বলে,

--- ঠিক নি । তে ত বালাউ, তুমি না থাকলেউ যাইমু । টিপিয়া উপিয়া দিমু । ভাদমাইয়া মাটি
পাইছ তো বুরবুরা, যেতা ইছা মাতরায় ।

--- অয় হক কতা মাতলেউ কথা হয় খুটার । হক কথা মাতলেউ মুখ বালা নায় বেটার । যাও,
তোমার যেতা ইছা করো ।

--- হুঁ না, খালি গুসা কেনে তুমার নাকৰ আগাত । জমিদার এইন বালা না বাদ ইতা দিয়া
তুমি কিতা করতায় । একটু মিঠা মিঠা কথা কও লাভ অইব । আমি দেখছি তান খুব ভক্তি ।
লাল চন্দনৰ টিকা লাগাইন, আই বিষরির পা না ছইয়া বার অইন না । অত বড় মন্দির
দেখাশুনার কেউ নাই । এক বাবনে আইয়া পূজা করি যাইন, পয়সা পাইন মাস গেলে ।
আমিও তো বাবনৰ পুড়ি দেখাশুনা করতাম পারি । লেপলাম পুছলাম পূজার সামগ্রী সাজাই
দিলাম । পয়সা আইব ।

--- কিন্তু যেদিন জানব তুমি কৈবর্তৰ বৌ ।

--- জানত নায় ।

--- জানত নায় তো । তে আইজ অউ আরম্ভ করি দেও । বাকিখান আমার কাম । কিন্তু এক কথা দিয়ার, মন্দির পর্যন্তউ থাকবায় । ভিতরে ঢুকবায় না ।

--- আইছা । অখন খালি নয় আনি দুকান থাকি একখান লক্ষীর ফটো আনি দিও ।

--- কেনে, অতবড় আইর মন্দির থাকতে আবার কেনে ফটো ।

--- কেনে নায় । গৃহদেবতা আর মন্দিরর দেখা এক অইলা নি ।

দেবীপ্রতিমার সামনে মাথা ঘুরে যাওয়ায় ভেতরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাবতীকে । বৈভব কখনও দেখেনি শ্মশানপণ্ডিতের মেয়ে, বৈতল পাটনির বিয়ে না করা বৌ । পাকা বাড়ির উঠোন পর্যন্ত পাকা । বৈঠকখানার ঘরেই কত রকমের আসবাব । মস্তবড় খাটপালঙ্ক, তার উপর জাজিম, তার উপরে ঢাকনা । শুয়ে থেকেই সুস্থ হয়ে যায় দুর্গাবতী । ঘুরতে-থাকা মাথা স্থির হয় । আবার অস্থিরও হয় । ভাবে মানুষের জীবন, মানুষের গেরস্থালিও এমন হয় । সুস্থ হওয়ার পরও তাই দুর্গাবতী কাজে অকাজে ভিতর বাড়ি যায় । পাকা বেদীর উপর তুলসীতলায় জল ঢালে, সন্ধ্যার প্রদীপ তৈরি করে দেয় । বৈতল দুর্গাবতীর চালচলনে সন্দিহান হয় । বলে,

--- তুমারে কইছলাম ভিতরো যাইতায় না । কেনে গেলায় ।

--- কৈ গেলাম । এমনে কুনু গেছিনি । হিদিন তো মাথা ঘুরাই পড়ি গেলাম, তুমিও নাই কিতা করতাম । তারা লই গেল ।

--- তারা কে ।

--- আমি কুনু দেখছিনি । তে সবে কইছইন জমিদার আছলা ।

--- আইছা, হে তো থাকবউ । হিদিন নায় মাথা ঘুরাইছিল, অখন দেখি রুজঅউ যাইরে ।

--- রাইয়ত হকলে যেতা দিয়া যায় ফলপাকড়, ধানচাউল ইতা তো নিয়া রাখন লাগে । গরিব মাইনষর ভক্তি আছে, আইরে দেয় ।

--- ভক্তি উক্তি কিছু নায়, সাপর আর লাঠির ডর ।

--- সাপ নায় বুঝলাম, লাঠি কিতা ।

--- লাঠি অইল ঠেলা । জমিদার বাড়িত না দিয়া হালুচায় খাইলাইত নি । ডরে, জমিদারর ডরে দিয়া যায় যেতা হয় । আমার মাথাত এক বুদ্ধি আইছে । তুমার তো মাজে মাজেউ ফিট অয় নানি । ইবার যখন ফিট অইব আবার, দেখাইমু ভেঙ্কি । তুমারে যেতা কইমু মানি লাইও ।

বৈতলের ভেঙ্কি কোনদিকে বেরোয় কেউ জানে না । বৈতলের সব ছক কষা থাকে । বৈশাখ মাসে গৃহপ্রবেশ-এর দিন বৈতল আর দুর্গাবতীর কর্মস্থল বিভাজিত হয় । দুর্গাবতী মা মনসার মন্দির সাজায় সারাদিন, জমিদারবাড়ির ভিতরেও আসা যাওয়া বাড়ে । চায়ের কাপ দিয়ে যায় বৈঠকখানায় । দুর্গাবতীর হাতের তৈরি চা এর সুঘ্রাণ ও স্বাদে ঘনঘনই কেটলি চাপাতে হয় তাকে । ভোগের রান্নার জন্য লালপাড় নতুন শাড়ির বরাদ্দ হয় এক জোড়া । শুদ্ধমতে চান করে ঠাকুরঘরের উনুন জ্বালায় দুর্গাবতী । সুনাম কাড়ে দুর্গা । বৈতল সব দেখে, জমিদার আর বৈতলকে ডাকে না, যে-কোনও কাজেই এখন বৌ । সকালের জলখাবার পেতে দেরি হলে এখন দুর্গাবতী বলেই ডাকে যমুনা প্রসাদ বৈঠকখানার আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে । বৈতল রাগে, হিস্ হিস্ শব্দ করে বসে থাকে মছয়া তলায় । যে আর কোনও কাজে লাগে না, সব যখন এখন দুর্গা, দুর্গাবতী নামের নানান প্রয়োগ । বৈশাখের শেষ দিকে বৈতল দুর্গাবতীকে ডাকে । বলে,

--- দরজা বন্ধ কর । তুফানর ঝাপটায় ঘরো জাবড়া ঢুকি যার ।

--- বালাউতো লাগের একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস । পুকইরো মাছেও বুড়বুড়ি দেব । দেখ না ।

--- আয় অউ বুড়বুড়ি দেখিয়াউ মনো পড়ল, অউপুকইর পারোউ বেটায় আমার শরীল লইয়া বেততমিজি মাত মাতছিল । আমি আউয়ার মতো হাসছি । তারে সাপের কামড় থাকি বাচাইছি । এখন হে উপকারির উপকার ভুলি গেছে ।

--- কিতা করছে ।

--- তুই জানছ নানি কিতা করছে । ঠিক আছে যা জানন লাগত নায় । খালি একখান কাম করি দিবে আমার । করবে নি ।

--- কও কিতা ।

--- তোর বেটা ইগুরে কইছ ।

--- কে আমার বেটা । আমার বেটা তো আমার সামনে ।

--- ঠিক নি । আইচ্ছা তে তোর জমিদাররে কইছ, আইজ আমার নামে খিচুড়ি ভোগ অইব মন্দিরো ।

--- আত্কা ।

--- আত্কা নায় বেটি । আত্কা !

--- জমিদারে মানতা নায় । তারার মন্দিরর ভুগউগ ইতা তারার নামেউ হয় । তুমি কে ।

--- তুই তো দেখি বউত্তা জানছ । ঠিক আছে, তে কও তারার নামেউ অইব । লগে লাভড়া । আইজ আমি পুখি পড়তাম । গাউআলা মানুষও আইবা ছনাত ।

--- অউ কথাউ কইয়ার, আত্কা গরমর মাঝে কেনে ।

--- কেনে কিতা আবার, কইও লখাইর বিয়া অইব আইজ ।

--- তুমি হাচাউ গাইতায় পারো নি ।

--- তুই পারবে নি বেটি ক, যেতা কইলাম ।

ভয়ডর কাকে বলে জানে না বৈতল । গুরু সৃষ্টিধরের সঙ্গে আসবে বসেছে, দোহারকির কাজ করেছে । আর আসর পরিচালনার জাদু দেখেছে গুরুজির গলায় । বৈতল একটু রকমফের করে । বৈতল দুর্গাবতীকে বলে নাকে নথ লাগাতে । তাদের দুজনের সম্পত্তি টিনের ট্রান্সকটি বের করে, মালিরভিটার যুবতি কন্যার লাল হলুদের শাড়িটা বের করে । বলে,

--- কথা রাখবায় নি কও ।

--- কি কথা ।

--- নথটা পিন্দবায় নি । অউ শাড়িত তুমারে দেখছি বারবার আর পিন্দ না । পিন্দবায় নি । ঘুমটা দিবায় নি । পুরা নায় সিতার উপরে রাখিও, আমি গাইমু আর দেখমু তুমারে ।

--- চণ্ড নি কিতা ।

বৈতলের গানের চণ্ডই ভিন্ন । আসরে বসার সঙ্গেই চমক । গণেশ বন্দনা নেই গুরু বন্দনা
নেই মনসা বন্দনা নেই, গুরুতেই লক্ষীধরের মুকুট । তারায় ওঠে বৈতলের গলা যখন গায়,

“ মণি ঝলকরে, জামাইর মুকুটের ম্নি-ঝলকরে ।।”

তারপর আবার নামে সুর, গায়

“কত মণি ঝলকে মুকুটের উপর

কি শোভা হইয়াছে দেখিতে সুন্দর ।।”

তারপর অনেকক্ষণ তানা নানার কালোয়াতি গেয়ে আসর জমায় বৈতল । তারপর দম্ভবৎ
প্রণাম করে মা মনসাকে । সরস্বতীর বন্দনা করে । গায়,

“তুমি কর তোমার গান উপলক্ষ আমি

সকল দেবতা বন্দি পদ্মাকে বন্দি আগে ।”

তারপর মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র বলভদ্র বুদ্ধ কল্কি অবতার বন্দনা
সেরে করে সর্ববন্দনা । গায়,

“প্রথমে বন্দির দেবনাথ নিরঞ্জন

দ্বিতীয়ে প্রণমি ব্রহ্মা তারণ কারণ ।।

তৃতীয়ে বন্দিব বিষ্ণু ত্রিজগৎ-পতি ।

তাঁর দুই ভাৰ্যা বন্দি লক্ষী সরস্বতী ।।

চতুর্থো বন্দিব শিব গণেশ সহিতে ।

অৰ্দ্ধ অঙ্গে গৌরী শোভে গঙ্গা শোভে মাথে ।।

পূৰ্বেতে বন্দিয়া গাই পূর্ব দিবাকর ।

যেদিকে উদয় ভানু চৌদিক প্রহর ।।

পশ্চিমে বন্দিয়া গাই ঠাকুর জগন্নাথ

প্রসাদ বলিয়া যার বাজারে বিকায় ভাত ।

উত্তরে বন্দিয়া গাই উত্তর তীর্থস্থান ।

ত্রিদেশের দেবগণ যাকে করে ধ্যান ।।

দক্ষিণে বন্দিয়া গাই কালীদয় সাগর ।

চান্দের চৌদ্দ ডিগ্গা যাতে হইল তল ।।

তল হইল চৌদ্দ ডিগ্গা বাদের কারণ ।

সেই হতে মনসার পূজা মঞ্চয় ভুবন ।।

বন্দি হরনন্দিনী অষ্টনাগের আইগো ।

তোমার চরণ বিনে আর গতি নাই গো ।।”

বৈতল সমবেত মহিলাদের বলে উলুধ্বনি দিতে । বলে,

--- জোকর দেইন ।

‘সমাপন হইল আজি অধিবাস কীর্তন ।’ তখন আপনারা লখাইর চউখ দিয়া দেখইন বিপুলারে,

‘বেহুলা দেখি রূপবতী লখাই সানন্দিত অতি,

বিপুলারে চাইল কটাক্ষিয়া ।’

ভাবে বিভোর হয় বৈতল । দেখে তার বিপুলা সুন্দরীর নাকে নথ আর গায়,

‘মুকুতা জরাউট, বেশর নাকে,

ঠেক চাকি দিয়াছে কর্ণে ।।’

অতিপরিচিত দুর্গাবতীর গায়ের কুমারী শাড়ি দেখে দেখে গায়,

‘লালনা শাড়ি, সোনার কিনারি,

কোমরে তুলিয়া পরে ।

সোনার উড়ুনা দিয়াছে গায়,

ঝিলমিল ঝিলমিল করে ।।’

কখনও বেহুলা কখনও লখাই এর সাজ ও রূপবর্ণনায় মাতে বৈতল । গায়,

‘বিপুলারে সাজ করে সখিগণ মিলে ।

বিবাহ মঙ্গল গীত গায় কুতূহলে ।।

যতনে বান্ধিয়া দিল করিয়া যতন ।।’

জমে গেছে, বৈতলের অপূর্ব কেরামতিতে বিবাহ উৎসব জমে যায় । আর মাঝে মধ্যেই
আসর কাঁপিয়ে বোল তোলে,

‘জয় মা মনসার জয় ।’

হঠাৎ বৈতল আসরের ঐ দূরকোনে দুহাত তুলে কাকে যেন দেখে । আসলে যে তখন লখাইকে
দেখছে গানে,

‘আরে, ও তোরা দেখবি যদি আয়

নূতন সড়ক দিয়া ছাওয়াল জামাই যায় ।।’

হাতেখড়িতেই বাজিমাত করে বৈতল । ধন্য ধন্য করে সবাই । জমিদার যমুনা সিং
পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছে বৈতলের কীর্তন । একক গানের ভিতর তার বিভিন্ন চরিত্রের
অভিনয় দেখে অবাক হয় । আসর শেষে দশ টাকার নোট একটা দেয় । বলে,

--- ইবার শাবণীত চান্দোয়া টাঙাই দিমু । পুরা পুথি পড়বায় রেবা তুমি । পুরা শাবণ মাস
তুমার ।

উপন্যাস

পাঁচিশ

শ্রাবণের ইজারা পেয়েও খুশি নয় বৈতল । বৈতলের আরো চাই, গ্রাস করতে চায় সে যমুনা প্রসাদকে । দুর্গাবতী যে সাধারণ মানবী নয় সে-প্রমাণ তাকে করতে হবে । প্রথম দিন দুর্গাবতীর মূর্তি, জমিদার বাড়িতে শুশ্রূষা ও তার অধিষ্ঠান ভুলতে পারে নি বৈতল । দুর্গাকে বলে কেরামতি দেখাবে, আর লেপাপুছার কাজ করতে হবে না । চা জলখাবারের সেবাদাসী হতে হবে না । দুর্গা বৈতলের মতলব বোঝে নি । জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন রৌদ্রের তাপ বাড়ে, মন্দিরের গায়ে গোবর লেপতে লেপতে দুর্গাবতী অজ্ঞান হয় আবার । এবার আর জমিদার বাড়ির বৈঠকখানায় যাওয়ার অবকাশ দেয়নি বৈতল । মন্দির চাতালেই শুইয়ে রাখে, আর প্রচার করে ভর হওয়ার, মা মনসার ভর । মনসা মন্দিরের চাতালে শুয়ে দুর্গাবতী মনোব্যথায় গায় ডিঙ্গা ডুবানির গান । শ্রাবণ মাসে মনসা গানের প্রস্তুতিতে বৈতল যে সারাদিন একা গান গায় । শুনতে শুনতে দুর্গাবতীর গঁথে যায় । রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে তাই দুঃখের গান গায়,

“একে একে সব ডিঙ্গা ডুবি হইল পাত ।

সব ধন হারিল চান্দের যে আছিল তাত ।

বালিশ বুকুতে ধরি ভাসে সদাগর ।

মরিয়া না মরে, আছে সঙ্করের বর ।।’

ব্যস, এই একটুকরো পয়ার গায় দুর্গাবতী, আর কিছুই না । বৈতলই তিন ঘড়া সোনাদানার গুপ্ত সমাচার জানায় জমিদারকে । এতদিন এক ঘড়ার গল্প প্রচলিত ছিল, তিন ঘড়া শুনে জমিদারও উজ্জীবিত হয় । হয় প্রচার, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আসে ভক্তের দল । পদ্মদিঘীর পশ্চিম কোনে ভেসে উঠবে মৈসামুড়া ডিঙ্গা । আই প্রসন্ন হলেই জমিদারের সিন্দুক ভরে উঠবে নানা ধনে । বৈতলের একান্ত অনুরোধে দুর্গাবতী শুয়ে থাকে ভর হওয়ার সব অঙ্গভঙ্গি করে, এলোচুলে মাথা ঘোরায় এদিক ওদিক ।

এরপর ঠাঠা রোদ্দুরে আর দুর্গাকে উঠোন ঘুরে ঘুরে লেপাপুছার কাজ করতে হয় না । মন্দির পুরোহিত শিবনাথ পণ্ডিতের সহকারিণী হয়ে যায় । এর আগেই তো এক জোড়া লালপেড়ে কোরা শাড়ি পেয়েছে দুর্গাবতী । লালাপাড় শাড়িতে দুর্গাবতীর যৌবনে আগুন লাগে ।

সে-আগুনে পোড়ে যুবা জমিদার যমুনা প্রসাদ সিং । বৈতল আর দুর্গাকে জমিদারের ভিতরবাড়িতে যেতে বারণ করে না । বৈতল পাটনির বৌও সিং জমিদারের গৃহিণীর সখী হয়ে যায় । হয়ে যায় সমকক্ষ । বৈতলও আর দুর্গাবতীর রাশ টেনে রাখে না তেমন । বৈতলও মন দেয় রুটি রোজগারের, ঘরের বাইরে থাকার । নতুন ভেকির খোঁজে বৈতল তাই রিক্সার টিপ বাড়িয়ে দেয় । সন্ধ্যার গাঁজার আসর থেকে উঠেও বাড়ি ফেরে না, অন্য এক আসরে মজিয়ে রাখে নিজেকে । আনারকলির ঘরে গিয়ে নেশা করে । বৈতল জানে তার মন বড় অবোধ, যখন যাকে ধরে তাকে প্রাণপণ আকর্ষণে নিজের দিকে টেনে রাখে । ভাবে দুর্গাবতী চায় একটা সম্মানজনক বৃত্তি । স্বামীর পরিচয় চায় । দুর্গাবতী বলে পূজারী হয়ে যেতে । শিবনাথ পণ্ডিতের সহকারী হলেই চুকে যায় ল্যাঠা । কিন্তু বৈতল যে ভুলতে পারে না তার উত্তরাধিকার তার গাত্রবর্ণ, তার কথা বলার অশিক্ষিত ধরন । কিছুতেই বেরোতে পারবে না, বেরোতে চায় না সে । তাই দুর্গাবতীকে বলে,

--- আমি পারতাম না । আমি মাছ মারতাম আর খাইতাম পারি । ইতা অং বং চং পারতাম না । ইতা সংগোস কিড়িমিড়ি আমার কাম না, ইতা জানইন বাবন পণ্ডিতে । আমি যেতা আমি অতা ।

--- আর আমিও তো অতা । রিক্সা আলাব বউ । আর কিতা । পুয়া পুড়ি অইলে কইব বাপ রিক্সাআলা ।

--- হুনো গো মাই, তুমার খুরো খুরো দণ্ডবং । আমি বাবনও না জমিদারও না । আমি এক মাইমল, পানির পুক, কপাল দুষো রিক্সা চলাইয়ার । গতর খাটাইয়া খাওয়ার কুনু শরম নাই । অখন যদি আমারে পছন না অয়, তুমার পছনর বেটার লগে থাক গিয়া । আমারে ছাড়ি দেও ।

ছাড়াছাড়ির কথা হলেই দুর্গাবতী অভিমানে ফুলে ওঠে, কান্নাকাটি জোড়ে । বৈতল বিব্রত হয় সন্ধি করে । হেরে যায় ।

বৈতল আবার নতুন করে ভাবে । ভুল হলো না ঠিক হলো । দুর্গাবতীর সুখের জন্য একটা আবাস দিতে চেয়েছে বৈতল, সেই দুর্গাকেই কি শেষপর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে । নিজের দোষেই এমন হয় । মেহেরপুর টিলা থেকে এত বড় সাপটা না ধরলেই হত । জমিদারকে ভয় দেখিয়ে আংটি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঠিকই ছিল । কিন্তু বড়লোকের বড় কথায় বড় অসম্মান হয় বৈতলের

। এই লোকটা তো আবার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে, সরাসরি ছোটলোক বলে না তির্যক
কথায় বলে । আর বৈতল রাগে । তার পুকুরের রুই মাছের থেকে ক্ষীণদেহী বলায় বৈতল
রাগে । ক্ষীণদেহের তেজ দেখাতে বদ্ধপরিকর হয় । লোকটা হয়তো কথাটা বলেই ভুলে গেছে
। নিচের তলার মানুষকে অসম্মান করাটাই তাদের স্বভাব ভুলে যাওয়াও স্বভাব । আসলে
বড়লোকের রসিকতা যখন নিচের দিকে ছোট তখন তার মাত্রা থাকে না । তারপর লোকটা
ওকে দেওলা করে রাখার কথাও বলে । হয়তো কৃপাভাজনকে সম্মান দেখাতেই বলা । কিন্তু
বৈতল তো তার কৃপা চায় না, তার সর্বনাশ চায় । হ্যাঁ লোকটা কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে একটা
ফাউও পেয়ে যায় । লাভ হয় তার, দুর্গাবতীকে অধিকার করার স্বপ্ন দেখছে । তবে বৈতল
জানে এত তাড়াতাড়ি দুর্গাবতী তাকে অমান্য করবে না । সাতঘাটের পানি খেয়েছে দুর্গা, দুর্গা
জানে বৈতল দাস রিক্সাওয়ালা ছাড়া অন্য গতি নেই তার ।

যদিও আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তেই বৈতল দুর্গাবতীর ঝগড়াঝাটি বাড়ে । বৈতলের রিক্সা
চালানো নিয়ে দুর্গাবতীর লজ্জা কাটেনি । দুর্গাবতীও বড়লোকের ভাষায় কথা বলে পেঁচিয়ে ।
বলে,

--- ব্রাহ্মণ হইয়া রিক্সা চালাও, লইজ্জা শরম নাই নি ।

তেঁড়া বেঁকা কথায় বৈতল জ্বলে ওঠে তেলেবেগুনে । বলে,

--- কিওর লজ্জা, কিওর শরম । থাকা ভাল পাওয়া ভাল নয় । তুমারে তো কেউ চুরর বৌ
কর না, তে কিওর লইজ্জা । কাম করিয়া খাই । আর শুনি লাও গো মাই, আমি কুন্সু বাবন
উবন নয় কই দিলাম, আমি কৈবর্ত, রিক্সা চালাইলে আমার শরম লাগে না । লইজ্জা তো
আমার, যখন মাইনষে কইব আমি যম জমিদারর ইওর হাই ।

--- ছি । তুমার মুখে কিচ্ছু আটকায় না নানি । জমিদারে অতবড় কাম দিতা চাইলা নিলায় না
এর লাগি কইলাম । কেতুমামা বুড়া অইছইন, কতদিন গাড়ি চালাইতা পারবা ঠিক নাই ।
শিখাইলে এর পরে তো গাড়ি তুমার ।

--- অয়, দানপত্র লেখি দিব নি বেটায় । ইগুরে ছিনছ না, অখন ছিনছে তরে, এর লাগি মিঠা
মাত মাতের গাড়ি দিব কর । গাড়ির ডাইভার বানাইত আমারে । আমারে সামনে রাখিয়া পিছে
বইয়া তুই করতে রাধালীলা, আর আমি দেখতাম । আমি জানি, আমি দেখছি তোর ছিনালামি ।

বৈতল কিছুই দেখেনি একটু বাজিয়ে নেয় শুধু । দুর্গাবতীও সময় বুঝে চুপ মেরে যায় ।
বৈতলকে ধন্দে রাখে । বৈতলও দুর্গাবতীকে বাজে কথা বলে দুঃখিত হয়, দমে যায় । আবার
মন দেয় পাঁচালি গানে । এই করে করে বৈতল প্রস্তুত হয় । শ্রাবণীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত
করে । বই নেই খাতা নেই কিছু নেই, স্মৃতিধর বৈতল গুরুর কণ্ঠ থেকে শুনে শুনে সম্পূর্ণ
পদ্মপুরাণ মুখস্থ শিখেছে । শুধু কি এক কবির লেখা । যে কবির যে টুকু সুন্দর সাজিয়ে
শিখিয়েছেন গুরু, ষষ্ঠীবর দত্ত বংশীদাস বাইশ কবি কালীচরণ জগন্নাথ বিজয় গুপ্ত চৈতন্য চরণ
পাল গুরু সৃষ্টিধর আর বদিওঝার গায়নরীতি মেনে নিজেকে তৈরি করেছে । গুরু বলেন
বদিওঝা তার ওস্তাদ, ওস্তাদের মার হল লাচাড়ি, মানে শ্রোতাকে ধরে রাখা, নাটক করে
দর্শকের মন কাড়া । মিল ছন্দের টানে শ্রোতাকে বিবশ করে দেওয়া, কোথাও কিছু একটা
শ্রুতিমধুর কিন্তু ধরা যাচ্ছে না । কোথাও গানের কথাকে থামিয়ে রেখে, অভিনয় দিয়ে দর্শককে
মোহিত করে দেওয়া । কখনও বিষাদ কখনও উচ্চকিত আনন্দ কখনও বা মৃদু হাসির রেশ
মুখে । গুরু বলেন গানের আসর হলো সাগরের পার হাসি কান্নার ঢেউ আসবে দুলে দুলে,
আসবে উচ্ছ্বাসে । বৈতল যখন গায়,

‘মামী মন কেনে বেজার

আজ বুঝি মামায় বুচি খাইছে না তোমার ।’

বৈতল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, চিনে নেয় শ্রোতা দর্শকের মন । সামনে বসা মানুষের খুশি
দেখে হাঁক দেয় ‘জয় আই বিষহরির জয়’ । গায় আর এক মজাদার দিশা,

‘বুড়া গেল না তোর খাইত

অকারণে হইলে বুড়া দুইপরী ডাকাইত ।’

আবার হাঁক দেয়, ‘শিব হে’ ।

গুরু বলেন,

--- ইতা হক্কলতা পুথিত নাই রেবা । ইতা চালাকি, একলা বকবক করে কে কও চাইন,
আউয়ায় । আসরর বউঝি হক্কলর দি যদি পড়াইতায় না পারলায় তে আর কিওর গাওরা তুমি

। সময় দেওন লাগব, নাইলে শ্বাসকষ্ট হইব, শাসিরগ ফুলি গেলে গাইতায়ও পারতায় নায়
পড়তায়ও পারতায় নায় । এর লাগি তারারে মাতাও মাঝে মাঝে, আর তুমি চুপ করি থাকো ।
মাইনষে যে ভাল কর ই কথা তুমার কানে ছনন লাগব ।

গুরু তো একাই একশ, তাই একক প্রদর্শনীর সুযোগ পায়নি বৈতল, কোনও শিষ্যও তৈরি
করতে পারে নি দোহারকির জন্য । চাতলার দক্ষিণ পারে খিরারতলা গ্রামের কীর্তনিয়া শ্রীহরি
পাটনির খোল করতাল মৃদঙ্গ আর দোহারকির চিকন গলা নিয়ে তৈরি করে তার আইকথার
নতুন নিবেদন । এই এক মাসেই তার পরীক্ষা, তার পরিচয় নবীন শহরে । জমিদার যমুনা
প্রসাদ বলেছে শামিয়ানা টাঙিয়ে দেবে, যতদিন গান হবে ততদিন ভোগ হবে । খিচুড়ি হবে
লাবড়া হবে ডেকচি ডেকচি, ভক্তজনরা প্রসাদ পাবে । বৈতলের জন্যও বিশেষ সম্মান হবে ।
দৈনিক অর্থ বরাদ্দ ত্রিশ টাকা করে, বলেছে যা চাইবে পাবে । বৈতল যা চায় তা দেবে কী
করে যমরাজা । বৈতলের চাহিদা পূরণ করতে পারবে না । তাই বৈতল হাসে । হাসতে
হাসতে বলে,

--- যেতা চাইমু দিবা, আইচ্ছা নিমুনে । যেতা ইচ্ছা যখন জিগাইয়া নিলেও নেওয়া না জিগাইয়া
নিলেও নেওয়া । মনো রাখইন যে ।

বৈতলের আইগানে বিভোর জমিদার হাসে । পুঁথিগায়ক বৈতলের গান শুনতে হরিৎবরণ
ইটখোলা দুধপাতিল থেকে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ এসে জড়ো হয় । গুরমির বেশে নাচে
বৈতল । বৈতলের গাল শ্মশ্রুবিহীন শ্যাম । কিম্পুরুষ নাচের আদর্শ । বৈতলের কণ্ঠেও
পদ্মাবতীর বাস । অধিবাসের দিন বৈতল একটু আনমনা হয় । উত্তেজনা দুর্ভাবনাও হয়,
পারবে তো । একক গানে উৎরে যাবে তো । গুরু সৃষ্টিধরকে স্মরণ করে গুরুর ব্রহ্মা গুরুর
বিষ্ণু গুরুরদেব মহেশ্বরো, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে গুরুকে, নির্দিধায় নিজের নাম উচ্চারণ করে
গুরুর নামে । নবীন গায়ক সৃষ্টিধর ওঝার পুনর্জন্ম হয় হরিৎবরণ মনসামন্দিরে । গুরুর মতো
নির্ভর করে নিজেকে । ভুলে যায় ঘর সংসার । শুরু করে গান । শ্লোক গান দিয়ে হয়
মঙ্গলাচরণ,

‘আস্তিকস্য মুনিমার্তা বাসুকী ভগিনীসুখা ।

জরৎকারু মুনির্পত্নী মনসা দেবী নমোহস্ততে ।’

‘জয় আন্তিক মুনির মা মনসা দেবীর জয়’ এর রব ওঠে মল্লয়া গাছের চারপাশে । গাছের
চারদিক ঘুরে সৃষ্টিধর নামের বৈতল ওঝা করে মনসা বন্দনা । গায়,

‘নম নম ওগো দেবী আন্তিকের আই ।

তোমার চরণ বিনে অন্য গতি নাই ।

সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার ।

সর্প হইয়া কামড় মার উঝা হইয়া ঝাড় ।’

শ্রীহরি পাটনির দোহারকিতে ‘সর্প হইয়া কামড় মার উঝা হইয়া ঝাড়’ হরিৎবরণের
আকাশে বাতাসে শ্রোতার কণ্ঠে মুখরিত হয় । প্রথম দিনেই বৈতল ওঝার নামে জয়ধ্বনি ওঠে,
সৃষ্টিধর ওঝার পোষাকী নাম থেকে বৈতল দাস ওঝা নামটাই ভক্তের প্রিয় হয় । জানিগঞ্জ
বাজার থেকে কেনা নতুন পাগড়ি ঘাগরা সালোয়ার ঘুঙুর আর হাতের সাদা চামরে বৈতলকে
এক ভিন্ন দুনিয়ার নর্তক মনে হয় । নতুন ওঝার গান শুনতে শহরের মান্যগণ্যরাও এক পাক
দিয়ে যান, খুশি হয়ে অনেকে দশ টাকার নোটও দিয়ে যান পুরস্কার । নগদ প্রাপ্তি থেকে
একভাগ বৈতল শ্রীহরিকেও দেয় ।

মনসাপূজার দিন তো এলাহি কাণ্ড । জমিদার হাত উপুড় করে দেয় পূজার জন্য ।
বিলপার থেকে আনা হয় রমণী আচার্যকে করণ্ডি সাজাতে । করণ্ডির পট দিয়ে যায় কর্ণমধুর
ভাদু পাটনি । হেরম্ব ভট্টাচার্য জমিদার বাড়ির কুলপুরোহিত, নিত্যপূজার কাজ চালিয়ে দেন
শিবনাথ পণ্ডিত কিন্তু শ্রাবণীর মর্যাদাই আলাদা । বৃদ্ধ কুলপুরোহিতের ডাক পড়ে, চোখের দৃষ্টি
ক্ষীণ হয়ে এসেছে বৃদ্ধের । নাগপেচ সাজাতে পূজনের বৌ বানিয়ে দেয় পঞ্চবিভূতি । পঞ্চগুণ্ডি
। চাউলতুষ বেলপাতা হলুদ আর আবির । আলাদা আলাদা কটরায় । হেড়ম্ব ঠাকুরের প্রথম
দেখায়ই ভাল লেগেছে দুর্গাকে । বলেন জমিদার গ্রিহিনিকে,

--- বড় লক্ষীমন্ত বৌ পাইছ গো, বড় কামর বেটি ।

বড়বৌরও দুর্গাকে অপছন্দ নয় । জমিদারের বৌ বয়সে প্রবীণা না হলেও সবাই বড় বৌ
বলে । বয়সে দুর্গাবতীর ছোটই হবে এক দুই বছরের । ভেতরবাড়িতে রোজই দেখা হয় কথা
হয় । গায়ের রঙ মাজা হলেও বৈতল যেমন বলেছে । ‘টিকির ছালি’ নয় । গতরের লছন কম

ভারী শরীরে সোনার গয়না খোদাই করা । দুর্গা প্রথমদিকে জোড়হাতে নমস্কার করেছে এখন হাসে । বড় বৌও হাসি দিয়ে প্রধান পুরোহিতের মন্তব্য সমর্থন করে । হেড়ম্ব ঠাকুর এবার দুর্গাবতীকে বলেন,

--- তোর হাতের কাম বড় সুন্দর বেটি, তুই অউ করি দে । নাগপেচ সাজাই দে ।

--- না না ঠাকুর, আমি কেমনে করতাম । আইর যে গুসা, অমঙ্গল আইব ।

--- কিওর অমঙ্গল । আমি তারার কুলপুরোহিত আমি কইয়ার কিচ্ছু অইত নায়, করি দে বেটি । মন দিয়া করিছ, মার আশীর্বাদ পাইবে ।

প্রবীণ পুরুষের সমর্থন পেয়ে দুর্গাবতী নাগপেচ সাজায় মন দিয়ে । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও রক্ষা পায়, এতদিন তো ধ্যাবড়া ধোবড়া ছবি একে নাকাল হয়েছেন । দুর্গাবতীর আঁকা দেখে বৃদ্ধের মুখ খুশিতে ভরে ওঠে আবার ।

বৈতলের এসব আদিখ্যেতা পছন্দ হয় না । দুর্গাবতী বলে,

--- ইতা কিতা । ইখান থাকি এনে, হিখান থাকি হেনে না আনলে কিতা অইত নায় নি আইর পূজা । পূজা থাকি ই আড়ম্বর বড়, খালি বড়লুকি দেখানি । করণ্ডি নাগপেচ ইতা এমন কিতা পণ্ডিতর কাম । আমরার গাউত ইতা গাউআলা মাইনষেউ করছইন ।

দুর্গাবতীর ব্রাহ্মণমন বৈতলকে সমর্থন করে না । বলে,

--- না, আচার্যি ঠাকুর না আইলে অইত নায়, ভটবাবন না আইলে অইত নায় করণ্ডি । মা মনসার হক্কলে ডরাইন ।

--- কেনে ভট বাবন কিতা গাছর গুটা নি । না আইলে অইত নায় । আর আই বেটি কুন্সু বাবনর সম্পত্তি নি, মাছুয়া মাইমল চাড়াল নাগার্চি হক্কলর আই, তুমরা যারারে কও ছুটলুক তারার মা । বাবনে কিতা করতা ইনো । আর কাকাবাবুয়ে কিতা কইছইন জানোনি । তাইনও তো ভটবাবন । কইছইন জন্মর সময় কেউর মাখাত লেখা থাকে না ভট আর পাটনি, হিন্দু আর মুসলমান । ই জমিদার ইগুয়ে মানুষরে মানুষ মানে না ।

--- মানুষ তো মানুষ অউ । কিন্তু বাবনর পুড়ি বাবন অউ হয়, মাইমলর পুত মাইমল, তুমার লাখান ।

--- কালা, নানি । গাত গন্ধ আইছলা গন্ধ । শ্রাবণ মাস যাউক তারপরে দেখাইয়ার তোর জিলকানি । বার করিয়ার বাবনাকি । জমিদারনী অইতে, নানি । তোর তেল কীলা বারকরন লাগে দেখাইয়ার । বাঙাল অই যাইমু । মুসলমান অইলে আর ভট থাকে না, শর্মা থাকে না, পাটনি থাকে না । সব অই খোদার বান্দা ।

--- বাক্সাউতো হিকছ দেখি । মন্দিরো বইয়া ইতা না মাতিয়া মজিদো যাও । ইতা কে হিকার তুমারে, কোন ইমামে ।

--- কেনে লুলা ইমামরে ভুলি গেলায় নি । রুল আমিন বেজ । ইখানো আছে এক বাউি ইমাম, শয়তানের লাউি, দুখু মিয়ারে দেখছ নানি । আমার লগে যে খালি লাগে । আর আছইন একজন, দাতা, মামুপির । তাইন পির উর কিচ্ছু নায়, মাত্তা পারইন না, কিন্তু বড় ভালা মানুষ । মাইনযে কয় তান হাতর মাইর খাইলে বুলে কপাল খুলি যায় । উমা ধুমা মারইন কিল।

ছাব্বিশ

দুর্গাবতী জানে তার স্বামীর অনেক গুণ । গুণের মধ্যে অগুণও বিস্তর । কুপিলক্ষের শিখা হয়ে জ্বলে বৈতলের গুণপনা । শিখা স্থির হলেই হয় বিপত্তি, জরা বাঁধে গুটিগুটি হয় । বৈতলকে সর্বদা অস্থির করে রাখতে হয় । অগুণ নিয়ে চিন্তার অবকাশ দিলেই অশান্তি । দুর্গাবতী তাও রাগে । না বলার কথাও বলে তার উদ্ধারকর্তাকে । ভারে স্বামীসুখ দিতে পারেনি জে-মানুষ তার গুণ থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী । বৈতল কি বুঝতেও পারে না কিছু, নাকি দুর্গাবতী অন্য সুখে বিভোর হয়ে উপেক্ষা করে স্বামীকে । স্ত্রীর উপেক্ষায় শীতলতায় আক্রান্ত হয় । নাকি দুর্গাই হিম হয়ে যায় ক্ষীণদেহী কৃষ্ণকায় মানুষটার সংস্পর্শে । নাকি তার উচ্চবর্ণের অহংকার দূরে সরিয়ে মিলিত হতে পারে না । দুর্গাবতী বৈতলের উপর ভরসা করে আবার বৈতলের নেশা ও পেশাকে অপছন্দ করে । পুঁথি পড়ার প্রশংসা যখন শোনে, গর্বিত হয় । কিন্তু কিম্পুরুষ বেশে নাচকে মেলাতে পারে না । তখন ঘৃণা হয় । দুর্গাবতী ঘর ছেড়ে চলে যায় জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে । সুপুরুষ জমিদার যমুনাপ্রসাদের সুঠাম দেহ দেখে লোভী হয় । প্রলোভনের টোপ দেয় । আঠা লাগিয়ে রাখে এখানে ওখানে, সর্বশরীরে ।

এদিকে, একা ঘরে নিজের বেশভূষা সাজায় বৈতল দাস ওঝা । পুঁথিপড়ার সাজ । মুখে পাউডার ঘষে, চোখে দেয় কাজল । দুর্গাবতী তখন ঘরের কাপড় ছেড়ে পাটভাঙা লালপেড়ে শাড়িটায় কুচি দেয় । আবার খোলে, আবার পরে । কুচি দেওয়া শাড়ি পরে তো আর ঘরের বেড়াকে দেখানো যায় না, আদর করা যায় না । তাই দুর্গাবতী আবার খোলে, আটপৌরে করে পরে । বৈতল তার সাজগোজ ভুলে এবার দুর্গাকে দেখে । মুগ্ধ চোখে দেখে । দুর্গার চোখে তখন আগুন, বৈতল চোখে চোখ রাখতে ভয় পায় । শরীরটাই দেখে, শরীর দেখে আর আশ মেটে না । বলে,

--- একটা পান বানাই খাওয়াও না । একটু সাদার গুড়া দিও ।

সাদার গুড়ার কথায় বৈতলের মনে পড়ে পুরনো কথা । কালো রঙের ফিঙে পাখিকে বলেছিল এক দুপুরে । বিয়ানিবাজার রইদপুয়ানি গ্রামের গুরুকন্যাকে বলেছিল পান সেজে দিতে, বলেছিল সাদার গুড়া দিতে । সেই সাজা পানও তো হজম হয়নি বৈতলের । সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এল । গুরুদেব চেয়েছিল জামাই করে রাখতে, চায়নার রঙ কালো বলে ফেলে চলে

এল বৈতল । আর দুর্গাবতী তার বিপরীত, পাকা রুই মাছের মতো সোনার বরণ । বৈতলের
বিয়ে না করা বৌ । দুর্গাবতী পান সাজে, খিলি বানিয়ে দেয় বৈতলের হাতে । বৈতলের তখন
মৌতাত ন' আনি দোকানের ছোট আয়নায় কালো ঠোঁটে পানের লাল দেখে । দুর্গাবতীকে বলে,

--- দেখো দেখো, ঠিক ভূষণ উঝার মতো লাগের আমারে । লাগের নি কও ।

করিমগঞ্জের ভূষণ চন্দ্র দাসের মতো উস্তাদ নেই দুজন এই উপত্যকায় । এমনকি সারা
আসামেও । নতুন ওঝাদের প্রেরণা তিনি, গুরুও তিনি । ঝোলা সালোয়ারের উপর মেয়েদের
মতো সাদা জামা, জামার কুচি কোমর থেকে হাঁটুর উপর । কানে দুল । বৈতল আয়না ঘুরিয়ে
ঘুরিয়ে নিজেকে দেখে । দুর্গার চোখের আগুনে নয় আনি আয়না ভেঙে চুরমার হয় । টুকরো
টুকরো ছড়িয়ে পড়ে ঘরময় । দুর্গাবতীর আগুন-ঝরা চোখে তাকাতে পারে না বৈতল । চোখ
বন্ধ করে । দুর্গাবতীর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে বৈতলকে । বলে,

--- চউখ বন্ধ করলে কিতা অইব । চা, চাইয়া দেখ ঘরো, সারা ঘর হাসের । তোর মতো
নিমাই-মুজরা নায়, দেখ দুর্গাবতী হাসের ঝলকাই ঝলকাই হাসের । আয়না হাসের দেখ, দুর্গার
কোমর হাসের, দুর্গার বুক হাসের, পান না খাইয়াউ দুর্গার লাল ঠোঁট হাসের । দেখ বেটা
দুর্গারে লইয়া কেমন খেলের আয়নার টুকরাইনতে । দুর্গার গার গন্ধ বার অর দেখ আয়নার
টুকরাত ।

দুর্গার এমন পাগলিনী বেশ দেখেনি কখনও বৈতল । তাই হতভম্ব হয়ে রয় বৈতল ।
দুর্গাবতী বুকের সেফটিপিন খুলে ভাঙা আয়নার টুকরোয় লাগিয়ে দেয় মৌমাছির হল দুটো দু-
বুকের । আয়নাকে ডাকে,

--- আয় চুকচুক, খা দুর্গারে, আর হউবেটারে ক করণ্ডি সাজাইত, বেটি সাজত । তারে ক,
রিক্সা চলাইত গিয়া । যাচনা বেটা ইখান থাকি, যা জালাল পিরর আড্ডাত গিয়া গাইঞ্জা খা,
নাইলে মউয়ার মালা গিলতে গিলতে যা গিয়া নাগাপট্টি । তোর দৌড় তো জানা আছে ।
ইখানো সালোয়ার জামা পিন্দিয়া গেলে নু মুড়া-হুরইনর বাড়ি খাইবে ।

--- আমি অখন আর রিক্সাআলা নায় । শ্রাবণ মাসো আমি রিক্সা চলাই না, আমার গুরুয়েও
আরি রান্দা ঘষাইতা না । আমি অখন উঝা ।

--- ফালাই থ তোর উঝা । তুই গুরমি, এর লাগি তোরে নাচায় ।

--- আমি গুরমি । আমারে নাচায় । কে নাচায় ।

--- কে আবার, জমিদারে । খেমটা কইলে খেমটা, গুরমি কইলে বেটিন্তর জামা পিন্দিয়া চামর হাতো লইয়া গুরমি ।

--- যম । অউ যম ইগুরেউ আমি গুরমি সাজাইয়া নাচাইয়ার । তুই বুঝতে নায় । ইগু তো ধ্বজভঙ্গ, মনসার অভিশাপে তার বংশত কেউ জন্মায় না, পড়ে বাইচা দিয়া যায়, বাইর থাকি । জানছ না ।

--- জানি জানি, কে ধ্বজভঙ্গ আর কে না সব জানি আমি । বড়বৌর যে বাইচা অইব জানছনি ।

--- অউক না, বাইচা ইগু তার নায় ।

--- তে কার । তোর নি ।

--- আমার লাখান অউ এগু যায় । আমি চিনি, তুইও চিনছ । ভোলারে চিনছ না নি ।

--- যার হউগ্দা খাইরে থাকরে বেটা, তার লগে লাগিছ না বালা অইত নায় কই দিলাম ।
অখনও সময় আছে, ইতা গুরমিগিরি ছাড়িয়া বালা কুনু কাম কর ।

--- আমি গুরমি । আবার কইরে । দেখ দেখ বেটি, দেখ ।

রেগে বৈতল তার সালোয়ারের ফিতে খুলে । দুর্গাবতীর চোখ টেনে দেখায় । বলে,

--- গুরমি অইলে বাপ হয় ।

--- হয়, ভোলা থাকলে হয় ।

যথাকালে যথাসময়ে জমিদার বাড়ির কেন্দ্রে, মানে রাজমহলে, আর প্রান্তে পুকুরপারে বাঁশবেড়ার ঘরে একই সময়ে এক শিশুপুত্র আর শিশুকন্যার জন্ম হয় । রাজার ছেলের রঙ রাজার মতো হয় না রানির মতোও না, হয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । আর পুকুরপারে কালো রাজা বৈতল দাস ওঝার কন্যা হয় গৌরাস্তী । নিজে উত্তরাধিকার, পুত্রসন্তানের জন্ম হওয়ায় জমিদার

যমুনাপ্রসাদের প্রাণে টগবগে ফুটি । বৈতলের মনের আনন্দও আর ধরে না । দুজনেই খুশিতে সাময়িক যুদ্ধবিরতি মেনে নেয় । জমিদার বৈতলকে বলে,

--- চলো বা উঝা, দেখি আই তুমার কইন্যা ।

বৈতল কুঁড়েঘর আলো করা তার মেয়ে আর মেয়ের মাকে দেখে গর্বিত দৃষ্টিতে । জমিদারও দেখে নবজাতক আর তার জননীকে । মুখে ঝলমলে আনন্দ । পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে সোনার হার, লকেটে আই মনসার পট । বৈতলের মেয়ের বুকের উপর রাখে হার ।

বৈতল খালি হাতেই মেয়ের মুখ দেখে । সোনার হার উঠিয়ে দেয় মেয়ের মাকে । দুর্গাবতীর মুখে প্রশান্ত হাসি, গরবিনীর দৃষ্টি তার দিকে নয়, জমিদারের দিকে অহংকারী চোখ । বৈতলও যুদ্ধবিরতি উঠিয়ে নেয় তৎক্ষণাৎ । মেয়ের মুখ খুঁটিয়ে দেখে । তার কালো রঙের আভাস খোঁজে মেয়ে মুখে । কোথাও পায় না । তবু বড় মায়া হয় । এক চুম্বনে মেয়েকে কাছে টেনে নেয় । বলে,

--- আমার পুড়ি । আমার সোনা ।

জমিদার বলে,

--- উঝা মেয়ে সন্তান রেবা, তুমি বড় ভাগ্যবান ।

বৈতল ভেবে পায় না তার সৌভাগ্য কেন টাটায় মানুষটাকে । চুপ করে থাকে । মুখের উপর সোনার হারটা ফেরত দেওয়া যায় কিনা ভাবে । সোনার আংটি যখন নিয়েছিল, নিয়েছিল কেড়ে তার পরাক্রমে । সে নেওয়ায় কোনও দয়া নেই, তার দায়ও নেই ফিরিয়ে দেওয়ার । কিন্তু তার মেয়েকে কেন দেবে দামি উপহার । রোষের দৃষ্টিতে দেখে যম সিংকে । যমুনা প্রসাদ হাসে । বৈতল নিশ্চিত হয়, যাক এখন পর্যন্ত যুদ্ধটা তার একার । জমিদার জানে না তার আক্রোশকথা । পুত্রসন্তান গর্বে গর্বিত পিতা হয় কল্পতরু, যেন বৈতল যা চাইবে সবই দেবে সে । প্রথমে দেয় বন্ধুত্ব । বৈতলের কাঁধে হাত রেখে বলে,

--- মাইয়ার কিতা নাম রাখতায় । ঠিক করছনি কিছু ।

--- গরিবর পুড়ির আবার নাম । আমার নাম যেলা বৈতল, মিলাইয়া রাখি দিমু নে কিছু ।

--- কিছু কিতা কই লাও ।

--- অউত্ত কইলাম, সোনা ।

--- সোনা তো ডাকনাম কইলায়, ভাল নাম কও ।

বৈতলের নাকের ডগা ফোঁস ফোঁস করে রাগে । তার মেয়ের নাম নিয়ে এত কৌতূহল কেন রাজামানুষের । আর ভাল নাম রাখার তো বিস্তর সময় আছে । মুখভাতের সময় রাখা যাবে ভেবেচিন্তে । তাই রাগের মাথায় বলে,

--- তাইর ভাল নাম রাখমু মরণি ।

--- ইতা কিতা নাম মরত কেনে অত সুন্দর বেটি আমরার । তুমি তো জিয়ানির গান গাও রেবা । দেও ভাল দেখি নাম একটা । তুমি তো বাপ ।

--- আমি কিওর বাপ । আপনার অন্তে আছি, অন্তদাতা পিতা আপনে, আপনেউ দেইন নাম ।

--- দিতামনি কও ।

--- দেইন না ।

--- তাইর নাম রাখো তিলোত্তমা । কীরকম নাম রাখলাম কও । তে উবা ঝিয়ারির তো নাম রাখলাম আমি, অখন আমার শ্রীমানর একখান নাম বাছি দেও দেখি । তুমার তো বউত পুথির বিদ্যা ।

--- আমার ইতা চুরি বিদ্যা, গুরুয়ে যেতা শিখাইছইন । আপনার তো রাজপুত্র । কই আপনে আর কই আমি ।

--- কিতা যে কও, অখন আর রাজারাজড়া নাই, জমিদার উমিদার নাই সব সমান ।

--- ইতা কওয়ার লাগি । অখনও আপনার কথাত পানি কাইত হয় ।

--- আমি ইলাখান নায় । আমি মাইনষর লগে থাকি, মাইনষর কাম করি, দেখ নানি ।

--- অয় দেখি । তুমারে যে না চিনছে হে অখনও মার পেটো ।

শেষ কথাটা বৈতল মুখ ফুটে বলে না । বরং কালো রঙের মুখের উপর এক বিকট হাসি বিস্তার করে বলে,

--- আইচ্ছা তে রাজপুত্রর নাম রাখইন চন্দ্রধর ।

জমিদারপুত্র চন্দ্রধর দিনে দিনে বাড়ে । খেলা করে বাড়ির বাহির উঠোনে । উঠোন তো নয়, মাঠই বলা যায় । প্রতিদিন ভোরে দুর্গাবতীর তত্ত্বাবধানে গোবরলেপা করে রাখা হয় । উঠোনের মাঝখানে বিশাল মছয়া গাছটির বয়স কত কেউ জানে না । একশ দেড়শ বছরের কম নয় । সিংহ পরিবারের উপরতলার কেউ বিহার থেকে নিয়ে এসেছে গোত্রচিহ্ন হিসেবে । বংশে বংশে বাড় বেড়েছে, ছেয়ে গেছে বিস্তীর্ণ উঠোনে । শাদা ফুলে ছেয়ে যায় লেপাপুছার খেলার মাঠ । জমিদারতনয় ফুল কুড়িয়ে খেলাচ্ছিলে, মুখে দেয়, হাসে, মুখ বিকৃতিও করে, মুখমিষ্টিও করে । পুকুরপাড়ে বাঁশবেড়ার বাড়িঘরের দাওয়ায় বসে ভিন্নবর্ণের সমবয়স্ক বালিকাটি হাসে । হাসি দেখে বালক ফুলমছয়ার খেলায় ডাকে চিকনবরগী কন্যাকে । হামাগুড়িতে নেমে যায় দুজনেই । খেলতে খেলতে হাতাহাতি, ঝাপটাঝাপটি । কালোররণ রাজকুমার একসময় হাসতে হাসতে হারে । কাঞ্চনবরগী সোনা একা কুড়িয়ে মছয়ার ফুল, বাড়ি নিয়ে যায় । মাকে দেয়, মা দুর্গাবতী ফুলের মালা গাঁথে শুঁকোতে দেয় শনের চালে ।

জীবনের জটিলতা পছন্দ করে না বৈতল, আবার সেই জটিলতাই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে । বৈতল শিশু চন্দ্রধরকে ভালবাসে যেমন বাসে তার হৃদয়ের মণি সোনাকে । আবার চাঁদুর পিতৃপরিচয় তাকে বিব্রত করে । শয়তান মানুষটা, যাকে বৈতল প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই শত্রু ভেবে এসেছে । তার শ্রেণীগত বিভেদ ছিল শুরুতে যখন তার ক্ষীণদেহ নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছে । তারপর রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার অনৈতিকতা যার নষ্টামির জন্যও ক্ষমা করেনি বৈতল । সে তক্কে তক্কে আছে , সুযোগের অপেক্ষায় আছে, ঝাড়বংশে ধ্বংস করবে সে জমিদারকে । চাঁদুও তো সেই ঝাড়েরই বাঁশ, কিন্তু বৈতল নিষ্পাপ শিশুর হাসির কাছে পরাস্ত হয় । চন্দ্রধর যে তার প্রাণের পুতুলি সোনামনির খেলার সাথি । বৈতল মেয়ের জন্য অনেক কিছুই সমঝোতা করেছে । যমুনাপ্রসাদ দুম করে মেয়েটার নাম রেখে দেয় তিলোত্তমা । না করতে পারেনি বৈতল, উচ্চবর্ণের জমিদার আর ব্রাহ্মণকন্যা দুর্গাবতীর যোগসাজসেই এমন একটা নাম রাখা হয় যার অর্থই জানে না বৈতল । মরণি নামটা কিন্তু সে স্নেহভরেই রাখতে চেয়েছে । শহুরে মানুষটা উল্টো অর্থ করে তার গালমন্দ করে,

দুর্গাবতীও বিরজা হয় । মরণি নামের মধ্যে যে কী অন্যায় সে জানে না । বইয়াখাউরিতে অনেক মেয়ের নামই মরণি । বৈতলও মেয়েকে মরণজয়ী করতে নাম রেখেছে । কালাচাঁদ কাকার মেয়ের নাম মরণি, ভুতুকাকার মেয়ের নাম মরণি, মঞ্জুকাকার ছেলেমেয়ে হয় বাঁচে না, শেষমেষ মরণিটাই বাঁচে । তার সোনামনিও বাঁচবে বলেই বাপের আদর । তিলোত্তমা নামটিও ভাল বলেছে দুর্গাবতী । তবু বৈতলের মনের ভিতর একটা কষ্ট থেকেই যায়, নতুন মা হওয়ার কৃতিত্বটা দুর্গাবতী একাই উপভোগ করছে আঁতুড়ঘরে । বৈতলের সঙ্গে ভাগ করেনি । বরং যমুনাপ্রসাদের সব কথায়ই মুচকি হাসির সমর্থন দিয়েছে । দুর্গাবতীর সমর্থন পেয়েই জমিদারের এই হঠাৎ উদারতা, সোনার লকেটসহ হার, মেয়ের নামকরণ বৈতলকে হারিয়ে । হারেনি বৈতল, সাপের মতো অনিষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এই যমসর্পের বংশধর, তাই নাম রেখেছে চন্দ্রধর । বৈতল এও জানে, ক্ষত্রিয় রাজা বৈতলের জাতিপরিচয় না জেনেই তার দেওয়া নাম নিয়েছে । বৈতল পাটনির নয়, শর্মা ব্রাহ্মণের নামকরণের অধিকার আছে বলেই নিয়েছে । আর সুযোগ বুঝে বৈতলও তার বদলা নিয়েছে চন্দ্রধরের আসল পরিচয় যে ‘পশুসোয়া নামেতে তপস্বী শূদ্রজাতি ।’ চন্দ্রধরের জন্মের সঙ্গে রত্নাকার দস্যুর বাল্মীকি হয়ে ওঠার মিল অনেক । দুজনেই শূদ্রজাতির সাধু । দুজনেই পাখির দুর্দশায় কাতর হয়ে নবীনজীবন সাজিয়েছেন । অমিলও আছে বিস্তর, বাল্মীকি কবি হয়েছেন, রামায়ণ গান লিখেছেন । চন্দ্রধরের জন্যই না পদ্মপুরাণ মহাপাঁচালি । তবে চন্দ্রধর একা এক মহাবীর, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইএ নেতৃত্ব দিয়েছেন, লড়েছেন একাও । ‘মনসারে নাগে ধরি পক্ষীর ছানা খায়’ এ অন্যায় তিনি মানতে পারেন নি তাই তখনই প্রতিজ্ঞা করেন ‘পুনরায় জন্মিব আমি সাপের বৈরী হইয়া ।’ যেমন বলা তেমন কাজ, ইচ্ছামৃত্যুর পর চম্পকনগরে কোটীশ্বর রাজার ছেলে হয়ে জন্ম এবং আজীবন খল দ্রুর সাপের সঙ্গে, সাপের নেত্রী মনসা দেবীর সঙ্গে শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হওয়া । এক আতান্তরের জীবন, কিন্তু সত্যের মুখে অবিচল । বৈতল ও দৈত্যকুলের এই প্রহ্লাদকে নামের মধ্যে বিদ্রোহের গোত্রচিহ্ন পরিয়ে দেয় ।

যতই কেন বৈতল জমিদারপুত্রের নাম তার নায়ক চন্দ্রধরের নামে রাখুক, হিংসা ভুলতে পারে না । ভুলতে পারে না একসময়ে জন্মে চন্দ্রধরে অতুল বৈভব আর তার কন্যার

কেন শূন্য উত্তরাধিকার । বাঁশবেড়ার এক কুঁড়েঘর , তাও চন্দ্রধরের বাপের দয়ার দান ।
জন্মসূত্রের এই অসাম্য মানতে পারে নয়া বৈতল ।

সোনামনির বয়স যখন তিন, চন্দ্রধর রাজকুমারের একটি দাঁত ভাঙে উপরের পাটির ।
বৈতল জানে দুধদাঁত ভাঙেই । জমিদার বলে, না, হেড়ম্ব জেঠাকে ডাকতে হবে । তিনি যে
কুলপুরোহিত, তিনি যে বিধান দেবেন তা-ই মানতে হবে । জমিদার বাড়ির পুরোহিত কিন্তু
কোনোদিন গাড়ি চড়েন না, সেই বিলপার থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসেন বৃদ্ধ । দাঁত তুলে রাখা
হয়েছে কাঁচের বয়ামে । ফেলা হবে না রাখা হবে তার বিধান চাই । পুরোহিত বলেন,
--- তলর না উপরর ।

মা এবং বাবা, জমিদার ও জমিদারগৃহিণী দুজনেই হতভম্ব । নিচের না উপরের পাটির । সে
তো খেয়াল করেনি কেউ । আতুপুতু মাতা পিতা জেনেও মনে করতে পারে না । সামনে থেকে
বৈতল বলে,

--- আমি জানি উপরর ।

জমিদার এবং বৃদ্ধ পুরোহিত বৈতলের দিকে তাকায় । এত জটিল একটা বিষয়ের সহজ
সমাধান যেন কেউ মেনে নিতে পারেনি । একটু হাঁকডাক ছুটোছুটি জমিদার তনয়কে নিয়ে
আসা তারপর সরেজমিন দাঁতশূন্য মুখগহ্বর দেখে না সিদ্ধান্ত । তাই বিরক্ত পুরোহিত অবজ্ঞার
দৃষ্টিতে বৈতলকে দেখে বলেন,

--- তুমি কেমনে দেখলায় রেবা ।

--- এ, ই তো হক্কেলেউ দেখছইন । বড় বউএ দেখছইন, জমিদারে দেখছইন, কী জানি কিতা
অই গেল ভাবিয়া ডরাই গেছইন । রাজবাড়ির কাণ্ড তো, ছুট অইলে কেমনে অইব । আপনে
আইছইন, অখন কইন কিতা করন লাগব ।

--- অয়, কিচ্ছু তো করন লাগব । তলো চালো, তলর অইলে চালো ফালানি লাগব, আর
উপরর অইলে দুপো । দুর্বাঘাসর উপরে ফালানি লাগব । তে তার আগে চন্দ্রধর বাবাজিরে
একবার ডাকো, ডাকিয়া দেখিলাও কিতা অইছে ।

এই তো বৃত্তান্ত দাঁত ভাঙার । বৈতল আদিখ্যেতা দেখে বিরক্ত হয় । দুর্গাবতীকে বলে,

--- ইতা কিতা আদিলকামি, আমার পুড়ির ওত্তো দাঁত পড়েছে এর লাগি নি বাবন ডাকাইছি, বইয়ম কিনছি, না আউতাশ করছি । মাইগ্গো মাই, পয়সা থাকলে হ্নছি মাইনষে বেঙরও হেঙ্গা দেয়, বাইচ্চার দাঁত পড়া নিয়া ইতা দেখছনি না বাপর জন্মত ।

--- তারার পুয়ার দাঁত ভাঙছে তারা করছে । করউক, তারার পয়সা আছে । তুমি মাততায় গেলায় কেনে ।

--- আমার গুসা উঠি গেলো । পুয়া ইগুরে জান নি এর লাগি আদর করতাম পারি না ।

--- কের লাগি ।

--- অউ যে তার বাপর বড়লোকি আর শয়তানি । বুড়া বাবনরে অউ বিলপার থাকি হাটাই আনল । তাইন গাড়ি চড়ইন না ঠিক আছে, একবার তো কইত পারত, তান ওতো বয়স অইছে নানি । লুতুর বুড়া ।

--- ইতা বাদ দেও । তারার তা তারা বুঝবা । তে তাইন তো তুমার পুড়িরেও আদর করইন । রুজ একবার দেখিয়া যাইন ।

--- অই বেটি, তাইন কিতা রে, তাইন কিতা তর তাইন নি । আর বেটায় কেনে রুজ দেখিয়া যাইত । তার পুড়িনি ।

সাতাশ

বৈতল ইদানীং খেয়াল করেছে দুর্গাবতীর পরিবর্তন । বৈতল সবসময়ই দুর্গাবতীর বুদ্ধি ও পরামর্শর উপর জোর দেয় । যমুনা জমিদারকে প্রথম দর্শনেই দুর্গাবতী বাতিল করে দেয়, বলে লোকটার চোখের দৃষ্টি ভাল না । আসতে চায়নি হরিৎবরণ । বৈতলের জারিজুরিতে এসেও খুব অস্বস্তিতে কাটিয়েছে । তারপর মূর্ছা যাওয়ার পর কী যে হয় কে জানে, বৈঠকখানা থেকে অন্তরমহল ঘুরতে ঘুরতে দুর্গাবতীও ঘুরে গেল কালীবাড়ির চর থেকে অন্নপূর্ণা ঘাট । একেবারে উল্টো । এখন তো জমিদার কিংবা জমিদারবাড়ি সংক্রান্ত কোনও কথা উঠলে আর বৈতলকে সমর্থন করে না । ঐ শয়তান লোকটার পক্ষ নেয় । আর তখনই বৈতল দুর্গাবতীকে তুইতুকারি করে, যা নয় তা-ই বলে । দুর্গাবতীর শুকিয়ে রাখা মল্লয়ার মালা ছিঁড়ে মুখে দেয় । একটা খায় দুটো খায় তিনটে খায়, নেশার মৌতাত এলে রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাতের খেপ খাটতে । গীতশ্রী থেকে সেকেন্ড শো এর প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফেরা । নতুনপটি ঢাকাইপটি আর আঁঠুপটি আর ইটখোলা হলে চোখের ইশারায় বলবে উঠে যেতে । অন্যদিকের যাত্রী হলে ‘যাইতাম নায়’ পর্যন্ত বলে না, নির্বিকার বসে থাকে গাছতলায় রাজার মতো । মিরতিঙ্গার পাটপাথরের রাজা হয়ে বসে থাকে । বৈতল তার মর্জির মালিক, সওয়ারি ঠিক করে সে নিজে, যাকে তাকে ওঠায় না । সন্ধ্যার পর কোনও মেয়ে প্যাসেঞ্জার নেয় না । ইদানীং আঁঠুপটির মুখে পিডব্লিউডি কলোনির সামনের রাস্তা বড় শুনসান, গাছগাছালিতে অন্ধকার গাঢ় হয় বেশি, অন্ধকারে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে আর লড়তে চায় না বৈতল । একদিন, শ্যামসুন্দর মঠ থেমে যায় । নড়ে না চড়ে না সামনে এগোয় না, বরং পেছনের দিকে টান । ভূতের ভয় নেই বৈতলের, তবু আচমকা রিক্সার পিছুটানে অবাক হয় বৈতল । বিরক্তি থেকে হাঁক দেয় ‘কিগুরে’ । দুই বৃদ্ধার কণ্ঠেও আতঙ্ক, চিৎকার । রাম নাম জপের মাঝখানে ভূত ভূত ডাক । বৈতল বলে,

--- কিতা করের ভূতে

দুই মহিলার সমবেত উত্তর,

--- গাত হাত দেব ।

--- অ, ইতা গাত হাত দেওরা ভূত নি । অ হালার হলাইনত, উবা বার করিয়ার ভূতভূতি ।

বৈতল ততক্ষণে অন্ধকার ভেদ করে বের করেছে ভূতের পাল ।

তিনটে টিংটিঙে ছোকরা । বৈতলের পরাক্রমে মোটেও ভীত নয়, তাও বৈতলের কালো
পিচ্ছিল হাতের জাপট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে হতাশাও ঝরিয়ে যায় অন্ধকারে । বলে,
--- ইতা বুড়িবে, ছাড়ি দে ।

বান্দর লাঠি, ছাতনি আর শিরিষ গাছের ঘন অন্ধকারে ভূত ধরার বিস্তর চেষ্টা করেছে বৈতল
কয়েকবার । ফাঁদ পেতে ধরতে চেয়েছে । দুর্গাবতীকে নিয়ে সেকেন্ড শো সিনেমায় গেছে,
ফিরেছে ফুরফুরিয়ে, নতুনপাট পেরোতেই চকিত থেকেছে, কোনও উৎপাত হয়নি । কিন্তু
বৈতল ছাড়বার পাত্র নয়, মেয়েশিকারি তিন ভূতকে ধরার নেশায় দুর্গাবতীকে নিয়ে রোজ
একবার বেরিয়েছে । দুর্গাবতীর মন্দ লাগেনি, যদিও জানে এ কোনও প্রেম ভালবাসা নয়, জ্যান্ত
ভূতকে ধরার ভূতে পেয়েছে তাকে । নেশা শেষ হলেই শেষ । তাই বলে,

--- আমি কুন্সু জির নি । বরির আগাত লাগাই ছাড়ি দিলায় হুকনা পানিত । তুমার রিক্সা আর
আটকাইত নায় পুয়াইনতে । আমারেও তারা বুড়ি ভাবের ।

--- ভাবলেউ অইল, দাঁত চাপাটি নু ভাগি লাইমু ভুতর । তুমি অইলায় আমার আনারকলি ।

--- অয়, তুমি যে খুঙা, অখন কইবায় আনারকলি, গুসা অইলেউ বেটির হুরইন বাড়ি । ইতা
আমি জানি ।

--- কিতা জানছ বেটি । আমি এমনে নি গাইল্লাই, গাইল্লানির কাম করছ এর লাগি । হি যম
জমিদার ইগু তর কিতা । কেতুমামারে আমরা অত মানি । বুড়া ড্রাইভার, আমরা অত ভাল
পাইন, তান পিছে বইয়া তুই বেটি হিগুর লগে কিতা করছ ।

--- কেতুমামায় কইছইন নি ।

--- তাইন কইতা কেনে । ধর্মাআ মানুষ । মাইনষে কয়, সবেউ দেখের নানি ।

--- তে তো তুমিও জানো, হক্লেউ যখন জানে কিতা করি ।

বৈতলও জানে । বৈতল অসম্মতি জানায়নি কারণ বৈতল জানে দুর্গাবতী এমন কোনও কাজ
করবে না যাতে দুর্নাম রটে । বৈতলের ভয় এই হিসেবি দুর্গাবতীকে । হিসেব করে সে
বৈতলকেও ঠকাচ্ছে না তো । দুর্গাবতী জমিদারের গাড়ি চড়ে । কেতুমামা ড্রাইভারের পিছনে

বসে চন্দ্রধরকে নিয়ে যায় সাপনালায় । আর চন্দ্রধর তো একা যায় না, খেলার সাথি তিলোত্তমা, বৈতলের প্রাণের পুতুলি সোনাও যায় সঙ্গে । দুর্গাবতী বৈতলের সম্মতি নিয়েই রাজি হয়েছে । বৈতল খুশি মনেই সম্মতি দিয়েছে, খুশি হবে না – ই বা কেন । স্ত্রী কন্যার সুখে যে তারও সুখ । রিক্সাওয়ালার বৌ দুর্গাবতীর রিক্সা চড়ায় ঘোর অনিচ্ছা, বৈতলের রিক্সায় উঠলে সিটিয়ে থাকে, হুড তুলে দেয় । ভালই তো এবারের প্রস্তাব এক লাফে চারচাকা । বৈতল সব পারে, দুর্গাবতীর জন্য সব পারে । দুর্গাবতীর সুখের জন্য সে ভুলও করে । চিন্তাভাবনার সময় পায় না, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখে না । শহরে তো চারখানা মাত্র কালো গাড়ি, একখানায় চড়ে যাবে তার বৌ, নরসিং ইন্স্কুলের মোড় থেকে লুকিয়ে দেখতেও সুখ । কেমন রাজরানীর মতো দুই বাচ্চার মাঝখানে যেন রাণিমা । বেশ কিছুদিন তো এরকম দুর্লভ দৃশ্য উপভোগ করেছে বৈতল । এর পরে তো বৈতলের কাটা খালে কুমির এল । আর সাপনালায় যায় না কেতুমামা । তবে কোথায় যায় । বৈতলের অবসরের সময় শেষ হয়, আর লুকিয়ে লুকিয়ে বৌ দেখা নয়, শিশুর খেলা নয় । বৈতল এবার ট্রিপে যায় । যায় সদরঘাট যায় জানিগঞ্জ কালিবাড়ি ফাটকবাজার গোপালগঞ্জ চামড়াগোদাম । ইন্সটিশনের পেসেঞ্জার নিয়ে ফেরার পথে কালোগাড়ির মুখোমুখি হয় ট্রাক্কর োড়ে । কেতুমামাই চালাচ্ছে গাড়ি । দুর্গাবতীও মাঝখানে বসা, আর একদিকে দুই বাচ্চা একদিকে সাদা পাজামা সার্টের যমুনা জমিদার । কেতুমামা গাড়ি জোরে চালায় না, অনেকক্ষণ মুখোমুখি আরোহীরা কেউ খেয়ালই করেনি বৈতলকে, এমন মশগুল । বৈতল অবাক হয় বসার ধরন দেখে, এ কেমন বসা । বাচ্চা দুটোকে মাঝখানে রেখে ওরা দুজন দুদিকে বসতে পারে । তাহলে যে গায়ে গা লাগানো যায় না । বাচ্চা দুটো পরস্পরের সঙ্গে বকবক করেই যাচ্ছে । বৈতলের সোনামনিটাই ছটফটে বেশি, খেলার সঙ্গী পেয়ে বাপকে ভুলেছে । বাপের শেখানো বুলিই হয়তো বন্ধুকে শেখাচ্ছে, শোনাচ্ছে ছড়া । ঘুঙ্গিঘুঙ্গি খেলার বিবরণ । দুপায়ের উপর মেয়েকে বসিয়ে দোল খাওয়ানোর নাম ঘুঙ্গি । ঘুঙ্গিরে ঘুঙ্গি তোর বাড়ি কৈ । দুল দুল দুলনি রাঙা মাথায় চিরুণি, বা ঘুঙ্গিতে বসিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলার ছড়ায়ও বৈতলের গলা দোলে, হেট্ ঘোড়া বদরপুর, মঙ্গলবাজার কতদূর । বৈতলের মেয়ের সবচে মজার খেলা হল গু খাওয়ার ছড়া,

‘একখান কথা,

কী কথা ।

বেঙের মাথা ।

কী বেঙ ।

ঘাড় বেঙ ।

কী ঘাড় ।

বাবন গরু ।

কী বাবন ।

ভট বাবন ।

কী ভট ।

গুয়া কট ।

কী গুয়া ।

ছাও গুয়া ।

কী ছাও ।

গু খাও ।’

শেষ লাইন গুনলেই মেয়ের খিলখিল হাসি । আর দুর্গাবতীর বকাবকি মেয়েকে খারাপ কথা শেখানোর জন্য । বৈতল ভেবে পায় না কিসে খারাপ কথা হয় আর হয় না । ভদ্রলোকের সমাজের সঙ্গে মেলাতে তার বড় কষ্ট হয় । দুর্গাবতী এখন যে খারাপ কাজটা করেছে, তার বেলা । তাকে কী বলেছে সে যমুনার সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোবে গাড়িতে । বৈতলের মনটা খিচড়ে যায় । বৈতল সওয়ারির সঙ্গে ঝগড়া করে বলে আর যাবে না । অন্য রিক্সা ধরে নিতে বলে । কারণ চেন খুলে গেছে, সে অনেক কেরামতি আছে তার । উল্টো প্যাডেল দিয়ে আঙুলের ঠেলা দিলেই চেইন নেমে যায় । বৈতলও নেমে যায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে । আজকের ট্রিপ শেষ আর সওয়ারি নেবে না । একটু সময় বসবে মাঠে, ঘাসের গায়ে হাত বুলোবে, দুঃখ বেশি হলে মুখ ঘষবে । হিসেব নিকেশ করবে, সব দোষের বোঝা চাপাবে যম সিং-এর ঘাড়ে ।

তারপর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলেই যাবে নাগাপট্টি । আজকে আর দুর্গাসঙ্গ নয়, তার আনারকলি
আজ পরপুরুষের তাই বৈতলও যাবে মধুবালার কাছে ।

বৈতল পিয়াইন নদীর উদ্দাম জলোচ্ছ্বাসের রাতের কথা মনে, একা কুমারী কন্যা
দুর্গাবতীর অসহায় মুখটাকে মনে করে । লুলা, বৈতলের বন্ধু রুল আমিন বেজ এর হাত থেকে
দুর্গাবতীকে রক্ষা করার পর বৈতলকে জড়িয়ে ধরার কথা মনে করে । অবিশ্রাম জলে-ভেজা
দুটি মানুষের জড়াজড়িতে আজন্মের বন্ধন সূচিত হয়েছে ভেবেছে বৈতল । খুনের আসামী
অনিশ্চয় মাথায় নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে স্বদেশ ছেড়ে নতুন দেশের উদ্দেশ্য রওয়ানা দেয়,
নতুন জীবনের স্বপ্নও দেখে সেদিন বৈতল । সেদিনের দুর্গাবতীর সঙ্গে আজকের দুর্গাবতীকে
মেলাতে বড় কষ্ট । বৈতল ভাবে বড় দ্রুত, যা তার নয় তার পিছনে ছুটেও চায় না, কিন্তু
মেয়ে তো তার । মেয়েকে নিয়েই বাঁচবে এবার । বৈতল তাই কিছুতেই শিশুমুখ সরাতে পারে
না মেঘলা মনের আকাশ থেকে । একা একা হাসে, ঝলমলিয়ে ওঠে মন । বৈতলের বাপ ছড়া
শেখায়নি, তার বাপ উদ্যম বুকে উঠিয়ে বৈতলের সঙ্গে খেলা করেনি কখনও । বরং সেই শিশু
বয়স থেকেই বাপ বৈতলের সঙ্গে লড়াই লড়ত । জলে নামিয়ে হাবুডুবু খাওয়ানোতেই ছিল
বাপের সুখ, আনন্দ । আর বৈতলও বাপকে অমান্য করেনি কখনও । বাপ যখনই বলেছে,
'হেই বৈতল পানিত লাম' বৈতল নেমে গেছে । মাছের খলই এ কেউটের বাচ্চা ভরে দিয়েছে ।
বৈতল ভয় পায়নি, উঠিয়ে ফেলে দিয়েছে জলে । শৈশব তাই মায়ের বুকটাই ছিল বৈতলের
খেলার মাঠ, মা সুর করে ছড়া কাটে 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে', আর বৈতল
খিলখিলিয়ে হাসে । মা তাকে ঘুঙ্গি থেকে ফেলে দেয় একপাশে, বলে,

--- ক, দুধহালো যাইতে না গুহালো যাইতে ।

মায়ের বাঁদিকে কখনও পড়তে চায় না বৈতল, মা বলেছে বাঁদিকে দুধ নেই । তাই বাঁদিকে
হেলে পড়লেও মায়ের শাড়ি-জড়ানো হাঁটু জোর করে জড়িয়ে ধরে । মায়ের কথা মনে পড়ে
বৈতলের । বৈতল মাকে ডাকে,

--- মা, মাগো ।

বৈতল মাকে আশ্বস্ত করে, তার মেয়েকেও সে ঘুঙ্গিতে জড়িয়ে রাখবে । পড়তে দেবে
গুহালে । বড় তুফান যাই আসুক বৈতল তার সোনামনিকে ছেড়ে দেবে না কাউকে । এমনকি

দুর্গাবতীকেও না । আবার বৈতল দুভাগ হয়, দুর্গাবতী নিয়ে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ।
বৈতল তো জানে দুর্গাবতী মায়ের মতো মা । জমিদারের সঙ্গে লেটপেট এর একটা আভাস
থাকলেও মেয়ে তার প্রাণের টুকরো । সন্তানকে চোখে হারায় দুর্গাবতী । সামান্য সর্দিজ্বর
হলেও অমঙ্গল ভাবনায় কেঁদে ভাসায় মা দুর্গাবতী । তখন আর ধর্মধর্ম ভেদ থাকে না,
মামুপিরের কাছে ছুটে যায় । মামু তো কিছুই দেয় না অলৌকিক পিরদের মতো, সোনামনিকে
ভালবাসে বৈতল দুর্গার মতো, একা একা কাঁদে পির । দুর্গ ভাবে দোয়া হল । দুর্গাবতী যায়
ভৈরববাড়ি । হতে দেয়, পূজারী ব্রাহ্মণ একটা জবাফুল হাতে দিলে শান্তি । বৈতল দুর্গাবতীর
পাগলামি দেখে হাসে । দুর্গাবতী বলে,

--- কিতা করতাম কও, মা নু । আপদে মাই, বিপদে মাই, মাই ছাড়া আর কেউ নাই ।

--- কেনে বাপ কিতা ।

--- বাপ তালই ।

--- অ, তে আমার কাম শেষ নানি, যাইতাম গি ।

--- কই যাইতায় । ইতা এক কথার কথা কইলাম । তুমার লগে অখন ঢঙও করা যায় না ।
নাকর আগাত ধানুমরিচ ।

মেয়ের অধিকার নিয়ে এরকম কথার কথা বলে দুর্গাবতী । যেন মেয়ে তার একার ।
মেয়ে মানুষ করা নিয়ে যমপ্রসাদের কথাও মান্য করে । তা হলে কি দুখুর কথাই ঠিক, সোনা
বৈতলের মেয়ে নয় । হারামজাদা জমিদার কেন এত অধিকার ফলায় । সোনা নামে ডাকে না,
তিলোত্তমা ডাকে । চন্দ্রধরের সমান অধিকার দেয় । নিজের বাড়ি ছেড়ে যায় রামনগর
বাগানবাড়িতে । ওখানে তো কেউ থাকে না এক পাহারাদার রায়ত ছাড়া । জমিদারের বৌ
পর্যন্ত যায়নি কোনোদিন । কালো বৌকে নিয়ে জমিদার যায় না কোথাও । দুর্গাবতীও তো
যেতে চায় না কোথাও কালো বৈতলের সঙ্গে । ধলা দুর্গাবতী ধলা যমুনার সঙ্গী হয়ে যায়,
কেতুমামা দেখে সব, বলে না কিছু । কিন্তু বৈতল মুখ বুজে থাকবে না, বৈতল দুর্গাবতীর কাছে
জানবে সব । বর্ডার পার করে নিয়ে এসে অনেক দুর্ভোগ ভুগেছে, প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে মেরেছে
দুর্গার জন্য । এবার নয় একই অপরাধে যমুনা সিংকে মারবে । তার আগে বৈতল
নিশ্চিত হতে চায়, ধারণার বশে দুর্গাকে অপরাধী করবে না । যমকে নিয়ে বৈতলের কোনও

দ্বিধা নেই । তাকে শাস্তি পেতেই হবে । শুধু দুর্গাবতীর রঙ ঢঙ দেখে বৈতল বিচলিত হয়,
মাস্টারের বাড়ির মেয়েদের মতো মাথার উপর খোপা বাঁধে, ঘরের ভিতরও কুচি দিয়ে শাড়ি
পরে । ঘরের ভিতর এখন শুধু বৈতল থাকে না, মেয়েকে দেখতে যখন তখন জমিদার ঢুকে
পড়ে বাঁশ বেড়ার ঘরে । যেদিন কালো গাড়ির বেড়ানো থেকে ফিরতে দেরি হয়, রাত হয়,
সেদিন বৈতলের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে । দুর্গাবতীকে বলে,

--- আমি যাইমুগি ।

--- কই যাইতায় ।

--- আমি আবার বইয়াখাউরি যাইমুগি । জৈন্তার পাড়ো পাড়ো ঘুরমু, পিয়াইনর পানিত খেপ
মারমু । আমার আর ইতা ভাল লাগের না ।

--- আবার নি মাথা চাড়া দিছে । আবার নি উল্লাদ দশা । তে চল, ইবার আর থাকতাম নায় ।

--- তুমি কই যাইতায়, তুমার তো সব আছে ইনো । ইনো যমর বাড়িত আইয়া তুমি বউত
বাড়ি গেছো । খুব উগ্রচণ্ডী অইছ, খুপা বান্দার কী বাহার, লংলা গাইয়া বেটিনতর লাখান নাচ
হিকছ খুব ।

--- কে নাচার জানো নানি । আমি আইতাম চাইছলাম নি । তুমার নু আউশ, জমিদারর কুটুম
অইতায় । মাছুয়া বেটা বাবন অইতায়, বাবন অইয়া রিক্সা চলাইতায় ।

--- জানি জানি বেটি, ইতা যে কইরে আমি জানি, সব দুষঅউ আমার । তর তো এখন খুব
আল্লাদ, বাত্তি জালাইয়া পাদ্রে । খুব রিঙো উঠচছ, দেখবে নে । হ্নছি লাভুত বডার খুলছে ।
আমার পুড়িয়ে লইয়া আমি যাইয়ার আইজ অউ ।

--- অয়, যাওয়াইমু । পুড়ি । কিওর পুড়ি । পুড়ি আমার । আমার একলার । পুড়ি পুড়ি করিছ
না বেটা, দেখচছ নি পুড়ির রং । মাছুয়ার পুড়ি নায় তাই । গাওর রং দেখিয়া কেউ কইব নি ।

বৈতল চুপ করে থাকে । রাগের মানুষ দুর্গাবতীকে বুঝতে পারে না । এমন রূপ সে
দেখে নি কোনোদিন । এমন সব কথা বলে দুর্গাবতী যা সে কখনও বলে নি, এমন অর্থহীন ।
বৈতল ভাবে, তবে কি দুর্গা তার উপর প্রতিশোধ নিতে চায়, তার উপর অকারণ সন্দেহের
বদলা নিতে চায় । তাই তুইতুকারিও করে, বৈতলকে কষ্ট দেয় । বৈতল ভাবে দাম্পত্য এমন

হয় । জলের উপর ঢিল মারলে ছত্রখান হয় আবার জলতল সমান হয় । দুর্গাবতীর রাগও
তেমন, বেশিক্ষণ থাকে না । জল হয়, কাঁদে । বলে,

--- যাও, লইয়া যাও । আমারেও লইয়া যাও । পুড়ি যেমন তুমার বৌও তুমার । উক্লা যেবায়
যায়, চিলিমও হবায় । তে কইয়ার ছন একখান কথা, গুসা করিও না, তুমি কালা এর লাগি নি
তুমার অত কষ্ট । কষ্ট করিও না, কথাত আছে কালায় ধলায় গৃহবাস, লক্ষী থাকইন বারমাস ।

--- আমার মারও রং আছিল ফক্ফকা, তাইর লাখান । মাও সুন্দর আছলা, দেবী প্রতিমার
লাখান ।

--- আমি সুন্দর নায় নি ।

--- তুই তো সুন্দর অউ বেটি । কী সুন্দর চউখ, বলিচ্ছেদর লাখান ধার নাক । তুই অইলে
আমার বাগাডাইয়া ।

--- কিলাখান দেখতায় নি ।

রাগের বৈতলকে ঠাণ্ডা করতে দুর্গাবতী বুকের কাপড় খুলে দুপাক ঘুরে দেখায় । গান গায়,

--- আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে নাচি আনন্দে ।

দুর্গাবতীর বোতলখোলা নেশায় বৈতলের রাগ জল হয় ।

বৈতল তখন মাছুয়া থেকে শর্মা হয় । বৌ এর পদবির সুখ সারা শরীরে । মুখবন্ধ হয়, বলার
কথা কিছুই বলতে পারে না । আপাতত দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল হয় । কিন্তু
বৈতল কিছুতেই ভুলতে পারে না কালো গাড়ির যাত্রীদের কথা । পাশাপাশি বসে থাকা
যমুনাপ্রসাদ আর দুর্গাবতীর ফুর্তিমুখ । সে-রাতে নাগাপটি থেকে ফিরে নেশার ঘোরে এক প্রস্থ
ঝগড়া করে । বৈতলের ঝগড়া দুরকমের, একটা সত্যিকারের আর একটা সমঝোতার ।
সমঝোতার গাড়ি যখন ছোটে তখন বৈতলের বুদ্ধিও ছোটে দুরন্ত । দুর্গাবতীর উপর তিন চার
রকমের ফতোয়া জারি করে । দুর্গাবতীও প্রতিরোধ করে, বৈতল মেনে নেয়, আসলটা মানে না
। বৈতল হারতে হারতে এগোতে থাকে, সে জানে শেষ দান তার । শেষ শর্ত মেনে নেয়
দুর্গাবতী, জমিদারের গাড়িতে আর যাবে না তাদের সোনামনি । এক নিশানায় দুই পাখি মারে

বৈতল । তার মেয়ে যাবে না মানে মেয়ের মাও যাবে না । বৈতলের বুদ্ধিতে রামনগর পর্বের
ইতি হয় যম সিং-এর ।

উপন্যাস

আঠাশ

বিপদের মুখোমুখি হলে বৈতলের সাহস বেড়ে যায় । কোন জট জঞ্জাল তাকে কাবু করতে পারে না । বিয়ানিবাজারের সাধু সৃষ্টিধর তাকে রক্ষা করেন । গুরুর মুখের কথা যেন অমৃতবানী । দুঃখ বেদনার ধারে কাছেও থাকেন না তিনি । তিনি ভিন্নপথে নিরাময় দেন । একথা সেকথায় ভুলিয়ে রাখেন জীবনের জটিলতা থেকে । মন শান্ত রাখার নানা উপায় বাংলাে দেন । বলেন,

--- জানো নি রেবা ঘরর ভিতর ঘর করে কয় ।

--- আইজ্ঞা অয় জানি, মশইর ।

--- ইতো রেবা পই ভাঙ্গাইলায় । ঘরর ভিতরে ঘর, তার মাঝে ছই রইছে পরমেশ্বর । আমি হি কথা কইয়ার না । আমরার মুখর কথা । আমরা বাঙালি না নি । বাংলা আমরার ভাষা, তার ভিতরে আবার সিলেটি, আমরার মাতৃভাষা । তুমি বাংলাত মাত্তায় পারো নি ।

--- হুনছি, যোগেন মণ্ডল আইছলা একবার হবিগঞ্জো, তাইন ভাষণ দিছলা বাংলাত । আর হুনছি গান মুকুন্দরামর, ‘ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি, বঙ্গনারী আর পরো না’ নেতাজিয়ে কইছলা ‘ তোমরা আমায় রক্ত দাও । আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব ।’

--- আর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথর গান হুনছ নানি । ‘বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল – পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ।’ আরো কত গান রেবা, তাইন নবেল পুরস্কার পাইছইন । তান গান দিয়া আমরা মনর কথা কইতাম পারি, তাইন অইলা বিশ্বকবি । আমরা সিলেটি অইলেও আমরা বাঙালি । চৌদ্দ কোটি হাত আছে বাঙালির ।

--- সিলেটিত অউত্ত আমরা মাতি ।

--- মাতি, কিন্তু আসল ভাষা অইল বাংলা । এর লাগিয়াউ কইছলাম ঘরর ভিতরে ঘর । সারা বাংলা ঘুরলেও সিলেটির লাখান মিঠা মাত পাইতায় নায় । আর সিলেটি মাইনষর বুদ্ধির ধারো কাছে কেউ নাই । সিলেটি পই ডিটান ইতা কুনু ভাষাত পাইতায় নায় । তুমার মুখর আগাত হক্কল সময় পাইবায় হাজাইল মাত ।

--- মাইনষে যে কইন ঢাকাইয়া মাতর কথা ।

--- কইন, ঠিকঅউ কইন । সবার মাতৃভাষাউ মিঠা । ময়মনসিং কুমিল্লা বরিশাল নোয়াখালি
চট্টগ্রাম খুলনা নবদ্বীপ সব ভাষাউ মিঠা যারযার কাছে । যেমন শ্রীচৈতন্য দেবর মাতৃভাষা তো
সিলেটি, তাইন মাততা পারতা না সিলেটিত, নবদ্বীপ শান্তিপুরর বাংলাত মাততা ।

--- তান বাপর বাড়ি তো ঢাকাদক্ষিণ । একবার গেছলাম মিশ্রবাড়ি । হারাদিন কীর্তন ।
এরমাঝে মিরদঙ্গ লইয়া কী নাচ ! আর শ্রীচৈতন্যর বাড়িত তো হক্কলেউ পরসাদ পাইন ।
নাউচরা বেটাইন্ত হক্কলরে দেখিয়াউ মনো অইল কথা,

‘ভাব নাই ভক্তি নাই

উবা উবা ফাল

পসাদ খাইবার বেলা

ঠাউয়া ঠাউয়া গাল ।’

--- না রেবা ইলাখান কইওনা, ভক্তি ছাড়া কুনু কেউ অতদূর যাইবনি । অউ যে তুমি আইছ
উঝা অইতায় । আইর গান শিখতায় এমনে পারবায় নি । উবা ফাল দিলে অইব নি । নাচ
শিখন লাগব, গান গাওন লাগব । নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে শিখবায় সব । মিলাইয়া যদি
কই তে কইমু ‘গাইতে গাইতে গাইন আর বাইতে বাইতে বাইন ।’ ঠিক নানি । তে সব থাকি
বড় কথা অইল সাহস, লুকাই থাকলে অইত নায়, তুমার নাচ গান তুমার জানা হক্কলতা নিয়া
বারে আওন লাগব । না দেখাইলে কে তুমারে কইব উঝা ।

বৈতলের ভয়ডর নেই । তাই গায়ক হয়েছে বৈতল । গুরুর আশীর্বাদে পদ্মপুরাণের
দেবখন্ড শিখেছে ভক্তিভরে, বানিয়াখন্ড শিখেছে সমান ভক্তিভরে তবে চম্পকনগরী ঘিরে যে
মানব সমাজ তার কীর্তন গানে বৈতল আপনভোলা হয়ে যায় । যেন নিজের সঙ্গেই কথা গান
দুঃখ সুখ । গুরু তাকে ভাষার কারিকুরি শেখান । বলেন,

--- সব আমার কথা নায় রেবা । তুমি আসর বুঝিয়া বদলাইবায় গান, পয়ার লাচাড়ি । তেউ
না গান তুমার অইব ।

বৈতল সিলেটি ভিন্ন ভাষা জানে না, বই এর বাংলা বলতে হাসি পায় । দেশ ছেড়ে আষাঢ়
পর বিশ্বকবির একটা গান তার খুব গাইতে ইচ্ছে করে । ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার
পরে ঠেকাই মাথা,’ গাইতে পারে না ঠিকঠাক । অন্যগান হয়ে যায়, দেশ ‘দ্যাশ’ হয় তোমার
‘তুমার’ হয়, ‘পরে’ ‘ফরে’ ‘ঠেকাই’ ‘টেকাই’ আর ‘মাথা’ ‘মাতা’ হয়ে যায় । রবীন্দ্রনাথের গান
হয় ‘ ও আমার দ্যাশের মাটি তুমার ফরে টেকাই মাতা ।’ কলের গানে যদি কখনও বাজে
সেন্ট্রাল রোডে, বৈতল মন দিয়ে শোনে । মন খারাপ করে ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারে না
বলে । বইখাউরি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে, গ্রামের ভাষায় এত সব বিচিত্র বাণী নেই ।
ইটখোলা ঘাটের বটগাছের নিচে বসে বৈতল তখন আপন মনে গায় ‘ফাহান্দে পড়িয়া বগা
কাহান্দে...’

গুরুর মনটা মনে পড়লেই বৈতলের সব মন খারাপ দূর হয়ে যায় । মন যখন খুব
আতালঝাতাল তখনও তার নিরাময়ের নিদান দেন গুরু । বলেন,

--- মন ঠান্ডা রাখবায় কুয়ার তলর ঠান্ডা পানির লাখান । বুদ্ধি দিয়া বার অইবায় হাসিমুখে । ই
দুনিয়ার সব কিছু অউ রেবা বাবুই পাখির বাসার লাখান, সুই বার করাউ আসল কাম । আর
জাননি মাথা ঠান্ডা রাখলে অত আপাঞ্জালির ভিতরে থাকিও দেখবায় বার অইব সোনার সুই ।
গোলোকধাম খেলছ নি ।

--- দেখছি, কাগজো ছবি আকা কুঠা কুঠা । সব তীর্থস্থানর ছবি পার অইয়া যাওন লাগে ।
খেলছি না ।

--- নরককুণ্ড আছে । উপরে উঠা নিচে লামা, গোলোকধাম তো স্বর্গপুরি, দেখলায় আগর
ঘরো আইছ, আবার মারলায় তিনচিত নামই গেলায় নীচে । তিনচিত্তে নরককুণ্ডে পতন লেখা
থাকে । অতাউ হইল ধাঁধা, ধান্দা লাগাই দেওয়া আরি ।

--- চিনি, পই আরি ।

‘রাজার বাড়ির মেনা গাই

মেন মেনাইয়া ডাকে

হাজার টেকার মরিচ খাইয়া

আরো খাইত চায় ।’

--- পাটা পুতাইল । ই পইর কথা কইয়ার না রেবা । কইয়ার ধাঁধা, ধান্দা লাগি গেলে কেমনে
বার অইবায় । বুদ্ধি দিয়া বার অইবায় । অঙ্কর লাখান । ধরো, তুমার যে নদী মহামায়া, খুরমা
আর রাউলি গাউর মাঝখানো কুনু মহামায়া নি, না নাইওর খাল ।

--- আইজ্ঞা আমরার নদীতো সুরমা, পিয়াইন ।

--- ঠিক আছে রেবা, তুমার নায় আমার অউ তইন মহামায়া । মহামায়ার উপরে আছে এক
বাশর পুল । অউ পুল ছাড়া আর কুনুপথ নাই রাউলি যাওয়ার । অখন মনো করো তুমি
যাইতায় হিপারো, তুমার লগে আছে এক আটি কাটলপাতা এক ছাগি আর এক ধুস্বা মারা বাঘ
।

--- বাঘ কেনে । বাঘ লইয়া কুনু কেউ যায় নি ।

--- ধরো না । যায় না আমিও জানি মনো করো বাঘে তুমারে খাইত নায়, ছাগি পাইলে ছাড়ত
নায় । ছাগিয়েও কাঠল পাতা ছাড়ত নায় । অখন তুমি এক একটা জিনিষ লগে লইয়া পার
অইতায় পারবায় । কেমনে পার অইবায় । বাঘ রাখিয়া আইলায় তারপরে ছাগি রাখলায়, বাঘে
খাই লাইব । ছাগি রাখলায় কাঠল পাতা রাখলায়, ছাগিয়ে খাই লাইব । তেউ কিতা করবায় ।
শহরর মানুষরে ইতা ধাঁধার কথা কইলে হাসবা । কিন্তু গাউর মানুষে অতাউ বুজে, সহজ কথা
।

বৈতল তার সহজ গুরুর সব কথা বোঝে, মেলায় জীবনের সঙ্গে । তাই নদীর পারে কাক
গুনে পয়সা আদায়ের পুরনো ফন্দির গল্প দুখুর অভিনয়ে মন্দ লাগে না বৈতলের । শহরে
বজ্জাতি থেকে যে গাঁয়ের মানুষ এখনও দূরে রয়েছে জেনে ভাল লাগে । জটিলতাহীন জীবনই
তো চেয়েছিল বৈতল, সরাসরি খোলামেলা । এতসব ভাবাভাবির সময় নেই । বৈতলের বাপও
বলেছে তেমন এক ভিত্তি মানুষের কথা । বন্যার সময় গাছে চড়ে বসেছিল, বাপ তার শ্বাসনালী
টিপে মারে অনুশোচনাহীন । বৈতল লুলাকে মেরেছে, তার প্রাণের বন্ধুকে মেরেছে । কিন্তু গ্রাম
ছেড়ে শহরে এসে কি তবে বৈতলকেও শহরে চলাকিতে পেয়ে বসে । সে কেন যমকে
সরাসরি শাস্তি দিতে পারছে না । বৈতলের তো ভয়ডর নেই কোনকালে । তবু বৈতল বুদ্ধির
খেলা খেলে, দুর্গাবতীর সঙ্গে শর্তের খেলা খেলে । শর্ত মেনেই দুর্গাবতী আর বাবু বিপজ্জ্বার

প্রমোদভ্রমণ বন্ধ হয় । কিন্তু মনেই যে কচকচি প্যাঁচ তাও জানে বৈতল । শর্ত মানে পথ খুলে দেওয়া, শর্তের বাইরে যা থাকল দুনিয়ায় তাতে কোনও আপত্তি নেই । তাই নতুন উপসর্গ দেখা দিতেই বৈতল প্রমাদ গোনে । যমজমিদারের বৌ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, দুর্গাবতী বলে সুতিকা । বৈতল বলে এ কেমন রোগ । দুর্গা বলে মেয়েদের হয় । বৈতল চুপ করে যায় । দুর্গাবতীর যে কাজ বেড়ে যায় এদিকে । চন্দ্রধর বাবাজির সর্বক্ষণের কাজে নিয়োগ হয় দুর্গাবতীর । খাইয়ে দাইয়ে ঘুমপাড়িয়ে তবে ছুটি । শরতে কোনও বাধা না থাকলেও মেয়েকে নিয়ে যায় না দুর্গাবতী ভিতরবাড়িতে । একা যায় একা আসে । দিনমান তাই বৈতল মেয়ের সঙ্গে কাটায় আর বাবুই পাখির বাসার জট ছাড়ায় । শয়তান যমুনাপ্রসাদের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় খোঁজে । তার দুর্গাবতীকে, গ্রামের সরল মেয়ে তার বৌটাকে ফিরে পেতে পাঁচালিকারের শরণাপন্ন হয় । আকুল হয়ে গায়,

‘সঙ্কট কালেতে কোথায় ভবানী শঙ্কর ।

কহে ষষ্ঠীবর কবি মনসার বর ।

বিপদ কালে কোথা রইলে ভবানী শঙ্কর ।।’

তবে কি তার গ্রামে ফিরে যাওয়াই উচিত । আবার সেই মাছ ধরার জীবন । মালির ভিটেয় কালীমূর্তির সামনে বসে দুএক দম গাঁজা খাওয়া । বৈতল ফিরে গেলে সানন্দে টেনে নেবে সবাই । এতদিন পরে কে আর মনে রেখেছে লুলার কথা । লুলা তো আর ছাতক পরগণার মানুষ না, বইয়াখাউরি তার গ্রাম নয়, বৈতলের পরিচয়েই এসেছে খিত্তাগাউ-এর বাদিয়া । বইয়াখাউরিতে লুলার বেশ পরিচিতি হয়েছে কবি গায়ক হিসেবে, কবি দিলবাহারের বেশ নামডাক সিলেটে । তখন তো দেশভাগের হিড়িক, কে কাকে মেরেছে কোনও খবর রাখে না কেউ । তার উপর প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ভেসে গেছে লুলার দেহ । বৈতল এতদিন অনুপস্থিতির একটা কারণ প্রচার করে দিতে পারবে । দেশে ফিরে গেলেই বৈতল সব পারে । ফিরে পাবে হাওরের জল, জলের পারে মনসা মন্দির, অদূরে মালিরভিটার কালিমন্দির । আর পাবে তার মায়ের কুঁড়েঘরটি । কী জানি ঘরটা এখনও অক্ষত আছে তো, মায়ের ভাঙা টিনের বাক্সটি । বাক্সের ভিতর রাখার মতো কিছুই নেই বৈতলজননীর । পাট করে রাখা দুটি কাপড় আর একটি প্রাণের ঢঙ, এক আয়না । মা সকাল সন্ধ্যা নিজের মুখ দেখে, শিশু বৈতলও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, নিজের মুখ যে অবিকল দেখা যায় আয়নায় । বৈতল নিজের মুখকে ভেংচি

কাটে, কখনও জিভ দিয়ে কেড়ে নেয়, বৈতল দেয় না, মাটিতে পড়ে ভাঙে আয়না । মা ভাঙা টুকরোটাই উঠিয়ে রাখে টিনের বাক্সে । লালপেড়ে শাড়িটার পাড়ে হাঁস আঁকা শঙ্খ আঁকা, বছরে একদিন মা কাপড়টা পরে যায় হাওরের পারে বিষহরির মন্দিরে । পরাণ ওঝার মনসামঙ্গল শোনে মা । এবার থেকে বইয়াখাউরিতে মনসাপুঁথি গাওয়ার একমাত্র ওঝাই হবে বৈতল । দেশে ফিরে গেলে সে পাবে আলাদা সম্মান, হাওরের জলে তার মতো ক্ষিপ্ৰগতি মাছুয়াকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে । জমিদারের পদ্মদিঘীর জলে বাউস মাছের বুড়বুড়ি দেখতে বৈতল ভাবে এখনও কি ওদেশে আইর পুঁথি পড়া হয়, গুরমির নাচ হয়, ঢলানি হয় জিয়ানি হয় । ওর নিজের দেশ কতখানি নিজের আছে । উদ্বাস্ত হয়ে ফিরে-আসা মানুষেরা শুধু শত্রুতার কথা বলে । বলে মন্দির ফন্দির কিছু নেই এখন ওদেশে সব মসজিদ । আল্লা হো আকবর । হিন্দুদের সব সম্পত্তি দখল করতে হবে । ওদের দুঃখ এদেশে তো হিন্দুর, এখান থেকে কেন ওদের তাড়ানো হবে না । শুরুতে বৈতলেরও মাথা ঘুরে যায়, বিভ্রান্ত হয় । যমুনা প্রসাদ সিং কংগ্রেসি নেতা হয়েও উল্টোপাল্টা কথা বলে । ইটখোলা মাঠে খাকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে কসরৎকারী বিহারি মানুষদের সঙ্গে যমুনাপ্রসাদকেও যেতে দেখে বৈতল । ভোরের বেলা খালি পায়ে বেরিয়ে পড়ে জমিদার । বৈতলকে দেখে উৎসাহ ডাকে । বলে,

--- চলো, যাইতায় নি ।

--- কই যাইরা ।

--- মাঠো । ইটখোলা মাঠো একটু ব্যায়াম করিয়া আই ।

--- ইখানো তো বিহারি হকলে লেফরাইট করইন ।

--- বিহারি নায় রেবা তারা হইলা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ । ইখানো খালি বিহারি নি সবেউ যাইন । আর হি কথা কইলে আমিও তো বিহারি ।

--- হাচানি ।

--- আমরা এখন বাঙালি অউ । কুনদিন বুলে ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা আইছলা আরা জিলা থাকি । বাদ দেও বা বিহারি বাঙালি, মুসলমান হকলে দেখলায় নি কিলানি মারিয়া খেদাইলা

হিন্দু হকলরে । ইখানোও দেখরায় নি কি রওয়াব । বাঘর বাচ্চা অইলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ।
তাইন কইছইন হিন্দুর দেশো হিন্দুর কথাউ ছনন লাগব ।

--- তে তারা যাইত কই ।

--- তারা থাকব । হিন্দুর মাথাত উঠিয়া নাচত নি এর লাগি । নতুন দল বানাইছইন তাইন ।

--- কিতা নাম ।

--- জনসংঘ ।

--- আপনে তো কংগ্রেস ।

--- কতদিন কংগ্রেস থাকমু বুজিয়ার না । হিন্দুর দেশো হিন্দু অউ না থাকলে কিয়র কংগ্রেস ।

যমুনাপ্রসাদের কথা মন্দ লাগেনি বৈতলের । যদিও বইয়াখাউরি বা সিলেট জেলার কোনও
তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই তার । তবু তো সবাই বলে ‘বাঙাল মনুষ্য নহে অন্য এক জিব’ । বাঙাল
মানে মুসলমান । লোকেল বোর্ডের ভোটের আগে আবার অন্য এক রূপ দেখে যম জমিদারের
। জমিদার বাড়ির বৈঠকখানায় শহরের গণ্যমান্য কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে সভা হয় । সভার
শেষে যমুনাপ্রসাদ বৈতলকে বলে,

--- চলো, যাইতায় নি ।

--- আবার কই যাইতা । আপনার লগে তো ভোলা যায় ।

--- তুমিও যাইবায় । কুম্ভা বাগানো যাইতাম । অখন আমার সব চা বাগান দেখন লাগব ।
কংগ্রেসর দায়িত্ব ।

--- আপনে নু জনসংঘ ।

--- চুপচুপ, ইতা মাতিও না । কংগ্রেস অইল মহাত্মা গান্ধীর দল, জহরলালের দল, সর্দার
পেটেলর দল ।

--- মৌলানাও একজন আছইন ।

--- আছইন তো, সবে মিলিমিশি থাকা হিকাইছে কংগ্রেসে । অউ যে আমরার ময়নুল হক চধরি তাইন অতো আছলা লিগ । অখন তাইন কংগ্রেসি, মাইনষর চাকরি করলে ধর্ম দেখন লাগে না রেবা । কংগ্রেস অইল ধর্মনিরপেক্ষ দল ।

বৈতল বোঝে টোপ গিলেছে সিং জমিদার । ক্ষমতা পেয়েছে হাতে । এখন তাই সে ধর্মনিরপেক্ষ । পঞ্চাশতেও অনেক কম্যুনিষ্ট নেতাদের দেখেছে বৈতল, তারিক ভাই সামসুল ভাই এর মতো কটুর কম্যুনিষ্ট নেতারা কি সব এখন মুসলিম লিগ করছে । বিয়ানিবাজারের রইদপুয়ানি গ্রামের পুকুরপারে চায়নার সঙ্গে কথায় কথায় স্বপ্নের স্বদেশ গড়েছে বৈতল । নেতাজির দাদা শরৎবাবুকে রাষ্ট্রপতি শাহিদ সুরাবর্দিকে প্রধানমন্ত্রী করে নবীন দেশ গড়েছে । গুরু সৃষ্টিধরের কাছে যা শুনেছে সব তার ফিঙ্গে পাখিকে বলেছে । গুরুকেও বলেছে,

--- আর আপনে, অনন্ত সাধু মন্ত্রী অইতা নায় নি ।

--- মন্ত্রী এমনে হওয়া যায় না রেবা । শিক্ষাদীক্ষা লাগে, আমার কিছু নাই রেবা । অনন্ত বাবু পারলা নে, তাইন ত আবার কম্যুনিষ্ট । তানে নিত নায় । নিলেও তাইন যাইতা নায় ।

--- যাইতা নায় কেনে ।

--- কম্যুনিষ্ট জন্ম মন্ত্রী হওয়ার লাগি নায় রেবা । গরিবর হক দেওয়ানি তারার কাম ।

বৈতল গুরুর বাক্য সত্যবচন ধরে নেয়, তবু সংশয় যায় না । গরিবর ত্রাতা যদি কম্যুনিষ্ট হয় তবে যমুনাপ্রসাদ কী, সেও তো এখন চা শ্রমিকের নেতা । এই দেশে কত নতুন নতুন নেতা আছেন, তারাপুরের সতীদেব সেন্ট্রাল রোডএর জ্যোৎস্না চন্দ সোনাবাড়িঘাটের ময়নুল হক চৌধুরি, চামড়াগুদামের হুরমত আলি লস্কর, বড়খলার যতীন্দ্রমোহন দেব লস্কর । আসাম থেকে এসেছেন শ্রমিক নেতা মহীতোষ পুরকায়স্থ । আর কম্যুনিষ্টদের মধ্যে আছেন অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, বীরেশ মিশ্র, গোপেন রায় । তারাপদ ভট্টাচার্যকে কেন যে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় কে জানে । রাজনীতির মাথামুড়ু কিছুই জানে না বৈতল, শুধু গুরুর শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্রে সব জেনে নেয় । অলস বিকেলে জমিদার বাড়ির পদ্মাদিঘীর জলে বাউস মাছের ঘাই দেখে দেখে ভাবে এবার একবার যাবে পার্টি অফিসে, বলবে গিয়ে সে গুরু সৃষ্টিধরের শিষ্য । জলের আলোড়ন থেমে যাওয়ায় বৈতলের মনও আবার ফেরে বাস্তবে । মেয়ের ঘুম ভেঙ্গেছে এবার, ইতিউতি চাইছে অবাক চোখে তার সোনামনি । মাকে খুঁজেছে মেয়ে, মা তো

এখন ফিরবে না, কাকমা হয়ে কোকিলের বাচ্চা মানুষ করছে । বৈতল মেয়েকে কোলে নেয়, পুকুরপারের ঘর পেরিয়ে মল্লয়া গাছের নিচে যায়, নাটমন্ডপের মাটির বেদিতে বসিয়ে দেয় সোনাকে, লুঙ্গির খুট থেকে বের করে নাসির বিড়ির বান, একটা ধরায় । মেয়ে আপনমনে খেলা করে, বৈতলও অপেক্ষা করে দুর্গাবতীর । এক বছরের মেয়ে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, একটু এগোয় আর বৈতল তাগা ধরে টানে । মেয়ে বিরক্ত হয়, বাপও বিরক্ত হয়ে উঠিয়ে নাটমন্ডপের মাঝখানে নিয়ে ছেড়ে দেয় । এর মধ্যেই প্রতীক্ষা শেষ হয়, দুর্গাবতীকে দেখা যায় । হালকা সবুজ রঙের, কচি কলাপাতার রঙ কী সবুজ, ওরকম একটা কাঁচের কাপে চা নিয়ে উদয় হয়, দুর্গাবতীর সঙ্গে পিরিচটাও একই কাঁচের । দুর্গাবতী চা নিয়ে যায় কাছারিঘরে, বাঁ হাতে ঘোমটা টানে । বৈতল ইশারায় ডাকে, ফিরেও তাকায় না তার বৌ । কাছারি ঘরে যে একা জমিদার, দুর্গা ঢোকে । বেরোয় না, অনেকক্ষণ হয়ে যায় । এক কাপ চায়ে এত সময় । বৈতল রাগে, কাছারি ঘরের বন্ধ দরজা জানালায় উঁকি দেয় দেবালয় থেকে ।

মেয়েটার এমন কান্নাও মায়ের কানে পৌঁছয় না । বৈতলেরও মাথার ঠিক থাকে না, কাছারি ঘরের বন্ধ দরজায় চোখ রাখতে রাখতে মেয়ের কথা ভুলে যায় । নাটমন্ডপের মাটির বেদি থেকে দূম করে পড়ে যায় মল্লয়া গাছের শেকড়ে । বৈতল মেয়ে উঠিয়ে গায়ে হাত দেয়, মাথায় হাত দেয়, পায়ে হাত বুলিয়ে দেখে কোথায় চোট লেগেছে । মেয়ে শুধু কাঁদে । বৈতল মেয়েকে কোলে নিয়ে কাছারি ঘরের বন্ধ দরজা খোলে । কই, কেউ নেই কোথাও । জমিদার নেই । দুর্গাবতীও নেই, চায়ের কাপ প্লেটও নেই । তাহলে বৈতল কি ভুল দেখেছে । দুর্গাবতী ভেতর বাড়ির রান্নাঘর থেকে ছুটতে ছুটতে আসে মেয়ের কান্না শুনে । ডালের ফোঁড়ন মাথায় ওঠে, মেয়েকে নিয়ে মা বাপ দুজন ছোট্টে সিবিল হাসপাতাল । কম্পাউন্ডার বলে ফ্যাকচার, হাড়ভাঙা । এইটুকু মেয়ের পায়ে লোহার শলা দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয় ডাক্তার । ডাক্তার বলে কচি বয়স তো ঠিক হয়ে যাবে, একটু খুত থাকবে, মামুলি । তার মানে কি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবে । ‘ভেউঙ্গরা’ বলবে লোকে ।

ঘোরের ভিতর সময় কাটে যতক্ষণ না মেয়ের কান্না থামে । কান্না থামতে যে কে সেই, কে বলবে এই মেয়ের পায়ে ফ্যাকচার । আবার সেই খিলখিল হাসি । ডাক্তার ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন দিয়েছে, বলেছে ব্যথা হলে মূর্তজা কম্পাউন্ডারকে দিয়ে আর একটা দিয়ে দিতে । বৈতল অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকায় দুর্গাবতীর দিকে, তার ভুলেই তো এত বড় খুত । বৈতল

ভুলে যায় দুর্গাবতীর প্রতি তার ক্ষোভ । ক্ষমাপ্রার্থী বৈতলকে দেখতে তখন ডাঙ্গার উপর পড়ে
থাকা কাংলা মাছের মতো, নড়াচড়া নেই । চোখের দৃষ্টি মাটিতে । দুর্গাবতী একটু হাসিমুখ
দেখিয়ে দিলেই ডানা দুলিয়ে নাচতে থাকবে জলে । বৈতল গোবেচারা ভাবে কিছু বলতে চায়
দুর্গাবতীতে । বলা হয় না, কারণ তখনই দুখুর রিক্সার বেল বাজে কিরিং কিরিং, পক্ষীরাজ
নিয়ে যায় নি বৈতল হাসপাতাল, স্ট্যান্ড এ এসে দুখু খবর শুনেই ছুটিয়েছে বহুইর রিক্সা ।
অবাক বৈতল দুখুকে বলে,

--- এ তুই, মামু কই ।

--- মামুরে মকবুলর রিক্সাত উঠাই দিছি । বহুই আছে লগে । হেও আইত আছিল মামুরে
দেখত কে । মোকামো পৌঁছাই দিব । তুই ডরাইছ না, তাই ভালা অই যাইব ।

দুখুর রিক্সায় চড়ে ওরা বাড়ি ফেরে । মেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ে ।
এবার প্যাডেলে বৈতল । বেলা দুই প্রহরে হুড়মুড়িয়ে রিক্সা নামায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে ।
মিলিটারি গাড়ির মতো বরই গাছের নিচে এসে থামে রিক্সা । কোমরের প্যাঁচ খুলে বৈতল বের
করে বস্তুনি । দুখু বৈতলের কাঁধে মারে এক ঘুঁষি । বলে,

--- দে বেটা, তুইন পারতে নায় আমি বানাই দিয়ার হালার হালা ।

নেশা না করেই দুখু নেশাগ্রস্ত হয় বারবার । বেঁটে লোকটাকে দেখে বৈতলের আজ বড়
গর্ব । বৈতল এই দেশ ছেড়ে যাওয়ার সব পরিকল্পনা বাতিল করে । কিন্তু দুখু তো দুখুই, সুখে
দুঃখে সব সময় সঙ্গে থাকবে আর বৈতলকে জ্বালিয়ে মারবে তির্যক কথায় । বলে,

--- তোর তো জমিদারর লগে বাইচা অইল ।

--- আমার বাইচা । হালার হালা ।

--- অউ আরি, ভাবির ।

--- তেউ ।

--- তারও ঠেং ভাঙছে নি, খবর লইচছ নি ।

--- তার কেনে ঠেং ভাঙত ।

--- না, একদিনো তো জন্ম । কুষ্টিউষ্টি উঠাইছনি ।

--- কুষ্টি ঠিকুজি ইতা আমরার বাইচাৰ নি । তে হুন্ছি যমে বানাইছে তার পুয়ার লাগি, মস্ত
বড় এখ চুঙার লাখান কুষ্টি, খুললে আর বন্দ অয় না ।

--- বালাউ অইছে । সব একতাউ হইব । একসময় জন্মাইলে কুন্সু আলেদা নি ।

--- অয় অয় আচার্ঘি এ কইছে এক বছরে ক্ষতি আর নয় মাসে প্রাপ্তি । প্রাপ্তি জানছনি । লাভ
। পাওয়া ।

--- কিতা পাইলে নয় মাসো ।

--- ব্যাঙ, আর কিতা ।

--- ব্যাঙ কিতাবে ।

--- আমি তো ভাবিয়ার, আইজ পাওয়ার দিন । ভালো কিছু পাইব । তাইর হিদিন মুখো পসাদ,
শ্যামসুন্দর থাকি ভোগ আনিয়া খাওয়াইয়ার, আকুতা থালো এক ঘাডু বেঙ ।

--- তেউ আর কিতা । তাইর তো খাওয়া অই গেল, আমরার খাওয়া অইল না ।

--- বুঝলাম । তে কিতা পাইলে ।

--- কইলাম নানি, ঘাডু বেঙ ।

--- আর হিগুয়ে । যমর পুয়া ।

--- হিগুর নানা মরল পাইল সম্পত্তি । অউত্ত অইল গরিবর কিছা, পাইতে বেঙ যাইতে ঠেঙ ।

উনত্রিশ

ঠাট্টা মাট্টা নারকেলের চোঁচ । দুখু থাকলে ঠাট্টার মজাও বাড়ে তিনগুন । কিন্তু বাড়ি ফিরলেই আবার দুঃখ বাড়ে । বৈতল তো আর ঠাট্ট ঠমকের ধার ধারে না, বৈতল অল্প নিয়ে থাকে । দুর্গাবতীর চমক ডমক দেখে ভাল লাগে না । দুর্গাবতী এখন শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজও পরে, শাড়িটাও আর ঢাকাঢুকির নেই । বৈতল যেমন আছে তেমনই আছে, লুঙিও ছাড়ে নি, কাঁধের গামছাও না । ব্যাঙ আর ঠেংএর গল্পের পর দুখু তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় । বৈতল মেয়েকে দেখে, মেয়ের পায়ে সাদা ব্যান্ডেজ দেখে দুঃখে হুহু করে ওঠে বুক । চোখে কি জল আসে তার । বৈতলের চোখের জল কেউ দেখেনি, কিন্তু মেয়ের জন্য বৈতল ভেঙে পড়তেও রাজি । এক হাওর প্রমাণ চোখের জল ফেলতে রাজি বৈতল, শুধু মেয়েটা তার আবার আগের মতো হয়ে যাক । দুঃখ থেকে হয় রাগ, বৈতল রেগে দুর্গাবতীর হাত ধরে জোরে । বলে,

--- হুন বেটি । ই অলক্ষী বাড়ি ছাড়ি দেই চল । ইবাড়ি ছাড়িয়া চল নায় যাই গিয়া খাসিয়াপাতি । দশ টেকা দিলেউ ঘর পাউমু ভাড়াত ।

--- কেনে ইনো কিতা দুষ । অন্যখানো থাকলেও অইল নে । ইতা খামকা মাত মাতিও না । অতদুর থাকি আইয়া কাম করলে শরীলেও দিত নায় ।

--- কে কর তরে কাম করতে । হুন বেটি আর উনাপেনা নাই । অখনও যদি ইবাড়ি না ছাড়ছ, আমি কইলাম তরে মারতাম নায় বেটা ইগুরে মারি ফালাই দিমু শাশিরগো টিপিয়া । আমি ইতা মানতাম নায় । আমার পুড়ির ঠেং ভাঙব আর তুমি তার লগে বইয়া চা খাইবায়, শাড়ির লগে বেলাউজ লাগাইবায়, ইতা অইত নায় । তুই বেটি ফিরাগাই নি, বলদ খুজরে নি । আমারে দি অয় না ।

বৈতলের রাগকে সমীহ করে দুর্গাবতী । কোনও জবাব দেয় না, মেয়েকে বুকে করে বসে থাকে আর কাঁদে । সন্ধ্যার পর আসে যমুনা জমিদার, বৈতল করে শুকনো নেশা । জমিদার একেবারে কাদাভেজা, মদের নেশায় চুর । পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে পাঁচ টাকা

দশ টাকার নোট, জমিদার টাকা দেয় দুর্গাবতীর হাতে । বলে সুর ডাক্তারকে ডেকে দেখাতে ।
মেয়ের প্রতি অবহেলার জন্য দুর্গাবতীকে গালমন্দ করে । বৈতলেরও নাকের ডগায় রক্ত জমে,
শরীরের সব পেশি জমে শক্ত হয় । বৈতল স্থির করে আজই শেষ দিন । মাতালকে আর বাধা
দেয় না । বলতে থাকে, শাসন করতে থাকে দুর্গাবতীকে । স্বামী যেমন শাসন করে বৌকে ।
বলে,

--- তুমি কি লাখান মা কও চাইন দুর্গা । একটা পুড়িয়ে দেখিয়া রাখতায় পারনা । আমারে
দেখিয়ার অখন বাইচা দেখার আলাদা মানুষ রাখন লাগব ।

--- আমি তো চান্দু বাবারে দেখিয়া রাখি ঠিক মতো ।

--- তিলোত্তমারেও দেখন লাগব ।

--- বাপে দেখইন । দেখিয়া অউত্ত লই গেলা লগে লগে বড় হাসপাতালো ।

--- ইতা গাইঞ্জাখুরর কুনু ঠিক নাই ।

পতিনিন্দায় এবার তেতে ওঠে দুর্গাবতী । বৈতলের রাগ তো চেনে, অনর্থের ভয়ে সামাল
দেয় পরিস্থিতি । বলে,

--- তে আমরা যাইমু গিয়া, আর থাকতাম নায় ।

--- কই যাইতায় । রিফ্যুজিকেম্পো । পারবায় আবার । কিতা বা উঝা পারবায় নি ।

দুর্গাবতীর রূপ দেখে বৈতলের পেশি শিথিল হয়ে, নাকের ডগার রাগ নামে । দুর্গাবতী
বৈতল দুজনেই সমস্বরে বলে,

--- পারমু ।

রাগের ভানে বৈতল এ কাঁধের গামছা ও কাঁধে নেয় । বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে ।
বৈতল জানে তার কাজ হয়ে গেছে । লম্পট জমিদার কাত হয়েছে । দেড়মনি কাতলার
বাচ্চাকে এবার একাই টেনে তুলতে পারবে দুর্গাবতী । কারণ বৈতল যতই রাগারাগি করুক সে
ভালই জানে তার বিয়ে না করা বৌকে । যতই রাগারাগি করুক সে জানে সে বৈতলের বৌ,
বৈতলের বুদ্ধিকেও তাই সে মান্য করে । দুর্গা জানে বৈতল যতই চপযাত্রা করুক বেরিয়ে

যাওয়ার, যাবে না । উদ্দেশ্য একটা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হরিৎবরণ ছেড়ে যাবে না । যম সিংএর সঙ্গে তার লড়াই সেয়ানে সেয়ানে । যমুনা প্রসাদও প্রতিহিংসা নিতে জানে, তার মুখের উপর কথা বললে ছেড়ে দেয় না সে । কিন্তু জমিদার জানে না বৈতলের প্যাঁচে পড়লে সবাই কাত হয় । জমিদার টলতে টলতে সোনার পায়ের ব্যাভেজের উপর আলতো হাত বুলিয়ে দেয় । দুর্গাবতীর দিকে একবার বৈতলের দিকে একবার তাকায় । বলে,

--- যাইতায় গিয়া । যাও । তুমরা আমার লক্ষ্মী । তুমরা আওয়ায় আমার পুয়া অইল, তুমরারও পুড়ি অইল, ভাবলাম ভাই বইন একলগে বড় অইব ।

বৈতল জমিদারের কথার মাঝে ফোড়ন কাটে । বলে,

--- রাজপুত্রর লগে রিক্সাআলার পুড়ির কিওর মিল ।

--- মিল লাগে নি । মিল করাই দিমু । আমার জমি জমা টেকা পয়সার অভাব নাই, তাইর নামো লেখি দিমু । নগদও দিমু । থাকি যাও ।

মাতাল লোকটা ঝরঝরিয়ে কাঁদে । বৈতলের পেটের ভিতর হাসি জমতে থাকে দুর্গাবতীর জন্য । এরাও দুজনে সমস্বরে বলে,

--- আমরা ইতা লাগে না ।

--- না লাগলেও লেখি দিমু বাজারর জমি । থাকলে থাকো, গেলে যাও ।

সে-রাতে আর মাল খায় নি বৈতল । ভাবতে ভাবতে যায় নাগাপট্টি । মাতাল মানুষের মালের ঘোরের কথার কান্নার কি কোনও ঠিক আছে । ঠিক আর বেঠিকের ভাবনায় দুলতে দুলতে ভরপেট মাল খেয়ে ফেরে বৈতল গভীর রাতে । দুর্গাবতীর গায়ে শেষরাতের মতো এলিয়ে পড়ে । বলে,

--- কেমন, কইছলাম নি, কও ।

এসব মামুলি মিল আর ঝগড়া দিয়েই বৈতলের কুপিলফের দপ্‌দপানি । ভালও লাগে অস্থিরতাও বাড়ে । দুর্গাবতীকে নিয়ে বৈতলের সব উচাটন । বৈতল দুর্গাবতীকে চেনে আবার চেনে না । এক এক সময় মনে হয় বৈতল ছাড়া সবাইকে নিয়ে দুর্গার দুনিয়া । দুর্গাবতীও

জানে বৈতল তার পোষা পাখি । ময়না রাধাকৃষ্ণ কও বললেই বৈতল বলবে কথা । বৈতল জানে তার চরিত্রে পাখির উষ্ণতা নেই । এক নিষ্ঠুর শৈত্য কাজ করে তার শরীরে । নিজের অক্ষমতা নিয়ে দুর্গাবতীর উপেক্ষা সহ্য করে বৈতল । দুর্গাবতী বলেই সহ্য করে, অন্য কেউ বৈতলকে উপেক্ষা করলে আগুন ধরিয়ে দেয় চরাচরে । দুর্গাবতীর সঙ্গে ঝগড়া হলে বৈতল তেল মবিল নিয়ে বসে পক্ষীরাজের পরিচর্যায় । এত ভারী গাড়িটাকে ওঠায়, প্যাডেল ঘোরায হাত দিয়ে বনবনিয়ে । তেল দেয় গ্রিজ দেয় বিয়ারিংএ । মার্ডগার্ড ঠিক করে দেখে নেয় টাল । পক্ষীরাজের ফিরুল ঘোরায চাকা । মেয়ে সোনামনিরও বয়সের চাকা ঘোরে । তিন বছরের মেয়ে সেজেগুজে তৈরি থাকে বাপের সঙ্গে যাওয়ার জন্য । বৈতল ছোট একটা বালিশ বানিয়েছে মেয়ের জন্য । সিটকভারের নিচে রাখে । সামনের রডে তুলোর গদিতে মেয়ে বসিয়ে বৈতল হয় উধাও ।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত । বৈতলেরও পছন্দের ঠাই বরাক নদী আর নদীর পার । সেই বিতর্কের ঘোড়ার ক্ষুরের বাঁক যেখানে । বাঁধের উপর মন্টু মিঠাইওলা ঘণ্টা বাজিয়ে সোনাকে ডাকে । মস্ত বড়ো এক তেলাল বরুয়া বাঁশ কাঁধ থেকে নামায় । লাল শাদা মিঠাইর মণ্ড বাঁশের মাথায় । রবারের মতো টেনে বের করে, তৈরি করে মিঠাই পছন্দসই সাজের । গরমদিনে বৈতলের সোনামার পছন্দ পাখার সাজ । এক পয়সার মিঠাই পেলেই মেয়ের হাসি খিলখিল । মেয়ে খায় মিঠাই বাপ খায় মালা । মল্লয়া ফুলের শুকনো মালা । মালা খেয়ে মাতাল হয় না, অল্প মৌতাত হয় । সব কিছু ভাল লাগে বৈতলের, রাগ দুঃখ হারিয়ে যায় । সোনা মেয়েকে নিয়ে বিশ্বজয় করতে বেরোয় বৈতল । কিড়িং কিড়িং করে রিক্সার বেল সংকেত পৌঁছে যায় ইয়ার বন্ধুদের কাছে, কয়েক মুহূর্তেই এসে জড়ো হয় সবাই । সোনাকে নিয়ে শুরু হয় লোফালুফি খেলা । সব হাত ঘুরে যায় দুখুর কোলে । গামছাবাঁধা গুপ্তধন থেকে বেরোয় চিরল পাতার শুকনো মধু । এ এক প্রক্রিয়া, পাতা পোড়ে, চোখ লাল হয়, কম কথার হাসি আনন্দে সময়কে কিনে নেয় চার ইয়ার । যে বন্ধু ওড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে হাসে, সেই দুখু মিয়া তখন খেলা করে বৈতলকন্যা তিলোত্তমার সঙ্গে ।

এর মধ্যেও লুকোচুরি খেলে বৈতল । বন্ধুদের লুকিয়ে চলে যায় নদীবাঁধের অপর পারে । একা একা মেয়ের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে । মামুর কথা বলে, দুর্গাবতীর কথা বলে, বন্ধু দুখুর কথা বলে । বলে দূরদেশের এক গুরুজনের কথা বলে বন্ধু রুল আমিন বেজ

এর কথা । দুখুর কথা বলতে গিয়ে বলে ‘দুষ্টা’ । দুখু না হলে যে বৈতলের কোনও কাজই সম্পূর্ণ হয় না, তবু দুখুর সঙ্গে তার এক অলৌকিক প্রতিযোগিতা । দুই সতীনের লাগ । মামুর সর্বক্ষণের খিদমতগার দুখু মিয়া । বলে মামু তার মুর্শেদ । বৈতল বলে মামু তার ভগবান । স্বার্থপরতার লেশমাত্র নেই বিশালদেহী বোবা মানুষটার । নিজের গাঁয়ের কাপড়টা পর্যন্ত যে ঠিকঠাক রাখতে পারে না, খেতে দিলে অন্যকে খাইয়ে সুখ পায় । যে-মানুষটা ভাল, মানুষের আরো কেন ভাল হয় না, তাই ধরে মারে । মন্দ বদমাশ লোককে আদর করে, যেন আশীর্বাদ দেয় ভাল হও । সে-মানুষ ভগবান না তো কী । সেই মামুকে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে বলে দুখুর উপর রাগ বৈতলের । বহুই ছাড়াও তো সে রিক্সা চালায়, নিজের রিক্সা পক্ষীরাজ, তবে কেন মামুকে নিয়ে যেতে দুখুর অনুমোদন চাই । বৈতল মুসলমান নয় বলে । কেন মামু কি দুখুর কেনা । দুখুকে শায়েস্তা করার জন্যই এবার বৈতল মুসলমান হয়ে যাবে । আর কোনও ফারাক থাকবে না বেঁটে লোকটার সঙ্গে । মামুও তখন একা দুখুর থাকবে না । দুখুটার ভিতর অনেক শয়তানিও আছে । ইন্ডিয়ার স্বাধীনতার দিন সে পাকিস্তানের চান্দ তারা পতাকা ওড়ায় । লোকে বলে দুখু তার বউকে মেরে খাদিম হয়েছে । কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে জানে না বৈতল । বৈতল জানে দুখুর মনটা ভাল । সব রক্ষতার ভিতর একটা শিশুমন লুকিয়ে আছে তার । তাই গাঁজার আসর সাজিয়ে দেয় বন্ধুদের, নিজে থাকে বাইরে, পাহারা দেয় । বন্ধুকন্যার দুর্ঘটনার বার্তা পেয়েই মামুকে অন্য রিক্সায় বসিয়ে বহুইর গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যায় সরকারি হাসপাতাল । বৈতলও তাই নিশ্চিন্তে সোনাকে দুখুর জিম্মায় রেখে নেশা করে । আবার এই দুখুই তাকে বারণ করে মুসলমান হতে । এই দুখুকে লুকিয়ে একা মামুকে পেতে বৈতল যায় পিরের মোকাম । মেয়েকে বলে,

--- তর দুখুকাকা খুব ভাল, নানি রে ।

--- কাকা নায়, চাচা ।

--- ভাল নি কছ না ।

--- ভাল ।

--- তর মাও খুব ভাল রে মনি ।

--- আমার মাও ভাল ।

--- মারে কষ্ট দিছ না বেটি ।

--- তুমি অউত্ত দেও । গাইল্লাও ।

--- আর দিতাম না, গাইল্লাইতাম নায় ।

বৈতল মেয়েকে কথা দেয়, আর নদীর জল থেকে এক আঁজলা চোখে দেয় । বৈতলকে কেউ কখনও কাঁদতে দেখেনি । মেয়েও না, মেয়ের মাও না । মর্মের সজল তার শুষে নেয় বরাক নদীর বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ।

মামুর বাড়ি । মামুর নাম যে শেখ জালালুদ্দিন সে ভুলে গেছে নদীর পারের মানুষ, শহরের মানুষ, জেলার মানুষ । কেউ কেউ এখনও বলে জালাল পির । জালাল পিরের মামু হয়ে যাওয়ার কারণ এখনও কেউ জানে না । মামু বোবা কিংবা মৌনী নন, মামুর কথা বলার একটি অস্পষ্ট ভাষারূপ আছে, যে-রূপের বিষয়ে অনেকটাই ওয়াকিবহাল দুখু মিয়া ।

মামুর বাড়ি এখন তীর্থক্ষেত্র । বাড়ি তো নয় বাঁশ বেড়ার এক ছাউনি নদীর পারে । ভেতরেও বাঁশের নড়বড়ে এক মাচান । মাচানে তেলচিটে কাঁথা, লুঙি গেঞ্জি গামছা আর অসংখ্য ছারপোকা । মামুর খুব কষ্ট হয় তাই দুখু মাঝে মাঝে বিছানাপত্র রোদে দেয়, গরম জল ঢালে মাচানে, কিছু ছারপোকা মরে, দুদিনেই বংশবৃদ্ধি হয় । বাঁশের খাপ থেকে বেরোয় রক্তচোষার দল । ছফুটের মতো দীর্ঘ মানুষটির কোনও বিরক্তি নেই একটু উসখুশ ছাড়া । আর, ভালমানুষ দেখলেই মারে চড়থাপ্পড় । বৈতল মেয়েকে নিয়ে যায় যদি সাধুমানুষ দু একটা চড় মারে সোনাকে । বৈতল জানে ভগবানের দরবারে এক নিয়ম চলে না । মামু সোনাকে দেখলেই হাততালি দেয়, যেন অনেকদিন পর খেলার সাথির দেখা মিলেছে । মামুর বাড়িতে তখন উৎসব হয় । একা দোক্কা খেলে ফকির । সোনার বাড়ি ফেরার সময় হলে চোখের জল ফেলে মামু । মামু ইশারায় বলে আবার আসবে তো । খুকি তিলোত্তমা মাথা হেলিয়ে বলে,
--- আইমু রেবা, আইমু ।

ত্রিশ

বাড়ি ফিরে দুর্গাবতীকে না পেয়ে আবার অধৈর্য হয় বৈতল । ভুলে যায় মেয়েকে দেওয়া কথা । দুর্গাবতীর সঙ্গে ঝগড়া না করার, দুর্গাবতীকে কষ্ট না দেওয়ার শপথ কথা । ভোলার বাড়ি, কেতুমামার বাড়ি, পুনামাসীর বাড়ি গেলে কোনও কথা নয়, দুর্গাবতীর এখন সর্বক্ষণের ঠাই ওই দালানবাড়ি । দুর্গাবতী যতক্ষণ যমুনাপ্রসাদ ততক্ষণ । জানিগঞ্জে একটা অফিস আছে কাছারি রোডে আর এক অফিস, এখন কোথাও যায় না, কাছারিঘরকেই অফিস করেছে । আর দুর্গাবতীও ঘনঘন চা করে দেয়, নিয়ে যায় বন্ধ ঘরের দরজা খুলে । ঘরে তুলসীতলায় সন্ধ্যাবাতি দেওয়ার কথাও ভুলে যায় দুর্গাবতী । চেষ্টা করে দুর্গাবতীকে ডাকে বৈতল । কোনও জবাব আসে না । মেয়েটার খাওয়ার সময় এখন, কে খাওয়াবে । মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখে যায় ইটখোলার মোড়ে, কিনে আনে এক কৌটো মুড়ি আর ভাইয়াজির দোকান থেকে পেঁয়াজি দুটো, লাল তুলোর মতো হাওয়াই মিঠাই কেনে কাঠিতে জড়ানো । ততক্ষণে দুর্গাবতী দিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে এসেছে । বৈতল কাঠি মিঠাই মেয়ের হাতে দেয় । মুড়ি পেঁয়াজি ফেলে বিছানায় । রাগ দেখিয়ে একটা খায়, এক মুঠো মুড়িও খায় । বৈতল রাগলে পারতপক্ষে রা কাড়ে না দুর্গাবতী । চুপ করে থাকে । বৈতল বলে,

--- অউ কই দিলাম, আমি আর ফিরতাম না ইবাড়িত ।

দুর্গাবতী শোনে । দুর্গাবতী হাবভাব দেখে বোঝে মতলব । দুর্গাবতী জানে আজ তার মানুষ যাবে নাগাপট্টি । মদ খাবে, দুর্গাবতী ভুলতে যাবে মধুবালার ঘরে । বৈতল ধরা পড়ে যায়, দুর্গাবতীর কাছে কিছুতেই নিজেকে লুকোতে পারে না । তাই রাগের গম্ভীর মুখ থেকে ফিক করে হাসি বেরিয়ে যায় । হাসতে হাসতে রাগের মুখ করে । আবার হাসে । সাজানো রিক্সা পক্ষীরাজের প্যাডেলে পা দিয়ে আবার হাসে । দুর্গার উপর রাগ করে দুর্গার পয়সায়ই মাল খাবে আজ । ছিকিতে জমানো দুর্গাবতীর সঞ্চয় সরিয়ে রেখেছে আধুলি সিকি । বৈতল আবার হাসে, আবার গান গায়, মধুবালার কাছে যেদিন যায় বৈতল, তার প্রস্তুতি থাকে সকাল থেকেই । দুর্গাবতীতে মন মজে থাকলে ওর আর কোথাও যাওয়া হয় না । তাই অকারণ দুর্গার সঙ্গে

একটা লড়াই বাঁধিয়ে নেয় । রিক্সার ঘণ্টিতে কিরিং কিরিং বাজায় ধীরে, প্যাডেলে পা রেখে
টাল ঠোকে, গান গায়,

রূপ দিয়া রূপ ধরতে গেলে রূপের পানে চাও

বদরপুরের নিকটে রূপসীবাড়িতে যাও ।

দুর্গাবতীতে একঘেয়েমি কাটাতে বৈতল যায় চৌদ্দ নম্বর । মধুবালায় গলির নামকে কেন যে
মানুষ ও নামে ডাকে বৈতল জানে না । বৈতল সেদিন গাঁজার আসরে, চোখের রঙে রঙে
চড়িয়ে বন্ধু বহুইকে প্রশ্ন করে,

--- কেনে বে । চৌদ্দ নম্বর কেনে ।

বহুই হাসতে হাসতে বৈতলকথা দেয় আপদকে । বলে,

--- কেনে বে ।

আপদও গাঁজার কল্কে দেওয়ার মতো বৈতলের প্রশ্ন দেয় নেশাহীন দুখুমিয়ার কাছে । দুখুমিয়া
হাসে মধুর মধুর ।

মধুর ঘর ।

প্রেমতলা পেরিয়ে চৈতন্য প্রেসে সওয়ারি নামিয়ে দেয় বৈতল । বরদা কলোনির অন্ধকারে
নামিয়ে নেয় পক্ষীরাজ, বাঁদিকে কিছুদূর গিয়ে পানুর কাছে জিম্মা রাখে রিক্সা । পানুর ঘুগনির
বাঁধা খন্দের বৈতল, তাই চেনা জানা ।

মধুর ঘরে ঢুকেই গালাগাল দেয় বৈতল । বলে,

--- শালি ।

বলে,

--- রাণ্ডি ।

মনের দুঃখে গালাগাল করতে ভাল লাগে । মাগনা তো না, পয়সা দিয়ে গালি দিচ্ছে বৈতল
। মধুবালায় টিনের ঘরে আজকাল দেবানন্দের এক মস্ত পোস্টার লাগিয়েছে, হাতে মদের

বোতল । ছবিটা দেখলেই বৈতলের রাগ ধরে, মনে হয় বৈতল আসার আগেই বাবু ঢুকিয়ে বসে আছে । মধুর ঘরে মদ খেয়ে রাগ কমে । নেশার পেটে ভাললাগা চুইয়ে চুইয়ে পড়ে । একশবার বলা কথা আবার বলে,

--- তর আসল নাম কিন্তু অখনও কইলে না মধু ।

মধুবালা মিটিমিটি হাসে । বলে,

--- আমার আসল নাম মীনাকুমারী ।

--- আইচ্ছা গো মিনু, একটা মামলেট ভাজিয়া দিবায় নি ।

দেশি মদের সঙ্গে এসব চাটের আদার করে বৈতল । মধুবালাও জানে আজ রিক্সাওয়ালার পকেটে মাল আছে । দুর্গাবতীর চিকির ভাণ্ডার চুরি করে এনেছে যে । মধুকে বলে,

--- তুই একটা খাইতে না । খা ।

আসলে শরীর মন সবই যখন বিবশ থাকে দুর্গাবতীর অদেখা উপেক্ষায় বৈতল অবলম্বন খোঁজে । দুর্গার পয়সায় দুর্গার উপর অভিমানের ঝাল মেটায় বৈতল নাগাপট্টির বেশ্যালয়ে । এতেই মনে ফুটি হয় । মধুবালাকে বিচারক করে গল্প জমায় বৈতল । বলে,

--- বাপ অইলে নাচত পারে না নি ক ।

বৈতল জানে মধুবালা জানে না কিছু অগ্রপশ্চাৎ । জানে না বৈতলের গুরমি নাচ নিয়ে দুর্গাবতীর কটাক্ষকথা । জানে না বারবার তার পৌরুষ নিয়ে সন্দেহ, জানে না এক লম্পট ধনীর সঙ্গে তার তুলনা । তুলনায় নামিয়ে আনা নিচে । তবু মধুবালার সমর্থন চাই তার । মধুও প্রতिसংলাপে জড়ায় নিজেকে । বলে,

--- কেনে পারত না ।

--- গাইত পারে না, ক ।

--- পারত না কেনে ।

--- আমি নাচি, গান গাই মনসামঙ্গল । কয় বাপ অইলে বুলে কেউ নাচে না ইলাখান ।

--- কে কয় ।

--- কে কয় জানিয়া তর কিতা রে শালি ।

ঝনঝনাং টাকা দিয়ে বৈতল বেরিয়ে আসে মধুবারার ঘর থেকে । এত বড় সাহস তার দুর্গাবতীকে নিয়ে প্রশ্ন করে । বৈতল চড়ে বসে তার রথে । আবার গালাগালি দেয় আপন মনে একা একা । বলে,

--- রেণ্ডিবেটিয়ে ভাবছে কিতা । ঘরর বৌর কথা আমি কইমু তাইর কাছে । হালির ঘরর হালি ।

শীতের শহর দশটা বাজতেই কাত । যদিকে ঢুকেছিল সেদিকে বেরোয় না বৈতল । সোজা পানপট্রি দিয়ে গোলদিঘীর পার । নয়আনি দোকান সব বন্ধ । অন্য সব ব্যবসায়ীরা বাড়ি ফিরছে পায়ে হেঁটে । রিক্সাওয়ালাকে পয়সা দেবে না দুআনা । নয়আনি দোকান বন্ধ হলেও গোলদিঘীর পার জমজমাট । নট কোম্পানির যাত্রা হচ্ছে সোনাইদিঘী । ভাবনা কাজির হাসিতে ফেটে পড়েছে আসর । যাত্রা দেখতে ভাল লাগে বৈতলের । পৃথক মহিলাসন থাকলেও বাড়ির বৌ ঝিরা মাঠে বসে যাত্রা দেখে না । যাত্রা দেখা পছন্দও করে না মেয়েরা । দুর্গাবতীও বলে,
--- যাত্রা দেখে ফাত্রা লোকে ।

ওরিয়েন্টেল সিনেমা হল সেকেণ্ড শো চলছে নাগিন । বৈতলের প্যাডেল ঘোরে দ্রুত । কলাবতী পেরিয়ে চিনা জুতোর দোকানিদেরও ঝাঁপ বন্ধ । কলাবতীতে চলছে রঞ্জনের হিন্দি সিনেমা ‘সোর্ড ফাইটার’ । জ্যোৎস্না চন্দর বাড়ির সামনে ভিড় কয়েকজনের । নির্বাচনের পোস্টার লেখা হচ্ছে । জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ, কংগ্রেসের প্রতীক । ইস্টবেঙ্গল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আর পালোয়ানের দোকানেও নেই আগামীকালের প্রস্তুতি । পালোয়ানের নাম জানে না কেউ, লাল লেংটি পরে যে পালোয়ান মুণ্ডর ভাঁজতে যায় ভোরের সাপনালায় তাকেই চেনে চাওলা হিসেবে । চায়ের সঙ্গে থাকে ময়দার বিহারি মিস্টি । গীতশ্রীতে নীলাচলে মহাপ্রভুর পোস্টার খুলছে দুজন কর্মচারি । চা বাগানের সাহেবদের আজ ক্লাব দিন । সিনেমা হচ্ছে কাছাড় ক্লাবের দোতলায় । রাস্তা থেকে দেখা যায় ইংলিশ সিনেমার নড়াচড়া । সব সাদা কালো রং । আজ কোন চিনা প্যাসেঞ্জার নেই । ইটখোলা ঈদগার সামনে আসতেই আঁধার ফুঁড়ে উদয় হয় দুখুর । ধপ করে উঠে বসে রিক্সায় । বলে,

--- মাতিস না জলদি চালা । রায়ট লাগি গেছে বেটা ।

--- কিতা কছ ।

--- গিলানি সায়েবরে চাকু মারছেমধুর বন্দো ।

--- গিলানি সাহেব কে জানে না বৈতল । তবে আতঙ্ক একটা জানে । নাগাপট্টি থেকে ফিরতে ফিরতে নেশা কেটে গেছে তার । শহর জুড়ে এক অবিশ্বাসের তোলপাড় শুরু হবে । বৈতলের জীবনে এই প্রথম শহুরে দাঙ্গার অভিজ্ঞতা । গ্রামে এসব নেই । আল্লা হো আকবর আর রামদা নিয়ে লক্ষবর্ষ শেষ হয় রায়টে । পালোয়ানের দোকানের সব কাজকর্ম কেমন নীরবে হচ্ছে আজ । অন্য রাতে বিহারি গানের জলসায় জমজমাট থাকে । বৈতলও একবার প্যাডেল পা রেখে থামে, চিৎকার করে যায় রামা হৈ । পরিচিতি পরিবেশ অন্যরকম হওয়ায় তখনই পেটে মোচড় দেয় বৈতলের । একটু গা ছম ছম । গুডলাক আর শিলং টেলার্স-এর দোকানেও আড্ডা নেই, ঝাঁপ বন্ধ । উল্টোদিকে সুনসান গীতশ্রী সিনেমার পাশে একা গোবর্দ্ধন পাল তার ভূষিমালা দোকানের ভিতর ঢোকাচ্ছে আপনমনে । এই একটা লোকই আছে শহরে যার কোনও হেলদোল নেই, দাঙ্গা হল না ভূমিকম্প হল, কিছু যায় আসে না । ভূষিমালের জঞ্জালে বসে হাসি মুখে চাল ডাল তেল নুন বিক্রি করে যায়, কেউ মাল নিয়ে পয়সা না দিয়ে চলে গেলেও কিছু বলে না । বৈতল জানে গোবর্দ্ধনদাকে বলে কিছু হবে না । তবু বলে,

--- কিতা অইছে বা গুবরধনদা ।

--- কিতার কিতা অইত, অখন কিছু পাইতায় নায় । দুকান বন্ধ করি দিছি । জ্বালাইও না যাও ।

--- এক ছটাক হইরর তেল দিলাও রেবা ।

বৈতলের মনে পড়ে সিটের নিচে রাখা তেলের শিশির কথা । দড়ি বাঁধা শিশিটা দেখে কী জানি ভাবে গোবর্দ্ধন । তেল দেয় । বলে,

--- অখন যাও । পয়সা পরে দিও, অবস্থা ভালো নায় ।

তখনই বুঝেছে কিছু একটা ঘটেছে । পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে এসেও যে একই আতান্তর, বৈতলের রাগ হয় । রাগ হয় নিজের উপর, রাগ বন্ধু দুখু মিয়ার উপর । রিক্সা

থামিয়ে দেয় । ইদগার গায়ে নালাব এপারে ডুমুর গাছের নিচে রিক্সা থামায় । কিছু বলতেও পারে না । অসহায় আক্রোশে ভাবে দুখুকে ফেলে দেয় নালাব জলে, রিক্সাসহ ফেলে দিলে কেউ কিছু বুঝবে না । এক গিলানির সঙ্গে আর এক মিয়া কমবে । বৈতল কিছু করার আগেই তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে আঘাত ।

দুখু বৈতলের রিক্সা থেমে যাওয়ার কারণ বোঝে না তাই বৈতলের ঘাড়ে দেয় ধাক্কা । বলে,
--- অই বেটা, বাঁচতে চাইলে চালা, থামলে কেনে ।
--- চলত নায় । আমার রিক্সা আর যাইত নায় ।
--- কেনে বে মরা, মরবে নু ।

বৈতল অন্ধকারে সিটের উপর রাখা কোমর ঘুরিয়ে দুখুকে দেখার চেষ্টা করে । দুখুর উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করে । এই লোকটাই কি তার একমাত্র বন্ধু এই দেশে যে তার ধর্ম পরিবর্তনের ইচ্ছায় বাধা দেয় প্রবলভাবে । বলে,

--- তর মুসলমান হওন লাগত নায় ।

সেই লোকটাই কি এখন রাতের অন্ধকারে অমুসলমান বলে তাকে খুন করতে চাইছে । চাকু মারবে তাকে । জাতভাই এর মৃত্যুর বদলা নেবে ছুরি মেরে । বৈতলের রাগ অভিমানে পাল্টায় । আর তখনই হয় অসহায় । ডাকে তার গুরুকে । গুরু সৃষ্টিধর বৈতলকে রক্ষা করেন সব অসহায়তা থেকে । গুরু জানেন বৈতলের নাকের ডগায় রাগ । তাই বারবার বলেন,

--- তুমার গুসা কমানি লাগব । আর কথায় কথায় হিন্দু বাঙাল হিন্দু বাঙাল করিও না । মানুষ মানুষ অউ হয়, মাটি আর পানিয়ে বানায় মানুষ । পঞ্চভূতে বানায় শরীর, হিন্দুর ও মুসলমানরও । এক এক জাগার মানুষ এক এক রকম । এর লাগি উ তুর্কি সাধু শাহজালালে তান দেশ এমেনর মাটির মিল পাইছলা ছিলেটো । ছিলেটি মানুষর মন বড় নরম রেবা একেবারে তুলতুলা মাটির দলা । হিন্দু অউ কও মুসলমান অউ কও তুমার লাগি জান দিব, খাওয়াইব, পিন্দাইব, আদর করব । কিন্তু উস্কাই দিলে কিতা করবায়, একলা বাঙাল খুব ভালো, দল বান্দিয়া আইলে কিতা করবায় । রায়ট উয়ট লাগলে আর মানুষ মানুষ থাকে না । আবার রায়ট লাগলে মানুষর পরিচয়ও পাওয়া যায় । অউ যে কইলাম জান দিয়া প্রাণ বাঁচায় ।

বৈতল গুরুর কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না । যতই দোস্তি করুক, বড় কটুর মুসলমান দুখু । বৈতল দুখুর কথায় তাই প্যাডেল ঘোরায়ে না । বলে,

--- তোর ঘনিয়ালাত গেলে যখন মারবেউ, অখন অউ মারি লা ।

--- অই হালার হালা, জবাই হওয়ার সময় হইবে, অখন ভাগ ।

--- কই ভাগতাম ।

--- তোর যেবায় ইচ্ছা । ইটখলাত তোর বাড়িত গিয়া ঢুক ।

--- আর তুই । তুই কিতা আমার লাগি আইচছনি ।

--- দুখুর লাগি ভাবিছ না । আমারে মারনেওলা অখনও পয়দা অইছে না । ইলা কত রায়ট দেখলাম । তুইন লতুন আইচছ । বুঝতে নায় ।

--- কিতা বুঝতাম নায় ।

--- পাকিস্তান থাকি আইচছ ভাবরে হিন্দুস্থান, শ্বশুরবাড়ি সরগোপুরি । অখন দেখবে নে সব অউ এক হুরইন বাড়ি ।

--- তুই অউত্ত বেটা ঝাণ্ডা উঠাছ চান্দ তারা । আল্লাউ আকবর করছ । পাকিস্তান জিন্দাবাদ করছ ।

--- পাকিস্তানো গেলে ভালো হইব-এর লাগি করি ।

--- কিছু অইত নায় । হরু মানু কুনু দিন বর অইত নায়, বেশি অইলে তেলি অইব পাল, নাপিত দারোগা অইব, দেখাইব বাল । তুমার কিতা হালার হালা, গোবর্দন পাল । তুই অইবে ইমাম ।

--- অখন ইতা বাবনাকি মাত মাতার সময় নায় । আপনে বাচলে বাপের নাম ।

--- কিওর নাম । বাপও নাই কেউ নাই । সেন্টেল রোডে শিলং টেইলার আর গুডলাক বন্ধ দেখিয়াউ বুঝি লাইছি । অখন থাকবা লেংটা ।

বৈতলের শেষ কথাটা দুখুর বোধগম্য হয় না । রায়ট লাগলে ন্যাংটা থাকবে কেন । কে থাকবে । দুখুকে রহস্যে রেখে বৈতল আবার বলে,

--- থাকবা না খাইয়া ।

--- কিতা মাতছ বেটা, পাগল উগল অই গেলে নি ।

পাগল হয়নি বৈতল । নিজের সঙ্গে লড়ছে সে । ভাবছে দেশ তো ভাগ হয়ে গেছে, হিন্দুস্তান টুকরো হয়েছে, পাকিস্তান হয়েছে । দুই ধর্মের লড়াই কেন থামে না তবে । গুদলাক আর শিলং টেলার্স শহরের দুই নামকরা দরজির দোকান । সব কর্মচারী এবং মালিক মুসলমান, ওদের যদি এখন এই দাঙ্গায় উৎখাত হতে হয় তাহলে বাহারি কাপড় সেলাই করে দেবে কে । বাবুরা কি ন্যাংটো থাকবে । শহরের কশাই বলতে বেচুদা, দশাসই পাঠান মানুষটা ডালায় করে কাটা মাংস পোঁছে দেয় বাড়ি বাড়ি । নির্বিরোধী মানুষটাও মুসলমান । বেচুদা চলে গেলে বাবুরা কী খাবে । পাটনাই খাসির মাংস আর কে বেচবে । কী জানি, হয়তো কিছুই কারো জন্য আটকে থাকে না । কিন্তু একটা ছন্দপতন তো হয়, ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে । নতুন করে আরম্ভ হয় । বইয়াখাউরিতেও তার বাপের মতো মাছুয়া দুজন নেই, বাপের বেটা বৈতলও তো কম কেরামতি দেখায় নি সুনামগঞ্জের হাওর জলে । ভাটির দেশের সম্পদ রক্ষা করেছে, গোটা জেলায় মাছ সরবরাহ করেছে বৈতলের মতো কৈবর্ত সমাজ, মাইমলেরা । এখন যে পালিয়ে চলে এল নতুন দেশে, ওদেশের ভাটির জল কি থেমে থেকেছে । বৈতলকে ডেকেছে, তুমি ছাড়া চলছে না চলে এসো । দেশভাগের সময় এবং তারও পরে বৈতল দেখেছে মানুষের দুর্দশা । তবে দেশভাগ গরীব মানুষকে যত না দুর্দশায় ফেলেছে, বাবুরাও কম কষ্ট করেনি । গরিবের কিবা দেশ, কিবা বিদেশ । খাটতে খাটতে খাও, খাটনি নেই তো চলে যাও । বাবুরা থাকে নিশ্চিন্তে, যা-ই করুক তাদের একটা স্থায়ী আয়ের উৎস থাকে । ধর্মের দেশভাগ বাবু মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়নি । ঘর বাড়ি পুড়েছে দাউ দাউ, গুজবের আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে । তাও ওরা বুদ্ধিমান, তাই ঘরবাড়ি বেচে বদলাবদলি করে চলে এসেছে নিজ নিজ পিতৃভূমিতে । এসেছে কাছাড়, ত্রিপুরায়, আসামে । সিলেটি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে গেছে কম । চাষাভুষো কৈবর্তদের এত বুদ্ধি নেই, ওরা ঝগড়াঝাটি মারামারি করেছে, ভিটে ছাড়েনি । শহরের মানুষের উস্কানিতে বেদম মার খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে শূন্য হাতে । খেতের জমি কিংবা হাওরের জল ওরা বদলাবদলি করতে পারেনি সবাই । এখানে এসে দেখেছে অন্যরূপ,

এখানে শহরের হিন্দু মসলমান আলাদা আলাদা থাকে আর ফুসফাস করে । নিজের এলাকায় নিশ্চিত থেকে উস্কানি দেয়, মন্দিরের দরজায় গরুর গোস্তু ফেলে দেয়, মসজিদের সামনে শুওরের মাংস । দূর থেকে বলে নারদ নারদ । বৈতল নিজেও কেমন সুরক্ষিত, হরিৎবরণ জমিদার বাড়ির দুর্গে স্ত্রী কন্যাসহ সে সুরক্ষিত । তাই, রিক্সা থামিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবতে পারে । আর ইদ্গা এত বড় হলে কী হবে, চারপাশের সব বসতি হিন্দুর । ঘনিয়ালা হলে আর এতক্ষণ ভাবার সময় পাবে না, কল্লা উড়ে যাবে । নিজের কথা ভাবতে ভাবতে বৈতল দুখুকে নিয়ে উতলা হয় । কী করবে এখন এই একরোখা বাঙালকে নিয়ে । দুখুর মতো বিপরীত বুদ্ধির মানুষ তো দুটো হয় না । নিজেকে বিপন্ন করে এখন সে বৈতলকে রক্ষা করবে । বৈতল মুহূর্তেই সম্মিত ফিরে পায়, রিক্সার সিটে কোমর ঘুরিয়ে বলে,

--- অয় পাগল অই গেছলাম, এখন চল ।

বৈতলের এখন বড় দায়িত্ব বন্ধুকে রক্ষা করা । দুখুকে ইটখোলা, হরিৎবরণ পার করে দেওয়া । তারপর সে যা পারে করুক, পাকিস্তান জিন্দাবাদের জিগির তুলুক না হয় পাকিস্তানেই চলে যাক চাঁদ তারা নিয়ে, বৈতলের কী । মুসলমান হলেই কেন পাকিস্তানপন্থী হয় বুঝতে পারে না বৈতল । ওদেশে থাকতে দেখেছে হিন্দুদের দুরবস্থা শেষ সময়, হিন্দু মানেই ইণ্ডিয়ার গুণ্ডচর । দুই বাংলা এক করার চক্রান্তকারী । পাকিস্তানে হিন্দু অবিশ্বাস এখনও মারাত্মক আকারে রয়েছে । ওখানে সবাই পাকিস্তানি আর হিন্দুরা বাঙালি । মুসলমান বাঙাল । বৈতলের গুরু সৃষ্টিধর বলেন বিবর্তনের কথা, ধর্মান্তরের কথা । বলেন বাংলাদেশে তখন বৌদ্ধধর্মের রমরমা, বৌদ্ধরা মাথা মুড়িয়ে ন্যাড়া হয়ে থাকে । মুসলমান বিজয়ের পর বৌদ্ধদের হলো ধর্মান্তর । ন্যাড়া থেকে নেড়া, নেড়া থেকে লেড়ো । নতুন মুসলমান হলো বাংলায় । এই সিলেটেও বাঙালি হিন্দুরা মুসলমান হয়ে হয়ে যায় বাঙাল । গুরু মজা করে বৈতলকে বলেন,

--- তারা অইগেলা বাঙ্গাল আমরা বাঙালি । তারা পুংলিঙ্গ আমরা স্ত্রীলিঙ্গ ।

গুরু নিজেই বলতেন তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কম । সব পার্টির কমরেডদের কাছ থেকে শোনা কথা । দেশে এখন হয়েছে নতুন উৎপাত, অশিক্ষিত গ্রাম্য বা বস্তিবাসী মুসলমানদের বোঝানো হচ্ছে ওরা ভুল করে ইণ্ডিয়ার বাসিন্দা হয়ে গেছে । সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট হাইলাকান্দি লালা কাটলিছড়া বদরপুরে পাকিস্তানের পতাকা উঠেছে । তারপর ত্রিপুরাকে ছিটমহল হওয়া থেকে বাঁচাতে নতুন করে সীমানা নির্ধারণ করা হয় অদলবদল করে । পাকিস্তান হয়ে-যাওয়া

ভূখণ্ড আবার ভারত হয় । তাই মনের দুঃখে চক্রান্তের কথা বলে । ভুল স্বপ্ন দেখায় স্বদেশ
পাকিস্তান ফিরে পাওয়ার, তাই পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে চাঁদ তারার পতাকা ওড়ে কোথাও
কোথাও । গরমাগরমির তো সবে গুরু, গিলানি সাহেবকে চাকু মারার উত্তেজনা চলবে
কিছুদিন, দুদশজন মরবে, কারফ্যু হবে । তবে শান্তি । হরিৎবরণের নিশ্চিত হিন্দু এলাকায়
এখানে ওখানে জটলা, নিরীহ মানুষ সংগঠিত হচ্ছে । সন্দেহের চোখে দেখেছে বৈতলের রিক্সা,
চেনা মানুষ বলে থেমে যাওয়া সংলাপ আবার শুরু করে । বলে,

--- মরত নায় । গিলানি মরত নায় । কাঠুয়ার পরাণ ইতার মরে না ।

বৈতল দুখকে নির্দেশ দেয় । বলে,

--- চুপ মারি বই থাক । নামিছ না । আমি তরে দিয়া আইমু ।

দুখু লাফ মেরে নামতে চায়, বৈতল পিছন ঘুরে মারে এক থাপ্পড় বেঁটে গাটা মানুষটাকে ।
বৈতলও পক্ষীরাজ ছোটায় ঘনিয়ালার দিকে । ঘনিয়ালায় ঢুকতেই জিগির ওঠে ‘নারায়ে
তকবির’ ‘আল্লা হো আকবর’ । মিলিত কণ্ঠস্বর থেকে প্রতিজ্ঞা ওঠে ।

--- ‘সিলেট নিলাম ভোটের জোরে, কাছাড় নিমু লাঠির চোটে ।’

বৈতলের পরাণে বারবার মনোব্যথার গুমোট । ভাবে, এ কেমন মানুষজন্ম মানুষ না
পায়খানার গু । বাড়ির পায়খানা থেকে নাগা জমাদারনির মাথায় । মাথার টিন খালি করে
আসে খাসিয়াপট্রির মালগুদামে, গুদামের মাল আবার যায় গুয়ের গাড়িতে, কোথায় যায় কে
জানে । তবে বৈতল জানে যেখানেই যায় দুর্গন্ধের অশ্রদ্ধায় যায় । বইয়াখাউরি থেকে গু-এর
টিন হয়ে এল ইণ্ডিয়ায়, ইণ্ডিয়ায় এসেও উৎপাত কমে না, আবার কি যেতে হবে মালগুদামে
বোঝাই হয়ে । শুনছে জল-নেই দেশে নিয়ে যাবে, দণ্ডকারণ্য যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছে ।
লেখালেই কি যেতে হবে । কোথায় যাবে বৈতল । কত ঘুরবে, কোথায় হবে তার শেষ আপন
দেশ । নিজের দেশ বইয়াখাউরির ভাটি ছেড়ে, জল ছেড়ে, বড় হাওরের হাওয়ায় চাদর ফেলে
চলে এল দুর্গা ভরসা করে এই ভিনদেশে । মুখের ভাষা এক বলে আবার যেন ঝাঁকে মিশে
যাওয়া । আবার সেই শ্রাবণী, মনসা আইর পূজো, গুরু সৃষ্টিধর ওঝার কাছ থেকে শেখা
মনসাপুঁথির গান, ঢলানি জিয়ানি । দুখুর সঙ্গে লড়ালড়ি । লুলার বন্ধুত্বের ছায়া । বৈতলের ভয়
লুলাকে হারিয়েছে, এখন না দুখুকেও হারাতে হয় । তাই সবসময় খটাখটি করে বন্ধুত্বের বাঁধন

শক্ত রাখছে । জিয়ানির শেষে বৈতলের মন খারাপ থাকে । গায়কের তো আনন্দ হওয়ারই কথা, একে একে সব হাড় জুড়ে যায়, বিপুলা ও লক্ষ্মীধর দেশে ফিরে আসে । চান্দেও পদ্মার পূজা করে,

‘বামহাতে পূজা কৈল চান্দ অধিকারী ।

তাহাতে সন্তুষ্ট হইলা জয় বিষহরি ।।’

সবই তো সুখের হয় । মনকাষ্টের নাওখানি শূন্য করে ওড়া বৈতলের মন খারাপ হয় সারা বছরের আয়োজন সমাপন হওয়ায় । আবার এক বছর, দুর্গা বিসর্জনেও এত বিষাদগ্রস্ত হয় না বৈতল । বৈতলের মনে হয় যেন জীবনটাই শেষ, সব পানসে । ধড়াচুড়া খুলে আবার লুঙি গামছা পরে বেরিয়ে পড়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ।

উপন্যাস

একত্রিশ

ভাদ্র মাসের শুরুতেই বাতাসহীন গুমোট গরম । মনসা আইর জন্ম ভাদ্রমাসে, তাই এত গরম, শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরেরও জন্ম ভাদ্রমাসে তাই দুএকদিনের হাওয়া বাতাস । মামুর বাড়িতেও মাঝে মধ্যেই মোচ্ছব হয়, দুখু লাগিয়ে দেয় এটা ওটার উৎসব । দুখু বলে, ওয়াজ । বলে,

--- তুই বেটা চাচ, তর হক্কলতা আমরা জানতাম, কিন্তু আমার মজহবর কিতা কেমনে হয়, কিচ্ছু জানতে নায় ।

--- কিতা জানতাম । ইদ হয় জানি, বকরিদো ছাগল গরু খাছ, অউত্ত জানি ।

--- আর ওয়াজ ।

--- ওয়াজও জানি । ওয়াজ করি নমাজ পড়া হয় ।

--- ওয়াজো ভালা ভালা কথা কওয়া হয় । নামকরা মৌলবী আইন । জলসা হয় ।

--- আইচ্ছা বেটা মৌলবী, তর আর ইমামতি করন লাগত নায় । ক চাইন তর নবির জন্ম কোন মাসো ।

--- নবির জন্ম ।

মহাবিপদে পড়ে যায় দুখু । আপদের দিকে তাকায় । বলে,

--- কই দে ইগুরে ।

দশাসই আপদ আলিও সঙ্গে সঙ্গে বছইর কাঁধে হাত দেয় । বলে,

--- ক বেটা বছই, মুসলমান অইয়া নবির জন্ম জানত নায়, অত আডুল পাইল নি আমরা কই দে ।

শেষ পর্যন্ত দুখুর কাছেই আবার ফিরে আসে প্রশ্ন, এবার দুখুর আর দোলাচল নেই, প্রত্যয়ে ভর করে বৈতলকে বলে,

--- তর মতো বারো মাস নাই আমার । নবি দিবস ঘুরি ঘুরি আয় । যেলাখান ইবারর ইদ পড়ব আশ্বিন মাসো । অলাখান । আর তুইন বেটা ইতা দি কিতা করতে ? তর আর বাঙ্গাল হওন লাগতনায় নু কই দিলাম ।

--- না, তেও, জানি রাখা ভাল । নাইলে তুই অউ কইবে কিচ্ছু জানি না ।

ফতেহা দোয়াজ দহম এর উৎসব, মানে নবি দিবসও খুব ধুমধামে হয় মামুর খানকায় । মাটিজুরির ঠিকাদার সাজিদ আলি টাকা দেয় উৎসবের । সাজিদ ভাই দুখু বহুই আপদ আর বৈতলের জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করে । বলে,

--- তাইন তো পির, দাতা । আপনারা তান খাদিম, আপনারা খুশ অইলেউ তাইন খুশ । তে একখান আর্জি আছে আমার । করি দিবানি ।

দুখুর ধূর্ত চোখে মিটিমিটি হাসি । বলে,

--- জবাই তো করি লাইছইন, আবার কেনে বিসমিল্লা করবা । কইন ।

--- যাইতাম নি । তে কই লাই । মামুরে লইয়া আমার দলিজে পাও রাখবা আপনারা একদিন । আমি গাড়ি পাঠাই দিমু ।

--- দলিজ কেনে । আর ভিতরে যাইত নায় নি গাড়ি ।

--- কিতা যে কইন, আমার মঞ্জিল অউত্ত মামুর । তাইন অউ মালিক । তান দোয়া না থাকলে কিচ্ছু অইত নায় । টেম্পু গাড়ির হেণ্ডিমেইন অইয়াউ থাকলাম নে ।

মাটিজুরির মানুষ সাজিদ মিয়াও বৈতলকে ধর্মপ্রাণ খাদিম বলে ধরে নেয় । পিরের তল্লিবাহক মানেই পাক বান্দা । আর দুখুরও কোথাও যেতে বৈতলকে চাই, সে চুরির কুটুস্থিতায় হোক, গাঁজার আসরেই হোক, এদিক-ওদিক ভ্রমণেই হোক । দুখু জানে পিরের সঙ্গ দেওয়া মানে ধর্মীয় নিয়মকানুন, আর বৈতল কোথাও কখনও বেমানান হয় না । বৈতল মিয়া আর আপদ আলির ফারাক থাকে না, বৈতল থাকলে দুখুর চোখ বেড়ে যায় একজোড়া । বিপদ আপদ ধারে কাছে থাকে না, তার উপর মামুর প্যার, বৈতল কাছে থাকলে মামু সব কথা শোনে । তবে গাড়ি পাঠানোর কথা ঠিকঠাক হওয়ার পর সাজিদ মিয়াই ক্যাচাল বাঁধিয়ে দেয় । বহুইর বৌকে নিয়েই উৎপাত । সাজিদ আলি মানুষটা দিলদরিয়া হলে কী হবে, একটু বেটিঘেঁষা ।

পরের বৌ-এর পিছনে ছোটর অভ্যেস । আপদ আলির বৌ বারমাসের বেমারি, দেখতে
শুনতেও তেমন সুন্দরী নয়, কাটাখোঁটা চেহারা । আপদ বলে তার বৌ ‘পরি থাকিও ভাল’ ।
কেন জিজ্ঞেস করলে বলে,

--- নিজে দেখিয়া নিকা করছি । মা বাপে দেখিয়া করাইলে কইতাম ইনো খুত হিনো খুত ।
দুই বেলা তো রান্দিয়া দেয় অখনও । তে ।

বিপত্তি হল বহুইর বৌকে নিয়ে । দুখু আবার ছড়া কেটে বহুইএর রূপ বর্ণনা করে । বলে,
--- বড় বিলর ঢেউ, ফালদি উঠে রউ ।

বড় মামুএ বিয়া করলা গদা মারা বউ ।

আপদ বলে বহুইর বৌর সঙ্গে দুখুর লেটপেট আছে । দুখু বহুইর বৌকে আদর করে
‘পেদেলি’ বলে ডাকে । মোটাসোটা বাঙালি ঘরের আদুরে বৌ বহুইর । একটা পুরুষ টানার
আকর্ষণও আছে । তাই সাজিদ মিয়া বহুইকে বলে,

--- ভাবিজিরেও লইয়া আইও বহুই ভাই ।

বহুই খুশি হয় । বলে,

--- গাড়িত জাগা অইব নি ।

মামু ঘোঁৎ করে বারণ করার আগেই বৈতল বাধা দেয় । বলে,

--- ভাবি অখন কেমনে যাইবা সাজিদ ভাই । ভাবির নু অইতা ।

না জেনেই বলে দিয়েছে বৈতল । পিরের চেলা তো, মুখের জবান লেগেও যেতে পারে ।
গরিবের যুবতি স্ত্রী গর্ভবতী থাকবে না এ হতে পারে না । অবাক চোখে বহুই
বৈতলকে দেখে । আর করুণ চোখে সাজিদ মিয়াকে নিরাশ করে ।

মুসলমানের মেয়ে বৌ সঙ্গে নেওয়ার অনেক ঝামেলা । রিক্সা চালাতে চালাতে বৈতল
দেখেছে, শাড়ি কাপড় দিয়ে রিক্সাকে একেবারে লখিন্দরের বাসর বানিয়ে ফেলে । বোরখায়
ঢাকা থাকে নারী, তার উপর পুরনো শাড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় রিক্সা । বৈতল এসব ঘোমটা

বোরখার খেলাপ । দুর্গাবতীরও এসব কোনও ঢাকাটুকি নেই । চুরি করে শরীরের এক আধ খাবলা না দেখলে কিসের পুরুষ । চরিত্রহীন জমিদার ব্যাটাও তো দুর্গাবতীর ঘোমটাইন দেহটার লোভে ঘুরপাক খায় পুকুরপারের ঝুপড়ি ঘরে । দুর্গাবতী তো ইদানীং শাড়ির সঙ্গে ফুলকাটা ব্লাউজও পরছে । সাজগোজের দুর্গাবতীকে বৈতলের সুন্দরই লাগে, তবে পরপুরুষের দেখা ঘোর অপছন্দ বৈতলের । বহুইর বৌ-এর আছে ছল্লাবল্লা, ওকে সঙ্গে নিলে সাজিদ মিয়াকেও ছেড়ে কথা কইবে না বৈতল, যেখানেই যত যমজমিদারের উদয় হবে, বৈতল তার বিনাশ করবেই করবে । তবে বৈতল এতসব জটিল ভাবনার কথা বলে না বহুইকে । বহুইকে বলে অন্য কথা,

--- জিপগাড়ি কুন্স ঢাকা নি বেটা । খুলা গাড়ি ঢাকলে কত শাড়ি লাগব ক ।

ঘনিয়ালা আর মাটিজুরির ফারাক বিস্তর । ঘনিইয়ালা তো শহরের বস্তি, ঘিঞ্জি । মাটিজুরিতে সাজিদ মিয়ার বাড়ি তো বাড়ি নয় শুধু, এক এলাহি প্রাসাদ । নদীর পারে কম করেও এক বিঘা জমির উপর বাড়ি । ঢোকান মুখেই প্রশস্ত দহলিজ ।

মামুপিরের দোয়া পাওয়ার লোভে গ্রামের মানুষ এসে জড়ো হয় মিয়ার উঠোনে । দলিজে বসে আছেন মামু উজ্জ্বল মহিমায়, কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে সবুজ রঙের সিংহাসনে । মামু এত মানুষজন দেখে বিরক্ত, মুখ থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ বের করে, সারা শরীর চুলকোতে শুরু করে । আর তখনই তিন শাকরেদ দুখু বহুই আর আপদ মামুর বুকপেট আর হাতের দখল নেয়, চুলকে দেয় । দুখু মামুর মুখে হাসি এনে দেয় কাতুকুতু দিয়ে । হাসলে মামুর মুখে স্বর্গের আলো খেলা করে । যেন এক দেবদেহ, শিশুর সারল্য মামু দুখুকে মারে । এরপরই শুরু হয় সব মুসলমানি কাণ্ডকারখানা । মামু তো আর কথা বলতে পারে না, তাই দুখু মিয়া পিরের তরফ থেকে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে আল্লার নাম জপ করে । মানুষের রূপধারী নবির কথা বলে, বলে ইয়া রসুল আল্লা, ইয়া হবিব আল্লা আরো কত কী বলে দুখু । তখন দুখুকে খুব শ্রদ্ধেয় মনে হয় বৈতলের । তবে এসব সময়ে বৈতলের খুব অস্বস্তি হয়, সে মুসলমানের ধর্মকর্মের খুব কিছু বোঝে না । না বুঝেই দুখুর সঙ্গে লাগালাগি করে । বলে,

--- বাঙাল হকলে কিতা হিন্দুর কাছ থাকি প্রণাম করা হিকছে নি ।

--- মুসলমানে কাফেরর কাছ থাকি কিছু নেয় না ।

--- পুরা নেয় না, আধা নেয় । আধা প্রণাম তো করছে বেটা ।

--- ইতা প্রণাম নায়, ইতারে কয় সিজদা । নমাজ পড়ার সময় দুই হাঁটু কপাল নাক মাটিত লাগানি লাগে । বহুত নামাজির কপালো দেখবে নে দাগ পড়ি গেছে । তারা পাক পুন্যাত্ম ।

--- সিজদা নায় বেটা, সিজদা চিনি নানি । অউ যে পাও হাত দিয়া করছ ।

--- ইতার নাম কদমবুসি ।

--- ইতা যতউ বুসিবাসি করছ, মামুর খিদমতগারি করছ, তোরে কেউ ইমাম বানাইত নায়, ওয়াজর লেকচারও দিতে পারতে নায় । এর তাকি এক কাম কর...

--- হিন্দু অই যাইতাম, নানি । ইতা নাপাক মাত মাতিছ না আল্লার দরবারো । গুনাগার অই যাইবে ।

--- ধুর বেটা, তরে নেওয়ার লাগি যেন সাধু সন্ন্যাসী হকল বই রইছইন কালীবাড়ির চরো ।
পাঁঠা অইলে তেও রামদার এক ছেদে লামাই দিল নে । তর মতো খাসিরে নিত নায় ।

সেই দুখুই আবার বৈতলের গান শোনে বিভোর হয় । বহুই আর আপদকে সঙ্গে নিয়ে হরিৎবরণ জমিদার বাড়ির উঠোনে বসে শোনে মনসামঙ্গল গান । মুগ্ধ হয়ে বলে বন্ধুদের,

--- ইগুর গলাত বেউলা বেটির দুখ নি অলা উৎলাই উঠে, নাচে কিলাখান কমর নাচাই নাচাই, দেখরে নি । ইগু হাচাউ গুরামি নি বে ।

গুরমি মানে কিম্পুরুষ । শূশ্রুবিহীন গাল আর সাদা শালোয়ার কামিজে সেজে যখন বৈতল 'নারায়ণ নমস্কৃত্য...' বলে মনসামঙ্গলের গান আর নাচের সূচনা করে জমিদার বাড়ির উঠোনে, তখন মন্দির ঘিরে বোল ওঠে 'জয় আই বিষহরি' মুহূর্মুহ শঙ্খধ্বনি আর জোকার । বৈতলের জামায় পোষাকে পেখম ধরে । দুখু তার দলবল নিয়ে এসে দোস্তুকে উৎসাহ দেয় । কিন্তু মুখোমুখি হলে ওরা লড়াই করে । বলে,

--- তুইন কুনু বেটা বাবন নি, ই সংগস কিড়িমিড়ি কিতা কছ ।

--- ইতা কওন লাগে, তুই বুঝতে নায় । তুই অইলে আউয়া চাড়াল বকার ডিম । তুই যে ইমামতির ভাও মারছ, পারবে নি এক লাইন কুরাণ পড়তে ।

--- না, নমাজর সময় তো তুইন পড়ি দেছ ।

--- কেমনে বুঝতাম, তুই তো কিছু জানছ না, নবির জন্মদিনও জানছ না ।

--- তর যত আজারির মাত । নে, নাচছ ভালা, গাইছ ভালা, অখন ক খাইতে নি ।

--- কিতা । নাবে, শ্রাবণ মাসো ইতা খাইতাম নায় ।

শ্রাবণ মাসে বৈতলের শুদ্ধাচার । যতদিন পুঁথিপড়া ততদিন সে কোনও নেশা ভাঙ করে না ।

মামুপিরের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে তখনও ওরা নেশা করে না । আপদের লুঙির গিঁটে গাঁজা কলকে আর দিয়াশলাই এর পুটুলি থাকে না সেই কদিন । সাজিদ মিয়ার বাড়িতে ওরা সম্মানিত অতিথি, মামুর সম্মান জড়িত । সাজিদ মিয়ার বাড়ির নেশায় পেয়ে যায় বৈতলকে । বাড়ি যেমন রাজপুরি তেমনি তার আশপাশ প্রকৃতি নদী । পাহাড়ের উপর গাছগাছালির ঘেরা দালানবাড়ি । টিলার নিচে নদী । নদীর উপর দুদুটো ছিপ নৌকা আর সর্বক্ষণের এক মাঝি । নদীর এপার ওপার করার জন্য । নদী দেখে বৈতলের মন উতলা হয় । মাঝিকে বলে,

--- কই যাও ।

--- কই আর, ইপার আর হিপার ।

--- ইতো বুঝিয়ার, আর যাও নানি দুরো ।

--- যাইন ভাইছাবে । কুচিলা যাইন, লালা যাইন ইবায় । হিবায় যাইন কাটাখাল ।

--- হাতরাইতায় পার নি ।

--- পারি ।

--- গেছনি । কাটাখাল থাকি বরাক, বরাক থাকি কুশিয়ারা, সুরমা ।

--- গেছিনা, হুঁনছি ।

--- যাইতায় কেমনে, হিতো পরদেশ, পাকিস্তান ।

জলের নেশায় মাতাল হয় বৈতল । ভাবে লুঙ্গি গুটিয়ে দেয় এক ঝাঁপ । জলের সঙ্গে কেন যে দেশের শত্রুতা । জলকেও ভাগ করেছে । গভীর জলে সীমানা । বৈতল ভেবে পায় না নদীর গভীরতা উপর থেকে মাপবে কী করে সীমান্ত পুলিশ ।

বৈতলের মন তো পাগলপারা । নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম করতেই উপর থেকে দুখুর হাঁক শোনে,

--- ওবা বৈতল মিয়া ।

দুখু চালাকি করে । বৈতলের পরিচয় লুকিয়ে রাখে । বলে,

--- কিতার লগি ক । দুই দিনর লাগি আইছি, তুই মিয়া বনি যা, কিছু অইত নায় ।

--- তরে তে আখড়াত লই যাইমু, অইবে নি দুখু দাস ।

--- না ।

এখানেই দুখু আর বৈতলের শৈশব সহচর লুনার ফারাক । ওরা হিন্দু মুসলমান দুই বন্ধু সিলেট ভ্রমণ করেছে, থেকেছে মন্দিরে মসজিদে । কখনও লুনা দাস আর বৈতল দাস । কখনও রুল আমিন বেজ স্বনামে বৈতল মিয়ার দোস্ত । বৈতল আর লুনা এরকম একা টিলার উপর মাজার ও মসজিদে কাটিয়েছে এক রাত । সিলেট শহরের মাঝখানে শাহজালালের দরগা । বৈতলের মাকে তখন ভূতে ধরেছে । আসলে বাপের যন্ত্রণায় মা ভুল বকে, বৈতলকে দূরে সরিয়ে দেয় । বলে ‘দূর যা দূর যা, বেইমান বেটির পুত’ । লুনা বলেছে শাহজালালের দরগাকথা । শাহি ইন্দারার পানি নিয়ে গেছে এক কৌটো । মাকে খাইয়েছে । মা সুস্থ হয়েছে। দিন দশেকের মতো বৈতলকে বকাবকি করেনি । লুনা কে বৈতলকে আদর করে সিদলপোড়া, চেংপোড়া বানিয়ে খাইয়েছে । দুখুর ডাকে লুঙির পাড় ছেড়ে দেয় বৈতল । জলের অতল খোঁজা ছেড়ে পাহাড়চুড়ার সাধুসঙ্গে ফিরে যায় । দুখুকে বলে,

--- আইয়ার । উবা ।

সাজিদ মিয়ার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দুখুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় বৈতল । বলে,

--- টান ।

দুখু টেনে তুলে বন্ধুকে । বলে,

--- খাইতে নানি বেটা । মিয়া ভাই এ ডাকিতরা তখন থাকি ।

--- তর দুয়া দরুদ যে অত তাড়াতাড়ি শেষ অই যাইব কেমনে ভাবতাম । ভাবলাম একবার আমার বইয়াখাউরি থাকি অই গিয়া । এক বুড়ে আমার সুরমা, আমার পিয়াইন ।

--- তুইন ভাগতে আছলে বেটা রিফুজি ।

--- না বে ভাগতাম কেনে । ভাবছিলাম । ভাবতে ভাবতে গেলাম গি অলাখান এক টিল্লার উপরে । আমার গুরুয়ে কইছলা, ভক্তিভরে শুনাইছলা তান গুণর কথা । আমি দেখিয়া আইছি । তুইতো বেটা খালি ইমামতি করছ, দেখচছ না দুনিয়ার কিছু । দরগা টিল্লার নাম হুচছনি ।

--- কানো । মাটিজুরিত অউ নি, না রাঙাউটিত ।

--- ধুর বেটা তুই আছছ তোর মাটিজুরি আর রাঙাউটি ভিচিংচা নিয়া । ছিলেটর নাম হুচছনি । তর টাউনোর দশখান হামাই যাইব । অলা সুন্দর । নদীখান আরো সুন্দর । হিন্দু হকলে কইন সুন্দরী বেটির লাখান এর লাগি সুরমা, আর মুসলমানে কইন চউখর কাজল, সুর্মা । অউ অইল সুরমা নদী । অউ নদীর ঘাটো বুলে হুরি পরি হকলে রাইত গোছল করতা, ফক্ফকা চান্দনির রাইত তাইন আইছলা শিষ্য সাবুদ লইয়া এর লাগি এক ঘাটোর নাম চান্নি ঘাট । ঘাটর সামনে অউ এক লম্বা ঘড়ি বাড়ির লাখান, কোন এক আমির মানুষ আলি আমজদে লাগাই দিছইন । নদীর উপরে এক লুহারপুল, এক সাহেবে বানাইছইন, মাইনষে ইপার হিপার করইন, নাম কিন পুল । ইতা কিছু আছিল না, ঘড়ি ও না পুলও না । অউ চান্নি ঘাটো এক লগে বউত নৌকা আইয়া ভিড়ল একদিন, মেলা লাগি গেল । শয়ে শয়ে মানুষ নামলা, সব সাধু । কুল্লে তিনশজন আর তারার যে মুরকি তাইন অইলা রাজা, রাজার রাজা । কই থাকি আইছইন ক চাইন ।

--- আমি কেমনে কইতাম । তর ইতা মাতর কল্লা গর্দনা কিছু বুঝিয়ার না । ছিলটর কথা কইরে বুঝিয়ার ।

--- অউত্ত বাউবেটার বুদ্ধি খুলছে ।

--- ছিলেটি রাজার গপ কইরে ।

--- আবার আউয়ামি কররে । ছিলেটো তখনো আছইন রাজা, তান নাম গবিন্দ ।

--- তুইন তো বেটা গাউয়া মাইমল, কৈবর্ত । অততা শিখলে কেমনে ।

--- আমার গুরু আছলা করাতি, তাইন জানইন সব । তান কাছ থাকি হুন্ছি ।

--- আইছা তে ক গোবিন্দ রাজার গপ ।

--- তাইন আর কেউ নায় বেটা, তাইন হজরত শাহজালাল । নাম হুন্চছনি ।

--- হুন্তাম না কেনে । তাইন আনছিল জালালি কইতর, আল্লায় দিছলা তানে ।

--- অয় হক্কল তাউ আল্লায় দেইন । তান বাড়ি কই আছিল জানছ নি । নবিজির দেশ কই জানছ নি । আরব, আরব থাকি আইছলা, এমেন বুলে আছিল তান দেশ । তুরুক হক্কলর লগে থাকতা । তানে একবার তান গুরুয়ে কইলা, যাও হিন্দুস্থান । হিন্দুস্থানো গিয়া আল্লার নাম জপ করবায় । কইয়া তানে এক কটাত এক মুইঠ মাটি ভরি দিলা, কইলা, অউ মাটি যে মাটির লগে মিলব হনোউ তুমার কাম । দিল্লি দিল্লি বউত ঘুরলা, মাটি আর মিলে না, বউত শিষ্যসাবুত অইল । তিনশ জনরে লইয়া আইলা চান্দনি ঘাটো । তখন ছিলট এক গাউ, গাউর এক টিল্লাত আইয়া বানাইলা ছাপটা । থাকলা, আবার তো যাওয়ার সময় অইল, আকতা তান মনো অইল মাটির কটার কতা । মিলাইলা, মারহাবা, মিলি গেল । অউটিল্লাত দরগা বানাইলা, ইন্দারা পানির লাগি । অউ ইন্দারার পানিত জানছ নি কিতা আছে, খাইলে কুন্ অসুখ বিসুখ থাকে না । মস্ত মস্ত গজার মাছে ভর্তি । অউ কুয়া আর মক্কার জমজম বুলে একঅউ পানি, তলে তলে আইছে । একজন বেপারি একবার মক্কা গেছলা, বউত সোনাদানা কামাইয়া এক বুকচির ভিতরে সব লইয়া খালি ঘুরে, কাবা শরিফ জিয়ারত করত গেছে পিঠো অউ বুকচি লইয়া । তখন অউ, তার মতো চুল মুন্ডাইল, সাদা দুই টুকরা কাপড় পিন্দা এক হাজিয়ে তানে কইলা, ‘ইতা কিতা বা পিঠো, আল্লারে দিতায় নি ?’ হে কয় ‘না আল্লায় দিছইন, লই যাইতাম বুরুঙ্গাত’ । বুরুঙ্গা তার বাড়ি আরি, হি সাদা কাপড়র সাধুয়ে কইলা, ‘আউয়া নি বেটা, অউ জমজমো ছাড়ি দেও, তোমার ছিলটো পৌছি যাইব । হিখানো জালাল পিরে টিল্লার উপরে বানাইছইন এক আজব ইন্দারা, ইন্দারার কুন্ তল নাই, সোজা জমজমর লগে মিল তলেতলে’ ।

বেপারি বেটা তো বুঝি গেছে হে ঠগর লগ পাইলিছে, হেও ছিলেটি বেটা কম নায়, কইল ‘হাচা নি চাচা’ চাচায় কইলা ‘অয়’ । হে কইল আইছা, কইল ফালাইদিব বুচকি । অউ ভাগল । এর পরে সাদা কাপড়ের বেটায় তো ছাড়ে না, রুজ রাইত অউলেউ জ্বালায়, কয় ‘আল্লার জিনিস বেটা আল্লায় যখন দিছইন ফিরাই নিবা নি কুনু, আল্লারে অবিশ্বাস করিছ না, অবিশ্বাসীর কিতা অয় জানছ না নি । দোজখো যাইতে নি হাবিয়াত গেলে পানি পাইতে নায়, খালি আগুনো জ্বলবে।’ রোজরোজই খোয়াব দেখতে দেখতে হে একদিন কয় ‘কিতা আর অইব, তান মাল তাইন নিলে নিবা’ রাইত থাকতে থাকতে বুচকা ইণ্ড নিয়া ফালাই দিল জমজমর পানিত, হজরত শাহজালালর নাম হইল তিনবার, আর চানা মটর যেতা ভিজাইয়া লই গেছিল মচাত করি, আল্লারে ডাকে আর এক একটা করি ইবায় রাখে, ইবায় থাকি হিবায় আনে, হাজার হাজার বার নাম লয় আল্লার । আকাশ সাফ হইতেউ সব চানামটর ফালাই দেয় পানিত । সোনাদানার বুচকি ফালাইয়া বেপারি থাকি ফকির অই গেল, ফকির অইয়া বেটার বুলে উবা ফাল । গেছিল বেটা কত দামি দামি কাপড় চুপড় পিন্দিয়া, বুরুঙ্গাত ফিরিয়া আইল তালি দেওয়া ছিড়া ময়লা এক গিলাবাইয়া গাত দিয়া । কেউ চিনে না, হেও চিন দেয় না । অখনও আছইন তাইন বুরুঙ্গাত ।

অধৈর্য তিন বন্ধু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বৈতলের কিছা । যে দুখু সর্বক্ষণ বৈতলের কথার মাঝখানে ফুট কাটে, সেও চুপ । আসলে সবাই মজেছিল ঐ বোচকাটি নিয়ে, কী হল শেষ পর্যন্ত । এত সব সোনাদানা কোথায় গেল । অসম্ভব সব অবাস্তব গল্প বলায় ওস্তাদ এই বৈতল । ওর আর এক রোগ, কাহিনীর শেষটা সহজে শেষ করে না । আগ্রহ তুঙ্গে উঠিয়ে সে মিটিমিটি হাসে, আর বিড়ি ফোঁকে । মামু পিরের সঙ্গে এসে কদিনের জন্য তো নেশার আসর চৌপাট, তাই বৈতল তার ভেঙ্কি দেখানোর জন্য সাজিদ মিয়ার দলিজের বাইরে তিন বন্ধুকে ইশারায় ডাকে । বলে,

--- দেখরে নি বেটা গাউ আলা মানুষ কিলা মামুর দিওয়ানা । অত মানুষ নি আইছে তানে দেখাত ।

দুখু ভুলবার পাত্র নয় । বলে,

--- ইতো আইয়াউ দেখলে । আরো বেশি আছিল, বউতে গেছইন গিয়া । তুইন কথা ঘুরাইছ
না, অখন ক বুচকির কিতা অইল । আর বুরুঙ্গার পির যে কইলে অখনও আছইন, কেমনে
তান বয়স কত ।

--- কইমু কইমু অখন জিকির দে একটা ।

--- কেনে ।

--- দেছ না, গান গাইতাম । ইচ্ছা অইছে । আল্লার নাম কর, মাইনষে হ্নব ।

দুখু আল্লার নাম নেয় বৈতলের কথামতো । সবাই মিলে ডাকে,

--- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ

দুখু আপদ বছইর সমবেত আল্লা নামের মাঝখানে বৈতল ধরে গান,

--- ‘পয়লা বন্দনা করি মালিক ছত্তার

দুছরা বন্দনা করি নবি মহতফার

পুবেতে বন্দনা করি আসামর পাড়

দক্কিনে বন্দনা করি জিলা তিরপুরার

তিছরা বন্দনা করি ছিলটি মানুষ

বৈতল মিয়ার কথা হ্ন দিয়া হ্নশ ।

ধন আছিল জন আছিল, আছিল ধান চাউল ।

হরিণ আছিল, পাখি আছিল, আছিল মাছ হউল ।

কি অর লাগি গম, আল্লা আছলা লগে

পির মুরশিদ আউলিয়ার দুয়া আছিল সঙ্গে

যত নিয়ামত দিছিল আল্লা দুনিয়ার মাঝ

বাদশাগিরি করা আছিল ছিলেটির কাজ

আরব দেশর মাটির লগে মিল ছিলটির

এর লাগি বাস অইল বাবা শাহজালালর

জালালি কইতর উড়ে কাজল পাংখা দিয়া

আল্লা আল্লা জিকির পড়ে তার সবে বইয়া ।’

বৈতলের গলায় জাদু আছে । জাদুর টানে, গানের টানে অনেক মানুষ এসে জড়ো হয় তার চারদিকে । গান থামতেই চোখ মেলে তাকায় । বলে,

--- অইছে বাবাই হকল, গান শেষ, যাউকা ।

বৈতল বছইর কাঁধে হাত দেয় । আপদের হাত ধরে, দুখুর ঘাড়ে দেয় কিল । আসলে বন্ধুদের ছুঁয়ে ভাবের ঘোর থেকে ফিরতে চায় । কিন্তু ভাব কি আর যায় । দুখুকে বলে,

--- ছিলেট গেছে না বেটা তর জন্মউ অইছে না । জালালি কইতর দেখচছ নি ।

--- দেখতাম না কেনে । যে কুনো মজিদউ দেখবে লাখে লাখে ।

--- দূর বেটা জালালি কইতর দেখতে অইলে যাওন লাগব ছিলেট টাউনো । আমরা গেছলাম, আমি আর আমার দোস্তু লুলা, রুল আমিন বেজ । তফনও নায় গামছাও নায়, কাপড়র এক টুকরা কমরো, গাত নিমা হাতো এক গামছার পুটলি, অউ লইয়া ঢুকিয়ার ছিলেটো । এক লুয়ার পুল, অলা নি লম্বা, অউয়ে কইছলাম কিনপুল, পুল পার অইয়াউ ঘড়িঘর, কয়টা বাজের তখন ইতা চিনি না, বাইচ্চা নানি । পুলর তলেও চান্নি ঘাট, যেনো আইয়া হজরত শাহজালালর নাও লাগছিল । আমরা হাটিয়া আইছি, সারা রাইত হাটছি, সকাল অইছে বুঝলাম চান্নি ঘাটো আইয়া, পুবে দি তখন এক মস্ত ডিংলার লাখান সূর্য উঠছইন । পাকনা লাল মিঠালাউর লাখান গুল আর তখন অউ জানছনি,হাজারে বিজারে কইতর উড়ি গেল পুলের উপরে দি, ইতা আর এক লাখান কইতর, গলাত ময়ূরর রঙ, নীল আবার চিকচিকিও করে । লুলা ইগুতো উস্তাদ, বউতবার আইছে, কয় জালালি কইতর, ইতা কেউ খাইন, যেলাখান দরগা শরিফর গজার মাছ কেউ খায় না ।

সিলেট প্রেমে বিভোর হয়ে বৈতল আবার গান ধরে,
--- ‘জালালি কইতর উড়ে কাজল পাজা দিয়া রে ।’

উপন্যাস

বত্রিশ

মাটিজুরির সাজিদ মিয়ার বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও এলাহি । সকাল গড়িয়ে গেছে কখন, তবু আয়োজিত নাস্তা খেতেই হয়, কয়েক দিস্তে চার কোনা পরোটা, মুরগির মাংস আর তালের বড়া । দ্বিপ্রহরের খাবারও বড় কম নয়, নদীর ঘাঘট আর বোয়াল মাছ শুধু । বৈতল বেশি খাবার দেখলে একটু বেসামাল হয় । সাজিদ মিয়াকে উদ্দেশ্য করে অন্তঃপুরে বার্তা পাঠায় এরকম,

--- আমরা লাগি অততা না করলেও অইব, আমরা হুকইনপুড়া ভাত দিলাইন যে । খালি মামুর খেয়াল রাখইন যে ধনো । মামু অইলা দাতা, তাইন খাইলেউ আমরা পেট ভরব ।

--- আমরা ভরত নায় ভাবিজান, আমরা খাওয়ানি লাগব মাছে মুছে গুস্তে । ইগু এক বেদিশা, তার কথা বাদ দেইন । তার গান হুনছইন নি । ইগুর গানর লাগি আমরা মামুও দিওয়ানা, সবরে মারইন, তার গাত হাতও দেইন না । মামু এমনেউ বদমাইশহর গাত হাত দেইন না ।

দুখুর বদমাশি কথায় রাগ হয় বৈতলের, আবার গানের প্রশংসা শুনে রাগ গলে জলও হয় । বোকার মতো হাসে । পিরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, মামুর গায়ের গন্ধ নেয়, বুকুর উপর টেনে রাখা লুঙিতে মুখ লাগায় । কী জানি কী এক সুবাস খুঁজে পায় বৈতল মামুর আভরণে । অপার্থিব এক আনন্দে, সুখে ভরে যায় মন । ভাবে এমন নির্মল হৃদয় কেন হয় না তার । বৈতল কখনই তার মতো ছোটখাটো কাউকে শ্রদ্ধেয়জন ভাবতে পারে না, মামুর দীর্ঘ দেহ সবার থেকে আলাদা হয়ে তাকে আশ্রয় দেয় । গুরু সৃষ্টিধর মামুর মতো বিশালদেহী না হলেও মনের ধনে মামুর মতো বড় । আর শিশুর মতো মন যার, দুখু বহুই আপদ যাকে বাবার মতো সম্মান দেয়, শহরের মানুষ, জেলার মানুষের কাছে ধর্মগুরু হিসেবে যার সম্মান, সেই মানুষকে বৈতল কখনও নিয়ম মেনে ধর্মাচরণ করতে দেখেনি । সময় ধরে নমাজ পড়তে দেখেনি,

আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা জায়নামাজ বিছিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন, সিজদা করতে করতে মাথায় কালো দাগ হয়ে যায় । আর নিয়মের বাকি ধর্মাচরণ সব করে দেয় দুখু । বৈতল ভাবে ধর্মগুরুরা কেন মামুর মতো হয় না । মামুর মুখের কথা স্পষ্ট নয় বলে কেউ তার মুখ দিয়ে মন্দ কথা বলিয়ে নিতে পারে না । মামুও খুব রাগে, রাগলে মারে খুব, কিল মারে । আর মামু হাসে, মামু হাসলে দেবতার মতো মনে হয় । মামু পির হলে কী হবে, অন্য ধর্মকে অসম্মান করে না । মামু জানে বৈতল মুসলমান নয় তবু তাকে আদর করে কাছে রাখে । মনসাপুঁথির গান শোনে । লখাইর দুঃখে কাঁদে । বৈতলের পয়ার কীর্তন শুনে চোখের জল ফেলে মামু, উপ উপ করে জল ঝরে চোখে । বৈতলও যে গায় স্বামীশোক, পুত্রশোকের দুঃখ জড়িয়ে,

--- ‘লোহার বাসরে কান্দে শাহের কুমারী

পুরী মধ্যে থাকি শুনে সুনুকা সুন্দরী

বুদ্ধিস্থির নহে সুনাই উচাটন করে ।

প্রমাদ ঘটিল বড় বলিল চান্দেরে

নাহি পিন্দে বস্ত্র সুনাই নাহি বান্দে কেশ

ঘর হতে বাহির হইল পাগলের বেশ ।’

আর ঘুরে ফিরেই বৈতল গাইছে দুঃখময় দিশা,

‘বিনাইয়া বিনাইয়া বিপুলায় কান্দে গো, ও সখি গো

বিনাইয়া বিপুলায় কান্দে’

মামুকে যেমন কাঁদিয়ে দেওয়া সহজ, হাসিতেও খিলখিলানো যায় । মামুর কলকলানো হাসিতে তখন এক বছরের শিশুর সারল্য । বৈতল মনের আনন্দে এক গুরুর বিদ্যা অন্য গুরুতে চালান করে । বিয়ানিবাজার রইদপুয়ানির সূত্রধর গুরু সৃষ্টিধরের শেখানো সিলেটি রামায়ণ শুনেও মামু শরীর কাঁপিয়ে হাসে । বৈতল গায়,

অউ যে দেখ সূর্য উঠইন বিয়ানিয়া বেলা

অউ বংশর রাজা দশরথ বড় বালা ।

তিন বিয়া করলা রাজায় পুড়া কপাল চাইয়া

কুনু রানির পেটো না অইল একগুয়া পুয়া

কুবাই থাকি আইল এক মুনি দিয়া গেল বর

তিন রাণির ঘরো অইল গাট্টা গাট্টা চাইর পুয়া,

বড়রাণির রাম, মাইজমজনর লক্ষণ

আর ছোট কেকয়ীর পুয়া ভরত শত্রুঘন ।

এর মাঝে কেকইয়ে কইন রামরে পাঠাও বন

ভরতের বওয়াও রাজ সিংহাসন ।

রাম গেলা বনবাস, ভরত বেটা বুকা

সিংহাসনো আনি রাখলা রামর পাদুকা

বাউগ পাইয়া বউ চুরি করল রাবণ

বান্দর লইয়া করে রাম যুদ্ধর আয়োজন ।

আর,

রাবণ মারি সীতা আনলা অউত্ত রামায়ণ ।

মামুপির সারা শরীর দুলিয়ে হাসে আর বলে অউত্ত । এর পর থেকে বৈতলকে দেখলেই ডাকে ‘অউত্ত’ আর হাসে খিলখিলিয়ে । দুখু অবাক হয়ে দেখে মামুর হাসি । বৈতলের উপর হিংসার ভান করে বলে,

--- কিতা বে, মামুয়ে দেখি অখন আর তরে বৈতল ডাকইন না । অউত্ত ডাকইন, ‘অউত্ত’ কিতা হাতি নি । বয়েল থাকি হাতি অইলে নি ।

--- ছিলটি রামায়ণ হুনাইছলাম । ‘রাবণ মারি সীতা আনলা অউত্ত রামায়ণ’ কওয়ার পরে কী হাসি রে কী হাসি । কিতা কইতাম তরে । খালি তান ‘অউত্ত’ ।

--- হই বেটা মালাউন । মামুরে ইতা রামায়ণ হুনাইছ না । ইতা না-পাক কিছা ফকিরর হুনাও গুনা ।

--- কেনে ঢলানি হুনিয়া তুইও তো বেটা কান্দলে ।

--- আমি কান্দি না । তে পুথির গান আলেদা । ইতা হক্কেলৈ গায়, হুনে ।

--- রামায়ণ মহাভারতও পুথি, হক্কেলৈ গায় হুনে । আমরা হুনি না নি কুরাণর গপ, জুলেখার গান । রূপবানর গান হুনি না নি বেটা ? ইতা খামকা খামকা লেইঞ্জা আগুন লাগাইছ না । যেতা ভাল লাগে অতাউ কর, অতাউ হুন, তেউ গিয়া তর শিঙ বার অইব ।

--- আমার কিওর শিঙ বার অইত ।

--- হুন না এক গপ । আমার গুরুয়ে কইচলা, তান বাড়ি আছিল পঞ্চখণ্ড, বিয়ানিবাজার । হিনো সব পণ্ডিত হকল থাকতা, পণ্ডিতপাড়া নাম অউ আছিল । তারার বউত শিষ্য । এক গুরুর আছিল এক মগরা শিষ্য, ইয়া গাটী, তার বাড়িত আছিল আর এক গাটী ভইস হে অউ ভইসর দুধ খাইত আর মুটা অইত । অখন বাবনর পুত ভইস রাখাল অইত নি, তেউ বাপে পাঠাইলা গুরুবাড়ি, পণ্ডিতপাড়াত । হে আর ধেয়ান উয়ান করত পারে না, কয় ইতা বই পুথি তার ভাল্লাগে না । গুরুয়ে কইলা আইছা । কইলা তুমার বই পড়ন লাগত নায়, খালি ধেয়ান কর । হেও কয়, আইছা । কয়, কিতা ধেয়ান করতাম । গুরুয়ে কইন তুমার যেতা পছন্দ । হেও কইল আইছা । কইবাউ চউখ বন্ধ করিয়া ভইসর ধেয়ান আরম্ভ করল । হে অউ ভইস অই গেল । গুরুয়ে ডাকইন, আয় বেটা উপাস ভাঙতে নানি । হে কয় ভাঙতাম তো, আইতাম কেমনে কইন । গুরুয়ে জিগাইন কেনে, কিতা অইছে । হে কয়, আমার শিঙ দুইটা যে দরজাত লাগি যার, বার অইতাম কেমনে । হাসলে তো । তেউ ক । হাসিলা দুই দিনর লাগি আইচছ আল্লাউ ক, ভগবানউ ক, তর শিঙ ভাজি দিত পারব নি কেউ । অউ গপ তুই পণ্ডিতপাড়া থাকি মাদ্রাছাত লই যাছ না, এক অউ থাকব নানি ।

ভাবের ঘোরে থাকলে বৈতলের মন অতিবর্ষণের টিলার মতো হয়ে যায় । বুর বুর করে নয়, গলে গলে পড়ে যায় মাটি, মাটি কাদা হয় । আসলে বৈতল মামুর কাছে তার মেয়ের নাম পেয়েছে । দুষ্ট জমিদার যমুনা প্রসাদের দেওয়া নাম তার পছন্দ হয়নি, মরনি নামের মধ্যে বৈতল কোনও অমঙ্গল খুঁজে পায় না । মরতে মরতেই বাঁচবে, বাঁচার মতো বাঁচবে গরিবের মেয়ে । দুর্গাবতীর পছন্দ হয়নি বলে স্থগিত রাখে নামকরণ । সোনা নামেই ডাকে । বৈতল মামুর আশীর্বাদ চেয়ে পিরের পায়ের কাছে রাখে সোনাকে, মামু পা সরিয়ে নেয় । বৈতল বলে মেয়ের নাম মরনি । মামুর ও মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয় । অস্ফুটে বলে , বাঃ । বলে ম নি, ম নি, মনি ।

মরনি নামের একটা দুঃখ আছে বৈতলের, মরে যাওয়ার কথা বলে জমিদার, জমিদারের শয়তানি কথায় বিশ্বাস করে দুর্গাবতী । জেদের বশে নামকরণ থেকে সরে নি বৈতল, তার যুক্তিতে মরণজয়ী তার কন্যার নাম । আর তাদের গ্রামে, ছাতক পরগনার বইয়াখাউরির অনেক ভাল ভাল মেয়ের নাম মরনি । মান্যগণ্যরাও বলেন ভাটির দেশে মরণ নিয়ে লড়াই সর্বক্ষণ । জলের সঙ্গে লড়াই, সাপি খুপির লড়াই, ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই, অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই । লড়াই দেখেনি সুখি জমিদার, শোষণ করছে একতরফা, গরিবের রক্ত বেচতে বেচতে দুমহলা অট্টালিকা করেছে, দেবালয় গড়েছে । গাড়ি চাকরবাকর, বৈতল আর বৈতল এর বৌ এর সেবা । পরবর্তী প্রজন্মের প্রস্তুতিতে সোনার পালঙ্কে জন্ম নেওয়া রাজপুত্র । একই সময়ে জন্ম রাজপুত্র আর বৈতলের মেয়ের । শুধু জন্মসময়ের মিলে ভাগ্যকেও মিলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্র হবিপ্র আচার্যি ঠাকুরের । তাই বৈতলমেয়ের মরনি নামে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে, কিন্তু মরনি নামে ডাকে নি একদিনও, সোনা বাবা মিঠাই এসব আদরের নামে ডেকেছে । কথা বলতে-না-পারা সাধু যখন নামটাকে সাজিয়ে দেন মাঝখানের বেয়াড়া বর্ণটাকে তাড়িয়ে দিয়ে, বৈতলের মনে আনন্দ হয় । ভাবে এমন সহজ সমাধানটা কেন তার মাথায় আসে নি । সে কিন্তু মনি নামেও ডেকেছে সোনাকে, আদরের মাত্রা বেশি হলে সোনামনি ডেকেছে । বৈতল তাই মন থেকে মরনি বিতর্কের ইতি টানে । বৈতল বুঝতে পারে সাধুপিরদের কেরামতি, যা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ায় আছে কিন্তু ধরতে পারে না, তাই ওরা ধরিয়ে দেন । এখন নির্ভর বৈতল তার সোনার শত নামের মধ্যমণি সাজায় মনিকে, দুর্গাবতীও মেয়েকে ডাকে মনি ।

সাজিদ মিয়া ঠিকাদারের অন্তঃপুরের সম্পদ দেখে অভিভূত হয় বৈতল । যে মানুষটার জীবনে শুধু টাকা দেদার টাকা আর লাম্পাটা ছাড়া কিছুই নেই, পাপের ভরা উপচে উঠলে ধর্মচিন্তায় মনোযোগী হয়, পির ফকিরের সেবা যত্ন করে লাঘব করে, কিছুটা কমিয়ে রাখে । সেই মানুষটার ভিতরবাড়ির সৌন্দর্যে অবাক হয় বৈতল । বৈতল গন্ধ শুঁকতে জানে । বৈতল দেখেছে মিয়ার দুই বৌকে খাবার পরিবেশন করতে । কোনও মহাত্মার জন্য নয় শুধু, তারা যে পিরের মুরিদ তাদেরও মাতৃস্নেহে আহার করিয়েছে দুই মা । গপ গপাগপ তালের পিঠে তার পাতে পড়ায় যে বৈতলের এই সহৃদয়তা তাও নয় । তালের বড়া তার প্রিয় খুব, দুর্গাবতী করে খাওয়ায় ভাদ্রমাসে । আসলে সাজিদ মিয়া আর তার পরিবারের বৈসাদৃশ্যে সে এক গন্ধ পায় । কেমন মা মা গন্ধ সাজিদ মিয়ার দুই পরিবারে ।

খাওয়ার পর বেশ অস্বস্তি হয় বৈতলের । অপরিমিত খাওয়া হয়ে গেছে, পান চিবিয়েও স্বস্তি হচ্ছে না । একটা বিড়ির সুখটান না হলে ভোজের মজা মাটি । ইচ্ছে করলেই বৈতল খেতে পারে । দুখু দারোগা তার কিছু করতে পারবে না । বৈতলকে ঠেকাবে এমন শক্তি কারো নেই দুনিয়ায় । মামুর শিষ্য হয়ে মামুর সফরে সঙ্গী হয়ে এসেছে সে, মামুকে সম্মান জানাতেই তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত কোনও নেশা করবে না । তবে বৈতল অন্য এক নেশায় বুঁদ হয়ে আছে এখন, মনটা কেমন ভিজে কাদা হয়ে আছে । বৈতল আপন মনে ভাবতে থাকে দুর্গাবতীর কথা । এক বৌ নিয়ে জেরবার হয়ে আছে বৈতল আর সাজিদমিয়া দু দুজন সুশীলা রমণীর পতি হয়ে আছে সুখে । দুই বিবির কেউই গৌরী নয়, মাথায় কানে শাড়ির আঁচল জড়ানো ঘোমটায় প্রয়োজনীয় পর্দা বজায় রেখেও কেমন সপ্রতিভ । নারীত্বের আভা জ্বলজ্বল করছে অসিত মুখমন্ডলে । সুখী একজোড়া মুখ, দেখলেই নুঝা যায় স্বামীসুখে গরবিনীর সুখ নয় এ । এক অন্য আলো, দুর্গাবতীর সঙ্গে তুলনায় অনেক সহজ এই রমণীদ্বয় । বৈতলের নারী দুর্গাবতীও তা বলে ওদের থেকে কম নয় কিছুতেই, দুর্গারও এমন নির্মল মুখশ্রী দেখেছে বৈতল । সিতবরণী দুর্গার মতো লড়াই তো করতে হয়নি এদের । মিয়া ঠিকাদার প্রাচুর্য দিয়ে বন্দী করে রেখেছে এদের তাই তো ধনসম্পদের দুর্গে এরা সুখেই আছে । ঠিকাদারের আদেশ কেমন নির্বিবাদে পালন করে যাচ্ছে দুই সতীন । চেনা নেই জানা নেই পরপুরুষ অতিথিদের আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখছে না । বৈতল পারে না দুর্গাবতীকে দিয়ে একটা ভোজ লাগিয়ে দিতে । দুখু বহুইদের ঘরেই ঢুকতে দেয় না দুর্গা । ওরা এলেও পুকুরপারে বসে থাকে । একটা জলবাতাসার আপ্যায়নও করে না । দুর্গাবতী বৈতলের কাছে মাপ চেয়ে নেয় । বলে,

--- বাবনর পুড়ি ইতা পারি না ।

আলাদা চিলিম তামাক টিকে থাকে, সব জ্বালিয়ে নিতে হয় বহুই আপদকে । উনুনের কাঠকয়লা পর্যন্ত বরাদ্দ নয় । বলে,

--- ইতা পারতাম নায়, আমরার বাবনবাড়ি ইলা বাঙাল হামাইছইন না কুন্‌দিন । তুমার পিরিত দেখিয়াউত্ত টিকি চিলিম আলাদা করি দিছি, আঙড়া উঠাইয়া আমি পাখাল নষ্ট করতাম নায় ।

স্পষ্ট কথার মানুষ বৈতলের এই এক দুঃখ । তার জীবন বড় বিভক্ত । যারা তার প্রিয়জন তারা এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে । বৈতল জানে দুর্গাবতী ইদানীং যা বলে এবং করে, তাতে তার মনের সায় নেই । দুর্গাবতী নিরাপত্তাহীনতা থেকেই ব্রাহ্মণী সাজার চেষ্টা করছে । হিন্দু মুসলমান ছোঁয়াছুটি করছে । বৈতলকে দুঃখিত করছে । বৈতল তাই বেজার মুখে দুখুর সামনে মাথা নুইয়ে থাকে । মানে দুঃখ প্রকাশ । দুখুর সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করাও বিপদের । পেয়ে বসে দুখু । বলে,

--- অখন কান্দিয়া কিতা করতে বেটা বে-আক্কল । ধলা দেখিয়া নাচছস, অখন তরে নাকো দড়ি দিয়া ঘুরার ইতা নতুন কথা কিতা । কথাত আছে, চেনাইতে ছাগি না ধরলে দৌড়াইয়া লাগাল পাওয়া যায় না, পয়লা রাইত অউ বিলাই মারণ লাগে, অখন মর ।

দুখু বৈতলকে উস্কে দেয় । আর বৈতলও দুর্গাবতীর সমালোচনা অন্যের মুখে শুনতে চায় না । দুখুকেও উল্টো গালাগাল দেয় মনের মতো । বলে,

--- অই হালার হালা রাড়ি বেটি, বৌর লগে তো ঘর করচছ না, বৌরে মারিয়া অখন মুরকিগিরি মাররে, আমারে হিকাইরে বিলাই মারার কল । মামুর লগে থাকিয়াও তোর কুন্‌ কাণ্ডজ্ঞান অইল না হাতি লেটলেও বেটা ঘুড়া থাকি বড়, আমার বৌ কুন্‌ বাঙাল বাড়ির বেটি নি, আজাব নায়, ছোঁয়াছুটি মানন লাগে । আর তুই কিগুরে আমার বৌ নিয়া মাততে । সাবধান করি দিলাম, আমার বৌরে নিয়া আমি যত ইচ্ছা মাততাম পারি, আরি পরিয়ে মাতলে মানতাম নায় কল্লা লামাই লিমু বেটা । বৈতল কিতা তো চিনছ না । তুই কুন্‌দিন কেউর ভালা দেখচছ নি ? এশক জানছ নি, পিরাকির পয়লা পাতাত অউ আছে এশকর কথা । এশক বিনা লাভ নাই । এশক মানে ভালা পাওয়া । প্রেম রে বেটা মদন ।

তেত্রিশ

বৈতলের মনে দুর্গাবতীর জন্য হু হু করা এশক বয়ে যায় গাগলাছড়ার পাগলা জলে ।
বৈতলের একার দুঃখ ইদানীং উথলে উথলে ওঠে, দুর্গাবতী যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিনদিন ।
দুর্গাবতী এমন নয়, জাত ধর্মের ফারাক করেনি বলেই বৈতলের মনে ধরেছে । দুর্গাবতী এক
প্রতিকূল পরিবেশে ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে মাছুয়া পাটনির সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছে । পিয়াইন-এর
পারে, একা বাড়িতে শ্মশানঘাটের বাড়িতে যখন একা তখন লুলাও গেছে । যে-রাতে লুলা
দুর্গাবতীকে বেইজ্জত করে, সে-রাতেও তো ছিল রুল আমিন বেজ । গ্রামের মানুষের এতসব
ফারাক করার সময় নেই । এপারে এসেও সব ঠিকঠাক ছিল, কোনও বিদ্বেষ রাখেনি দুর্গাবতী
কোথাও । লুলার বিশ্বাসঘাতকতায় একটা ক্ষত হয়েছে হয়তো, বাকিটা কি বৈতলের প্রতি
অভিমান না যম জমিদারের কাছে নেওয়া হিন্দুত্বের পাঠ । দুখু বহুই আপদরা দুর্গাবতীর পাত্তা
দেওয়া না দেওয়ার উপর নির্ভর করে না । ওরা জানে ওদের দোস্তু বৈতল, আর কিচ্ছু জানে
না । বৈতল মানেই সরাসরি, বৈতল মানেই অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার, বৈতল মানে অনেক
জানার এক মজুব । সত্যের বড় বিপরীত চলন, মানতে গেলেই আপদ বাড়ে । হরিৎবরণের
চ্যাড়া জমিদারের সঙ্গিনী হয়েই কি দুর্গাবতীর অধঃপতন । দুর্গাবতীর ইদানীং খুব বিবিয়ানা
বেড়েছে । ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, বৈতলের মুখে মুখে কথা বলছে, দুর্গাবতী আর অভিমানে
আঁচল ভেজায় না । বৈতল খুদকুঁড়ো যা-ই হোক রোজগার করেছে কিংবা ডোলের পাওনা নিয়ে
এসেছে তা-ই দিয়ে হাসিমুখে বাড়িয়ে দিয়েছে কলাইকরা ভাঙা থালায় পঞ্চব্যঞ্জন । বৈতল তার
বৌকে দিয়ে কাজ করাবে এমন কাপুরুষ নয়, দুর্গাবতী স্বেচ্ছায় ঠাকুরঘরের লেপাপুছার কাজ
নেয়, আর এখন তো হেডদিদিমণি জমিদার বাড়ির, কার এত সাহস আছে বলে দুর্গাবতী কাজ
করবে না । বৈতল প্রাণভরে দুর্গাবতীকে কিছু বলতে পারে, কিন্তু বৈতলের বৌকে নিয়ে যে

পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে ছাড়ে না । বইয়াখাউরি থেকে এদেশে আসার পর দুই নামে রিফ্যাজি খাতায় নাম লেখানোর পর বৈতল বড় ধন্দে আছে । কোনটা আসল কোনটা নকল বেছে বার করতে পারে না । বৈতল নিজের জাতি নিয়ে ধন্দে আছে, বৈতল নামটা নয় গুরুর নামে পাঁলে ফেলেছে মন্দ না । কিন্তু সে কে, পাটনি না শর্মা । সে বৌএর স্বামী না যা স্বাভাবিক তা-ই । সম্পর্কের ধন্দ নিয়ে বাঁচা যায় না । দুর্গাবতী বৈতলকে ব্যবহার করে তো কোনও ধন্দ, কোনও টানাপোড়েনে নেই । দুর্গাবতী প্রাণের দায়ে বৈতলের সঙ্গে সমঝোতা করেছে । ব্রাহ্মণ কৈবর্ত বিয়ে করে ধর্মরক্ষার কবচ পরেছে গায়ে, মুসলমানের ছায়া না মাড়ানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছে । আসলে দুর্গাবতী চাকরির শর্ত মেনে ধর্মাধর্মের পাঁচালি চড়িয়েছে মনে । নিজের সঙ্গেও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে । বলে,

--- আছলাম কটার বাবন কেম্পে বানাইল শর্মা

স্বামী পাইলাম পাটনি, আমার কিতা আর ধর্ম ।

বৈতল সাহস করে স্বামী হতে পারেনি । দুর্গাবতীই ওকে বরণ করেছে । কিন্তু অসম বর্ণ, অসম শিক্ষায় স্বামী-স্ত্রী জীবনযাপন করতে পারেনি । সম্বন্দের দূরত্ব বজায় রেখেছে বৈতল । হরিৎবরণ চলে আসার পর কী থেকে যে কী হয়ে যায়, দুর্গাবতীর ছেঁড়া কাপড়ের ফাঁকে উঁকি-দেওয়া যৌবন বিদ্রোহ করে বৈতলকে । কী জানি ঈর্ষা না তেজ । যুবক জমিদারের কুচোখ থেকে স্ত্রীর শরীর বাঁচাতে বাঁচাতে নিজেই ঘায়েল হয়ে যায় বৈতল । বৈতল ভাবে তারই তো সব, নবীন শহরে নবীনা ঘরনিকে নতুন চোখে দেখে । বৈতল ভাবে শুধু অসভ্য জমিদার কেন সেও চাইলে সব পেতে পারে, তাদেরও একটি সন্তান হতে পারে । একটি মেয়ে চাই, মেয়েই চেয়েছে বৈতল । দুর্গাবতীকে বলেছে,

--- আমার পুড়ি অইব দেখিও ।

--- তুমি কুন্স সব জাস্তা নি । পেটর ভিতরে ঢুকিয়া দেখছ নি । ইতা ভগবানর দয়া । পুয়া অইলে কিতা করবায়, তুমার অউত্ত পুয়া ।

--- অয়, আও কথাও ঠিক ।

বৈতলের ভয় ছেলে হওয়া নিয়ে । নিজেকে নিয়ে ভয় । ছেলে হলে যদি শয়তানিতে পায়,
ছেলে বাপে শত্রুতা হয় । বাপকে ফেলে দেয় গাছমাচা থেকে । দুর্গাবতীর কথায় নতুন করে
ভাবে । না ছেলেকে নষ্ট হতে দেবে না, ভাঙা পথে যেতে দেবে না । মানুষের মতো মানুষ
করবে । পড়াশুনা শেখাবে, জজ ব্যারিস্টার না হলেও মাস্টার তো হবে । গ্রামে শিক্ষকের বড়
অভাব । ভাল ওস্তাদের মনসাপুঁথি শেখার জন্য ভাটির দেশ ছেড়ে কত কত গ্রামে ঘুরে
বেড়িয়েছে । শেষ পর্যন্ত তো বৈতল সদগুরুর পায়ে মাথা ঠেকাতে পেরেছে রইদপুয়ানি গ্রামে,
পণ্ডিতের দেশ পঞ্চখণ্ডর এক কাঠমিস্ত্রি বৈতলকে আবার জন্ম দিয়েছেন । গুরুর শিক্ষা এক
জীবনে শেষ হওয়ার নয়, বৈতল তার ছেলেকে গান শেখাবে, মনসাপুঁথিও পড়বে ছেলে, কিন্তু
গুরমির নাচ শেখাবে না, ছেলের মা পছন্দ করে না, বাপকে নপুংসক বলে অবজ্ঞা করে ।
গুরুর কথাটাই বৈতল ধুব মানে । গুরু বলেন,

--- আইমনসার গান শিখতায় করি বাকি গানর লগে আড়ি নি । আরো কত সুন্দর সুন্দর গান
আছে বাংলাত । বৈষ্ণব পদাবলী এক জীবনে পড়িয়া শেষ করা যায় না । খালি হিন্দু পদকর্তা
নি রেবা কত মরমীয়া মুসলিম সাধকে লেখছইন পদ, ছনতায় নি । ছন, ছন বলেই আর তর
সয় না গুরুর । দুকলি শোনাবেনই শোনাবেন,

‘শিতালং ফকিরে কয় শ্যামরে কালিয়া

প্রকাশিত কর ঘর দরশন দিয়া ।’

গুরুর গানের ভাঙুর অফুরন্ত । সারি গান জারি গান রামপ্রসাদী মালসী থেকে রবীন্দ্রনাথ
পর্যন্ত তাঁর বিস্তৃত ভ্রমণ । বলেন অখন সিনেমার গানও মাইনষে গায় । তিনি বলেন,

--- গান অইল রেবা মনর আয়না, চউখ বন্ধ করিয়াও দেখা যায় নিজরে ।

বৈতল ছেলেকে শেখাবে সিনেমার গান, সায়গলের গান, কাননবালার গান । শেখাবে, ‘আমি
বনফুল গো, নাচি ছন্দে কী আনন্দে ।’ সেন্ট্রাল রোডের কালীজয় কবিরাজের বাড়ির ছেলে
মেয়েরা গান শেখায় সঙ্গীত বিদ্যালয়ে । রবি ঠাকুরের গান হয়, ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি কে
আমারে নিয়ে যাবি’ শেকানো হয় ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় ।’ দুর্গাবতী
আবার বৈতলের মতো ক অক্ষর গোমাংস নয়, লেখাপড়া জানে । বলেছে ওটা রবি ঠাকুরের
গান নয়, এক ফকিরের লেখা গান, লালন ফকির । নামটা ভারি সুন্দর, বৈতলের মনে ধরে ।

দুর্গাবতীকে বলে, ছেলে হলে নাম রাখবে লালন, লালন পাটনি । উঁহু, দুর্গাবতী বারণ করে পাটনি লেখা চলবে না, কৈবর্ত না, উঝা না এমন কি দাসও না । এখন যে বৈতলের বৌ এর নামে পদবি । বৈতল দাস শর্মার ছেলের নাম হতে পারে লালনদাস শর্মা । বৈতল বুদ্ধি করে দাস শব্দটা ঢুকিয়ে দেয় মাঝখানে ।

মাটিজুরির সাজিদ মিয়ার পাঁচ বেটা দুই বেটি । দুই বিবি বর্তমান । ছোট তিন ছেলে আর দুই মেয়ে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই । মায়ের বাধ্য বাপকে ডরায়, মাটির সঙ্গে কথা কয় । একেবারেই ছোট ছোট । শেষ পাঁচটির বড়টির বয়স সাত, ছোট দুটো এখনও কোলে দুই মায়ের ।

বড় দুই ছেলে একেবারে খোদার অদেখা । বাপকে ডরায় না, দুই মায়ের নয়নের মণি । এতেই ভয় ঠিকাদারের, ঠিকাদারের মন পোড়ায় । বারবার যায় পিরের কাছে, দোয়া চায় । মামুর হাতে চড় চাপড় খায় বেদম, আর হাসে । গভীর বেদনা হাসি হয়ে ঝরে মামুর মারে । মিয়া ঠিকাদার যখন মার খায় তখন তার দোয়া হয় । হাতে নাতে যে প্রমাণ পায় ঠিকাদার, যখন মার খায় পিরের হাতে তখনই তার অর্থাগম হয়, ঠিকাদারিতে লাভ হয় বিস্তর । সরকারি অফিসে সাজিদ আলির বিল পাশ হয় । ঠিকাদার যখন মামুর হাতের মার খায় তখন কাতর চোখে মামুকে নিবেদন করে তার মনোদুঃখ । বলে,

--- আরো মারো, আমারে মারি ফালাই দেও দাতা । আমার বড় দুইটারে মানুষ করি দেও । ই দুইটারে ডিগরা দেও বাবাজি ।

‘ডিগরা’ দেওয়া মানে বেঁধে রাখার কথা বলে সাজিদ মিয়া । নাকি অন্য কোনও ইশারা করে, তার মনের কোনও গোপন কথা শোনাতে চায় সর্বশক্তিমানের প্রতভূকে । পিরের কাছ থেকে কোনও অলৌকিক সমাধান না পেয়ে, মনের ব্যথা মনে নিয়ে ফাটকবাজারে আহমদিয়া হোটেলেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নেয় সাজিদ, মাটিজুরি একরাত না ফিরলেও কেউ তার জন্য অপেক্ষায় জেগে থাকে না । হোটেলের ঘরে যেমন একা, বাড়ি ফিরলেও একই । তবে মিয়া ঠিকাদারও কোনও ভালবাসাবাসির তোয়াক্কা করে না তাই তটস্থ করে বাড়িতে তার উপস্থিতিতে সবাইকে । সবাই তাকে ভয় পেয়ে এসেছে এতদিন, ইদানীং বড় ছেলে দুটো একটু লাগামছাড়া হয়ে গেছে । বাড়ি থেকে উস্কানি পাচ্ছে সে বুঝতে পারে সাজিদ । বুঝেও সে অসহায়, কিছুই করতে পারে না, তার হস্তিত্বিতে ভয় পায় না ওরা দুজন । তাই তো পিরের কাছে যাওয়া ।

পির যদি কিছু একটা সমাধান দিতেন, সাজিদের মন খুশিতে ভরে যেত, পিরের পায়ে বেণ্ডার টাকা পয়সা ঢেলে দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছে সে । সাজিদ মিয়া তাই মনোদুঃখ সন্ধ্যার পর যায় নাগাপাড়ির পতিতালয়ে । বৈতল ঠিকাদারকে আগেও দেখেছে নাগাপাড়িতে, তখন এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি । তাই বৈতল এবার নিজেকেই লুকিয়ে রাখে মধুবারার ঘরে । মুখোমুখি হলে যে মানী মানুষের লজ্জা ।

এরপরও সাজিদ ঠিকাদার যায় মামুর কাছে । মামুর হাতে মার খেয়ে হাসতে হাসতে কাঁদে ঠিকাদার । দুখুর হাত ধরে বলে,

--- আমার কজা আছে, ভুল করছি আমি । বাবাজি তো আল্লার অলি, জানইন সব তা উ ।

--- জানলে ভুল করইন কেনে । শুধরাই লাইন । যাইন না যেন বেজাগাত, সিমেন্টর বদলা বালু মিশাইন না যেন । বালুর পুল যেদিন ভাঙ্গিয়া পড়ব হিদিন তো ধনে মানে যাইব । তখন কারে দোষ দিবা, আপনার নিজর, না মামুর, না আল্লার । মামুয়ে মারিয়া আপনার খাইসলত খারাপ কররা না, আপনারে সাবধান কররা । ঠিক আছে, লিল্লা বাড়াই দেইন অখন ।

দুখুটা মহা হারামজাদা । ঠিকাদারের বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার কথা বৈতলের কাছ থেকে শুনে কেমন ঝেড়ে দিল । মামুর মহিমায় যেন সে জেনেছে । আসলে ঠিকাদার কিছু একটা বুঝতে পারলেও দুখুর ইশারা বোঝে নি । সেয়ানা দুখু তো বেশ ভাল ভাল কথাও বলতে জানে, দুর্বল মানুষটার উপর খাঁড়ার ঘা টাও মেরে দেয় কেমন মোক্ষম । দানের টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার কথা না বললেই পারত দুঃখী মানুষটাকে । তবে কাজ হয় । দুখুর কথায় মিয়া ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে সঙ্গে সঙ্গে । দুখুর হাতে মামুর পবিত্র অর্থভাণ্ডারে দান দেয় হাত খুলে । গরিব দুঃখীদের দাওয়াত দেয় বাড়িতে । মোমেন, মৌলবি, পিরদেরও ভরপেট খাইয়ে দেয় । মামু পিরকে তার মুরশিদ মেনে, ভক্ত সেজে পড়ে থাকে । মামুর ছনবাঁশের ঘরটা কাঠ সিমেন্ট ঢেউ টিনে বেঁধে দেয় । নতুন জিপ কিনে মামুর কাছে আসে । দুখুকে অনুনয় বিনয় করে মামুকে তার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য । গাগলাছড়া নদীর পারে সাজিদ মিয়ার নিজ বাড়িতেও একই ঘটনা পুনরাবৃত্ত । মামুর হাতে মার খেয়ে হাসতে হাসতে দুখুকে বলে,

--- মামুরে জিগাইন না, একটা মসজিদ বানাইতাম নি বাড়ির জমিনো ।

মসজিদ বানানো তো খুব পাক প্রস্তাব । না করার কিছু নেই । কিন্তু মামু রাগে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে । ঠিকাদার এবার আসল প্রস্তাবটা দেয় খোদার নিজের মানুষকে । বলে,

--- আমার ডেকা দুইটা আমারে মানে না । ইতারে মানানি লাগব আপনার ।

মামু আবার হাত উঠাতেই সাজিদ মিয়া সরে যায় । পিরের বাড়ি তো ধর্মস্থান, ওখানে মার খেলে পুণ্য বই ক্ষতি নেই । এখানে তার নিজের বাড়িতে মানসম্মানের ভয় আছে, গ্রামের মানী মানুষে এমন মার খাওয়ার অসম্মানকে ভয় সাজিদ ঠিকাদারের । তাই হাসিমুখে সরে যায় । বৈতলের চোখে চোখ রেখে বলে,

--- কিতা উঝা, মুরগির ছালন কিলা খাইলায় ।

--- কিলা আবার, যেমনে খাওয়াইলা । আপনে অইলা দিলদার ইনসান । আপনার বেপার অউ আলেদা ।

সাজিদ মিয়াকে একেবারে পছন্দ করে না, দুখু ওকে চাপে রাখে সর্বক্ষণ । তাই বৈতলের অকারণ প্রশংসায় রেগে যায়, বৈতলকে মারে । পিঠে লুকনো চিমটি খেয়েও যখন হাসে, তখন সে মাথায় মারে চাঁটি । ফিশ্‌ফিশিয়ে বলে,

--- অই বেটা পুঞ্জির ভাই, আল্লার লগে বেইমানি করিছ না । আল্লায় কইছইন যেণ্ড ভালা ইগুরে ভালা কওয়ার লাগি, বাদুয়া ইগুরে অত দিলদার উলদার কইলে কেনে ।

--- দিলদার কারে কয় অততা করের বেটায়, একটু কইতাম নানি । তর কেনে তার উপরে রিশ আমি জানি ।

--- কিতা জানছ । তর জানা তো অইল কার বৌ কিণ্ডয়ে নিল অতা । কোন জমিদারর লগে কোন বৈতলের বৌর লেঙ্গিপেঙ্গি, অতা । আমার তো বেটা বৌ অউ নাই । আমার কিতা জানতে ।

--- মারিলাইচছ বৌ তে থাকত কেমনে ।

--- মুখ সামলাইয়া মাতিছ কইলাম । ই বেটা ইগু ঠগ, ভাবিছ না, মামুর ঘর উর পাক্কা করি দিছে এর লাগি মামুয়েও ভালা পাইন । তাইন অইলা উপরআলা, তাইন কেনে আইছইন তাইন অউ জানইন । সোজা রাস্তাত আনার লাগি বউৎ চড় থাপ্পড় মারছইন, হে ভাবছে উল্টা ।

--- তে আইলা কেনে, তাইন না করলে আমরা আইলাম নে নি ।

--- পিরাকি তুইন বুঝতে নায় । হে ঠগ অইলে কিতা অইব, তার পরিবার দেখছ নি । ভালা কইলে তারারে কইছ । হিগুরে না ।

--- হে আর কিতা খারাপ ক । শিলচর গেলে একটু আধটু মৌজমস্তি করে, হোটেলো থাকে, চৌদ্দনম্বরো যায় । ইতা হক্কেলেউ করে একটু আধটু ঘরো শান্তি না থাকলে ।

--- তুইন ওতো যাছ, এর লাগি নায় বেটা । ইগু বদমাইশ, আমার বাড়িও তো হইলাকান্দির ভিচিংচাত । হে যখন টেম্পুর হেণ্ডিমেন তখন থাকি উ নু চিনি । আমিও ত হেণ্ডিমেন করছি শিলচর হইলাকান্দির রউটো, মোহনপুর দিয়া আইত । হারা জিল্লাত তখন দুই টেম্পু, এক শিলচরর পান্না নাগর, প্রেমতলা সোনাবাড়িঘাট । আর হইলাকান্দি মাটিজুরিও বলাই পুরকায়স্থর, আমরা কাকা ডাকতাম, অখন নাই, মরি গেছইন । হউ ভালা মানুষরে ঠগাইয়া হে অই গেল ঠিকাদার, আমি অইলাম চেরাগ জ্বালানির কামলা, মাজারর খাদিম । যত নেকি করলাম মামুর পাওর তলো থাকি সব গেল বরাকর পানিত ।

--- কেনে বে ।

--- কেনে কিতা, তিন বেইমানরে গাইঞ্জা খাওয়াইয়া গুণাও তো কম অইল না ।

--- তুইও খাচনা কেনে হালার হালা, খামকা ছুকইন টিপরে কেনে । বচন ছনতে নি । লিল্লার বাক্স মারিয়া বেটা ফাক করি দিরে আর গাইঞ্জা না খাইয়া তুই পির অইবে । আল্লায় ভগবানে ইতা দেখইন । তুইও একলাখান চুর, হি বেটাও চুর, চুরে চুরে আলি, এক চুরে বিয়া করে আর এক চুরর হালি ।

--- তুইত বেটা বড় চুর । আমরা সব চুরির মাল তো তর কাছে উ । তুই কইছ সব তোর জমিদারর জাপ্পালও ফালাই রাখছ, কিছু নছিবালা হাকিমর পুকইরো । অখন তুই নি হক্কলতা মারি দিছ কে জানে ।

--- মারন লাগত নায় আর, বহুই আর আপদে সব শেষ করি দিছে জানছ না যেনে তুই ।

সত্যি সত্যি দুখু জানে না কিছু । দুখুকে না জানিয়েই বহুই কাপড় চোপড় করিমগঞ্জ পাথারকান্দি গিয়ে বিক্রি করেছে । বৈতল এক পয়সাও নেয়নি, দুখুও নেয় না । বৈতলের কাছে চুরিটা একটা নেশা, মজাও বটে । বৈতল পেশাদারি চুরির কলাকৌশল ঝালিয়ে নেয়, নির্লিপ্ত দুখুও বৈতলের মতো সঙ্গ নেয় । আর আপদ বহুই লুটের মাল হাপিস করে । বৈতল যখন দুখুর উপর চড়াও হয় তখন মুখে তাই খই ফোটে । আবার বলে,

--- তর কথা কইয়াউতো হে আইয়া জমিদার বাগানো ঢুকে । আমি ইতা বুঝি না নি, বহুই ইণ্ড আউয়া, পয়সা পাইলে সব ছাড়ি দেয় । ভাঙা বেড়া ফালাইয়া হে তো যায় পাথারকান্দি, জানে না বাট্টি বেটায় তার বাড়িত কিতা করে ।

বহুইর মনে রাগ আছে বৈতলের উপর । বৈতলের জন্য বহুই তার বউকে আনতে পারেনি সঙ্গে । ঠিকাদার সাজিদ আলির নয় একটু বেটিঘেঁষা বাতিক আছে, বহুইর বৌর দিকেও নজর আছে । বহুই এসব নিয়ে ভাবে না, সব পুরুষই অন্যের মেয়েমানুষ দেখলে চঞ্চল হয়, আর বহুই-এর বৌ এর মতো স্বাস্থ্যবতী হলে তো কথাই নেই । পয়সাওলা লম্পটদের কথায় আলাদা, ধরাকে সরা জ্ঞান করার প্রাথমিক ধাপই হল নারীত্বের অপমান, সে জমিদার যমুনাপ্রসাদই হোক কিংবা ঠিকাদার সাজিদ মিয়াই হোক । যম হারামজাদাও বৈতলের ভাঙা ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখেছে সর্বক্ষণ, বৈতল বেরিয়ে গেলেই সে রাজা গড় গোবিন্দ । এমনিতে তো দুর্গাবতীকে লোলুপ চোখে দেখে সারাদিন । তবে বৈতল জানে তার বৌকে, দুর্গাবতীকে নষ্ট করার ক্ষমতা কোনও শয়তানেরই নেই । দুর্গাবতী না চাইলে কিছু হওয়ার নয় । বৈতল এও জানে লুলা দুর্গাবতীর জন্য মরেনি, বৈতল লুলাকে মেরেছে চোখের সামনে বন্ধুত্বের অপমান হতে দেখে । দুই বন্ধুতে মিলে ওরা চুরি ধারির অনেক অপকর্ম করেছে কিন্তু নারীশরীর নিয়ে অপমানজনক কিছু করেনি । বৈতল জানে লুলাকে মেরে সে দুর্গাবতীকে উদ্ধার করে নি । দুর্গাবতী তার মর্জির মালিক, সে চাইলে লুলার প্রেমিকা হওয়ার কোনও বাধা থাকত না । কিন্তু দুর্গাবতী এখন যদি জেনেশুনে যমুনাপ্রসাদের সঙ্গে জড়ায়, ঠিক হবে না । বৈতলের ইদানীংকার সন্দেহ কি ওদিকেই গড়াচ্ছে, দুর্গাবতী যে ঘনঘন এখন জমিদারবাড়ি যায় । দুর্গাবতী যা চাইবে তা-ই করবে ঠিক, কিন্তু তাহলে বৈতলকেও তার ইতিকর্তব্য ঠিক করতে হবে । শয়তানের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে । একা একাই তার লড়াই হবে দুই প্রতিপক্ষের

বিরুদ্ধে, একজনের পাপের ভরা শূন্য হলে সে যাবে তার আপন দেশে । যমুনা যাবে যমের দেশে, কিন্তু আর একজন যে অবধ্য । বৈতল হাজারো প্ররোচনা সত্ত্বেও দুর্গাবতীর অনিষ্ট করতে পারে না । তাই বৈতলের এই বিপরীত লড়াইএ সে একা, ওখানে কেউ তার সঙ্গী নেই । দুর্গাবতী নেই, দুখু নেই বহুই নেই, আপদ নেই । বৈতল ভাবে সে বহুইর মতো হলে কী হত, বহুইর এত মনের মনকলা খাওয়ার বাতিক নেই । সে তার পেট নিয়ে ভাবে শুধু দুবেলা ভালমন্দ খাওয়ার জন্য সে সব কিছু করতে পারে । বৌকেও বন্ধক রাখতে বাধা নেই, কী আর করবে, শুধু দেখবে । ঠিকাদার মানুষটাকে নিয়ে দুখু বৈতলের কেন এত দুর্ভাবনা ভেবে পায় না বহুই, সে জানে বৌকে নিয়ে এলে আরো একটু খাতির হয় তার । নাহয় একটু তাকিয়ে দেখবে তার বৌ-এর পুরুষ্টু বুক । হাত দেওয়ার জন্য নিশপিশ করবে । দেবে তো না । বহুই তাই বৈতলের উপর রাগ ঝাড়ে । বলে,

--- তোর ভাবিরে ত বেটা চিনছ না, হাজারা বেগমরে দেখেনেঅলা অখনও পয়দা অইছে না ।
ছইয়া দেখউক না, বিচি কচলাইয়া মারি ফালাই দিব বেটিয়ে ।

--- তর কুনু ঘিন্না পিত্তা নাই, অততা জানিয়াও শুওরর জনার বাড়িত আইচছ মাছে গোস্তে
খাইতে এর লাগি ।

--- আইছি তে কিতা অইছে । মামুর লগেউত আইছি, পিরর চেলা অইয়া আইছি । তুইও
হক্কলতা জানিয়া আচছ যম জমিদারর বাড়িত ।

--- হি কুত্তার বাইচ্চার কথা ছাড় । তার বাড়িত আমি কেনে আছি, আমি উ জানি ।

--- তে বুঝি লা আমি কেনে আইছি, আমি জানি ।

--- হে নায় বুঝলাম, দুখু হারামজাদা কেনে আয় । তারেও তো পয়সা দেয় ঠিকাদারে ।

--- দুখুর কথা দুখুরে জিগা, হে জানে ।

বৈতলের সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় । এতসব জটিলতা চারদিকে, কোনটা শুদ্ধ কোনটা ভুল বুঝতে পারে না । সে শুধু অন্যের ভুল ধরে যাচ্ছে, নিজের দিকে ফিরেও দেখছে না । বইয়াখাউরির স্বদেশ তাকে স্বার্থপরতা শেখায়নি । মিরতিঙ্গার পাহাড়জঙ্গল আর সুরমা পিয়াইনএর জলহাওয়ার নির্মল পরশে বুকুর পাটাও হয়েছে চওড়া । বড়হাওরের জলহাওয়ায়ও

যে কোনও লুকোচুরি নেই । বৈতল চুরি করেছে, ডাকাতি করেছে সরাসরি । নিজের দোষ ঢাকতে অন্যের দোষ ধরে বসে থাকেনি । বৈতল কখনও অকারণ অন্যের স্তাবকতা করেনি । দুদিনের জন্য ভরপেট মাছ আর মাংসের লোভে সে কেন ঠিকাদারের প্রশংসা করবে । তাহলে কি লোকটার প্রাচুর্য দেখে সে হারিয়ে ফেলেছে তার তাত্ত্বসন্মান । সাজিদ মিয়ার উঠোনে পিল পিল করে ঘুরে বেড়ানো মুরগির বাচ্চা দেখে মাথা ঘুরে গেছে তার । পুকুরের মাছ আর এপার ওপার নদীর মালিক মানুষটাকে সে তার মাপের থেকে বড় ভাবতে শুরু করেছে । দুখু যেমন জানে বৈতলও তো জানে মানুষটার অপদার্থতা । জানে তার শয়তানি । নাকি বৈতলের মনেও কোনও অপরাধ । যম জমিদারের লাম্পট্যকে সে ঘৃণা করেছে অর্থবানের দুরারোগ্য অসুখ হিসেবে । যার একমাত্র শান্তির সত্য শুধু বৈতল জানে । নিদানও দেবে সে । সাজিদ মিয়াকেও সে দেখেছে বেশ্যাবাড়িতে, দেখেও দেখে না, লুকিয়ে থাকে মধুবালায় ঘরে । দেশবাড়ির কথার কথা ‘হাগল বেটির লাজ নাই, দেখল বেটির লাজ’ কথাকে অভ্রান্ত করে এক জটিল নাগরিক দ্বিচারিতার শিকার হচ্ছে । মুরগির মাংসের লোভ তার আছে । আর এক লোভী, দুষ্ট জমিদার যমুনাপ্রসাদ, যে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ নিয়ে সভা করে, মুসলমান বিতাড়নের কথা বলে পরিবেশ উত্তপ্ত করে, মুসলমান এলাকায় গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলে, ধর্মনিরপেক্ষতার বক্তৃতা করে, বৈতল তারও দেখেছে বলরূপী রঙ । গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে তার বদলে যাওয়ার লোভী মানসিকতা । বৈতলকেও সেই যমুনাপ্রসাদ ব্যবহার করেছে । বৈতল যতই বলুক যে তাকে খেলাচ্ছে, দেড়মণি বোয়াল মাছের জন্য দেওয়া টোপ গেলানোর জন্য এসব করতে হয় । না, বৈতল কিছুটা হলেও ব্যবহৃত হয়েছে যমুনাপ্রসাদের শয়তানির । জমিদারের বাগানে ফিস্টি করার মদ ও মুরগির যোগান তো দিয়েছে বৈতলই । প্রথম প্রথম বেশ উৎসাহ করে, বাগানের জঙ্গলে তিন ইন্টার উনুনে রান্না করে দিয়েছে মাংস ভাত, তেলে সাজিয়ে দিয়েছে মদপাত্র । প্রফেসার বন্ধুর সঙ্গে খেয়েছে । বৈতলের জন্য রেখেছে মাথা গলা আর ছানামাথা ঝোল, মদের খালি বোতল । বৈতল বলেছে সেদিন, হালা, হালা হালা । এরপর থেকে কলাপাতায় রেখে দিয়েছে নিজের জন্য আগপাত । মাংসের ভাল ভাল টুকরো । চড়া নেশা হয়ে গেলে বোতলের মদেও জল মিশিয়ে পরিবেশন করেছে । নিজের ভাগটা রেখেছে ষোল আনা । বৈতল কারো ভাগে ভাগ বসায় না, তবে নিজেরটা নিয়ে কেউ শয়তানি করলে ঠকানোর চেষ্টা করলে বৈতল ছেড়ে দেয় না । তার বৌ দুর্গাবতীর সঙ্গে ফস্টিনস্টিও বৈতল সয়নি, বইয়াখাউরির বৈতলের ভয়ঙ্কর রূপ এখনও এদেশে কেউ দেখেনি । কিন্তু বৈতল

যে দুখুর উপর ভরসা করে । দুখুর সঙ্গে লড়াই করে, কিন্তু দুখু কোনও দ্বিচারিতা করলে
বৈতল সহিতে পারে না । তাই দুখুকে সরাসরি প্রশ্ন করে । বলে,

--- তুই কেনে তার কাছ থাকি পয়সা নেছ, তার গাড়ি চড়ছ, তার বাড়িত থাকছ আইয়া ? হে
যদি অত বাদুয়া, তে কেনে ক ।

--- কিতা কেনে ।

--- তুইন হালা কাফের, কিতা বুঝবে কেরামতি । মামুয়ে না চাইলে দুখু মিয়া কুণুখানো এক
পাড়াও দেয় না । সাজিদ মিয়ার নিয়ত খারাপ, কিন্তু হে আল্লার নেক বান্দা । হে আল্লার
ওয়ালন্তে কিতা না করে,

--- হুন তে নেক বান্দা অইতে কিতা করন লাগে,

এক চিত্তে পাচ ওক্ত নেমাজ পড় ।

কাল মাল্লা পড় ভাইরে গোছল করিয়া

জুম্মার নেমাজ পড় সকলে মিলিয়া

ফজরের নেমাজ পড় সাহেবিনীর সহিত

নহে দিবা নহে রাত্র কোরাণের লিখিত ।

ত্রিশ রোজা কর একদিল-এক-জানে

হরদমে আল্লার নাম জপ মনে মনে ।

যেই জনে মহম্মদের তারিক্ না মানিবে

কাফের হইয়া সে যে দুজকে যাইবে ।।’

হে হক্কলতা মানে । নাইলে মামুরে পাওয়া নি অত সুজা । হে পুল বানার, নিয়ত খারাপ এর
লাগি সিমেন্টো বালু দেব বেশি । মামুয়ে দোয়া দরুদ দিবা, তারে সোজা করন লাগব ।

--- আর হে যে লাটিয়ামি করে । নমাজ পড়লেউ নি সব মাফ ।

--- আল্লায় সব দেখরা, সব ঠিক করবা দেখিছ । তুইন অউত্ত একটু আগে কইলে ঠিকাদার
ভালা, অখন কইরে বুৱা । কিতা বুঝতাম ক । বেটা ইগুরে আমিও দেখতাম পাৱি না, তার
লগে বেশি মাতিও না । কিন্তু তার কপালো যে অত দুঃখ, তুইন হুনে কইবে অয় । তার সব
থাকিয়াও কিছু নাই । জানছনি তার বড় ছুৱা দুইটা বেলাইনো গেছে গিয়া । তারে মানে না,
এৱ লাগি তার আতান্তর । মামুৱে দিয়া মুকাবিলা কৱাইত আনছে ।

--- কিওৱ বেলাইন বে । কিওৱ মুকাবিলা ।

--- মিয়াৱে মানে না, বাপ ডাকে না । বড়গু হাই মাদ্রাসা পাশ কৱিয়া আৱ পড়ল না, অখন
কবি অইচে । আৱ ছুটগু সাইকেল মাস্টৱ ।

উপন্যাস

চৌত্রিশ

প্রেমের মাস্টার শফিউল্লাহ গ্রামে গ্রামে ‘রূপবান’ এর গান গায় । সফির গান শুনতে মানুষ রাত জাগে । লালা মনাছড়া কাটলিছড়া, কালাছড়া, কুচিলা, সরসপুর, আলগাপুর ভিচিৎচায় শীতের রাতে শামিয়ানা টাঙিয়ে গান হয় । সিলেটি কবি খলিল শাহর অপরূপ প্রেমকাহিনি চন্দ্রমুখী আর গুলসুনাহর এর প্রেমকথা । যে রাজকুমারী কখনও হরিণির বেশ ধারণ করে কখনও শাহা সাইক্কানামের এক দরবেশের রূপে । ইন্দ্রপুরির অঙ্গরার সঙ্গে গুলসুনাহরের বিয়ের রাতেই আত্মহত্যা করে চন্দ্রমুখি । অপরূপা নববধূর রূপধারণ করে মৃত্যুর মুহূর্তে অন্তরের অভিমান প্রকাশ করে গানের কথায়,

‘যদি বা থাকিত মনে চন্দ্রমুখি করি

তে কেনে করিত বিয়া ইন্দের আবেশ্বরী

এ বুলিয়া আল্লা নবি করিয়া স্মরণ

কাটারি হির্দেতে হানি ত্যজিল জীবন।’

কোনোদিন শফি শুরু করে ‘ভেলুয়া সুন্দরী’র কাহিনি দিয়ে । রূপকথার জাদু ভরপুর প্রেমকাহিনির মজা বাঁকে বাঁকে । দর্শকের দুঃখ ও আনন্দ যুগপৎ উথলে ওঠে গানে যখন নায়ক আমির তার মায়ের কাছে ভেলুয়াকে রেখে বিদেশ যাত্রা করে । আমির মাকে ভেলুয়ার যত্ন নিতে বলে,

‘না দিও গোবর ফেলিতে কন্যার গায়ে দাগ লাগিবে

না দিও উঠান কুড়াইতে কন্যার পায়ে ধূল পড়িবে ।

মরিচ বাটিতে না দিও ভেলুর হাত যে জ্বলিবে

না দিও পানি আনিতে কন্যার গায়ে ব্যথা হইবে ।’

শফির গান শুনতে গাঁয়ের মানুষ রাত জাগে । রাজপুত্রের মতো দেখতে শফিউল্লাহর জন্য মানুষ দূর গ্রাম থেকে দল বেঁধে আসে । কেউ কেউ রূপোর মেডেল বেঁধে দেয় বুকে । বড়মা সাজগোজ করা জরির পাজামা পাঞ্জাবি আর চাপদাড়ির ছেলেকে দেখে বলে,

--- ইরাণের ফকির আমার সফি ।

ছোটমাও বলে,

--- মাইনষে না নজর লাগাই দেয় । কিলা মহব্বতর গান গায় দেখছ নি বুবু । ইবার বাপের নিকা একখান করানি লাগব ।

দুই মায়ের কথাবার্তা শুনে শফির মুচকি হাসি আরো বড় হয় । বলে,

--- ইতা ভেলুয়া আর চন্দ্রমুখি কও রূপবানর ধারোকাছো নাই । এক ‘ধাইমা’ টান দিলে জানো নি আঠারো গাউর মাই হকলর পরাণ কাপে ।

--- তুমি কেমনে জানলায় বাপজান । মাই হকল না ছুকরি হকল । ইবার আর আমরা ছাড়িয়ার না । ইবার তুমার বিয়া ।

দুইমাকে আশ্বস্ত করে শফিউল্লাহ শোনায় গান,

‘আমার বাড়ির পশ্চিম ধারে

ও ধাইমা কিসের বাজন বাজে গো

আমার ধাইমা

বারো দিনের শিশুর সঙ্গে

ও রূপবান তুমার হবে বিয়া গো ।’

বড় বৌ ছোট বৌর সঙ্গে সফির সব মনের কথা । কিন্তু ওদের কেউই তার আপন মা নয় । আপন মাকে মনে নেই, কিন্তু দুই ধাত্রী মাকে নিয়েই তার সংসার । সফির মা মারা যাওয়ার পর দুটো বিয়ে করে সাজিদ মিয়া ঠিকাদার । সফি দুজনকেই মা ডাকে, দুজনই বোঝে কাকে ডাকছে । এমনই বার্তা এমনই সংকেত এক শব্দের । সেই ছেলে রাত জেগে ক্লান্ত হয়ে দুই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, বেশি স্নেহ কম স্নেহ নিয়ে কেউ ভাবে না । শীতকালেই কবিগানের ধুম, তখন আর নাওয়া খাওয়ার সময় নেই । এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম, তবে সফিউল্লার নাম হওয়ার পর গ্রামে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, ছোট ছোট শহরেই শামিয়ানা পড়ে, থানার মাঠে মানুষ আসে শফি কবিকে দেখতে । গ্রামের মানুষের কাছে শফির গান শুনতে যাওয়া উৎসবের মতো, যেন ইদের খুশি । রাত জাগা আর অনিয়মের শফির টাইফয়েড হয় একবার । সাজিদ মিয়া বলে শিলচর নিয়ে যাবে সিবিল হাসপাতালে । সাজিদ মিয়া দুই মার চোখে কী দেখে কে জানে, মায়ের চোখের জলে পাথরও গলে যায়, শিলচর থেকে টেক্সি গাড়ি করে সুর ডাক্তারকে নিয়ে আসে । ডাক্তার ঔষধ দেন, দুই মা হেঁটে হেঁটে হাইলাকান্দি গিয়ে চিরাগ ফকিরের জলপড়া নিয়ে আসে । ফকিরের কেরামতি আর ডাক্তারের ঔষধে সুস্থ হয়ে ওঠে শফি । সাজিদ মিয়া বলে,

--- ডাক্তারে কিতা করত, দরবে কিতা করত, ফকিরর কী কাম । ই দুই বেটি না থাকলে আমার পুয়া বাচল না নে ।

দুই মা সুযোগ বুঝে আর্জি জানায় ঠিকাদারকে । বলে,

--- অখন পুয়ার মা থাকি বৌ দরকার । আমরার তনাইএও আর দেয় না । আপনারও কিতা নাতি নাতনর মুখ দেখার হাউস অয় নানি ।

--- তানে জিগাও, আমার কিতা, আইজ কইলে আইজ অউ লাগাই দিমু ।

জন্মদাতা পিতা ও দুই ধাত্রী মায়ের কথোপকথন শুনে শফি মা দুজনকে শোনায় এক বহুপ্রচলিত মরুকাহিনি । বলে,

--- বিয়া যে দিতায় জান নি এক কিচ্ছা ।

--- কিচ্ছা ত অখন নায়, কিচ্ছা শুরু অইব বিয়ার পরে । হুনি না আমরা ইতা মাত ।

দুই মা বিবাহে অনিচ্ছুক পুত্রের কোনও কথা শুনতে চায় না । আর শফিউল্লাহ শোনাবে উপকথার রূপক । বলে,

--- আরব দেশর এক পুয়ায় কিনছে এক তুরুক দেশর ঘুড়া । ঘুড়াত চড়িয়া বালুর উপরে দি
হে দৌড়ার, দৌড়াইতে দৌড়াইতে দেখে এক পরি, পরি না হুরি । কইল বিয়া করত, তাইও
কইল বিয়া করত । কইল একলা থাকন লাগব । হে কইল আমার মা আছইন । হুরি পরিয়ে
কয় মার কইলজা আনিয়া দিতায় পারবায় নি । হে কয় দিমু । ঘুড়া লইয়া গেল মাটিজুরি মা
দুইজনর দুই কইলজা লইয়া হে হাটিয়া যার হুরির দেশো । আকতা খাইছে এক উষ্টা ।

--- লাগল নি রে বাপ ।

--- লাগল নি রে বাপ ।

--- এ, আমার কিচ্ছাত নু একবার মাতল মার কইলজায় ।

--- তোর কিচ্ছাত ও তো দুই মা । আমরা দুইজন । আর ই গপ তুই তিন তিরিক্কা চৌদ বার
কইছ আমরারে ।

--- কইছিনি । তো কিতা অইছে আবার হুনলায় । মা অইলে হুনন লাগে ।

এত যে ভাল ছেলে শফিউল্লাহ । দুই মায়ের বাধ্য যে, তারও আছে মনোব্যথা । কাউকে
বলে না, শফি তার বাপের সঙ্গে কথা বলে না ।

শফির ছোট আতাউল্লাহ বাপকে শোনায় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা । তার বয়সী যুবক,
কিশোরদের সে নেতা । আতার দোস্তির টানে কেউ দূরে থাকতে পারে না । আটা বাপের
পকেট কেটে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে যায় । বাঘবাহার যায় সরসপুরের জঙ্গলে যায় । ধোয়ারবন্দ
জালেঙ্গা । আর সবুজবরণ পেরিয়ে যায় শিলচর । আহমদিয়া রেস্টুরেন্টের মতো মুরগির
কোরমা নাকি বড়মা ছোটমা কেউ রাঁধতে পারে না । ওরিয়েন্টেল হলে ম্যাটিনি শো সিনেমা
দেখে রাতে ফিরলে বাপ পেটায় খুব । আতার খুব ভয় ডর নেই, মার খায় আবার ঝাড়ে
বাপের টাকা । মার খেয়ে বাপের মুখের উপর বলে,

--- চুরর পয়সা চুরি করছি কিওর লাজ । খোদার জাহান অত ছুট নায়, সব হিসাব দেওন লাগে । তুমি আর তুমার বড় ঠিকাদারে মিলিয়া যে পুল বানাইবায় মাটিজুরিত, দেখবায় নে, ঝরঝরাইয়া পড়ব ।

--- পড়অউক, তর কিতা তে ।

--- আমার কিছু নায় । মাইনষে কয়, আমার বাপ ।

--- কইছ না বাপ ।

--- কই না । তেও তো কল্লা সোজা রাখতাম পারি না । আমি আমার তারিফ লইয়াউ থাকি ।

--- তর আবার কিওর তারিফ । কিওর পরিচয় । নাক টিপলে চেনা বার অইব আর বড়বড় মাত । ছাইকেল চলাইয়া তারিফ অয় না । ইতা পাচদশ গাউ পরে পরেউ আছইন একজন করি সাইকেল মাস্টর । দিনরাইত সাইকেল চালানি নতুন খেলা নায় । ছাইকেলো গোছল, ছাইকেলো খাওয়া, ইতা সাতদিনর মেলা দেখাত অইব মাইনষে, পয়সাও দিব, অউ সাতদিন অউ, আর নায় । মাদরেছা পাশ না করলে কেউ ফিরিয়াও চাইত নায় ।

--- সাইকেল চলাইয়া আমি পয়সা নেই না । আমার মাদরেছা আমার ছাইকেল, আমার মজিদ আমার সাইকেল । ছাইকেল অউ আমার পরিচয় । আমার পরিচয় ঠিক করব আমার ছাইকেল । তুমি নায় ।

--- তে আমি কিতা । তর বাপ কে ।

--- জানি না । আমি জানি আমারে আর আমার নানারে । মাঝখানো আন্দাইর ।

পড়াশুনায় মন নেই আতাউল্লার । বাপের অন্তে প্রতিপালিত হতে লজ্জা নেই । আবার বাপের সঙ্গে বনিবনাও নেই । বাপকে বলে ‘আন্দাইর’ । নানা আর তার মধ্যখানে বাপ অন্ধকার । দুই সৎমা আর সৎবোনদের সঙ্গে বিরোধ নেই । তবে শফির মতো এত আদুরে নয়, সব সময় রাগে । আতাউল্লার সব রাগ বাড়ির ভিতর, বড়ভাই আর ছোট ছোট বোন ছাড়া সবার উপর তার রাগ । বাচ্চা বয়স থেকে বাপের পয়সায় দান খয়রাত করে, দোস্তি করে । বলে নানার উত্তরাধিকার পোক্ত করছে । নানা আফজল ডাক্তারের সঙ্গে খুব ভাব আতার । নানারও খ্যাতি আছে ক্রমাগত সাইকেল চালানোয় । সাইকেল থেকে না নেমে ঔষুধ দেয়,

সারাদিন রাত নানা ঘুরে বেড়ায় এম এন্ড বি গুলি আর ‘শূলশমন’ নিয়ে । বেমারি মানুষরা
সবসময় ঔষুধের দামও দেয় না, নানা নাতিকে বলে,

--- দাম না দেউক । ডাক্তার ত কয় । আমি মরলে তুমারেও আফজল ডাক্তারর নাতি কইব ।

নানার উত্তরাধিকারে চড়ে আতাউল্লা ঘুরে বেড়ায় গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ।
শফিউল্লাহর কবিগানের আসরে গিয়ে উদয় হয় । কুচিলা গিয়ে শিকার করে খরগোস, প্রেইরি
হাঁস । সরসপুরে বাঘের উপদ্রব হচ্ছে খুব । বাপকে বলেছে বন্দুক কিনে দিতে । আতাউল্লা
ছোটবেলায়ই পেয়ে গেছে নানার সাইকেল । নানার এন্তেকাল হতেই সাইকেল হাতিয়ে নেয়
আতা । শুরু হয় সাইকেল মাস্টারি, নানা কেরামতি । বাড়ির সামনে পাকারাস্তার পাশে
নয়ানজুলি শীতে শুকিয়ে যায় । গ্রামের ছেলেদের নিয়ে নালা বড় করে, মস্তবাটির আকার ধারণ
করলে থামে । নানার হাম্বার সাইকেল নিয়ে নেমে পড়ে গর্তে । ছোট বোনের দল চিৎকার
করে উৎসাহ দেয়, উরিবিচি গ্রামের বাচ্চা বুড়োদের উৎসাহে আতাউল্লা দুরন্ত হয়ে ওঠে । ভয়
পাইয়ে দেওয়া বিচিত্র সব কসরৎ দেখায় । অগ্রগতির চাকাকে আরো দ্রুত করার সব কায়দা
কানুন রপ্ত করে । শফির মতো শামিয়ানা টাঙিয়ে, রঙিন কাগজের ঝালর লাগিয়ে, হাজাক
বাতির আলোয়, শিশির ঝরা ভোরে, ধানকাটা মাঠের দুপুরে, সখি বেড়ালের রোদঘুমের দুপুরে,
গোধূলির সন্ধ্যায় সে নাগাড়ে চালায় তার সাইকেল । নানার মতো নিরুদ্বেগ আনন্দে ঘুরে ঘুরে
চালাতে থাকে চাকা, আতাউল্লা চালায় । নাওয়া খাওয়া সব বসে বসে, নয় পাদানিতে দাঁড়িয়ে
থামে না আতার চাকা । চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে মানুষের উৎসাহ বাড়ে, আটচল্লিশ ঘণ্টায়
তুঙ্গে, চানামটর ঘুঘনির দোকান বসে, চা হোয়াইটের স্টলও বসে উজ্জ্বল হয় অনুরাগীর মুখ,
লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান সাবাসি দিয়ে যায়, শিলং থেকে নেমেই চলে আসে এম এল এ,
পঞ্চাশ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন, আরো কত খবর যে রটে তার ইয়ত্তা নাই । ছোটমা
বড়মা দুই মায়ের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা, আহা রে মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে । জনতার মনেও আশা
নিরাশার আনন্দ ভয়, এই বুঝি নেমে যাবে, আর পারবে না আতা । আতার শরীরে ধকলের
শ্রান্তি কিন্তু মনের ভিতর নানার মুখ । চারদিন পেরিয়ে যায় ছোটমা বড়মা পালা করে নায়ক
ছেলেকে খাওয়ায়, চলন্ত সাইকেলে জল ঢেলে চান করায় । শফিউল্লাহও ভাইয়ের সঙ্গে দৌড়ায়
মাটির পাত্র হাতে । বলে,

--- করিলা ভাই, দেখত নায় কেউ ।

এসব হয় রাতে । পায়খানা বন্ধ রাখতে পারে আতা সাতদিনের সাতদিন । আতা শফিকে বলে,

--- ভাইজান যতখান মজা লাগব ততখান থাকমু, কিতা কও ।

--- অয়রে ভাই, তুইন কছ মজা, কবি হকলে কইন আনন্দ । আনন্দ থাকলে দুনিয়াত কুন্ দুঃখ নাই । হাইলাকান্দির পূর্বায়নো বার অইছে তর কেরামতির কথা । ফটো তুলি নিছলা নীতীশদায়, দিতা পারছইন না, ফটো ছাপার মেশিনে বুলে কাম করের না । দিবা কইছইন পরে ।

বাপ সাজিদ মিয়াও মেলার মাঠ ঘুরে বেড়াচ্ছে । দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, বলছে ‘আমার পুয়া’ । ছেলেকে বলেছে,

--- দেখিছ, মাথা ঘুরাই উরাই পড়িছ না । সাতদিন পরেউ লামবে ।

আতাউল্লা বাপকে চলে যেতে বলে,

--- তুমি কেনে আইছ । আফজল ডাক্তারর নাতি এ তার পরিচয় ঠিক করের অখন । মজা করের, মজা করছ নি কুন্দিন, খালি ঠগঠগামি । আনন্দ কারে কয় জান নি । যাও গি ইখান থাকি, তুমি থাকলে অখন অউ লামি যাইমু কইলাম ।

--- তে আমার কিতা । তুই লামি যা ।

--- দেখতায় নি কিতা অইব । ঠিকাদারর মান ইজ্জত নু মাটিজুরি পুলর লাখান ভাগি যাইব বুরবুরাইয়া । যাও গিয়া আফজল ডাক্তারর নাতিরে ছলাইও না ।

সাজিদ আলি ঠিকাদারের বাড়িতে মানুষে মানুষে অরণ্য । পিরের পিরাকি দেখতে দূর গ্রামের মানুষ আসে উরিবিচি গ্রামে । মানুষের মনে সে কী প্রশান্তি, জালাল পিরকে একটু চোখের দেখা দেখে যেন সব কষ্টের লাঘব হয় । সবার মুখে এক কথা,

--- অখন ত আর জিন্দাপির দেখা যায় না, সব ধোকাবাজি । তান গা থাকি যেন লুকা বার, অলা তেজ ।

সবাই মনে মনে প্রার্থনা করে,

--- বিসমিল্লা গুন কর, তানে বাচাই রাখ ।

সবাই চলে গেলে সারাদিন ধকলের পর দুখু বৈতলকে বলে,

--- দরজা বন্ধ কর ।

--- কেনে । খানি উনি আইত নানি ।

--- খানির সময় এমনেউ ডাকবা তারা । তরে না দিয়া আইত নায় কেউ ।

--- অইবেটা বাঙ্গাল, খানির খুটা দেছ কিতা খালি । সকালেও কইচছ, কিতা এমন খাওয়াইলার বাদশাভোগ তোর ঠিকাদারে । খালি মুরগি খাওয়ার, হুনাইয়া আনল মাছ খাওয়াইয়া বে-আঙ্গাজ লাগাই দিব । এক ঘাঘটর ঝুল খাওয়াইল, অউনি বে-আঙ্গাজ । এর থাকি বেটা হিন্দু বাড়িত থাকে কত নানানি বিনানির মাছরান্দা । বাঙাল হকলে আইতা জানইন নি । হে তো জানে মামুয়ে কিতা ভাল পাইন, খাওয়াইল নি মকা মাছর কডু ।

--- খাইবে নে, আইলে তো মাত্র ।

--- আর খাওয়াইছে । হকলতাউ একরান্দা । পিয়াইজ আদা রসুন । রসুন আদা আর পিয়াইজ । সব শরীল গরম ।

--- আর তুই কিতা খাছ রাজভোগ জানি নানি । পাটনি বাড়ির সব আনা তেলে রান্দা । পুড়া পুড়া মাছ ।

--- খাইছ একদিন দুর্গার হাতো, চাটবে বেটা । অত আনাজ আর অত মাছ, কত একমের সম্ভাষ ! আইর পুথিত হুচছ নানি, তে হুচছ অখন,

প্রথমে নালিতা শাকে

রাঙ্কিলেক ঘৃতপাকে

কচুশাকে নারিকেল কাটি

শাচিয়া শাক ঘৃতে ভাজে

আদা দিয়া তার মাঝে

নাটা শাকে জিরা লং বাটি

পালই শাক বসাইয়া

তার মধ্যে জল দিয়া

পাসরিয়া না দিল লবণ

ঘূতে ভাজে নিমপাতা উদাইয়া উরসি তাত

বেতের আগা থৈকরের চষি ।

বার্তাকু তুরই ঝিঙ্গা ঘূতে ভাজে রাজডেঙ্গা

কাচকলা দুঞ্চে ভাজে কষি ।

লাউ কুমড়ার চাকি হরিদ্রা পিঠালি মাখি,

বচবাচ জিরা লং বাটি ।

কচু আনাজ কাঠল বিচি করিলেক ঘূতে ভাজি

তার মধ্যে উরসি দিল কাটি ।

একে একে নিরামিষ রান্ধিলেক ব্যঞ্জন ত্রিশ

সুকতানি আর মগডালি ।’

অউ গেল নিরামিষা । অখন ছন মাছর কথা,

‘পাবিতা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝুল

পুরাণ কুমুড়া দিল চিতলের কুর ।

নবীন কুমুড়া দিয়া কই মৎস্যের সনে

কুরি মৎস্যের ঝুল সুনাই রান্ধিল যতনে

খাসির ডাইল দিয়া রান্ধে রোহিতের মাথা ।

হিং সহিতে তাতে দিল তেজপাতা ।

এতেক ব্যঞ্জন রান্ধে জামিরের রসে

বাড়িঘর মোহিত হইল ব্যঞ্জন সুবাসে ।
বদরি অম্বল রান্ধে কাঠি দিয়া ঘুটে ।
সরা দিয়া ঘুরি দিলে ফুকাই ফুকাই উঠে ।
মুরে পুড়ে অম্বল উপরে উঠে ফেনা
ঘাটিতে ঘাটিতে লড়ে দুই কর্ণে সোনা ।
বড় বড় কই মৎস্য ঘন করি আজি
জিরা গুলমরিচ দিয়া তৈলে তুলে ভাজি ।
রোহিতের পেটি ভাজে মাগুরের চাকি
চিতলের কুর ভাজে বারবাখর মাখি
ইলিশ বোয়াল ভাজে বাচা বাঙ্গিনা
বড় বড় পুটা রান্ধে ঘনিয়া তলিত
চেংপাবি কতরান্ধে তাহার সহিত ।’

তিতা মিঠা শুনতে নি অখন ? পয়লা হ্ন তিতা,

‘হিম তিতা নিম তিতা উদাইয়া শাক

আর তিতা রান্ধে কন্যা বেতের আগ ।’

আরো হ্ন, অখন জিবরাত পানি বারই যাইব,

‘এক লাউয়ে লাবড়া বিচিয়ে বড়া

বাকল দিয়া ভাজি

ধন্যধন্য লাউরে তরকারি শিরোমনি ।

কচুর খাড়ি কিম্বা আলুর খাড়ি যদি দেও আনি

তার মধ্যে যদি লতা দেওয়া যায়

ফৌজদারি প্যাদায় যেমন ধাক্কাই লই যায়।’

অখন যদি মাংসর পাকশালো গিয়া ঢুকি তর ভালা লাগত নায় । বাদ দে,

--- বাদ দিতাম কেনে । ইতা কুনু খালি ইন্দুবাড়ির খানি নি । আমরাও খাই ।

--- হাচা ত । তে কই এর পরর কথা । খাচ তো । হেশে গাইল্লাইছনা কিন্তু । তে ছন,

‘মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধি করিলেক শেষ ।

মাংসের পাকশালে গিয়া করিল প্রবেশ

কাঠুয়া মাংস রান্ধে...

--- ভবা তবা তবা । বন্ধ কর হালার হালা । মামুর সামনে, পিরর সামনে নি তুই ইতা গাইরে ।

--- তবা । তর লাগি অউত্ত ।

বৈতল বুঝতে পারে মামুর সামনে নাপাক কথা বলা যাবে না । মামু কিছু বোঝে না, তবু বৈতল তাকে ধর্মগুরু বলে মানে । তবে বৈতলের গানের গলার গুণেই হয়তো দুখু বহুই আপদ ক্লান্ত হয় না, বরং উপভোগ করে এক অলীক মহাভোজ । আর মামু তার জন্য বরাদ্দ জাজিমে শোয় না, ঘরের এক কোনে গিয়ে বসে থাকে আর বৈতলের গানের সঙ্গে তাল মেলায় । এর মধ্যেই বৈতলের নজর পড়ে উঠোনের ওপারে, ঠিকাদার তার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছে । আর তখনই বৈতল তার পরিচয় পাল্টায়, বৈতল দাস শর্মা হয়ে যায় বৈতল মিয়া, জিগিরে গায়,

‘আলাহামদো লিল্লা, ঠিকাদার ভাইর সব খুয়াইশ পুরা কর বিসমিল্লা ।’

চোরের মতো নীরবে পা টিপেটিপে ঠিকাদার এসে প্রবেশ করে অতিথি-নিবাসে ।

দুপুরে যে মানুষটা মামুর হাতে কিল চড় খেয়ে লজ্জায় পালিয়েছে, সেই মানুষ এবার এসে সোজা মামুর পায়ের উপর পড়ে যায় শরণাগত । কাঁদতে থাকে প্রভাব প্রতিপত্তির বিশাল মানুষটি । বৈতলও চোখ বন্ধ করে বারবার গাইতে থাকে ‘আলাহামদো লিল্লা...’ । ঠিকাদার খুশি হয় না ।

মামুর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই থাকে । বলে,

--- আমার দামা দুইটারে মানুষ করি দেও দাতা ।

মামুর পায়ে লাগে, মামু মারে লাথি । তাও অবিচলিত পা ধরে থাকে, এখন তো আর গ্রামের মানুষ নেই সামনে, সাজিদ মিয়ার অসম্মানের ভয়ও নেই । বলে,

--- তারারে কইছি আইত । আইব, দোয়া দরুদ করি দিবা দাতা ।

প্রথমে আসে শফি । শফিউল্লা, যেন আরব বেদুইন । বাপের ইশারায় কদমবুসি করে সাধুকে । মামুর মুখে তখন শিশুর হাসি । এমন সুন্দর রাজপুত্রের মতো যুবকের ব্যবহারে কোন ঔদ্ধত্য নেই । শুধুই বিনয় । মামুর মুখের হাসি দেখে দুখু পিরের হয়ে আশীর্বাদ জানায় ঠিকাদার তনয়কে । বৈতল তখন দুখুর মুখে তাকায় । অবাক দৃষ্টিতে একটাই প্রশ্ন । বৈতল দুখুর কানে কানে বলে,

--- কিতার দুঃখ বেটা ইগুর ।

দুখুও ইশারায় থামতে বলে বৈতলকে । বলে,

--- উবা, পয়লা সিন দিখিয়াউ পাগল আই যাইছ না । সব ভালা ভালা কইছ না ।

শুরু হয় দ্বিতীয় দৃশ্য । দ্বিতীয় পুত্রের প্রবেশ হয় উদ্ধত । সাজিদ আলিও হয় তটস্থ, পির থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বসে । মামুর কিল চড় লাথি থেকে দূরে । আতাউল্লাকে ঢুকতে দেখে কিন্তু মামুর মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হয় । কিন্তু পা চলে শূন্যে । দুখু বুঝতে পারে মামুর ইশারা । সাজিদ মিয়াকে অনুরোধ করে বেরিয়ে যেতে । ঠিকাদার গাঁই গুঁই করে, বেরোয়ানা । আতাউল্লা ঝড়ের মতো ঢোকে ঘরে, যেন সব লম্ভভন্ড করে চলে যাবে । মামু নয়, বাপ নয়, কেউ নয়, ঘরের ভিতর সব জীবন্ত প্রাণীকে উপেক্ষা করে শূন্যে ছুঁড়ে দেয় ‘আদাব’ । হরির লুটের বাতাসা যেন, একমাত্র বৈতলই লুফে নেয়, মামুকে দেয় । মামু খিলখিলিয়ে হাসে,

শফিউল্লাহর মুখে মুচকি হাসি ঝিলিক দেয়, আতাও অপ্রসন্ন নয় । এবার টনক নড়ে ঠিকাদারের, বোঝে সে ঘরে থাকলে আরো উতপ্ত হয়ে উঠবে, বাপের উপর আক্রোশে মেহমানদের অবজ্ঞা করবে, আল্লাহর ওলিকে অসম্মান করলে যে তার সর্বস্ব যাবে । তাই নীরবে বেরিয়ে যায় । ঠিকাদারের বংশের বাতি দুটো দূরকম । বড়টিও বাপকে মানে না, কথা বলে কম, কেউ বোঝে না লড়াই, মিস্টি হাসি আর চারিত্রিক প্রশান্তি দিয়ে ঢেকে রাখে সব । কিন্তু ছোটটাকে নিয়েই সমস্যা, আবার ছোটটাই তার আশার আলো । একমাত্র আতাউল্লাহ পারে সাজিদ মিয়ার উত্তরাধিকার বহন করতে, তার ব্যবসার হাল ধরতে, বেটার ভিতর নেতা হওয়ার সবগুণ আছে, অকারণ শুধু বাপকে শাস্তি দিতে সাইকেলের খেলা দেখায় । বেরিয়ে যাওয়ার আগে তাই করুণ চোখে মামুর দিকে তাকায় । উৎকোচে প্রলোভিত করে আল্লাহর প্রতিভূকে । বলে,

--- তোমার মোকাম দুতলা করি দিমু । সব পাক্সা করি দিমু, সাদা পাথর লাগাই দিমু ।

ঐদিকে সাজিদ ঠিকাদার বেরিয়ে যেতেই হয় চমৎকার । পাথর গলে হয় ঝুরঝুরে বালি, বালি গলে জল । সাজিদ মিয়ার কনিষ্ঠ পুত্রের মুখে হাসি ফোটে । অবজ্ঞার বদলে শ্রদ্ধা । ঘরের এক কোণে শুয়ে থাকা পিরকে টেনে ওঠায় । বলে,

--- তুমি মাটিত পড়ি রইছ কেনে । উঠো ।

মামুর জন্য বরাদ্দ জাজিম ঝেড়ে দেয় মমতায় । ঘরের মাঝখানে এনে জাজিমে শুইয়ে দেয় । মামুও যেন মায়ের কোল থেকে বিছানায় শোয় । মিটিমিটি চোখে তাকায় আতাউল্লাহর দিকে । আতা মামুকে বলে,

--- তুমি অইলায় রাজা, রাজার মতো থাকবায় ।

গভীর জল থেকে বুড়বুড়ি ওঠার মতো মামুও কিছু বলে বিড়বিড়িয়ে । আতাউল্লাহর সঙ্গে পিরের সংযোগ হয় । আতা বলে,

--- তুমার অউ চেলা ইগুরে ঠিক করি দেও । অখনও সময় আছে, হে মানুষ ভালো নায় । আমি তার পয়সাত মৌজমস্তি করি, হে কয় চুর । তার ডাকাইতির পয়সা আমি গাউআলারে দেই । আমার নানা গরিব আছলা, তেও দিতা । আল্লায় সহিতা নায় । মাইনষে পয়সা দিয়া ছিমেণ্ট পায় না, ইবাড়িত অত স্টক কিওর । তুমি বিচার করবায় নি ।

দুখু মামুর হয়ে আতাকে প্রতিপ্রশ্ন করে । বলে,

--- অত বড় পুল অইত, সিমেন্ট লাগব নানি ।

--- অইত কিতা বা বাছাই অই গেছে ছিমেন্ট ছাড়াই । বালুর পুল ইগু, খালি বুরবুরা বালু ।
ফিতা কাটবা আইয়া বিম্বুরামে । সব ঠিক অই গেছে ।

এবার বৈতল মুখ খোলে । বলে,

--- সব তো তুমরার লাগিউ কররা ।

--- অয়, কররা । হিন্দুর ডাকাইত সাধু অইতা । তাইন রত্নাকর । আমরার লাগি ডাকাইতি
করবা, মানুষ মারবা । আমরা যেনে কই দিছি আরি । জিগাউকা গিয়া বাড়ির মানুষরে । দুই
বিবি অখনও জিন্দা আছইন । বড় ভাইসাব আছইন, আমি ছোট, ছোট হিতায় কিতা বুঝে,
তেও কইব নি । কেউ নিব নি তার পাপর বাগ । আমরা নিয়ার, আমরা দুই ভাই এ নেকি
করিয়ার, তার গুনা কম করি দিয়ার, হে ইতা বুজে না ।

--- কিতা গুনা, কিওর গুনা । আমি তর বাপ না তুইন আমার বাপ ।

ঘরের বাইরে থেকে সাজিদ মিয়ার পরাক্রমী প্রবেশ দেখে বৈতল প্রমাদ গোনে । এবার
লেগে যায় সম্মুখ সমর । পিতাপুত্রের লড়াই । কিন্তু সাজিদ মিয়া ঘরের মাঝখানে শায়িত
প্রশান্তমূর্তি পির দর্শনে অবাক । পিরের পায়ের উপর বন্ধুর মতো হাত দেওয়া তার কনিষ্ঠ
পুত্রের অবস্থান দেখে ভয় পায় । সে তখন মামুর অন্যপায়ের দখল নেয় । পিরের মনেও যে
কখন কী কথার খেলা, আবার অতল থেকে বুড়বুড়ি দেওয়া কথা বেরোয় । আতাউল্লা তাকে
সাহায্য করে । শয়ন থেকে ওঠে সাধু । মামু ঠিকাদারের শার্টের কলার ধরে টানে, কাছে
আনে, কিল চড় ঘুষি মারে । নাগাড়ে হাসে সাজিদ মিয়া । হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে পিরের
পায়ে । বলে,

--- মারো, আরো মারো ।

বরাক উপত্যকার মানুষ জানে, জালাল পিরের মার খেলে কপাল খুলে যায় । অর্থাগম হয়
। মার খেয়ে ঠিকাদারের তৃপ্তি হয় ।

পরদিন আরো মুরগি জবাই হয় । গ্রামের পুকুরে জাল ফেলা হয়, মামুর প্রিয় বলে শুধু
গুটি কয়েক মৌরলা রেখে বাকি সব ফিরিয়ে দেওয়া হয় দুখুর নির্দেশে । পেটুক বৈতলকে জব্দ
করে দুখু হাসে মিটমিটিয়ে ।

ওরা ফিরে আসার পরদিনই প্রত্যাশা মতো বুরবুরিয়ে ভেঙে পড়ে মাটিজুরির পুল ।

পঁয়ত্রিশ

বৈতল এক আকাশ থেকে আর এক আকাশে ঢোকে । ইটখোলা ঈদগার পুকুরে ভাসে
মকা পুঁটি আর দাঁড়কিনার ঝাঁক । বালিগড়া কাশখাউরি, পুকুরের পারে দূর্বাঘাস আর
কলমিলতার ফাঁকে ফাঁকে ইচা । ইচা মানে ছোট চিংড়ি । পুকুর ছেঁচতে বলেছে মসজিদ
কমিটি, বৈতল দরদাম করেছে বিস্তর । বলেছে,

--- মানু লাগব তিনজন । মাছ দিবা না টেকা দিবা ।

--- মাছ উছ পাইতে নায় । টেকা নিবে, আর অতা দারকিনা উনা ইতা নিবেগি ।

--- ইতা লাগত নায় । দাড়কিনা কাশখাউরি ইতা হিন্দুয়ে খায় না । রউ ঘাঘট দিবানি ।

--- না নু কইলাম । কমিটির মানুর অউ অইত নায়, ইমামও আছইন সবে চাই রইছইন । মাছ
এমন জিনিস, আনমিলার চান্দ । দশ টেকা দিমু, অইলে ছেচ ।

--- তিন মাইনষর খুরাকি হয় নি দশ টেকা । পইধগাশ দিবা ।

--- বিশ টেকা দিমু ।

--- পারছি না । আপনে দেখইন ভালা মাইমল পাইবা, দাড়কিনারও নিব গজারও নিব ।

ত্রিশ টাকায় জাল ফেলে বৈতল । তিনজন তো কথার কথা দাম বাড়িয়েছে । বৈতল একাই তিনজন । বড়ো বড়ো দিঘী হলে ভিন্ন কথা, ছোট পুকুরে বৈতল পেলইন দিয়েই ধরতে পারে বড় মাছ । বৈতলের মাছ ধরার প্রক্রিয়ায় সবাই হাসে । যেমন হেসেছিল হরিৎবরণের জমিদার যম । যমুনাপ্রসাদ সিং । বৈতলকে তাচ্ছিল্য করলে রক্ষা নেই । কমিটিপ্রধান খরিচ আলির দিকে মাছের চোখে তাকায় বৈতল । বলে,

--- দেখইন না, চেমছাও দিমু পরে । অখন আপনার পুকইরর কাম অই যাইব পেলইনেউ ।

--- তে কমরো খলই বান্দিলা বেটা । আর খাড়া চোফা নাইলে পারং বওয়াই দে । ইগু কিগুরে আনচছ বা দুখু ।

দুখুও হাসে । বৈতল দুখুর দিকে কটমটিয়ে তাকায় । বলে,

--- কই দে তানে, বৈতল অইল পানির পুক, একবার পানিত নামলে ছানি রাখি দিমু, পনাও নু পাইতা নায় এরপরে ।

--- হাচানি ।

খরিচ আলি তাও অবজ্ঞা করে বৈতলকে । দুখুকে উদ্দেশ্য করে বলে,

--- না রেবা তানে কও ইতা করতা না । আমরার গজার টাইন মারতা না । ছিলট থাকি আনছিলা আমরার ইমামে । হজরত শাহজালালর দরগা থাকি জিয়ল আনছিলা । তানে দেখিয়া যে ডর লাগের রেবু । তাইন নি রুস্তমর বাপ ।

এসব মস্করা তামাসার মধ্যেই ষোল সতের বছরের এক কিশোরের পুকুরপারে প্রবেশ । মাথায় সাদা তকি, সবুজ নীলের চেক লুঙি গোড়ালির উপর উঠানো, আর গায়েও হাঁটুর নিচে নামানো দীর্ঘ জামা । পাঞ্জাবির মতো কিন্তু পাঞ্জাবি নয় । বৈতল দেখে বেশবাস কেমন মানুষের পরিচয় নির্দিষ্ট করে দেয় । তবে নবীন পড়ুয়াকে দেখে বৈতলের মন প্রসন্ন হয়ে যায় । এ তো কুতুবউদ্দিন, একে চেনে বৈতল । শিলচর টাউন মাদ্রাসায় পড়ে । ওর রিক্সার নিয়মিত সওয়ারি । বৈতলের খুব পছন্দ ছেলেটিকে । কুতুবকে দেখে তার শৈশব মনে পড়ে , মনে পড়ে কৈশোরের দিনগুলি, তার বন্ধু লুলার কথা বড় বেশি করে মনে হয় এরকম একটা

লুঙি পাঞ্জাবি আর একটা সাদা তকি বাঁধা থাকে লুলার পুটলির মধ্যে । কিন্তু সর্বক্ষণের পরার জন্য তার ভিন্ন সাজ, গামছার মতো ছোট লুঙি আর নিমা । পুটলির সাজ ইদের দিন নামাজ পড়ার জন্য । ইদের সময় নতুন জামা কাপড় দেয় মসজিদ থেকে, লুলারও আত্মসম্মান জ্ঞান খুব টনটনে, নেয় নি কোনোদিন । বৈতলের ওসব বাছবিচার নেই, বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ঢুকে যায় এখনও । শীতের সময় বন্যার সময় কম্বল বিতরণ হয় । বৈতল নাম লিখিয়ে আসে ইস্কুলের ক্যাম্পে । বৈতল খয়রাতের মাল পরে না কোনোদিন । বিক্রি করে দুপয়সা হয়ে যায় । সেই পয়সা সম্বল করে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ে ভ্রমণে, পিরথিমপাশা, শ্রীমঙ্গল না হয় আনারসের দেশ জলঢুপ । লুলার মতো একটা বন্ধু হয়নি বৈতলের, লুলার পায়ে ধনিয়ার বিচি, চল বললেই চল । কোথায় যাবে জানে না, বেরিয়ে পড়েছে বারবার । আর উল্টো হয়েছে এই দুখু, এক বাঁধের নীচে গাঁজার আসর পরিচালনা কিংবা রাতের কুটুম্বিতায় বেরনো ছাড়া নড়তেই চায় না । জন্মের মধ্যে কর্ম আপদ বহুই আর তার সম্মিলিত সিদ্ধান্তে দুখু বাধ্য হয়ে বেরিয়েছে মাটিজুরি । মামুও যে বেড়াতে ভালবাসে । তবে দুখু নিরাশ হয়নি, মাটিজুরি গিয়ে বাড়িবেটা খুব খুশি । দুখুকে বলেছে মামুকে নিয়ে ওরা এবার বেড়িয়ে আসবে এখানে ওখানে, মাঝে মাঝেই । বৈতল জানে মামু রাজি হলে দুখুর কোনও ক্ষমতা নেই না করার । বেড়ানোর কথা শুনলেই মামুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । কুতুবের মুখেও বৈতল মামুর সারল্য খুঁজে পায় । শুধু চোখমুখে নয় তার হাঁটাচলায়ও অনেকখানি মামু । কুতুবও বৈতলকে দেখে, দেখে খারিচ আলি সেক্রেটারিকেও । বৈতলের হেনস্থায় দুঃখিত হয় সে । সে খারিচ আলির দিকে তাকিয়ে বলে,

--- আরে, এইন তো মিয়াসাব । খুব বালা মানুষ , আমারে মাগনা রিক্সা চড়াইন । বউত সাহস তান । একদিন দেখছি এক আলদর বাইচ্চারে এক হাতে ধরিয়া ফালাই দিছইন গাঙো । অলা তেজ !

---তেজ কার দেখলায় রেবা আলিম, সাপার বাইচ্চার না অউ পাটকাঠির ।

খারিচ আলি সেক্রেটারি কিছুতেই বৈতলের উপর ভরসা করতে পারে না । তার তৈলাক্ত ক্ষীণদেহ নিয়ে এর আগেও ঠাট্টা করেছে যমুনাপ্রসাদ জমিদার । এদিকে দুখু, যে এতক্ষণ খারিচ আলি আর বৈতলের তরজা উপভোগ করছে নীরবে, কোনো কথা বলেনি । দুখু চেনে তার দোস্তুকে, ওরকম সেক্রেটারি কাত করা বৈতলের কাছে কিছু না । কিন্তু আসরে

নতুন খেলোয়াড়ের উদয় হয় কী করে গুঢ় তথ্য নিয়ে । বর্ষাসন্ধ্যায় বৈতলের সাপ ধরার চতুর্থ সাক্ষী থাকার তো কোনও সম্ভাবনাই নেই । এমন দুর্যোগের বিকেলে বাঁধের উপর তখন আপদ বহুই আর দুখই সঙ্গী বৈতলের । বাকি চরাচর তো বন্যার জলে থৈ থৈ । তাই দুখু অবাক চোখে ইটখোলা মসজিদের অস্থায়ী আবাসিক ছাত্রকে প্রশ্ন করে,

--- তুমি কেমনে জান রেবা ।

--- গুলার সময় নানি । আমি গেসলাম কবরো ।

--- আমার নানার কবর জিয়ারত করাত যাই আমি ।

--- ফ্লাডের সময় নি মনো পড়ল তুমার নানারে ।

--- আমি তো রুজ অউ এখবার তানে দেখিয়া যাই ।

--- তুমার বাড়ি ত রেবা বাশকান্দিত, তে ।

--- তে আর কিতা, নানা থাকতা ঘনিয়ালার ভাড়াবাড়িত, আমিও থাকতাম । তান এন্তেকাল অইলে আমারও পড়া শেষ, খারিচ চাচায় লই আইলা মজিদো, এর লাগি পড়িয়ার অখনও ।

--- হি তো বুঝলাম, হাপ ইগু দেখলায় কেমনে আন্দাইরো ।

--- কেমনে কিতা, কবর কই । সব পানির তলাত, খালি শিকল একছার লাখান বন্দর মাটি দেখা যায় । গেলাম, ইপার হিপার গুলা দেখিয়া আইলাম । আপনারা আমারে দেখছইন না, আপনারা তো...

--- অইছে বা বুঝছি ।

দুখু কুতুবের মুখবন্ধ করে । আর বৈতল কিশোর কুতুবের মুখে তাকিয়ে সব ভুলে যায় । ভুলে যায় খারিচ মিয়ার প্রতি বৈরিতা, তার উল্টোপাল্টা কথাবার্তা । বৈতল ভেবেছে আজ পুকুরের সব মাছ বের করে দেবে ‘খোড়ল’ দিয়ে । কিন্তু কুতুবকে খুশি করতেই বৈতল পুকুরের জল তোলপাড় করে, কথার অতিরিক্ত মাছ তোলে । বৈতল অবাক হয়ে কুতুবের চোখমুখের আনন্দ দেখে । কিশোর বয়সের সারল্যে সব কটু কাঁটা সরে যায় । বিদ্রূপ করা সেক্রেটারি মানুষটিও হয় আনন্দিত ও লজ্জিত যুগপৎ । এত বড় মানুষটি এসে বৈতলের হাত

ধরে মাপ চায় । বৈতল বিব্রত হয় । বৈতলের মনে পড়ে তার গুরুর উপদেশ । গুরু সৃষ্টিধর বলেন,

--- গুসা অইল চন্ডাল । গুসা অইলেউ ফুল গাছো চাইও । গুসা থাকত নায়, তখন হউ ফুলো দেখবায় নে মিঠা ফল ধরব ।

গুরুবাক্য সব শুনে গেছে বৈতল । সব কি আর মান্য করতে পেরেছে । কিন্তু আজ কুতুবের মতো ফুলগাছে তাকিয়েছে বলেই না মানী মানুষটাও তার আঁশটে শরীরে হাত দিয়ে ক্ষমা চায় । ত্রিশ টাকার উপর দশটাকা বেশি দেয় । বলে মাছ নিয়ে যেতে । বলে,

--- নেও রেবা । তুমার যেটা ইচ্ছা, সব থাকি বড় অটাই নেওগি যাও । তেও আমারে গুনাগারি রাখিও না ।

বৈতলও তার বাপের বেটা । মাছ নেয়, সের খানেক মৌরলা মাছের দিকে চোখ রাখে । বলে,

--- দিলাইন অউ মকা ইটাইন । আমার মামুর খুব পছন্দ । মামুর বাড়ি পাঠাই দিমু, অউ দুখুইয়েউ লই যাইব । আমিও রাখমু দুইটা, আপনারেও দেওয়া লাগব । নে গিরে দুখু, কী বলবলা নানি ক ।

বলবলা মাছ দেখে দুর্গাবতীরও আনন্দ ধরে না । বলে,

--- কিতা খাইতায় । ঝিঙ্গা দিয়া কড়ু না এমনে কালিজিরার দরো ।

--- ঝিঙ্গা কেনে গো, কচি পুরইল আছে দেখছি বিছারার মাচাঙ্গো । মিঠা মিঠা ঝাল ঝাল অইব ।

সেই ঝাল মিঠে ব্যঞ্জন্যের জন্য তেল কিনতে থামে বৈতল সেন্ট্রাল রোডের গোবর্দন বনিকের দোকানে । রিকশার সিটের নিচে তেলের শিশি গড়াগড়ি খাচ্ছে রিক্সার গতির সঙ্গে তাল রেখে গড় গড় গড় গড় গড় । ঘনিয়ালা ঢুকতেই বৈতলের গা ছমছম করে । তেলের বোতলের শব্দ মাথায় ওঠে । বৈতলও চুপচাপ; দুখুও চুপ । শুধু শিশি যায় এদিকে গড়গড়, যায় ওদিকে গড়গড় । এমন তো হয় না বৈতলের, বৈতল দুখু একঙ্গে মানেই বোতলে বোতলে টক্কর, বাসনে বাসনে ঝনঝনানি । দুখুই বা কেন এমন চুপচাপ পিছনের সিটে বসে, বৈতলকে

একটাও চিমটি কাটছে না, হুল ফোটাচ্ছে না । তিন পোয়া মৌরলা মাছ যে নিয়ে গেল সকালে, মামুর মুখের হাসির কথা তো বলে না । তাহলে কি সত্যি সত্যি দুখুর মনে অন্য, তাকে মারবে । বৈতলের ওসব ভয় ডর নেই, মানুষকে ভয় পায় না । জলের জন্তুর সঙ্গে লড়তে লড়তে গুঁদা শক্ত হয়ে গেছে । আর ঘনিয়ালার মানুষকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বৈতলের, ওখানকার সব দুঃখী মানুষরা তার একান্ত আপনজন । বৈতলকে কেউ নামে চেনে না । জানে ওঝা বলে । বৈতল ওঝা । ওঝার আবার জাতপাত কী । কিসের হিন্দু কিসের মুসলমান । ওকে তো মিয়াও ডাকে কেউ কেউ । উরস উৎসবের দুখুর সঙ্গে ছটাফদারি করেছে । সৃষ্টিছাড়া বৈতল জানে তার কোনও শত্রু নেই এই দুনিয়ায় একমাত্র যম ছাড়া । যম জমিদার তার লেজে পা দিয়েছে বলে সে কালসর্প । আর দুখুর উপর তার রাগ ঝগড়া চড় থাপ্পড় তো ভরসা থেকে । দুখু ছাড়া তার কে আছে ভরসার স্থল এই নবীন দেশে । সেই দুখুকেই এখন বৈতল বিশ্বাস করতে পারছে না । বৈতল যখন হরিৎবরণে এরকম ঘনিয়ালায় অন্যরকম হয় তখন দুখুও রাগে । বলে,

--- ঘনিয়ালাত ঢুকিয়াই বেটা আল্লা আল্লা করছ আর হিদিবে গেলেউ জয়গুরু । যেদিন পাইব দুগুয়ে লাগাল একলগে তখন দেখিছ কেমনে মরবে । জবাই হইবে না বলিচ্ছেদ অহিত তর রে বৈতল ।

দুখুর বিদ্রূপ গায়ে মাখে না বৈতল । ধর্মকর্ম নিয়ে তার স্পষ্ট দৃষ্টি । হিন্দু মুসলমান আর দুনিয়ার সব ধর্মই মানুষ নিজের সুবিধার জন্য বানিয়েছে । কোনও আল্লা খোদা ভগবানই নিজেকে টুকরো করে বাঁচতে পছন্দ করেন না তাই বৈতল নিজেকে সবার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় । আল্লার মানুষ ভগবানের মানুষে দূরকম দেখতে পারে না । এই একটামাত্র জায়গায় বৈতলের সঙ্গে দুখুর ফারাক । আবার বৈতল এও অনুভব করে কোথাও না কোথাও দুখুর মধ্যেও একটা মানুষ আছে যে কখনও কখনও পেরিয়ে যায় লঙ্ঘনের গন্ডি । ধর্মের রাজনীতিতে থেকেও সে এক বেদুইন, দেশহীন ধর্মহীন মানুষ । তাই বৈতল দুখুকে বলে,

--- জবাই অউ বালা, কিতা কছ । বাঙালবাড়িত মাছ উছ থাকি আসল খানি খায় গোস্তে ।

--- তে অছ না কেনে বেটা, অইলে অউত্ত আর আতান্তর থাকে না । আর হালাল খাইয়া তো বেটা এমনেউ তর জাত গেছে ।

--- তর লাখান ছলা কাউয়ায় কইলেউ জাত যায় না । বেশ মাতিছ না, যা ।

মামুর চেলা বৈতলের কোনও বাছবিচার নেই । ছোটবেলা থেকেই খাদ্যাখাদ্যে কোন বিভেদ নেই । বন্ধু লুলা বলে,

--- গরিবর পুয়া অত মানলে চলত নায় । আমরার হক্কলতাউ হালাল কেউরে না কইলেউ অইল । আল্লায় মাপ করি দিবা গুনা অইলে ।

লুলার এই কথায় আল্লা আল্লা করা ভাল লাগে না । বলে,

--- তুই আচ্ছ বেটা তর আল্লা নিয়া । আল্লায় কিতা করতা আবার । তর আরিপরি আছে নানি, নানা আছইন নানি, মজিদর ইমাম আছইন নানি তারারে মানিছ, তেউ আল্লারে মানা অইব । মানুষ না থাকলে বেটা কিওর খোদা কিওর ভগবান আর মা মনসা ।

লুলা ও দুখুর মধ্যে পার্থক্যও অনেক । লুলা বৈতলের বাল্যবন্ধু, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে থেকেছে, কোনও ভেদাভেদ করেনি । আর দুখু বয়সকালের বন্ধু, মনের মিল আছে কিন্তু ধর্মকর্ম নিয়ে কউর । হালাল মানে হালাল, লুকিয়েও হালাল সামনাসামনিও তাই । বৈতল সবসময় বোঝেও না দুখুকে, মনে হয় দুখু সব সম্পর্কের হিসাবই কোরান আর হাদিস দিয়ে করে । মনের মিল শুধু ওপর ওপর, যে-কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে শিববাড়ির বাঁধের মতো । তাই গিলানি সাহেবের আহত হওয়ার খবরে থম মেরে-থাকা শহর, আর ইটখোলা ইদগার সামনে থেকে দুখুর তার রিক্সার উঠে বসা ইস্তক এক আতান্তর বৈতলের । এখন যদি সত্যি রায়ট লেগে থাকে, কী হবে তবে দুখুর ভূমিকা । তাকে মারবে, ধরিয়ে দেবে দাঙ্গাবাজদের হাতে । বৈতল তার গুরুকে স্মরণ করে, বিয়ানিবাজার রইদপুয়ানির সৃষ্টিধর ওঝাকে ডাকে প্রাণপণ । গুরুর সঙ্গে বৈতলের দেখা হয়নি সেই জৈন্তিয়ার পাহাড়তলি ছাড়ার পর থেকে । গুরুর ইচ্ছাকে সম্মান দিতে পারেনি বৈতল, শুধু কালো বলে, গুরুকন্যা চায়নাকে ফিরিয়ে দিয়েছে । কোনমুখে এরপর গুরুর সঙ্গে দেখা করে । তবে লুলার মুখে শোনে অন্য এক বৃত্তান্ত । বিয়ানিবাজার রইদপুয়ানি আর পন্ডিতপারা তখনও হিন্দুপ্রধান । রইদপুয়ানির গ্রামপুরুষেরা রামদা নিয়ে সারারাত গ্রাম পাহারা দেয় । গণভোট হয়ে গেছে, সিলেট যাবে পাকিস্তানে । এর মধ্যে পঞ্চখন্ডর হিন্দুদের মনে আনন্দ । করিমগঞ্জ মহকুমা সিলেট থাকবে না, যাবে ইন্ডিয়ার কাছাড় জেলায় । সীমানা নির্ধারণের সুবিধা হবে বলে । পঞ্চখন্ডও আর

পাকিস্তান হবে না, ঢাকা দক্ষিণে ঠাকুরবাড়িও থেকে যাবে হিন্দুস্থানে । হিন্দুদের মনে আনন্দ, মুসলিমরাও রাগে ফুসছে, মুসলিম লিগ গুজব কান না দিতে বলছে । বৈতল যে কিছুদিন ছিল বিয়ানিবাজার, মানুষে মানুষে কোনও অসন্তোষ দেখেনি । গুরু সৃষ্টিধরের বাড়ির উত্তরেই দুঘর মুসলমান ; কেরামত আলি আর মুরশেদ মিয়া । একজন মাটি কামলা আর একজন গাড়োয়ান । মুরশেদ আলির নিজের গরুর গাড়ি বাঁশ মাটি বালু বওয়াজ কাজ, আনারসের সময় চলে যায় জলটুপ, অনেক দিন ফেরে না, গাড়ি বোঝাই আনারস নিয়ে যায় সিলেট, শিলচর । মুরশেদ আলির অনুপস্থিতিতে গুরু সৃষ্টিধরের উপর দায়িত্ব থাকে ওদের পরিবারের দেখাশোনার । ফেরার পথে মুরশেদ আলি গুরুর বাড়িতে দিয়ে যায় এক হালি গুড়ের মতো মিস্টি আনারস । সেই দুই ভিন্নধর্মী মানুষকে প্রাণে মারার চক্রান্ত হয় রইদপুয়ানির কালিবাড়িতে । আসলে তখন দাঙ্গা লেগে যায় কথায় কথায় । কে যেন বলে সুনামগঞ্জের জয়মঙ্গলে এক সঙ্গে দশজন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে । ব্যস, যে যেখানে সংখ্যায় বেশি সেখানেই প্রতিহিংসা । বৈতলের গুরু সৃষ্টিধর ওঝা তা হতে দেননি, দুই বিধর্মী পরিবারকেই তার বাড়িতে পঞ্চকন্যার হাতে দিয়ে ছুটেছেন কসবা, বিয়ানিবাজারের লিগ অফিস । সৃষ্টিধর ওঝা মানুষের ভাল করতে প্রাণের মায়া করেন না । তাই তিনি পঞ্চখন্ডর এক অবিসংবাদী মানুষ, হিন্দু মুসলমান সবাই সম্মম করে কাঠমিস্ত্রিকে । কসবা পাড়ায় লিগের নেতা সান্তার মিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হতে পারেন অকুতোভয় । কী কথা হয় কে জানে, সান্তার মিয়ার লোকজন রাতের অন্ধকারে গিয়ে বিপন্ন দুই পরিবারকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । সব শুনে বৈতল লুলাকে বলে,

--- ইতা মাতন লাগত নায় বেটা, আমার গুরু অলাখান অউ, জান দিলাইবা চুকতা নায় ।

--- ঠিক অউ কইচছ, এক্কেবারে ফকিরর লাখান মানু । কিচ্ছু নাই বেটা । কে কইব এক কাঠমেইস্তরর অলা তেজ । তরে যেদিন দিয়া আইলাম, মনো আছে নি তর আমার নাম রুল আমিন জানিয়াও কইলা খাইয়া যাওয়ার লাগি ।

--- তুই ত খাইলে না ।

--- আমারে তুইন খেদাই দিলে মুখপুড়া মনো নাইনি । অতদিন একলগে ঘুরলাম আর তুইন এক পুঁথি হিকার লাগি দুষ্টরে ছাড়ি দিলে । বহুত দুখ আছিল দিলো । তান উপরেও গুসা আছিল । তাইন তরে নিলা গি । এর লাগি ।

--- জয় গুরু । অখন ক ইতা যে কইলে, মুরশেদ চাচা আর কেরামত আলির কথা, তুই কেমনে জানলে, তুই নি লিগর লগে আচছ তলে তলে ।

--- ইতো আছে হক্কেলেউ । অখন ত থাকবউ, পাকিস্তানো থাকিয়া কংগ্রেসি করতাম নি ।

--- না, হুনলাম নু করিমগঞ্জ যাইব গি হিন্দুস্থানো । গুরুর বড় হাউশ আছিল দেশভাগ অইত না । তাইন কইতা হক্কেলরে নিয়া থাকার কথা । কমুনিষ্ট আছলা নানি ? তান পকেটো আমি দেখছি কাচি দাও আর ধানর ছড়ার ছবি । তাইন শুদ্ধ বাংলাত কইতা ‘কাস্তে ধানের শিস’ কমুনিষ্ট পার্টির চিন । তারার বউত বুকর পাটারে । আর অততা জানইন ।

--- জানিয়া কিতা অইল । জানছছনি, হউ যে দুই বাঙাল পরিবাররে বাচাইলা, লিগর মাইনষে আইয়া লই গেল ।

--- ভালাউত্ত করলা, বাঁচাইলা ।

--- তাইন বাচলানি ।

--- কেনে কিতা অইছে, তানে মারি লাইছেনি ।

--- না জানে মারছে না, কিন্তু মারার লাখান অউ ।

--- কিতা করছে কছ না বেটা ।

--- ছাত্রার মিয়া তো খুব ধুরন্দর । হে ভাবল অউ মউকা । হিন্দুর মাড়ইল হাড্ডি ভাঙ্গি লাওয়ার । কাঠমেইস্তর অইলে কিতা অইব সৃষ্টিধর উঝারে সবে মানে । অউ বেটারে দাগি বানাই লাইলেউ অইল । তাইন বাচাইলা অউ দুইঘর মানুষরে, আর ছাত্রার মিয়ায় মিটিং করিয়া কইল উঝায় কেরামত আর মুরশিদরে বান্দিয়া রাখি দিছলা । তারা গিয়া ছাড়াইয়া আনছইন ।

--- কইলেউ অইল নি । মুরশিদ চাচায় কিতা কইল । আমি চিনি তানে, বউত ভালা মানুষ, মিছা মাত মাততা নায় । জলঢুপ থাকি আনারস আনিয়া খাওয়াইতা ।

--- আর তর আনারস । তখন কিণ্ডয়ে কইত লিগর ফয়সালার উপরে ।

--- তাইন অখন কই । আমার গুরু । তান বড় বিপদের সময় ।

--- আছইন রইদপুয়ানিত অউ । সব গেছেগি ইন্ডিয়াত, পন্ডিতপাড়াত দুই একঘর আছইন,
রইদপুয়ানিত তাইন । তাইন কইছইন যাইতা নায় ।

--- তাইন যাইতা নায়, শেওলার পারউ মরবা কইছইন ।

--- পুড়িনতর বিয়া অইছে নিবে ।

--- অত জানার অইলে যাছ না কেনে ।

বৈতল যায়নি । অপমানিত গুরুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি । শুধু লুলার কাছ থেকে
খবর জেনেছে । শেষদিকে লুলাও কিছু বলতে পারেনি । দেশভাগ বন্ধুকেও বদলে দিয়েছে ।

ছত্রিশ

দুখুও বদলে গেছে । রায়ট হলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে । ইটখোলায় হরিৎবরণের
তিন মাথা পেরিয়ে যায় বৈতল । নছিবালি হাকিমের দিঘী পেরিয়ে

যায়, বৈতল পায়ে জোর পায় না, প্যাডেলের গতি কমে । সংস্কৃত টোল পেরিয়ে যায়, বিধু
চৌধুরির শেষ হিন্দুবাড়িটাও পেরিয়ে যায় । সুলতান আহমেদ পোস্টমাস্টারের বাড়ির গায়ে
বেচুদার বাড়ি । এখানে সবার বাড়িতেই এক একটা পুকুর, পুকুর পারেই বেচুদা পাঁঠা খাসি
কাটে । শহরের একমাত্র ভ্রাম্যমান কশাই । বিসমিল্লা করে হালাল করে । এসব দাঙ্গা হাঙ্গামা
হলেই বেচুদার বিক্রিবাটা কমে যায় । তখন যে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় । মূল
গ্রাহকের কাছাকাছি হতে পারে না । তখন মাংস নিয়ে হিন্দু মুসলমান তকরার শুরু হয় ।
পাড়ায় শুরু হয় রবিবাসরীয় পাঁঠাবলির মহোৎসব । বলিচ্ছেদের এক কোপে কাটা হয় সমবায়ী
পাঁঠা, মানে কয়েকটি পরিবারের যৌথ উদ্যোগে কেনা হয় পাঁঠা, অবিকল বেচুদার অনুকরণে
কিত্তা পাতার ‘মচা’ বানিয়ে দিয়ে আসা হয় বাড়ি বাড়ি, আর বেচুদার বিরুদ্ধে প্রচারটাও হয়ে
যায় মুখে মুখে । মুসলমান কসাই প্রাণীকে বড় কষ্ট দিয়ে মারে । কী নিষ্ঠুর, গলার নালী কেটে

ছেড়ে দেয়, এর নাম হালাল । এত কষ্ট দিয়ে আড়াই পেঁচ দেওয়াকে সমর্থন করে না বৈতল ।
আসলে মৃত্যুর মুখোমুখি জন্তুটার ছটফটানি সহ্য করতে পারে না বৈতল । তাই দুখুকে দায়ী
করে বলে,

--- অত কষ্ট দিয়া মারছ কেনে । এক কুপে ত মারি লাইলে হয় ।

--- অ, এক ঝটকায় মারলে মারা নায়, হালা করলেউ মারা, নানি । সব মারাউ মারা রে বলদ
। আমারে ইতা কইছ না, ইতা হনলেও আমার গুনা হয় ।

--- মাতিছ না বেটা, বাঙালর লাখান আজাব আছে নি । পাঠা ছাগি মানে না । ছাগির পুন্দো
বিচি বুলাই রাখছ ।

--- রাখে তোর লাখান খবিছ হকলর লাগি । ছাগি নু মা, গরু নু মা । খাওয়ার জিনিষ খাইতে
বেটা, অত কিতা ।

--- তে গরিব মাইনষর ইতা নাই । তারা হকলতাউ খায় । আমি খাই নানি গোস্ত । খাই । এর
মাঝেও তর লাখান গাফি পুক দুই একটা আছে । পাকিস্তানর ঝান্ডা উঠানির লাগি জান দিলায়
। তুই জানছও না পাকিস্তানর ঝান্ডায় কিতা অয় আর ইন্ডিয়ায় পতাকার কিতা অয়
। তরে কই দিছে , তর মাথা খাইছে শহরর শয়তানে, পয়সার জুরে আর দুই এক ছত্তর
লেখাপড়ার জোরে ইতায় শয়তানি করে । গরিবরে ঠগায়, পেটর ভাত দিত পারে না, কাপড়
দিত পারে না, ধর্ম দেয় । ধর্ম পাইলেউ সব পাই লাইল, ঝান্ডা পাইলেউ পেট ভরি যায়,
তনাইর তেনা অই যায় সিলিকর কাপড়, আর ধর্ম কই, মরারে মারাত ধর্ম । হালাল করাত ধর্ম
এক কুপে মারাত ধর্ম । হুইন দি মারো ইতা ধর্মর কপালো ।

--- চুপ যা, চুপ যা ইতা মাতিছ না বে ডগা । মাইর খাইয়া মরবে ।

--- কেনে মাততাম না । সারা বছর তো বেচুদার মচা খাইলে আর নূতন বছর আইলেউ
তারাপুর । নববর্ষর মাংস হিন্দু পাঁঠা না অইলে অইত নায় । সকাল থাকি লাইন । পাচ টেকা
সের, এক পোয়া মাংসর লাগি কী থাকরা থাকরি । তেও পছন্দসই মাল তো পাইতে নায় ।
ছিনা গর্দান কওয়ার উপায় নাই । পর্দা মর্দা তেলে তুলে মিলাই দিল, তেও বাড়ি আইয়া যখন

সিদ্ধ হয় না, কয়, কয়ফল দিলাও এক টুকরা । তেও না অইলে কইব ঠগাইছে মাধব হালার
হালায়, জুতার চামড়া দিলাইছে । নাইলে কইব ছাগির মাংস দিলাইছে ।

--- দিলে দিছে, তর কিতা বে-আকল ।

--- কেনে তে । বেচুদার রুটি মারত কেনে খামকা । বেচুদা আমার ভাই । হে ও আনপড়
আমিও আনপড়, হেও দিন আনে দিন খায়, আমিও অলাখান । বেচুদায় ঠগঠগামি করে না ।
বাবু হকলর পছন্দ জানে, কিতাপাতার মচাত ঠিকঠাক দেয় । মাংসর গন্ধে আর গরম মশলার
গন্ধে যখন ঢেকইর তুলে তখন তো কয়, বেচুর মাংস! পয়সাও কুনু নগদ নেয় নি । যে যখন
পারে দেয় তে কেনে । অখন কিণ্ড এক গিলানিএ মাইর খাইছে, তুই ছলি গেচছ । পারছ তে
যাছ না যম জমিদার ইগুরেও চাক্কু মারিয়া আয়, কইমু বেটা ।

অকারণ কথা সাজায় বৈতল । দুখুর মন বোঝার চেষ্টা করে । দুখু রাগে । বলে,

--- কান মগজ খাইচ না । অখন চালা, কুনুরকম গিয়া উঠ বান্দর উপরে ।

--- তুই আমারে বান্দর উপরে আনলে কেনে হারামজাদা । আমারে মারতে । বৈতল ইতা
ডরায় না । তুই ভাবিছ না বৈতল একলা মরব । তরেও ছাড়ত নায় । কাইল যে মরিবায় নিধি
এরে নি তুমি চাও । তরে বাচানির লাগি আইলাম আর তুই হিতারে ডাকরে । ডাক ।

বৈতল বরাক নদীর জলে টাইটুম্বুর বাঁধের উপর উঠিয়ে দিয়েছে তার পক্ষীরাজ । বৈতল
দেখে একদিকে অন্ধকার আর মসজিদের দিকে সার সার মশাল । মশালের আলোর ভিতর
জটলা । একজনকে পেয়েছে, লাঠি সড়কি দিয়ে খুব মারছে । বৈতলের তখন হিতাহিত
জ্ঞানশূন্য অবস্থা । আর বাঁচার কোনও উপায় নেই । বৈতলের রিক্সার টিমটিমে আলো দেখতে
পেয়েছে মশালের আলো । আধমরাকে ফেলে হৈ হৈ করে জটলার আলো দৌড়তে শুরু করেছে
। বৈতল সাহস হারায় না, বৈতলের যে ভয় ডর নেই । দুখুর দিকে তাকায় অবজ্ঞাভরে । বলে,

--- কিতাবে, মাইর খাইয়া কাজিমরা অইয়া পড়ি রইছে যেণ্ড, ইগুরে বাজারি কিল দুই একটা
দিয়া আইও যা । এর পরে তো আমার টান ।

দুখুর মুখেও এবার বিদ্রূপ । বলে,

--- হিঙরে মারার সময় পাইমু অখন ত তরে ধরাই দেই আগে । মামুর লগে দেখা করতে
নানি । যা কইয়া আয় দুখুয়ে তরে ধরাই দেব । যা যা ।

বৈতলের একবার মনে হয়েছে এক দৌড়ে চলে যায় পিরের বাড়ি । মনের দুঃখ
জানিয়ে আসে । বাঁধের নিচে নদীর পারেই মামুর মোকাম । কিন্তু বৈতল তার রিক্সা
ছেড়ে যাবে না , লড়াই ছেড়ে যাবে না । একাই লড়বে, লড়তে লড়তে মরবে । ওদিকে
আধমরা লোকটাকে ফেলে লাঠিসোটা নিয়ে মশালের মিছিল সচল হয়েছে । বৈতল পিছন ফিরে
দেখে দুখু নেই । দুখু ততক্ষণে রিক্সার পিছনে, বাঁধের উপর রিক্সা ওঠাতে যে ঠেলতে হয় ।
বৈতলও দুখুর দিকে এগোয়, মানে পিছোয় । দুখুও তখন মহাবীর । ঠেলতে ঠেলতে রিক্সা
উঠিয়ে দেয় বাঁধের উপর । বাঁধ থেকে ঝপাং করে নদীর জলে । দুখুর পিছনে দৌড়য় বৈতল
। নদীর পাড়ে দুই বন্ধু মুখোমুখি । শারীরিক শক্তিতে বৈতল কখনও দুখুর সঙ্গে পারে না ।
বৈতল কিছু বুঝে ওঠার আগেই দশাসই বেঁটে মানুষ দুখু ওকে দেয় জোরে এক ধাক্কা । বৈতল
ততক্ষণে ত্রুদ্ব নদীর জলে, অন্ধকারে জলের আলোড়নও বোঝা যায় না ।

পাড়ে দাঁড়িয়ে দুখু মিয়ার আশ্ফালন শুরু হয়েছে নদীর অদৃশ্য জলের সঙ্গে আক্রোশে ।
মশালের আলোকে গুনিয় গুনিয় বলে,

--- আল্লা হো আকবর ।

ওদিক থেকে ওঠে সমবেত জিগির,

--- নারায়ে তকবির ।

দুখুর লক্ষবাক্স দেখে মসজিদের জনতা যত এগিয়ে আসে, দুখুর মুখ তত উজ্জ্বল হয় ।
বৃষ্টির কাটাকুটি আলোয় বেঁটে মানুষটা প্রকট হয় আলোয় মুখে । লুকা হাতে জনতার দিকে
তাকিয়ে আবার দেয় সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ । বলে,

--- আল্লা হো আকবর ।

বলে,

--- কিতা রেবা তুমরা । এলকুনি আইলায় । রিক্সাআলা ইগুর গাত নি অলা বল । এমন
লেংড়ি একটা মারছিল হালার হালায়, আর আমারেও ত চিনে না, কয় বাঙাল মারিয়া বুলে

স্বর্গত যাইত । যাওয়াইছি, হে কয় হে পানির পুক, পানিত অউ তার কবর দিলাইছি, লগে তার
রিক্সা ইগুও । পক্ষিরাজো চড়িয়া হালার হালায় যার স্বরগোপুরিত । ইশাক ভাই তুমার লুকা
ইগু লামাও চাইন, দেখি আমার পাওত অত খুন কিতা, ইগুরে মারার আগে আকতা এক তেলর
শিশি বার করিয়া ভাঙল পাথরো আর ঢুকাই দিল আমার পাও । ইশ্ রঙে বইয়া যার ।

--- ইগু তো বৈতল নানি । হে তো বা তুমার দোস্ত । তুমি কুনু মারবায় নি । তুমি তারে
ভাগাই দিছ । মামুর মোকামো লুকাই রাখছ । তুমারে আমরা চিনি দুখু ভাই ।

--- বাল চিনো । বৈতলর লাখান শয়তান নি দুইটা আছে । ইগুয়ে দুস্তি করত আর আমার
সব খবর দিত গিয়া যম জমিদাররে । জাসুসি করত । তার বৌর লগে জমিদারর লেটপেটর
কথা জান নানি । তার পুড়ি ইগুও তার নায় । জমিদারর লাখান চউখ মুখ ধার ধার ।

--- তেউ । ইতা দিয়া কিতা অইত । তুমরা চাইর ইয়াররে সবে চিনে । হুদা মাত মাতিও না
বা, অখন কও ইগুরে কই লুকাইছ ।

--- আমি মারি লাইছি, মারিয়া পানিত ফালাই দিছি ।

--- পানিত ফালাইলায় কেনে ।

--- হে গপ করছিল পাকিস্তানো হেও এক মুসলমান দোস্তরে মারিয়া নদীত ফালাই দিছিল
রায়টর সময় । বদলা নিলাম ।

--- বুটা সব মিছা ।

--- কিওর বুট বেটা । জানছ নি কিতা করছে, আমারে কইছে বছইরে কইছে
আপদরেও কইছে মুসলমান অইব । কলমা পড়ানির সব বন্দোবস্তও করছিলাম ঘনিয়ালা
মজিদো ।

--- দেরি করলায় কেনে ।

--- দেরি কই করলাম । ধুরন্দর ইগু হালার হালা । সাপার থাকি বিষধর । কইল ঘনিয়ালাত
পড়ত নায়, নদীর হিপারো দুধপাতিলর ইমাম সাবর লগেও কথা অইছে ।

--- তে ।

--- তে আর কিতা । ইতা হুদা, অইত নায় এর লাগিউ পিছলাই যায় ।

--- পিছলার না হাতরার ।

--- কিওর হাতরাইত । মরিয়া ভূত অই গেছে ।

--- দুখু ভাই ভালা করলায় না । ইগুরে আমি চিনি ইগু পানির পুক অউ । তুমি জানিয়া শুনিয়া ছাড়লায় ইগুরে । অখন গিয়া উঠব ইটখোলা ঘাটো । জমিদাররে কইব, জমিদার ইগুতো ঘড়িয়াল, কিতা করব কে জানে ।

--- বাচলে ত উঠত । তুমি খামকা সন্দ করবায় । আর যদি উঠেও, হে বাচত নায় । সব ঘাটোউ আমার মানু আছে ।

--- সব খানো নাই ইটখোলা ঘাটোর বজিরাম ত হিন্দু ।

--- কেউ নাই, ঘাটআলা হক্কল ভাগছে ।

--- তুমারে কে কইলবা । তুমি তো আইলায় টাউন থাকি ।

--- না আমি গেছলাম ইটখলা ঘাটো । চলো দেখাইয়া আনি ।

দুখুকে সবাই সন্দেহ করে । দুখু ওসব পরোয়া করে না । লুকাওয়ালা দলকে নিয়ে এগিয়ে যায় মামুপিরের মোকামের দিকে । মামুর রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসে কেরোসিন ভর্তি দুই বোতল । দড়ি বাঁধা বোতল দুটো নিয়ে এগোয় বাঁধের দিকে । উত্তরমুখি বাঁধ ধরে এগিয়ে যায় দুখু বুক চিতিয়ে । পেছনে মশালসহ জনতা । বৃষ্টির দাপট তেমন নেই । ঝিরি ঝিরি পড়ছে । ঘাটোয়াল রজিরামের ছোট চালায় পোয়াখানেক কেরোসিন ছড়িয়ে দেয় । ইশাককে বলে,

--- ইশাক ভাই, দেও দেখি শলই । হালারে বেটার ঘাট ইগু দেই জ্বালাইয়া ।

ইশাক নয়, দুখুর হাতে এক ঘোড়ামার্কী দিয়াশলইর বাক্স এগিয়ে দেয় সকালের দেবদূত । কুতুবউদ্দিন লস্কর । টাউন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী । ইটখোলা ইদগায় আজ সকালেই যে বৈতলের নিগ্রহের প্রতিবাদ করেছে । দুখুর বড় ভাল লেগেছে ছেলেটাকে । রাতের বেলায় ধর্মরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কুতুবকে দেখেও ভাল লাগে । বলে,

--- শাবাশ বেটা ।

দুখু নিজেকে সামলে নেয় । হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নেয় । চোখের ইশারায় কুতুবকেই দায়িত্ব দেয় বজিরামের চালাঘর পুড়িয়ে দেওয়ার । নেতৃত্ব উজ্জ্বল পনেরো বছরের কিশোরকে মনে হয় ঈশ্বর প্রেরিত ফেরেস্টা । কুতুবের নির্ভুল হাতের প্রক্ষিপ্ত বারুদে জ্বলতে থাকে বিধর্মীর বাসস্থান, জ্বলেপুড়ে থাক হয় সামান্য তৈজসপত্র । দুখু ভাবে, বজিরামের শন-বাঁশের ঘর পোড়ে, তারও পরীক্ষা হয় ।

ছোটঘর পুড়িয়ে কুতুবের তৃপ্তি হয় না । সে তার হাতের মশাল নিয়ে আবার ফেরে অকুস্থলে, যেখানে বৈতলকে জলে ফেলা হয়েছে । কুতুব লুক্কার আলোয় খোঁজে এদিক ওদিক । দেখে, কোথাও কি ঘাপটি মেরে আছে অন্যধর্মের রিক্সাচালক । জলের ত্রুদ্ব গর্জন আর উথালপাথাল মশালের আলো ভয় পাইয়ে দেয় অন্ধকারকে । কিশোর দমবার পাত্র নয়, অনুসন্ধানী মশাল নিয়ে নেমে যায় নদীর পাড় বেয়ে নিচে । ডাক দেয় ধর্মযোদ্ধাদের । বলে,

--- ভাইসব । চাচা হকল ।

সবাই তৎপর হয় । তবে কি পাওয়া গেল বৈতল ওঝাকে, কিংবা তার লাশ । দুখু প্রমাদ গোনে । না, সবার হাতধরাধরি করে জলের কিনারা থেকে উঠে আসে বৈতল দাসের চার বছরের পুরনো পক্ষীরাজ । বৈতলের খুব দেমাগ তার রিক্সা নিয়ে । বলে,

--- আমার তো পুয়া নাই, এক পুড়ি । পক্ষীরাজ অউ আমার পুয়া ।

মামুর শহর পরিক্রমার সাধ হলে বৈতলের রিক্সাই এখন একমাত্র ভরসা । বছরইর গাড়ি এখন ভগ্নদশায়, মামুকে টানতে পারে না । মামু রিক্সায় চড়লে বৈতল কোনোদিন সিটে চড়ে না । হেঁটে হেঁটে রিক্সা নিয়ে দৌড়ায় । বলে,

--- আমি কুন্স পির থাকি উচা নি । মামু আমরার দাতা, তানে মাখাত লইয়াও দৌড়াইতাম পারমু । সিটো বইতাম নায় ।

ধর্মযোদ্ধা কুতুবউদ্দিনের নেতৃত্বে বৈতলের রিক্সা জল থেকে ওঠে । হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় বৈতলের প্রথম সন্তানকে । বজিরামের ঘরে আগুনের শিখা তখনও জ্বলছে দাউ দাউ । সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে বৈতল ওঝার বুরবাক । দুখু বৈতলকে বলেছিল

বেহেশ্তের ঘোড়ার কথা । ওঝা বৈতলও মাঝেমাঝে আদর করে তার পক্ষীরাজকে ডাকে,
বুরবাক ।

সাঁইত্রিশ

জলের প্রাণীকে মানুষ বোকা ভেবে শিকার করে, খুশিতে ঝলমল করে ওঠে মুখ যখন
দেখে হাতখলুই ভরে গেছে রূপালি ফসলে । কিন্তু বৈতল জানে, জলের জীব এত বোকা নয় ।
কিন্তু লোভে আর কিছু নিরুপায় হয়ে ধরা দেয় মানুষের জালে, মানুষের টোপে । জলের ভিতর
আছে মাছের নিজস্ব সংসার, নিজস্ব এলাকা । এলাকা ছাড়া বড়ো একটা যায় না তারা ।
মাছেদের মধ্যেও আছে গুপ্তা বদমাশ । বড় মাছ ছোট মাছকে খায়, তাই মা মাছ পোনা মাছকে
রক্ষা করে । খাদ্যাখাদ্যের ভেদ জানে যারা তারা টিকে থাকে আর লোভী বোকার দল ধরা
পড়ে । মাছভর্তি পুকুরে বোকা আর চলাক মাছের সংসার চেনে বৈতল । বোকা মাছ, যারা
সহজে ধরা দেয় তেমন মাছে উৎসাহ নেই বৈতলের । একটা সেয়ানের সঙ্গে সে সারাদিন
লড়াই করতেও রাজি । সেই কোন ঝড়ের রাতে বইয়াখাউরির বড় হাওরে এক দুই মণি
বোয়ালের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েও ব্যাটাকে কাবু করেছে বৈতল । তখন আর তার বয়স
কত, পনেরো ষোল হবে । বাপ খুশি হয় । বাপেরও আছে বৈতলের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই,
হাতখলুইএ আলদের বাচ্চা ঢুকিয়ে দেয় । নিজের বাপকেই বোঝেনি বৈতল জীবনে । মারতে
চেয়েছে, নাকি প্রতিকূলতা সয়ে জলের সংসারে বাঁচতে শিখিয়েছে । বরাক নদীর জলে তার

কালো হিলহিলে শরীরটা ভাসিয়ে দিয়ে ভাবছে হঠাৎ হঠাৎ কী থেকে যে কী হয়ে যায় ।
বন্ধুত্বের সংজ্ঞা খোঁজে, দুখকে বৈতল তার প্রাণের থেকেও বড় বন্ধু ভেবেছে । একদিন সন্ধ্যার
আঁধারে নির্মীয়মাণ বরাক নদীর পুল থেকে পড়ে যখন মৃত্যু অবধারিত, সেই নতুন দেশের
নবীন বন্ধু দুখু মিয়াই তাকে বাঁচায়, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাঙা পুলের মুখে । বোকা মানুষ
বৈতলের অন্ধকারের দৌড় খামিয়েছে বুক চিতিয়ে । দুজনেরই মৃত্যু হতে পারত । শুধু কি দুখু,
আরো দুজনও বোকা মানুষ তার পাশে দাঁড়িয়েছে । আপদ আর বহুই । ধর্মে আলাদা জেনেও
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে । দুখু কি তবে তাকে মুরগি পুষেছে এই দিনের জন্য ।
একবেলায়, এক অচেনা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কী করে সব ওলটপালট হয়ে যায় । ধীরে ধীরে
তৈরি-হওয়া সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় । দুখু কি ওকে রক্ষা করতে পারে না, মামুপিরের বাড়িতো
সামনেই, ওখানে পৌঁছে দিলেই বেঁচে যায় । নাকি ওখানেও ধাওয়া করবে দাঙ্গাবাজের দল ।
দুখু তো জানে জলের নাগাল পেলে বৈতল হয়ে ওঠে মহাবীর, তবু বোকাম মতো ফেলে দেয়
জলে । দুখু জানে বৈতলের রিক্সা তার জান, তাও ফেলে দেয় জলে, এত নিষ্ঠুর । কিন্তু
বৈতলও কম নিষ্ঠুর নয়, সেও বদলা নিতে জানে । প্রাণের বন্ধু, শৈশবের বন্ধু, কৈশোরের বন্ধু
কৈশোর-যৌবনের দোস্তু লুলাকেও গলা টিপে মেরেছে । বৈতলের কোনও অনুশোচনা নেই ।
কিন্তু লুলা থেকে দুখুকে সে অন্য আসনে বসিয়েছে, আরো বড় অনেক দিলদার । দুখুর সঙ্গে
তার সব রাগ অভিমান ঝগড়া । সেই দুখু তাকে এমন দাগা দেবে বুঝতে পারে না ঘুণাক্ষরেও
। বৈতল বুড় বুড় শব্দে তলিয়ে যায় জলের অতলে আবার ভেসে ওঠে ভুস্ । জল যে এত প্রিয়
তার, জলের গভীরে গিয়েও বৈতলের কোনও সুখ নেই । বড় একাকী জলে নামলেই, জলের
প্রাণীর সঙ্গে মিত্রতা চাইছে । আয় মাছ, আয় মকা পুঁটি কাতলা রুই মৃগেল বোয়াল চিতল
রিঠা, আয় সর্প আয় আলদ আয়, আয় অলগর্দা, চিতি ঢোঁড় শঙ্খচূড়, লাউডগা আয় কালী নাগ,
অষ্টনাগ, ডাকে ঘড়িয়াল আয় । বৈতল ডাকে সবাইকে, কুচুটে মানুষের রাজ্য থেকে সে আজ
বিতাড়িত । প্রিয় বন্ধুও আজ ধর্মের জন্য সমর্পণ করেছে জলে । বৈতল অবাক হয় জলের
নীরবতায় । এমন চুপ, নেই কোনও জলজন্তুও । ভরা বর্ষার নদীও বৈতলকে বঞ্চিত করে ।
একাকী বৈতল ডুবছে আর ভাসছে আর দেখছে পারের কাণ্ডকারখানা । সার সার মশালের
লাফঝাঁপ । কুতুবউদ্দিনের জন্য বড় কষ্ট হয় । সকালে এরকম এত মিষ্টি ছেলোট কী করে
বদলে যায় রাতে । সকালে মসজিদ কমিটির কাছে সুপারিশ করে বৈতলের হয়ে । বলে সে
তাকে বিনিপয়সায় রিক্সা চড়ায় । এই তার কৃতজ্ঞতা । ছেলেটার মুখ দেখে বড় মায়া হয় ।

পোষাকটাও পরে ভারি সুন্দর, সাদা সালোয়ারের মতো পাজামা থাকে গোড়ালির উপর ।
পাঞ্জাবিটা অন্যরকম । হিন্দুদের মতো নয়, একটু লম্বাটে সাদা । মাথায় টুপি । মসজিদের
ভিতর ছাত্রাবাসে শুধু সালোয়ারের বদলে সবুজ লুঙ্গি, চৌকো ঘরকাটা । বৈতলেরও একটা
সালোয়ারের আছে কুচি দেওয়া, মনসাপুথি পড়ার সময় পরে । নাগ পঞ্চমীর দিন কালো মানুষ
বৈতলের সর্বাপেক্ষে তখন সাদা বেশ, হাতেও সাদা চামর । ব্রতধারিণীরা ভক্তি ভরে সারাদিন
শোনে আইমনসার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা আর থেকে থেকেই ধুয়া ওঠে ‘জয় মা মনসার জয়’
‘জয় বিষরি মাইর জয়’ । ঐ একটা দিন বৈতলের মধ্যে দেবভাব বিরাজ করে । কুতুবউদ্দিনের
মুখটা দেখলেও বৈতলের দেবশিশু মনে হয় । এমন নিষ্পাপ । সেই মিষ্টিমুখের ছেলেটি যে কী
করে পারে এত বড় অন্যায় করতে । দুখুও একবার বলে না বৈতলের রিক্সার নাম শুধু
পক্ষীরাজ নয়, বুরবাকও । তার ধর্মেরও স্বর্গীয় ঘোড়া ।

আসলে বৈতল শুধু একটি দেবশিশু দেখেনি । এক জোড়া দেবদূতের দেখা পেয়েছে ।
কুতুবের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে দেয় ওরই সমবয়সী টোলের ছাত্র যামিনী আচার্যর সঙ্গে । এক পা
খোঁড়া এবং খর্বকায় কিশোর ছাত্রকে বন্ধুরা ডাকে বাউ আচার্যি । এক আচার্যি আর এক লঙ্কর
বৈতলের রিক্সায় ওঠে, যায় কাছাকাছির গন্তব্যে । দুজনকেই বৈতল টেনে নিয়ে যায় তার প্রিয়
নদীচরে । ওপারে গ্রাম দুধপাতিল । মাঝে নদী বরাক । শীতের সময় বৈতল তার মেয়েকে
নিয়েও এসে বসে থাকে জল আর বালির মধ্যে ।

দুই ছাত্রেরই প্রধান আকর্ষণ বিস্তীর্ণ নদীর চর । ‘দুজনই নদীর পারে এসে বাড়ির জন্য
মন খারাপ করে । কুতুব যায় বাঁধের নিচে, তার নানার কবরে জিয়ারত করে । আর বাউ-
আচার্যি যামিনী যায় তার মামার বাড়ির গ্রাম দুধপাতিল । নৌকো পেরিয়ে যায় ওপারে । দুজন
এক হলে বৈতল দুজনকে দেয় এক একটি শুকনো মছার ফুল । খাওয়ার কথা বলে না, সে
নিজেই খায় একটা । ওরাও মুখে দেয় । ভাল লাগে না ফেলে দেয় থু থু করে । বৈতল
এবার দুজনকে বসিয়ে একই প্রশ্ন করে । একেকজনের জবাব হয় একেক রকম । বলে,

--- তুমি কিতা পড় ।

--- আমি আরবি পড়ি ।

--- আর কিতা পড় ।

--- বাংলা পড়ি ।

--- মনসাপুঁথি পড়ছ নি । রূপবানর গান শুনছ নি ।

--- না । ইতা ইন্দুর বাড়িত পড়ইন । রূপবান শুনছি, ধাইমা গো ।

বৈতল যামিনীকেও প্রশ্ন কে কী পড়ে । যামিনীর জবাব সংস্কৃত । এরপর বাংলার কথাও বলে, বাড়ি আচার্য বলে সে রূপবানের গান শোনেনি, মনসা পূজা হয় বাড়িতে, পুঁথি পড়েনি ।

বৈতল দুই শিক্ষার্থীর মনের মিল করিয়ে দেয় । আরবি সংস্কৃতের মিল । দুজনের গন্তব্য এক জেনে সহাবস্থানের প্রস্তাব দেয় । বলে,

--- ভাড়া কম পড়ব । কও যাইবায় নি এক রিকশাত । নাইলে তুমারে দিয়া আইয়া তারে লইয়া যাইমু । দুই পয়সা করি দিবায়, দেখ ।

দুজনেই রাজি হয়ে যায় । মনের আনন্দে দুই ধর্মের দুই শিক্ষার্থী নিয়ে বৈতলের পক্ষীরাজ ছোটো নদীর পার । প্রথম পরিচয়েই দুজনে বন্ধু হয়ে যায় । রিক্সায় বসে দুই সখায় গল্প করে আর শুনতে শুনতে বৈতল হাসে । কুতুব বলে,

--- আমপারা সিপরাও পড়ন লাগে । কুরাণ পড়মু কেমনে । বাংলাও পড়ন লাগে, মাতমু কেমনে ।

ল্যাংড়া ঠাকুর যামিনী বলে,

--- আমি আরবি জানি না সংস্কৃত জানি, বাংলা জানি । আরবি শিখাই দিবে নি । ডাইন দিক থাকি লেখন লাগে নানি । খালি তেড়া তেড়া টানা দিয়া লেখা, মাত্রা উত্রা নাই । আমার বাবায় খুব বিটলামি করতা, ঠাটা পড়লে আকাশে জিলকায় নানি, বাবায় মারে কইতা, অউ দেখ গো ভগবান আল্লা হই গেছইন, আকাশো আরবি লেখরা ।

--- নানায়ও সংস্কৃত মন্ত্র পড়া নিয়া কইতা, সংগোস কিড়িমিড়ি, কইতা অংবংচং । আমারও খুব ইচ্ছা সংস্কৃত পড়তাম ।

--- সংস্কৃত পড়িয়া কিতা করতে । টুলোউ ছাত্র হয় না, টুল বুলে বন্ধ হই যাইব । সংস্কৃত শিখিয়া কিচু হয় না, এক পুরহিতগিরি নাইলে কুষ্টি লেখা । অউত্ত কাম ।

--- নারে, রামায়ণ মহাভারত পড়তাম ।

--- হি তো বাংলাত আছে । কাশীদাসী আর কীরতিবাসী ।

--- বাংলাত আছে নি । দিছ চাইন ।

--- সব অউ বাংলাত আছে । কুরানও বাংলাত আছে ।

--- থাকলে কিতা অইব । আরবি ছাড়া অইত নায় ।

--- অইত নায় কেনে ? ওয়াইলেউ হয় । আরম্ভ করি দিলেউ অইল ।

--- নাবে, ইসলামো ইতা অয় না । মারি ফালাই দিব ।

--- কেনে মারত । আমার ইচ্ছা অইছে মাতৃভাষাত পড়মু, তেউ ।

--- ইসলামি বেরাদবিত ইতা চলে না । তুইন পারবে নি অংবংচং সংস্কৃত মন্ত্র বাংলাত কইতে ।

--- লেখাত হয়, ঠিক অউ কইচছ । বিয়ার মন্ত্র বাংলাত পড়ে না কেউ, গায়ত্রী মন্ত্র বাংলাত অয় না ।

এই পর্যন্ত বৈতল কুতুবকে যামিনীকে আলাদা করতে পেরেছে কণ্ঠস্বর দিয়ে এবং বিষয় দিয়ে । ইটখোলা বাজারের কোলাহলে ঢোকার পর আর কণ্ঠস্বর আলাদা করতে পারে না, কিন্তু বৈতলের সংলাপ এবং বিষয় বুঝতে অসুবিধে হয় না । দুজনের যে কেউ একজন বলে,

--- বাংলাত অত পণ্ডিত আছলা না । সহজ সরল মানুষ আছলা । তারা কত দামি দামি কথা কইছইন, কবিতা লেখছইন । আইচ্ছা কচাইন ই কবিতা কার লেখা ।

‘যে সবে বঙ্গিতে জন্মি

হিংসে বঙ্গবাণী

সেসব কাহার জন্ম

নির্ণয় না জানি

দেশি ভাষা বিদ্যা যার

মনে না জুরায়

নিজ দেশত্যাগি কেন

বেদেশে না যায়

মাতা পিতামহক্ৰমে বঙ্গিতে বসতি

দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ।’

একজনের প্রশ্নে অন্য কিশোর পণ্ডিত বিচলিত হয় । অনেক ভাবনা চিন্তার পর বলে,

--- রঘুনাথ শিরোমণি নানি । পঞ্চাংগুর পণ্ডিত ।

--- ধুর বেটা ফেইল ।

--- তে কিতা । কুন্ বৌদ্ধ কবি । এর বাংলা ঠিক বাংলা না ।

--- না, খাটি বাঙলার লেখা । কবি আব্দুল হাকিমর নাম হুন্‌ছস নি ।

--- ঠিক নি বে । তেউ ক । আমরা বাংলা না শিখিয়া আরবি আর সংস্কৃত দিয়া ধর্ম শিখিয়ার
। কী আডুয়া ক আমরা । মাতৃভাষা এক ধর্মভাষা আর এক । ইংরাজি না জানলে মানুষ হয়
না, জহরলালে আবার কইছইন হিন্দি অইব রাষ্ট্রভাষা ।

--- আর রাজ্যভাষা আসামি ।

--- অত ভাষা, আর ধর্মভাষা শিখিয়া কিতা লাভ অর ক চাইন ।

--- অর নানি তে । তর ঘর পড়ানির লাগি । অউ যে রিক্সা চালাইরা তানে দেশ থাকি
খেদানির লাগি ।

--- আমরা অউ দেশর এক কবিয়ে কইছইন, দুনিয়াত এমন কুনু মহাপুরুষ আইজ ও আইছইন না যার লাগি ধর্ম সম্প্রদায়র সংখ্যা কমছে । একজন মহাপুরুষর জন্ম মানেউ আর একটা নতুন সম্প্রদায় ।

--- নতুন করি আগুন । নতুন ধর্ম, ধর্মাস্তরীকরণ ।

--- একেবারে হাচা কথা ।

--- কে ক চাইন ই কবি । আর তুই অততা শিখলে কেমনে ।

--- হাচা কথা কইতাম নি । নতুনপট্টিত অমূল্যর চার দুকানো গিয়া আমি চা খাই সকালে, তখন দুইজন মাস্টর আইন, নতুন আইছইন মলইবাজার থাকি । তারা দুইজনে মাতইন, আমি গিলি ।

বৈতল অবাক হয়ে শোনে দুই পণ্ডিতের আড্ডা । বাচ্চা বাচ্চা ফাজিল পণ্ডিতের চিন্তার স্বচ্ছতায় মুগ্ধ হয় । সিটের উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে,

--- সালাম, দণ্ডবৎ প্রণাম বাপ হকল ।

রিক্সা বাঁধের উপর রেখে দুই পণ্ডিতকে নিয়ে নেমে যায় নদীর চরে । দুই ভিন্নধর্মী বন্ধুকে বলে,

--- বাবা হকল, একটা বিড়ি খাও ।

কুতুবউদ্দিন দুই গালে থাপ্পড় খেয়ে বলে,

--- রামো রামো ।

ল্যাংড়া পণ্ডিতও শাস্ত্রবিহীন খুতনিতে হাত বুলিয়ে বলে,

--- তওবা তওবা ।

বৈতল বর্ষারাত্রে দাগার রাতে নদীর জলে ডুবতে-ডুবতে ভাসতে-ভাসতে ভাবে, কী করে হয় পরিবর্তন । কী করে হয় এমন হিংস্র । ধর্মভাবনা কি মানুষের জীবনের থেকেও বড়, মানবিক সম্পর্কের থেকেও বড় । গুরু সৃষ্টিধরের স্মরণও আজ তাকে সাধুনা দিতে পারে না ।

গুরুজি বৈতলের মন ভাল করার শান্ত করার কত উপায় বের করে দিয়েছেন । কিছুতেই কিছু হয় না বৈতলের । তবু ভাবে গুরুর কথা নিয়ে । গুরু বলেন,

--- দেখো বাবাজি । একলা মানুষ বড় ভালো । হে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয় । হে মান আর হুশ আলা । হে তুমার কুণু ক্ষতি করত নয় । কিন্তু হউ একলা মানুষ অউ জাতো পড়লে খুয়াই লায় হুশ । তখন হে রায়ট করে, ভাই মারে, ভইন মারে । বন্ধু মারে, মা-রে মারে বাপ-রে মারে ।

বৈতল ভাবে, দুখুর সঙ্গে তার হিসেবনিকেশ করবে পরে । কিন্তু কুতুব । কুতুবের কী ক্ষতি সে করেছে । কুতুব তো পণ্ডিতের মতো কথা বলে । সেই তো মরে বেঘোরে ।

বৈতল পরদিন ভোরের বেলা ভেসে ওঠে অল্পপূর্ণা ঘাটে,

দাঙ্গার রাতেই সাক্ষ্য আইন ঘোষিত হয় শহরে । লালপাগড়ি পুলিশ আর হিন্দুস্থানী মিলিটারির ভারী বুটের শব্দে শহর স্বাভাবিক হয় তিনদিনেই । চাকু খাওয়া গিলানিও সুস্থ হয়ে ওঠে । জোর গলায় বলার সাহস নেই কারো, রাজনীতির বাজারে কোনও প্রতিপক্ষ যে নেই, তবু কানাঘুষায় সবাই জানে নকল রায়টের মহড়ার পিছনে কে বা কারা । দেশভাগ স্বাধীনতার কাগুরী জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদের প্রতীককে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করার প্রস্তুতি মহড়া । নতুন দলবদল করা জমিদার যমুনাপ্রসাদ এবার বিধানসভার প্রার্থী । পদ এবং নির্বাচন যে প্রায় নিশ্চিত ।



বৈতল রাজনীতির কারবারি নয় কোনোদিন । বৈতল শুধু মেনে নিতে পারেনি কারো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে শুধু গরিব মানুষের রক্ত জমাট বাঁধবে কেন বারবার নদীর জলে । আগুনে পুড়ে থাক হবে গরিবের অবলম্বন । রাজনীতি না করলেও আরো বেশি নিষ্ঠুর হতে পারে বৈতল । বইয়াখাউরির জলের জন্তু বৈতলকে নিয়ে খেললে বৈতল হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর । বৈতল ধর্মের কিংবা রাজনীতির হিসেবনিকেশ জানে না । বৈতল তার গুরু সৃষ্টিধরের শিষ্য । তাই বৈতল সব পারে, মানুষের ভালর জন্য নির্মম হতে পারে বৈতল । তাই তো বৈতলের অনুশোচনা হয়েছে কুতুবের মতো নির্মল মনের কিশোরের বদলে যাওয়ায় । তার পক্ষীরাজ পুড়িয়ে ফেলার জন্য বৈতলের ক্রোধ হয়েছে, আর ক্রোধ হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তার । আসল কথা জানার পর অনুশোচনা হয়েছে বৈতলের । শান্তির এলাকা হরিৎবরণ ইটখোলা মালুগ্রাম ঘনিয়ালার হঠাৎ উত্তপ্ত হওয়ার কোনও কারণই নেই । পরিশ্রমী খেটে-খাওয়া মানুষ হঠাৎ কেন খেপে যাবে । আগুনে ঘি না পড়লে প্রজ্বলন্ত যজ্ঞাগ্নির কেরামতি যে যায় না হোমকারী ব্রাহ্মণের । যম জমিদারের হাতের নীরব ছোঁয়ায় মশাল জ্বলছে সারিসারি । হিন্দু

মহাসভা থেকে জনসংঘের পথ না ধরে ধর্মনিরপেক্ষ জননেতা হওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা শুরু হতেই সন্দেহ হয় বৈতলের। যম সিং-এর রাজবাড়িতে শর্মা ব্রাহ্মণ বলেই থাকতে পেরেছে বৈতল, পাটনি কৈবর্ত ওঝা পদবির বিতর্ক শুনলেও দুর্গাবতীকে বিশ্বাস করেছে। অন্ত্যজ এবং বিধর্মীর প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিতে হয়েছে শেষপর্যন্ত রাজনীতির বাধ্যবাধকতায়। জমিদার এখন মধুরবন্দ বেরেঙ্গা ঘনিয়ালা সদরঘাটে মিটিং করে ঘনঘন। ময়নুল হল চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে ঘন ঘন উঠাবসা। বৈতল এসব দেখে হাসে আর জমিদার তাওয়ার উপর রুটির মতো ফোলে। প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতায় রং কখনই ফিকে হয়ে গেছে যমুনাপ্রসাদের। বৈতলের উপর বিরক্তি বাড়ছে জমিদারের দিনদিন। দাঙ্গার রাতে নদীর আর বৃষ্টির জলে ‘লুলানো’ বৈতল এখন শুধু সূর্য ওঠার প্রতীক্ষা করে। তার এখন চাই তেজ। বৈতলের চোয়াল এখন দৃঢ়। বৈতল এখন প্রস্তুত। কুতুবের সঙ্গে যা হয়েছে হয়েছে, দুখুকেও মাফ করে দিয়েছে বৈতল, অল্পপূর্ণাঘাটে ভোরের বেলা ভেসে ওঠার পর বৈতল ঠিক করে নিয়েছে তার ইতিকর্তব্য। গরিবের যাওয়ার কিছু নেই তার ‘তেনা’ ছাড়া, গরিব মানুষ কখনও চক্রান্ত করে মানুষ মারে না, সে সবই একতরফা মালিকানা বড়লোকের। অল্পবুদ্ধি মানুষকে তারা প্রলোভিত করে, জলকে কাত দেখায়, তখনই কাত হওয়া চোখে সন্দেহে নীল চোখ অনর্থ ঘটিয়ে দেয়। প্রিয় বন্ধুর আস্তিনকে বড় ভয় তার, কী জানি কখন রামপুরি না রহিমপুরি ছুরি বের করে। এক রাত নদীর জলে বাঁশের চালিতে লুকিয়ে থেকে অনেক কথা শিখেছে বৈতল। লুসাই পাহাড়ের বাঁশের চালি দুলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছে গন্তব্যের দিকে, আর গন্তব্যহীন বৈতলও কোথাও যেন যাচ্ছে, কোনও দেবপুর কিংবা কোনও অসুরপুরে, কোনও এক নিধনের প্রতিজ্ঞায়। চালি চলে রাতের অন্ধকারে, যেমন চলে গাঙুড় নদীতে বেহুলার ভেলা। গোধার ঘাটের বর্ণনা গান বৈতল গায় মুখবিকৃতি আর হাস্যরস মিলিয়ে। বাঁধের উপর লুক্কায়ালাদের কার্যকলাপ দেখে রামনামী বিশজন গোধার নাম মনে পড়ে বৈতলের, ‘ভাউলকা গোধার নাতিন জামাই নাম তার নিজাম আর, ফেক্‌ড়া গোধার নাতিন জামাই মেডু গোধার নাতি ফেক্‌ড়া গোধার সমস্কিকের নাতির ঘরের পত্তি তার নাম খেট্‌কা গোধা সর্বকনিষ্ঠ।’

একদার দেবকিশোর কুতুবকে দেখে বৈতলের খেটকা গোধার নাম মনে পড়ে । বৈতল জলের অতলে ডুব দেয় গোধার পালের কার্যকলাপ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য । জলের জন্তুর সঙ্গে সখ্য চেয়ে হাত বাড়ায় ডুবসাঁতারে । রাত গভীর হতেই, আগুন নিভে যেতেই, গোধার ঘাট ছাড়তেই ধোপানীর মৎস্য বরাকনদী ভরে ওঠে,

‘লাচো খরিস ভাসে বড় বড় পুটা ।

ভাসিল ঘাঘট মৎস্য পৃষ্ঠে উবা কাটা ।।

চিতল কাতল মৎস্য ভাসে শত শত ।

শউল ও গজার ভাসে মুটা পর্বত ।।

গুতুম চান্দখিরা মৎস্য ভাসিল প্রচুর ।

কাকি মৎস্য ভাসে যেন তাল ও খাজুর ।।

নানিন্দ পিপলা ভাসে আর ভাসে টেংরা ।’

এত এত মাছ দেখেও মনসামগল গায়ক বৈতল তোলপাড় তোলে না জলে । মাছের সখ্যে রাত কাটিয়ে দেয় ভুরায় । এক সময় ভুরভুর করে সব নদীর মাছও যায় তলে । ভোর হয় অল্পপূর্ণাঘাটে ।

অনেক কারণে তখন শহরে বৈতলের বিস্তর পরিচিতি । হরিৎবরণ জমিদারবাড়ির পোষ্য বলে চেনে অনেকে । চেনে জালাল পিরের বাহন হিসেবে । মামুকে শহর পরিক্রমায় নিয়ে যায় বৈতল তার রিক্সা পক্ষীরাজে । চেনে নাগাপাট্টির মাতাল বাহক রাতের রিক্সাওয়ালা হিসেবে । চেনে গুরমি নাচের ওঝা বলে । তাই চেনা মানুষটার অচৈতন্য দেহ গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে আসে জগরদেও গোয়ালা । জমিদার বাড়ির গাছতলায় শুইয়ে দেয় । সবাই জানে যম জমিদার রায়তের ভগবান । অচৈতন্য ভেবে পোঁছে দিলেও বৈতল হুঁশ হারায়নি ! ঠিক শুনতে পেয়েছে জমিদারের বিরক্তি । পরিকল্পনা যে রূপায়িত হয় না । বৈতল যে মরে না । দুর্গাবতী বলে সিবিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা । জমিদার শ্বাস নড়ছে দেখে বলে, না । পুলিশের ভয় পায় কি যমুনাপ্রসাদ । বাড়িতে ডেকে আনা হয় বীরেশ ভট্টাচার্যকে । হোমিওপ্যাথির বিধান রায় শহরে । দুদিনেও বৈতলের ঠাণ্ডা শরীর গরম হয় না দেখে আনা হয় মূর্তজা আলি

কম্পাউণ্ডারকে । সবাই বলে ডাক্তার, হাবেভাবেও ষোলআনা, স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে রোগী দেখে। ডাক্তার দেয় গুলি, দাগকাটা ঔষধ শিশিতে । জ্বর কখনও বাড়ে কখনও কমে । কমলেই ভয় পায় দুর্গাবতী, হিমঠাণ্ডা হয়ে যায় শরীর । আবার ঔষধ খায়, কমে বাড়ে, দুর্বলতা যায় না। বৈতল দুর্গাকে কাছছাড়া করে না, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বসে থাকে । রাতে যায়, আবার ফিরে আসে । জমিদারবাড়িতে দুর্গার অনেক কাজ । সারা রাতের কাজ, অন্নকূট উৎসবের প্রস্তুতি, বাড়ির এয়োতিরা মিলে একশর উপর পদ রান্না করে, আরো হবে সকাল পর্যন্ত । দুর্গাবতী ফিরে এসে বৈতলের মাথায় হাত বুলোয় । বলে,

--- তুমারে দেখাইমু ভাল ডাক্তার । অমূল্য হালদাররে দেখাইমু ।

মুর্তজা ডাক্তারের ঔষধ খাওয়া ছেড়ে দেয় বৈতল । বৈতলের আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে, কুতুবের মৃত্যুর খবর শুনে বাড়ি আচার্য যামিনী একদিন দেখতে আসে বৈতলকে । পরদিন তার মামা অশ্বিনী কবিরাজকেও নিয়ে আসে দুধপাতিল থেকে । কবিরাজের মকরধ্বজ খেয়েই সুস্থ হয়ে ওঠে বৈতল । কিশোর যামিনী বৈতলের কাছে বন্ধু কুতুবের কথা শোনায় । বলে,

--- তুমি তো গান গাও কাকা ।

--- পুঁথি গাই আর কিতা । পড়ালেখা জানি না । গুরুমারা বিদ্যা । গুরুয়ে যেলাখান শিখাইছইন ।

কুতুবে কিতা করত জান নি ।

--- কিতা করত আবার কিতা কত্ত রেবা । হে অখন কই ।

--- এ, ইতা জানো না নি কাকায় । হে তো গেছে গি-বাঁশকান্দি । নানার দেওয়া টেকা পয়সা সব শেষ । আর পড়া অইত নায়তার । নাইলে কিতা আইল না নে নি তুমারে দেখাত । তুমারে দি তার জান ।

--- কেনে রেবা জান ।

--- তুমি যে পুথির গান গাও এর লাগি । হে কইত হেও পুথি লেখব । এর লাগি লুকাই লুকাই
বাংলা লেখত ।

--- ভালা অউত্ত ।

--- না কাকা । হে কুরাণর বাংলা লেখত । আমার কাছে রাখত । কইত কেউরে না কওয়ার
লাগি । কুরাণর বাংলা করা বুলে গুনা ।

--- হেও গুনা করল ।

--- হুনতায় নি কাকা তার বাংলা ।

--- হুনিয়া আর কিতা করতাম ।

--- হুন না । হে আমারে কইত এক নরকর কথা । আগুনর কুণ্ড বুলে নাম হাবিয়া । কুরাণর
অউ টুকরা নিয়া লেখছে ছিলটি বাংলাত । হুন,

‘আগুনো যেলা উড়ে প্রলয়র পতঙ্গ

পাড়োর উপরে জ্বালাইয়া ধুনি

সুমতির সাবাশ পায় গুনি

ভালা কী আর যায় হাবিয়া বিজন

হাবিয়া কিতা কও চাই সুজন

দুর্জনে যে ঝাঁপ দেয় আগুনর কুণ্ড ।

--- ইতা কিতা লেখছে ।

--- কেনে বুঝলায় নানি । হে আমারে বুঝাই দিছিল, ভালা মাইনষর কুনু ডর নাই, আল্লায়
দোয়া করইন । আর শয়তানি করলেউ আগুনর কুণ্ড, হাবিয়া ।

--- হে নু হুনছি খুব ধুনি জালাইছিল নদীর পারো ।

--- ইতা খামোকা মাত । কুতুব ইলাখান নায় ।

তার মন বড় নরম । আগুন দেখলে যে বেটায় ডরায়, রক্ত দেখলে ফিট অই যায় হে নি
বার অইব রায়টর রাইত । ইতা আমিও হুঁচি মাইনষে রটাইছে, হে বলে তুমার রিক্সা
জ্বলাইছে । আমরার টোলর ধারউ থাকে কত কুতুব, কিণ্ডয়ে করছে আর নাম দিলাইছে
সাধুবেটার ।

--- ঠিকঅউ কইছ, কুতুব কুনু দুনিয়াত এণ্ড নি । কত হাজারে বিজারে আছে । আমার
লুলারও আছিল এক দোস্তু কুতুব ।

--- তেউ কও ।

--- আইছা ইতা বাদ দেও । অখন কও বন্ধুরে তোমার লাগে নি ।

--- লাগে । তারে কইছলাম আমি দিমু দশ টেকা । আমার ত অউ পুঞ্জি । ইবার দাশগুণ্ড
বাড়ির দুর্গাপূজাত পণ্ডিত মাশয়র লগে আছলাম পাঁচদিন । প্রণামীর থাল থাকি দিছলা দশটেকা
। খর্চ করছি না । হে কয় অইত নায় ।

--- কত লাগে রেবা ।

--- পাঁচশ টেকা বছরে । মজিদো খানি খর্চ দেওন লাগে ।

--- ঠিক আছে, আমি দিমু ।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বৈতল কথা দিয়ে দেয় । বৈতল জানে সিদ্ধান্ত নিতে
পারলেই উপায় বেরিয়ে যাবে । যামিনী আচার্যকে আবার অভয় দেয় । বলে,

--- তুমার বন্ধুরে আনি দিমু রেবা, মন খারাপ করিও না । বন্ধু বড় প্রাণর ধন জানি, ছাড়াছাড়ি
অইও না ।

--- আনি দিবায় নি কাকা । হে কিরতিবাসী রামায়ণ পড়ত চাইছিল, দিতাম পারলাম না ।

--- দিবায় নে তে, সময় কুনু যার গিনি । খামকা কান্দিয়া ভরাইরায় কেনে ।

বন্ধু বিরহে হাউহাউ করে কাঁদে যামিনী । বৈতল টোলের পডুয়া কিশোর পণ্ডিতকে সাঙ্ঘনা
দেয় । বলে,

--- বুঝি রেবা বুঝি । আমারও আছিল এক বন্ধু ।

--- তুমার বন্ধুরে হক্কলেউ চিনে ।

--- কার কথা কইরায় বা । তুমি কেমনে জানলায় ।

--- কেনে দুখু চাচারে সবে চিনে ।

--- ও । ইতা বাদ দেও । আমার বন্ধু আছিল বইয়াখাউরিত, ছাতক পরগণা, সুনামগঞ্জ
মহকুমা জিলা ছিলট অখন পাকিস্তান । হে নাই । আমি কান্দি না । আমার আছিল পক্ষীরাজ
নাই । আমার রিক্সা আছিল আমার পুয়া আমি কান্দি না ।

উপন্যাস

উনচল্লিশ

বৈতলের এখন সব শূন্য । আর নেই, বৌ-এর রোজগারে খাওয়া । জমিদারবাড়ির ঝি-
গিরি করে দুর্গাবতী । মন্দিরের লেপাপুছা করতে হয় না সত্যি জমিদার বাড়ির রান্নাঘর, চন্দ্রধর
রাজকুমারের দেখাশোনার কাজে অনেক সময় বেরিয়ে যায় । রাত বিরেতেও ডাক পড়ে
দুর্গাবতীর । দুর্গার রোজগারও বাড়ে । কাপড়চোপড় হয় পূজা পরবে, মেয়ে মণির স্কুলের
খর্চা, কাপড়, জামা এমন কি সোনার গয়নাও দেয় যমুনাপ্রসাদ । কর্মহীন বৈতল দুর্গাবতীর
খাটাখাটুনি দেখে ঝিম মেরে বসে থাকে । কানা মনুর দোকান থেকে গাঁজা কিনে এনে একা
একা টানে চিলিম । দুখুর সঙ্গে কথা বলে না, আপদ বহুই এর সঙ্গে দেখা হয় মামুর মোকামে
। জমিদারবাড়িতেও নতুন উপসর্গ দেখা দেয় । জমিদার আবার নতুন রূপ নিয়ে হাজির হয়
বৈতলের কাছে । আবার যেন সেই কৃতজ্ঞ জমিদার যম সিংহ ।

বলে,

--- আমি আর পারিয়ার না রেবা একলা । আবার লাগি যাও । ইলেকশন আর, তুমি থাকলে আমার ডাইন হাতের লাগি চিন্তা নাই । বাড়ে যাওন লাগত নায়, বাসাতঅউ অফিস থাকব ।
তুমারে ডরাইব ভলান্টিয়ার হকলে । কনট্রল করবার ।

বৈতল হাসে । বলে,

--- উঁ ।

খুশি মনে চলে যায় জমিদার নেতা । পরদিন আবার আসে । বলে,

--- কিতা ভাবলায় উঝা ?

--- ভাবছি ।

--- আমিও ভাবছি, তুমার তিলোত্তমা নামে মেহেরপুরো কিছু জমিন লেখিয়া দিতাম ।

বৈতল এবারও উম দেওয়ার মতো অস্ফুট শব্দ করে । বলে,

--- উঁ ।

বিভ্রান্ত জমিদার চলে যায় । চলে যেতেই বৈতল রাগে । রেগে ডাকে দুর্গাবতীকে । বলে,

--- পকুড়া বানাইবে নি ।

--- সকালে পকুড়া দিয়া কিতা অইত ।

--- খাইতাম । মালর লগে খাইতাম, আর কিতা ।

--- কিতা অইছে তুমার । গাইঞ্জা খাইবায় হিতাও খাইরায় । মরবায় নু ।

--- মরলে তোর কিতা । তর তো ভালাউ । থাকবে বেটি জমিদারনি অইয়া ।

এবার দুর্গাবতী দেয় উম । বলে,

--- উঁ ।

--- উঁ কিতা । আমি মরলে বান্দি বানাই রাখব । হে কিতা ভাবছে । পুড়ি কার, ক তুই । তুই
ত মা ।

--- কিতা হইছে । কে কিতা কইছে তুমার পুড়িরে ।

--- হালার হালায় কয় ডাইন হাত বানাইত, কয় পুড়িরে জমিন লেখি দিত । রিক্সা নাই এর
লাগি বৈতল কিতা মরি গেছে নি ।

--- তুমি আবার রিক্সা বানাইবায়, আমি পয়সা জমাইয়ার ।

--- আমি আর রিক্সা চলাইতাম নায়, তুমার খুব দুঃখ, রিক্সাআলার বউ, নানি । আমি এখন
খালি গান গাইমু । পুথি পড়মু গাইমু, শিখাইমু ।

--- হারাদিন গুরমি নাচ নি । এর থাকি তো রিক্সা চালানি বাল।

--- আর গুরমি নাচতাম নায় । তুই যেতা অপছন্দ করছ কিচছু করতাম নায় ।

--- আকতা ।

--- আকতা নায় । ইখান ছাড়ি দিতাম । ইখানো থাকলে কুনদিন রিশ উঠি যাইব আর হিগুরে
মারি লাইমু । আর মানুষ মারতাম নায় আমি । আর ভুল করতাম নায় ।

--- কিতা ভুল ।

--- কিচছু নায় । পকুরা বনাইতে নানি ।

--- বানাইমু, এখন নায় । আগে কও ভুলর কথা । আবার কেউরে কিচছু করছইন, না
করতায়।

--- না রে বেটি । ছুটবেলা ত এক পুড়ির কান টানছিলাম । মাকড়ি লইয়া ভাগছিলাম ।

--- ইতো কইছ ।

--- তাই আমারে চাকর কইছিল । আমি জানছ নি, কেউর লগে লাগি না, আমার লগে খামকা
লাগলে আমি অই যাই মাছুয়া আলদ ।

--- আমি যে লাগি, আমারে তো বিষ ঝাড় না ।

--- না পারি না ।

বৈতল দুর্গার হাত ধরে মুঠো করে । বলে,

--- তর লগে পারতাম নায । তুই আমার দাউদর খাউজ । খাউজাইতে খাউজাইতে পানি বার
অইব, রক্ত বার অইব তেও তো ছাড়তাম নায । ইখানো থাকলে পাগল অই যাইমু । এর লাগি
কই, চল যাই গি ।

--- কই যাইতায় ।

--- নতুন জাগাত । সবুজবরণ গাউত তুমার একমামা আছইন নানি ।

--- মামা নি । মামা ডাকি । পিয়াইনড় পারো আখড়া আছিল । আমারে আদর করতা, মাই
ডাকতা । কইতা দুর্গা মাইকি জয় । পাকিস্তান হওয়ার পরে হারাই গেলা । অউ তুমি অউত্ত
লইয়া আইলায় কেম্পো । মামায় কইলা, যাইবা গি, একটা টিলা পাইছইন সবুজবরণো ।
কইলা আখড়া করবা মহাপ্রভুর ।

--- অউত্ত অইছে গো মাই । চল যাই গিয়া । বৈষ্ণব অইলেউ মানুষ ভালা অইন । দয়া মায়া
থাকে ।

--- হিতো বুঝলাম । তুমি আবার হিনো গিয়া তাকত দেখাইও না ।

--- ইতা কিতা কও । আমার আর কিওর তাকত । ডুলতে ডুলতে সব শেষ । আমি যতউ
করি চতুরাতি আমার কপালো হউ এক রতি । হউ হরে কৃষ্ণ হরে রাম । ইবার আর কিচ্ছুত
থাকতাম নায । যে কুণু কিরা ।

--- অয় তুমি অলাখান বেটা আর কিতা ? তুমারে চিনি নানি ।

--- অউ তুমারে ছইয়া কইয়ার, কিচ্ছুত থাকতাম নায । মাঝে মাঝে অউ ছুটো হাওরো যাইমু,
মাছ মারমু তোমার লাগি ।

--- ছুটো হাওর পাইলায় কই ।

--- কেনে চাতলা । ইতা হাওর নি । ইখানো এক কুয়া হিখানো এককুয়া । এর থাকি ভালা হউ রায় বাড়ির দিঘী ।

--- দিঘী পাইলায় নি ।

--- আছে, আইরংমারাত মস্ত বড় পুকইর ।

--- তুমি কেমনে জানো ।

--- আমি গেছি নানি ।

--- তুমি কিছু লুকাইরায় আমারে ।

--- কিতা লুকাইতাম ।

--- তখন কইলায় ভুল করছ, অখন কইরায় গেছ আইরংমারাত । আমি যাইতাম নায় যাও ।

--- যাইতায় না কিতা বেটি । হুঙ্কা যেবায় যায়, চিলিমও হবায় যাইব । আর আমি তরে কিতা লুকাইতাম । আমি সুজা মানুষ আমার লগে কেউ বেইমানি করলে আমি ছাড়ি না । লুলারে মারলাম তর লগে বেইমানি করল এর লাগি ।

--- না ।

--- তে কিতা ।

--- আমি জানি তুমি ইতা মান না । হিন্দু-মুসলমান । হে মুসলমান অই গেছিল এর লাগি মারছ ।

--- হে ত মুসলমান অউ ।

--- অউত্ত কথা । তুমি কিতা আর কেউরে মারছ নি ।

--- না ! কে কইছে তরে ।

--- কেউ কইছে না, কিন্তু জমিদারর লগে লাগিও না ।

--- কেনে তারে আমি ডরাইনি । বৈতলের ভয়ডর নাই । আর আমি কেনে মারতাম ? আলদ
দিয়াউ যখন মারছি না, ইগু এমনেউ মরা ।

বৈতল কোথাও ঝামেলা পাকায় না । ঝামেলা ওকে ডাকলে সে দূরে থাকে না । ওকে
মেরে ফেলার জন্য কেউ চক্রান্ত করলে সে কেন মানবে । সে কেন পালাবে । বৈতল কার্য
সমাধা না করে কোথাও থেকে নড়ে না । তাই দুর্গাবতীর কথা রাখতে আবার সে যায়
সবুজবরণ, যায় আইরংমারা, যায় জালেঙ্গা । সবুজবরণ গ্রামে সে খুঁজে পায় বিপ্রদাস বাবাজিকে
। দুর্গাবতীর মামা । এবার আর শ্রাবণ মাসে সে থাকবে না হরিৎবরণ । তার আগেই চলে
যাবে নতুন ঠিকানায় । আইরংমারায় রায়বাড়িতে বিষহরি পূজা হয় মহা ধুমধাম । বৈতল
ওয়ার নাম শুনেছেন শান্তিরানী রায়, রায় বাড়ির গৃহিণী, সতীশ চন্দ্র রায়ের স্ত্রী । তাঁর সাথে
কথা হয়ে গেছে, সারা মাস ধরে পুঁথি পড়বে বৈতল, নাচবে আইর গানের তালে তালে এমনি
নাচ । গুরমির পোষাক গায়ে চড়াবে না । চাতলার পারে নব বসতি হয়েছে কৈবর্তদের ।
শ্রাবণের মহাধুমধামে বৈতল ওখানেও পুরোহিত । বৈতল যায় বাঁশকান্দি । যামিনী পণ্ডিতের
বন্ধু কুতুবউদ্দিনের হাতে দেয় বিদ্যার্জনের মাশুল নগদ পাঁচশ টাকা ।

সব ঠিকঠাক করে ফিরতেই পুলিশের টানাটানি শুরু হয় । হরিৎবরণ ইটখোলা
ঘনিয়ালা ঘিরে হয় তোলপাড় । দুখু মিয়াকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, ছেড়েও দিয়েছে । বহুই
আপদ পালিয়েছে শহর ছেড়ে । বৈতল জানে সব বাট্টা ইমামের বুদ্ধি । দুখুর সঙ্গে কথা হয়েছে
বৈতলের । কিন্তু বন্ধুত্বের দেখা নয়, কেমন শীতল কেমন দূরত্বের । জমিদার যমুনা প্রসাদ
নিখোঁজ হওয়া নিয়েও কোনও কথাই হয় না । দুখু ভাবে, বৈতল তো একবার বলতে পারে
কিছু, ওর সঙ্গে লাগালাগি করতে পারে, দোষারোপ করতে পারে তার উপর । বলতে পারে
জমিদার হারিয়ে যাওয়ার তার হাত আছে । বৈতল কেন অন্য মানুষ হয়ে যায়, বৈতল ভেবে
কুল পায় না । সবাই যখন বৈতলের দিকে ইশারার আঙুল তুলেছে তখন দুখু কিছু বলবে না ।
বৈতলের দিকে পুলিশের সন্দেহের কারণও যথেষ্ট । বৈতল যে কোথা থেকে এসেছে কেউ
জানে না, হিন্দু না মুসলমান জানে না । কেউ বলে সে পাটনি কেউ বলে ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণ হয়ে
রিক্সা চালায়, জাল দিয়ে মাছ ধরে মানুষের পুকুরে । কালো রঙের ক্ষীণকায় মানুষটার এমন
সুন্দরী গৌরবর্ণা স্ত্রী কন্যা দেখেও সন্দেহ ঘনীভূত হয় । তার উপর একই সময় বৈতল শহর
থেকে উধাও হয় । পুলিশ বৈতলের কথামতো খবর নেয় সবুজবরণ আখড়ায়, আইরংমারার

রায়বাড়িতে । চাতলার কৈবর্তপাড়ায় । বৈতল বলে না বাঁশকান্দির কথা । কুতুবের পড়াশুনার খরচ বাবদ পাঁচশ টাকা দেওয়ার কথা । জমিদার উধাও হলে ভাবা যায় কোথাও বেড়াতে গেছে, ফিরে আসবে ফুর্তি-ফার্তা করে । বড়লোকরা যেমন করে । কাছাকাছির বাগানে যায়, দিন দুয়েক থেকে আসে, শিকারে যায় ডার্বি ভুবনডর সরসপুর বড়জালেঙ্গা । কিন্তু জমিদারের সঙ্গে যে উধাও হয়েছে জমিদার বাড়ির প্রভূত ধনসম্পত্তি । দুঃসাহসিক ডাকাতি । সিন্দুক ভেঙে টাকাকড়ি, সোনাদানা উধাও । বাড়ির মন্দিরের প্রাচীন মনসাপট, প্রতিমার সোনার গয়না সব লোপাট । বাড়ির দিঘীর জল তোলপাড় করে পুলিশের ভাড়া করা ডুবুরি । নসিবালি হাকিমের পুকুরেও পড়ে ডুবুরি, কিছু সোনা রূপার বাক্স পাওয়া যায়, সব সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির গয়না । জমিদার গিল্লীর চেনা গয়না নয় । গুজব রটে দেওলা টেনে নিয়েছে ধনরত্ন আর জমিদারকে ।

যুবক জমিদারের কৃষ্ণ বর্ণ স্ত্রী পুলিশকে বলে তার স্বামী ফিরিয়ে দিতে, সোনাদানা ফিরিয়ে দিতে । ছোটখাটো অপরাধের শহরে পুলিশ পড়ে মহা ফাঁপরে । পুলিশ বলে কেউ যাবে না বাড়ি ছেড়ে । বৈতল ফিরতে বৈতলের উপরও জারি হয় ফরমান । বৈতল বলে,
--- কেনে না খাইয়া মরতামনি । কে খাওয়াইব ।

পুলিশ বলে,

--- জমিদারনিয়ে খাওয়াইবো ।

জমিদার গৃহিণী বলে,

--- রাজার ধন বেনালে যাইত নি । ডাকাইত ধরি দিলে খাওয়াইমু ।

পুলিশের কুকুর লাকি আসে কলকাতা থেকে । ঘেউ ঘেউ করে এদিক ওদিক ঘুরে কাউকে ধরতে পারে না । এরোপ্লেন চড়ে চলেও যায় একদিন । পুলিশ বৈতলের পরিবারকেও ছেড়ে দেয় নজরবন্দী থেকে । না ছেড়ে উপায় নেই । শহরের একমাত্র থানাও যে জলের তলায় । ভেসে আছে একমাত্র টিকরবস্তির টিলা বাকি সব থইথই জল । আর ভেসে আছে এক বিশাল সাপের শরীর, বরাক নদীর পেঁচানো বাঁধ । নদীর বাঁক যেখানে ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতির । বাঁধের উপর মানুষের অস্থায়ী ঠিকানা ।

বৈতল এর মধ্যেই বাঁধের ডাক শুনতে পায় । বৈতলের মনে বোঝাপড়ার হিসেবের খাতা । গুটিগুটি পায়ে বৈতল এগোয় বাঁধের পথে । রিক্ত মানুষ বৈতলের পা পড়ে না । সবহারানো মানুষ বৈতল জালাল পিরের মোকামের দরজায় মাথা নুইয়ে দাঁড়ায় । বৈতলের চোখের জল দেখেনি কেউ । গভীর দুঃখে বৈতলের চোখে তখন ক্রোধ । দুখুর উপর ক্রোধ না অভিমান কে জানে ।

উপন্যাস

চল্লিশ

পিরের পিরাকি শেষ হয়েছে কদিন আগে । বৈতল তখন সবুজবরণে, কিছুই জানে না । দুখুর নিষ্ঠুরতায় বৈতল মর্মাহত হয়, এই কি সেই দুখু । তার প্রাণের বন্ধু দুখু যে সোনামনির পা ভাঙার খবর শুনে দৌড়েছে হাসপাতাল । মামুকে রিক্সা থেকে নামিয়ে নিয়ে গেছে রিক্সা । সেই দুখু এত বড় দুঃখের সময় বৈতলকে জানায় না কিছু । চারবন্ধুর পিতৃদায়ে বৈতলকে ওরা আলাদা রাখে । কেন, বৈতল বিধর্মী বলে । হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরিব মানুষের ত্রাতা ছিলেন বিশালদেহী মানুষ । কোনও শিক্ষিত ধর্ম মানুষকে তার কাছে দেখা যায় নি জীবৎকালে । এন্তেকালের পর নাকি ঘনিয়ালা বস্তিতে তাঁর কবরের সামনে ঢল নেমেছিল মানুষের । মুসলমানরা কাপড় বা টুপি মাথায় শ্রদ্ধা জানিয়েছে । হিন্দু চাষি-শ্রমিকজনেরা

চোখের জলে করজোড়ে দাঁড়িয়েছে । বৈতলের মনে এক প্রশ্ন, মামুকে কোনও এক ধর্মের মানুষ করে রাখা কি ঠিক । বোবা মানুষের কি ধর্ম হয় । মামু তো ধর্মাচরণ করেনি জীবনে, নমাজ পড়েনি তেমন করে । দুখু মামুর মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করেছে । মামু ও দুখুর একটা মনের মিল রয়েছে । দুখু ভুল কথা বললে মামু দুখুকে ধরে মারে । আসলে মামুর শরীরটা যে অনেক বড় । সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা তাই মানুষ সম্ভ্রমের সম্মান দেয় । মানুষ নিজের মতো কাউকেই আলাদা করে দেখে না । গুরু সৃষ্টিধর এসব নিয়ে শিখিয়েছেন অনেক তত্ত্ব । বলেছেন,

--- গণেশ ঠাকুরেরে মাইনষে সিদ্ধিদাতা কয়, আলাদা সম্মান দেয় । কারণ তান মাঝে আলাদা হওয়ার কিছু আছে, মাইনষের মতো আবার মানুষ না, হাতির গুড় মুখো, তেউ আবার বাইচা হাতি, পেটটাও মোটা ধুম্বামারা আদর করার মতো । বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখছনি, কী সুন্দর । কেনে কও চাইন । তান নাকটা কী সুন্দর, কয় তিল ফুলের লাখান, ইরকম মাইনষের হয় না । কান অত সুন্দর লম্বা, কয় লকারান্ত । দুর্গার মুখ অত মুকুটমাটুক দিয়া সাজাইল, আমরারে রোজ দেখিয়াও মনো করতায় পারবায় নি । কইতায় পারবায় নি সিস্টিছাড়া মিস্ত্রির মুখ কীলাখান ।

এত বড় মাপের মানুষ রইদপুয়ানির গুরুদেব বৈতলের । নিজেকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছল্য করতে পারেন অবলীলায় । বলেন,

--- ঘাস থাকে পাওর নিচে, ঘাসের লাখান নীচা থাকলেউ সুখ রেবা । আমার কথা নায় রেবা, ইতা কই গেছইন তাঁরা ।

বলে আকাশের দিকে প্রণাম জানিয়েছেন গুরু । রাগের মানুষ বৈতলকে ধৈর্য শিখিয়েছেন তিনি । বৈতল শেষ রক্ষা করতে পারেনি । গুরুবাক্য অমান্য করে লুলাকে শাস্তি দিয়েছে । মামুপিরকেও অমান্য করেছে বৈতল । আরো কী সব সাংঘাতিক ঘটে গেছে তার হাতে । বৈতল এবারও শপথ নেয় মনে মনে । বলে,

--- অউশেষ । আর ভুল অইত নায় । তুমি বাঁচি থাকলে কুনু আমি ইতা করলাম নে নি ।

মামুমুখের শিশুর সারল্য-ভরা হাসি ভুলতে পারে না বৈতল । সব কিছু বুঝতে পারে মামু । মনের ভিতর ঢুকে মন পড়তে পারে । সমবেদনা জানাতে পারে দুঃখে, আনন্দে খুশি

হতে পারে, ফুটি করার একটা মনও আছে মামুর তরতাজা । বৈতলের মেয়ে মনিকে নিয়ে গেলেই আনন্দবাজার ! কী খুশি কী খুশি । বৈতলের মনেও এক প্রশান্তি কাজ করে । মামু চলে যেতেই আবার সুরমা গাঙের উথালিপাথালি । নীল নীল কালচে রঙের জাজালি কবুতর উড়া দিতে চায় । বইয়াখাউরির হাওরের পাখি কিচির মিচির করে ডাকে বৈতলকে, ডাকে মিরতিঙ্গার পাহাড়ের পক্ষীকুল, তার নিজস্ব বানরসেনা । ভাটির টান সুনামগঞ্জ পর্যন্ত নিয়ে যায় বৈতল দাস কৈবর্তকে । মাকে মনে পড়ে বার বার, মিরতিঙ্গার পাহাড়ে তার পাটপাথর দেখে মায়ের হাসি এখনও ভুলতে পারে না বৈতল । ভুলতে পারে না তৃণাদপি সুনীচেন মহীৰুহ তার গুরু সৃষ্টিধর ছুতোরকে । পিয়াইনের জলে সমর্পণ করা বাল্যবন্ধু প্রাণসখা লুলাকেও মনে পড়ে । লুলা যে বৈতলের সব ভাল মন্দের সাথি । লুলা তার মায়ের শেষকৃত্য করেছে, লুলার কাছে অনেক ঋণ রয়েছে বৈতলের । বৈতলের খর চোখে এক ফোটা জলকণাও চিকচিক করে না । সব প্রিয়জন একে একে বৈতলকে ছেড়ে যায় । অবুঝ না বুঝে দূরে সরিয়ে দেয় অনেককে । বৈতল সরাতে পারে না একজনকে, বৈতল জীবনের দুর্গাপ্রতিমা দুর্গাবতীকে এক মুহূর্তের জন্যও সরাতে পারে না । বৈতল জানে না দুর্গা সতী না অসতী । বৈতল জানে দুর্গাবতী তার জীবনের ধ্রুবতারা এখন । বৈতল বোঝে দুর্গা তার কাছ থেকে আরো বেশি করে চায় কিছু । শরীরে সুখ চায় আরো । বৈতল তো তাকে নিংড়েই দেয় । তবু দুর্গাবতী লম্পট জমিদারের দীর্ঘ দেহে ফিরে ফিরে চায় ।

বৈতলের নতুন বসতে আর টান নেই । তাই এবার আবার ভেসে যাওয়া । বৈতল ওঝার মামু নেই, পিরের আশীর্বাদ উঠে গেছে মাথা থেকে, তার মেয়ে মনিকে আদর করার পিরদাদু আর নেই । বৈতলের রিক্সা নেই, ভালই হয়েছে, যা হয় ভালোই হয় । এখন পক্ষীরাজ থাকলেও কি যে চালাবে আর । মামুকে না চড়ালে তার সাইত ই হয় না, ‘বনি’ হয় না ।

ঘরসংসার নিয়েও বৈতলের কোনও ধারণা নেই । মেহেরপুর ক্যাম্পের জীবনে অনেক আতান্তর দেখেছে । প্রায়ই বৈতলের মন বিবাগী হয়ে গেছে । কতবার চলে গেছে কাটিগড়া দামচড়া সোনাপুর কাকাবাবুর সঙ্গী হয়ে, দুর্গাবতীকে একা ফেলে রেখে । ব্রাহ্মণকন্যা দুর্গাবতীকে কিছুতেই স্ত্রীরূপে মানতে পারে নি যে । এখানে পিরের সান্নিধ্যে এসে কী যে হয়ে যায়, বৈতলের মন থেকে অশান্তি দূর হয়, গেরস্থ হয়ে যায় । মনথারাপ যে একেবারে হয়নি

তাও নয়, মনখারাপ কাটাতে গেছে মধুবার কাছ, দেশি মদ আর মামলেট খেয়ে কিছু গালাগালি দিয়ে মন ঠিক রেখেছে। নদীঝাঁপ শুকনো নেশার মৌতাত শুকনো মনকে বেভুল করে দিয়েছে। দুখু বছরই আপদের মতো বন্ধুদের জন্যই বৈতল পেয়েছে। নইলে কখন সব ছেড়ে ছুড়ে নতুন আকাশের খোঁজে বেরিয়ে যেত। মামুপির তাকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা শিখিয়েছে। বৈতল সব ঢেলে দিয়েছে দুর্গাবতীর আঁচলে।

বৈতল মানুষকে ভালবেসে ধর্ম পাল্টাতে চেয়েছে। মুসলমান হতে চেয়েছে। জমিদার যমুনাপ্রসাদ চেয়েছে ধর্মীয় বাহিনি গড়তে। প্রথম দিকে হিন্দুমহাসভা। তার পর ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মহীন রাজনীতির নামে সবাইকে তোষণ এবং বিভাজন। বৈতলকে নিয়েও মামুর ভক্তদের মধ্যে বিভাজন। বোবা মানুষেরও শত্রু আছে। শত্রুরা শাসিয়ে যায়। বলে,

--- পিরাকি করছ কর। নিজের মজহব, বেরাদরির মাঝে কর।

মামু বৈতলকে ছাড়েনি। দুখুও শুনিye দিয়েছে কড়া কথা। মামুর পাশে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দুখুর উপর আক্রমণ হয়েছে। পরোক্ষে মামুর উপরেই তো আঘাত। পাহাড়ের কি আর একটি-দুটি বাঘ শেয়ালের আছড়ে কোনও ক্ষতি হয়। সেই সব বিরুদ্ধবাদী মানুষরাই এখন কমিটি করেছে, মাজার গড়বে পিরের নামে। অলৌকিকত্ব খুঁজছে মামুর। মামু অলৌকিক কিছু করেনি। কাউকে ধনীও করেনি। মনের ধনে ধনী হয়ে মানুষকে সাহস যুগিয়েছে সরলমতি মহামানুষ।

দুর্বিনীত জমিদার আর তার সুন্দরী স্ত্রী দুর্গাবতীকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই বৈতলের। বৈতল চেনে তার বৌ দুর্গাকে। বৈতল যেমন দুর্গাও তেমন। এক ধাতুতে গড়া। জমিদার চাইলেই দুর্গাবতীকে অধিকার করবে এমন ক্ষমতাবান নয় ভূস্বামী। দুর্গাবতী তার মর্জির মালিক। তাই দুর্গাবতী যা চেয়েছে তো -ই করেছে। জমিদারবাড়িতে ক্ষমতার এক সমান্তরাল কেন্দ্র তৈরি করেছে। কিন্তু বৈতল জমিদারকে মানেনি। দুর্গাবতীকে নিজের কাছে ফিরে পাওয়ার নিরাপদ উপায়টাই বেছে নেয়। বৈতল ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সব শুনে দুর্গাবতী হাসে। বলে,

--- জানি।

--- কিতা জানছ।

--- কেনে তুমি ধর্ম বদলাইতায় ।

--- কেনে ।

--- তুমি হারি গেছ ।

--- না, তুই জানছ না ।

--- তুমি যেতা চাও আমিও চাই । এক বেটায় দুষ করেছে এর লাগি মাটিত ভাত খাইতাম নি ।

--- দেখো গো মাই, তুমার আদরর যম ঠাকুররে আমি ডরাই না । বৈতল কেউরে চুকে না ।
তারে যেতা করার আমি করমু । হিন্দু থাকলেও করমু বাঙাল অইলেও করমু ।

--- কিতা করবায় ?

--- তার ইও ছেচিয়া পানিত গাড়ি দিমু, তেউ শান্তি ।

--- তে আর ফজলু মিয়া অইতায় চাও কেনে ।

--- ডরে নায় রে বেটি ভালবাসায় । বেগুমার প্যার । মামুর কিতা দেখচছ তুই । দেখছি আমি
আর দেখছে তর পুড়িয়ে । মানুষটার শরিল থাকি লুকা বারয়, লুকার আগুনে দুনিয়ার সব
বাদবাদুয়া পুড়িয়া থাক অই যায় । তুই পারতে নায় বাদ কাম করতে ।

--- তাইন তুমারে জাদু করছইন ।

--- তুই করচছ নানি বেটি । পানির পুক বৈতলের মাইনষর জঙ্গলো ছাড়ি দিচছ । বিলাই
কুত্তার লাখান খাকরাখাকরি করার লাগি ।

--- আমি জাদু জানলে স্বর্গপুরি বানাইলামনে । ইতা দুখু পুখু বানাইলাম নানে ।

--- পিরাকি জাদু নায়রে বেটি পিরাকি প্যার ভালবাসা । মামুর কুনু ধর্ম নাই । তাইন ত
ভগবান ।

--- মুসলমানর ভগবান নাই । আল্লা আছইন, খোদা আছইন ।

--- অউ এক অউ কথারে বিবি । তুই যখন দুর্গাবতী থাকি দুরজন বিবি অইবে তখন আপনে
আপ সব বদলি যাইব । ভগবান অই যাইবা আল্লা । নতুন মানুষ অই যাইবে বুরখা উরখা
লাগাইয়া । একদম মুখ ঢাকি রাখবে । কুণু হালায় যেন দেখত না পারে মুখ ।

--- আর তাইন যদি দেখইন । কিতা অইব মামুয়ে দেখলে । পাপ লাগত নায় নি ।

--- পাপ নায়, গুণা । মামু আর মানুষ এক অইল নি । দেখবে তাইন তর পুড়িরে কী মায়া
করইন । দুই বাইচার লাখান খেইড়ো বই যাইন চান্দু আর মনির লাখান লাগে । অলা
মায়াধারী । আর কেউ আছে নি তাইর আপনা ।

--- আছে আছে । তাইরে ভালা পাওয়ার আছইন । দেখ না নি তুমি । দিনে একবার দেখলে
কিলাখান পাগল অই যাইন ।

--- ইতা স্বার্থর লাগি । আর বাড়ির বিলাই বাইচারেও মাইনষে ভালা পায় । বাইচার লাগি
নায়, বাইচার লাগি নায় । মায়ে নু ইন্দুরর গাতো থাবা দেয় । তরে হাতো রাখার লাগি ইতা
করে ।

মামুর মাজারের সামনে গিয়ে বিহ্বল হয়ে যায় বৈতল । কোথায় সেই শন বাঁশের
মোকাম । মাটিজুরির ঠিকাদার একদিক পাকা করে দিয়েছে ইট সিমেন্ট দিয়ে । মামু থাকে নি,
পির তার মাটির ঘরের মাটিতেই শুয়েছে । কিন্তু এখন যা হচ্ছে সে তো একেবারে এলাহি
কারবার । অনেক বড় বড় পৃষ্ঠপোষক হয়েছে মামুর । কবরের সামনে নতজানু হয়ে বসে
বৈতল । হাউ হাউ করে কাঁদবে বলে চেষ্টা করে । বৈতল পারে না । বৈতলকে কেউ
কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি । কবরের উপর কী সুন্দর লাল শালু চড়িয়ে দিয়েছে দুখু । মামুর
সব ব্যবহৃত জিনিষের উত্তরাধিকারী এখন দুখু । পিরের এন্তেকাল হওয়ার অনেকদিন পর দুখু
আবার সবাইকে ডাকে । আপদ বছইর সঙ্গে বৈতলকেও ডাকে । বলে,

--- আয় আমরা হক্কেল মিলিয়া একবার কান্দি ।

বৈতল ছাড়া ওরা সবাই কাঁদে । দুখু বৈতলকে নিয়ে যায় মামুর মাটির ঘরে । ওঘরে
এখনও নির্মাণ-কার্যে হাত পড়েনি ।

দুখু বৈতলের কোমরে হাত দিয়ে বলে,

--- আনচ্ছনি ।

--- কিতা আনতাম ।

--- এরে, যন্তর মন্তর আনচ্ছনা নি ঠিক অউ ।

--- কিতা কছবে ।

--- কেনে । কটা, চিলিম, তেনা, পাথর, শলই আর ঘাসপাতা ।

তিন নেশাডু পুরনো দিনের বিস্ময়ে তাকায় দুখুর মুখে । দুখুর মাথায় যে কখন কী বুদ্ধি খেলে কেউ বুঝতে পারে না । কিন্তু তিনজনেই এখন দুহাতে খাবড়ায় যার যার মুখে । বলে,

--- তবা তবা ।

দুখু দুঃখের হাসি হাসে । বলে,

--- তবা কিতা বে । গুনার ডর ডরাইরে । মামুয়ে তো সব জানতা । মামুরে লুকাইয়া খাইচ্ছনি কুন্‌দিন । তে ।

--- তে আবার কিতা । লুকাইছিলা কিন্তু তান সামনেও খাইছিলা ।

--- ইখানো কুন্‌ অখন আছইন নি তাইন । তাইন বারো, মাজারো । খাইলা রেবা, খাইলা । একদিন দেখিলাই আবার আমরার মিলাপ । এর পরে তো শকুন পড়ব । আমারেও খেদাই দিব । মামুর জিনিষ উনিশ যেতা আছে, নিতে নি কিছু ।

--- কিতা নিতে ।

বৈতল বলে,

--- নিমু ।

বছই বলে,

--- নিমু ।

দুখু বলে,

--- কিতা নিবে ।

বৈতল প্রথম দাবি উত্থাপন করে । প্রথম ওয়ারিশান । বলে,

--- মামুর গার এক টুকরা তেনা দিবে নি । পিরর গার গন্ধ লইয়া বাচমু সারা জীবন ।

দুখু মামুর ব্যবহৃত ছেড়া লুঙি একটা দেয় দুখুকে । বলে,

--- নে হালার হালা, তোর নানিহালি সম্পত্তি ।

দুখুর গলা ভারি হয়ে আসে ঠাটার সঙ্গে । আবার বলে,

--- আমার কথা রাখবে নি একটা ।

--- ক, কছ না ।

--- তুইন যা গি টাউন ছাড়িয়া । আর কুন্সুদিন আইছনা ।

--- কেনে । তর ডরে নি ।

--- না রে, আমারে ডরাইছ না আমি আর কিণ্ড ।

--- একবার পারচছ না মারতে আর পারতে নায় । বৈতলরে মারা যাইত নায় । বৈতল মহাবীর ।

--- অই পুঞ্জির ভাই । আমি পানিত না ফালাইলে অউ ফাল ফালাইতে পারলে নে নি অখন ?

--- লগে লগে তো বুঝছিনা । গুসা অইছিল খুব । পাইলে মারি লাইলামনে তরে ।

--- মেড়া ।

--- মেড়া নায় । তুই যদি দুস্তি নিভাইলে, তে কেনে টানি লইগেলে বান্দো ।

--- কইতাম নি হাচা কথা । তরে না লইয়া গেলে ইটখলার হিন্দু হকলে তরে শেষ করি দিল নে । হরিৎবরণো মারিয়া ঘনিয়ালাত ফালানি অইল নে ।

--- তরে কে কইল ।

--- আমি অখন বলদ পাটিত কাম করি নানি ।

--- ও হালার হালা । যমে করাইছে ।

--- ইতা আমি জানি না । তে তর দুশমন কিন্তু কুনু মুসলমান নায় । এর লাগি কইয়ার ভাগ ।

হাতে ধরা আধোয়া নোংরা লুঙির স্বর্গীয় সুবাস প্রাণভরে উপভোগ করে বৈতল । গন্ধের সঙ্গে কথা কয় বৈতল । বলে,

--- মামু, আমারে ভালা থাকতে দেও । বৌ-বাইচা নিয়া আমি সুখে থাকতাম । আমার দোস্তু তিনটারে ছাড়িয়া আমি কই যাইতাম । কই দেও ।

উপন্যাস

একচল্লিশ

বরাকনদীর তৃষ্ণা অপরিসীম । পাহাড় থেকে জল নামে । নামতেই থাকে অবিরত ।
নামে বাঁশ, মুলি আর ডলু । নামে আনারস । নামে আদা, রগুনীযোগ্য সব বাণিজ্য পসরা ।
চৈত্র বৈশাখের বর্ষা এখানে ফাউ পাওনা । জ্যৈষ্ঠমাসে একটু রোদ, কাঠফাটার মাস ।
আষাঢ় থেকে গুরু ঝামঝামঝাম । ভরে যায় খাল বিল হাওর । বাঁধের উপর নিরাপদ অবস্থান
থেকে নিমজ্জিত বাড়ির টুল্লি দেখে এখনও বৈতলের মনে হয় ত্রাণের কথা । বড়লোকের
বাড়িতে ডাকাতি করার বাসনা জাগে । লুলা নেই তো কী হয়েছে, দুখু আছে আপদ আছে বহুই
আছে । আছে আরো অনেক না দেখা সহায়ক । সদিচ্ছার অসহায় মন নিয়ে বৈতল বাড়ি
ফেরে । হরিৎবরণ জমিদার বাড়ির পুকুরও জলে টইটুম্বর । পেছনের রাস্তা দিয়ে

কানে হেঁটে যাচ্ছে কৈ মাছের ঝাঁক । কোথায় যাবে কে জানে । বৈতল বাড়ির থেকে
ঝাঁকা নিয়ে এসে মাছ ধরে । দুর্গাবতীও সঙ্গ দেয় । বৈতল দুর্গাকে বলে,

--- ছালি আছে নি পাখালো । দেখ কত বড় বড় কৈ । তোর হি বেটার বাড়িত দেখলাম,
দেখলাম হিদিন হিঙর বড়ি হুকার ।

--- আমি অউ দিছি ।

--- তুই দিচছ । তুই একলা বাটচছ অত কালাইর ডাইল ।

--- তান আর চান্দুর খুব পছন্দনু ।

--- তান কিতা রে । হে কিতা তর হাই নি । আমার লাগি দিতে পারছ না । পারছ না পাড়তে
কুটুস কুটুস আঙ্গুল দিয়া । লইয়া আয় যা এক মুইঠ ।

--- পারতাম নায় । বর্ষার বড়ির উপরে হক্কলর নজর কমি গেলে ধরি লাইব ।

--- অ তুই তো আবার সতী । না কইয়া আনতে নায় । ঠিক আছে আমি অউ আনমু ফাটক
বাজার থাকি । ডাইল থাকি চাউল থাকব বেশি । তেও, বড়ি দিয়া রান্দবে কইমাছ । একটু
তেল বেশি দিও গো মাই ।

--- রান্দমু নে । এক অউ রান্দা নু রান্দিয়া আইলাম হি বাড়িত ।

--- অউ পথুয়া কই দিয়ানি । তে বাদ দে, আর রান্দন লাগত নায় তর ।

শত চেষ্টায়ও বৈতল রাগ সামলাতে পারে না । ঝাঁকা ভর্তি মাছ আবার পুকুরের জলে ছেড়ে
দেয় বৈতল ।

বৃষ্টির দিনের সন্ধ্যায় একটা মনখারাপের সুর বাজে । কোথায় বাজে জানে না বৈতল,
কিন্তু বাজে । বৈতল তার বাড়ির পিছন-বারান্দায় বসে পুকুরের জল ভরা দেখে । দেখে বৃষ্টির
টাপুর টুপুর । ঝুমুর ঝামুর । মনখারাপের বারিধারায় মিশে -যাওয়া বৈতলের গায়ে গা
লাগিয়ে যে কখন দাঁড়িয়ে-গেছে নয় বছরের শিশুকন্যা মরনি, বৈতল বুঝতেই পারেনি ।
বৈতলের মরণজয়ী মেয়ের নাম এখন মনি । বোবা মানুষের অস্ফুট সংকেত ছুঁয়ে যাবে মেয়ের

সারাজীবন । তার নতুন নাম । হঠাৎ কখন অন্ধকারের পাশে আলোর মতো মেয়েকে দেখে
চমকায় বৈতল । মেয়ে বাপের গা ঘেঁষে বলে,

--- অউটা কিতা বাবা ।

--- কোনটা গো মাই ।

--- ওউযে পুকইরর মাঝখানো । একটা বাঁশ ।

--- অয় ।

--- বাঁশর আগাত কিওর বাত্তি ।

--- বাত্তি কই দেখলে বেটি ? আশ্বিন মাসো ইখানো বাত্তি দেওয়া হয় । চৌদ্দ পুরুষে দেখইন,
আশীর্বাদ করইন । আশ্বিন আইতে তো বউত দেরি ।

--- আমি নু দেখিয়ার । গুডির কাগজর লেনটনর লাখান ।

--- অয়, অয়, গুডির কাগজ দি, বাশ দি বানানি হয় প্রদীপ । তুই নি স্বপ্ন দেখরে বেটি !
ঘুমাইয়া উঠচছ নি ।

--- না বাবা হাচাউ দেখিয়ার । অউ দেখ আকাশর মাথাত দেখছ নি ।

--- না গো মাই দেখিয়ার না । সব আন্দাইর ।

--- অউ দেখ । তুমি দেখরায় নানি বাবা ।

নয় বছরের মরনি কাতর কণ্ঠে বাবাকে দেখায় আলো, আকাশের আলো । সন্ধ্যার আঁধারে
বৈতলের মনখারাপ উধাও হয়ে যায় হঠাৎ । মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বৈতল । আকাশ-আলোয়
যেন উজ্জ্বল হয় মুখ । বলে,

--- তুই দেখরে নি গো মা ।

--- অয়, দেখিয়ার । অত সুন্দর বাত্তি তুমি বানাইছ নি বাবা ।

--- না রে বেটি ।

--- তে কে বানাইছে ।

--- তর বাপ থাকি ভালা কেউ একজনে বানাইছে ।

--- কে নানা পিরে নি ।

--- তুই দেখবে সারাজীবন । তাইন দেখাইবা । ইটার নাম অইল জীবন-বাণ্ডি । হক্কেলে দেখে
না, কেউ দেখে ।

--- তুমিও দেখবায় বাবা ।

দেখছে না বললে মেয়ে ভুল বুঝবে তাই বৈতল চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ । তার পর
মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে,

--- তুই আমারে মানছ নি বাবা । বিশ্বাস করছ নি ।

--- করি ।

--- আমারে ভালা পাছ নি ।

--- পাই ।

--- তর মায় আমারে ভালা পায় নি রে ।

--- পায় বাবা ।

--- তুই কেমনে বুঝলে ।

--- চান্দুর বাড়িত তনে কাম করি আইলে মায়ে কান্দইন ।

--- আগে তো কইচছ না মাই ।

--- মায় কইন, তর বাপে যে কেনে ইবাড়িত পড়ি রইছে ।

--- তুই যাছ নি হি বাড়িত ।

--- না, মায় অখন লই যায়না । কয় বড় বড় অই গেছি ।

--- চান্দুর লগে খেলছ না ।

--- খেলি উঠানো ।

--- চান্দুর বাবা ভালা না তোর বাবা ভালা ।

--- চান্দুর বাবায় বউততা দেয় ।

--- অ, আমি ভালা নায়, নানি ।

--- আমি তো কিছু নেই না ।

--- কেনে নেছ না ।

--- মায় কয়, নিলে তুমি গুসা করবায় ।

--- তর মায় তো চান্দরে খুব ভালা পায় । অখনও রইছে হি বাড়িত, খুব রান্দের নানানি
বিনানি, নানি ।

--- মা অখন পাকঘরো । মাছ রান্দের । কই মাছর ঝোল বড়ি দিয়া, তুমি খাইতায় ।

--- মাছ কই পাইল । বড়ি কই পাইল ।

--- তুমি নি খালি মাছধরতায় পার, মায় পুকইরো লামিয়া ধরছে ।

--- আর বড়ি ।

--- আমার মার রান্দাঘরো সব থাকে ।

রাগ হলে বৈতলের সব ইন্দ্রিয় বন্ধ হয়ে যায় । একবগ্গা হয় । বেগুন পোড়ার
বেগুনের মতো গরম হাওয়া বেরোয় শরীর ফুঁড়ে । দুর্গাবতীর ফস্টিনস্টি নিয়ে নিজের
মনখারাপ সাজায় । বৈতল দুর্গাবতীর মনের ভিতর উঁকি দেয় না আর । অনেক চেষ্টা করে
দেখে, অতল বৈ কিছু নেই । তাই একাকী বৈতল অন্ধকারে গুম হয়ে বসে থাকে । যখন
বৈতলের মন কাঁদে তখন আকাশ ভরা বৃষ্টি । ঝমঝমঝম । পায়ের নিচেও জল । পাতা ভিজে
গোড়ালি অন্ধি ছুঁয়েছে । চালাঘরের বারান্দায় সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয় । বৈতল দেখে দূরের
আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করছে এক আকাশপ্রদীপ । যা দেখে বৈতলের নয় বছরের মেয়ে

মরনি, দুই শূন্যমূল নারী পুরুষের আকাজ্জক সলতে । শুধু বাঁচিয়ে রাখা আর বেঁচে থাকার
লড়াইরত দুই বাস্তবহারা । বৈতল ওঝা বর্ষার ভিজে বাতাস বুকে নিয়ে তার আপন রমণীর কাঁধে
হাত রাখে বিশ্বাসে । বলে,

--- তে চল ।

চল বলে বৈতল চলার গতি আনে । দুর্গাবতীও জানে তার জীবনের চলার গতি বলতে
একজনই । তিলে তিলে বড়ো করে তোলা তাদের নবম বর্ষীয় কন্যা । অবিশ্রান্ত বর্ষার রাতে
একাকী বসে থাকা পাথরের মূর্তিকে সঙ্গী করে । দিঘীর জল বলে এখন আর কিছু নেই, সব
একাকার । দুর্গাবতী বৈতলের গোড়ালি ছাড়িয়ে উঠে গেছে জল । টুপটাপ বৃষ্টিপতনের শব্দে
দুজনের একাকী রাত ঘন হয়ে ওঠে । দুর্গাবতীও বৈতলকে ছুঁয়ে দেয় । বলে,

--- জল বাড়ের ।

--- বাড়উক । আমরা ডারাই না পানিরে ।

--- কিলাখান টাপুস টাপুস, ছলছলাৎ করি বাড়ের । বিশ্বসংসার ডুবি যাইব ।

--- পানির সর্বনাশা ডাক । আমি চিনি ।

--- জল কুনুসময় সর্বনাশ করে না । জল অইল জীবন ।

--- অখনঅউ তর ভাঙা ঘর ভাসি যাইব ।

--- কেমনে কছ । তুই কুনু সবজাস্তা নি ।

--- আমি কেনে । তুমি সব জান । তুমি থাকলে আমার ডর নাই । আমার মাপুড়ির ভগবান
তুমি । আমি যে কই ভাসি গেলাম নে আইজ । দেশবিদেশে জানি না, তুমি অউ আমার দেশ,
বইয়াখাউরি ছাতক সুনামগইঞ্জ ছিলেট সব । সব তুমি । আমার লাখান এক পাপিষ্ঠারে লইয়া
তুমি ঘুররায় ।

--- তুই আমার বৌ, তাই আমার পুড়ি । আমার লাখান সুখর সংসার কার আছে ক চাইন ।

--- তে তুমি মনখারাপ করি বই রইছ কেনে ।

--- নারে, আমি কিছু দেখি না, আমি কিছু জানি না । খামোকা আমারে চাণ্ডো উঠাইছ না ।

--- চাণ্ডো উঠাইতাম কেনে । তুমি যেতা হতাউ কইলাম ।

--- তে ক চাইন, আমি যেতা দেখি তুই হিতা দেখছ নি ।

--- কিতা দেখতাম কও আন্দাইরো ।

--- অউ আকাশো বাত্তি দেখরে নি ।

--- কিওর বাত্তি ।

--- আকাশ বাত্তি । পুকইরর মাঝখানো বাঁশর আগাত ।

--- আমি কিছু দেখিয়ার না । ঘুটঘুটি আন্দাইর ।

--- আমিও দেখিয়ার না কিন্তু আমার মরনিয়ে যে দেখের ।

--- তাইরে তুমি মরনি ডাক কেনে । তিলোত্তমা নামটা খারাপ কিতা । নামে দুষ করল কিতা । কেউ দিলেউ কিতা নাম খারাপ অই যায় নি । কইলায় মনি ডাকবায়, অখন আবার কেনে মরনি ।

--- নারে ইতা নায় । আমরা গরিব মানুষ, আমার লাখান নাম রাখা অইত নানি । বড়ো মাইনষর সমাজো মরনি খারাপ নাম অইত পারে, কিন্তু মরণ জয় করার ই নামও কিন্তু খারাপ নায় । বড়লোকর চউখ দিয়া পুড়িরে দেখলে পুড়ি আমার অইত নায় । কাউয়াও অইত নায় কুকিলও অইত নায় । আমার তাই কিন্তু মরণ জয় করি বাচি থাকব ।

বৈতলের বড় বড় সব কথার ভাণ্ডারী এক ছুতোর মিস্ত্রি । গুরু সৃষ্টিধর বৈতলকে পদে পদে জীবনের পাঠ শিখিয়েছেন । জীবনের গূঢ়তত্ত্ব যে এমন সাদাসিদে হয় বৈতলকে শিখিয়েছেন তিনি । তাই দুর্গাবতীর মনোব্যাথায় সামিল হতে পারে সহজে । দুর্গাবতীর মনে মনে গড়ে-ওঠা ধারণাকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ।

বৈতলের এমনিতে ভয়ডর বলে কিছু নেই । সেই নির্ভয় মানুষটার ভেতরকে আরো শক্ত করেছেন গুরু । সহজিয়া কথায় বলেছেন মানুষের জীবনে মৃত্যু এক উৎসব । মৃত্যু মানে

পরিপূর্ণতার স্মারক । তাই মৃত্যুকে যে জয় করতে পারে তার জীবনে হয় মহোৎসব । যে-মানুষ সারাজীবন মৃত্যুর ভয়ে মরতে মরতে বাঁচে, তার জীবনে কোনও উৎসব নেই । বৈতলের জীবনে তাই উৎসব লেগেই আছে । বৈতল জীবনে হারতেও শেখেনি । একবার মাত্র হেরেছিল, মেয়ের জন্য হেরেছিল, মেয়ের জন্ম হওয়ার আনন্দে হেরেছিল, ইচ্ছে করে যম জমিদারের কাছে । পাল্টাপাল্টির নাম রাখে জমিদারপুত্র আর পাটনিকন্যার । বৈতল জমিদারপুত্র চান্দুর নাম রাখে চন্দ্রধর, জমিদারও তার মেয়ের নাম রাখে তিলোত্তমা । কথা দিয়েও কথার খেলাপ করে বৈতল, তিলোত্তমা রাখেনি । বৈতল মেয়ের নাম রাখে মরনি । তবে এত ভেবে নাম রাখেনি, ভালো খারাপ ভাবে নি, শুধু গুরুর মৃত্যু নিয়ে ব্যাখ্যা তার মাথায় রেখেছে । এর মধ্যে একদিন শিববাড়ির হেডমাস্টার, তার পক্ষীরাজের বাঁধা সওয়ারি, বৈতলকন্যার অভিনব নাম শুনে বাহবা দেন বিস্তর । বলেন,

--- খুব ভালো নাম রাখছ রেবা । চাবুক মারছ । মরণ শুনলে মানুষে খুব ডরায় । তুমি ডরাইছ না, দেখিও তুমার পুড়ি অইব অকুতোভয় ।

বৈতল প্রশ্ন করে,

--- কিতা কইলা আইজ্ঞা । অর্থ কিতা, অকুতোভয় ।

তিনি হেসে এড়িয়ে গেছেন জবাব । বলেছেন,

--- আছে একতা । খাইয়া নাচন ।

রাতের অন্ধকারে বৈতল আবার পুকুরপারে তাকায় । স্পষ্ট দেখতে পায় জীবন প্রদীপ । প্রদীপের আলোয় দেখে টাউন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী কুতুবউদ্দিন নিস্পাপ মুখ । মুখের হাসি । বৈতল প্রাণপণে দুর্গাবতীকে কাছে টানে । বলে,

--- কইছলাম নানি তরে, এক ভুল করছি ।

বৈতল দুর্গাবতীর জবাবের অপেক্ষা করে না । ডুবে যায় তার ভাবনার অতলে । ভেবে পায় না তার মেয়েও কি একই ভুল করবে । পুকুরের অন্যপারে জমিদারের দোতলা বাড়ির আলোকেই কি তবে আকাশপ্রদীপ ভেবে ভুল করছে মেয়ে । যমুনাপ্রসাদের আকাশবাড়ির আলোকে নিশানা করে বৈতল অন্ধকারের জলে মারে ঝপাং ।

বৈতল সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে না । কোনো দোনামনার অবকাশ রাখে না । কাউকে বুঝতেও দেয় না তার সিদ্ধান্ত কথা । একবার ভুলও করেছে অতি উৎসাহে । গাঁজার কলকেয় দুটান দিয়ে বলে দেয় দুখুকে, বছইকে আপদকে তার মনের কথা । তার শর্তের কথা । বলে,

--- দুধপাতিল উতিল ইতা খামোকা । তর ঘনিয়ালা মজিদউ আমি মুসলমান অইতাম ।
দুর্গাবতী বেটি ইণ্ডয়ে আমারে খেলার, দেখাই দিতাম তাইরে ।

--- কিতা দেখাইতে ।

--- এ তরে নু কইলাম, পয়লা আমার কাম করি দিবে । হিণ্ডরে বধ না করলে কিচু অইত নায় ।

বৈতল দুখুকে শত্রু বিনাশের শর্ত । দুখু ভাবে নেশার কথা । উড়িয়ে দেয় । বলে,

--- ধুর হালার হালা । মুসলমান হওয়ার কুণু শর্ত লাগে না । লাগে খালি ইমান ।

--- ইমান কিতা রে ।

--- ইমান অইল বিশ্বাস । বিশ্বাস থাকলেউ মোমিন হইবে । এর লাগি মুসলমান হওন লাগে না ।

ইমান আছে আছে বৈতলের একশভাগ । ছোটখাটো বদমাশি চুরি ছ্যাঁচড়ামি করে সে । সে তো সব গরিবেই পেট ভরানোর জন্য করে । বৈতল ওসব বেইমানি ভাবে না । আর বৈতলের লেজ মাড়িয়ে না দিলে সে কারো উপর চূড়ান্ত আঘাতও করে না । বৈতলের ইমানও তাই তার নিজস্ব । ধর্মবিশ্বাস নেই তার কিন্তু ধর্মের ভিত-এর উপর বিশ্বাস আছে । মানুষের উপর বিশ্বাস আছে বৈতলের ।

আকাশপ্রদীপ না আলোয়া কিসের টানে জানে না বৈতল, সে রাতে আর দুর্গাবতীর হাতে কইমাছ হিং-এর বড়ির ঝোল খাওয়া হয়নি । ঝাঁপ দেয় বৈতল উল্টোদিকের আকাশবাড়ি নিশানা করে ।

উপন্যাস বিয়াল্লিশ

রিক্সা নেই বলে বৈতল আতুর হয়ে যায়নি । বৈতল জানে জলে নামলে তার রুজির অভাব হবে না । কিন্তু জলকে স্থায়ী পেশা করায় বৈতলের আপত্তি না থাকলেও, দুর্গাবতী যে অপছন্দ করে । দুর্গা এখন আর ব্রাহ্মণ কৈবর্ত নিয়ে বিতর্ক জড়ায় না । মামু চলে যাওয়ায় দুখুও কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে । বছই আপদ তো পরগাছা । হিন্দু-মুসলমান নিয়েও দুর্গাবতীর ধারণা পাল্টেছে । দুখু এলে ঘরে ডাকতে আর কোনও আপত্তি নেই ।

শুধু বৈতলের মাছ মারা নিয়েই তার আপত্তি । বলে,

--- তুমি মাছ মারাত গেলেউ গাত মাইমলি গন্ধ অই যায় ।

--- আমি তো মাইমল অউ বেটি । বৈতল দাস পাটনি । গন্ধ ত থাকবউ ।

--- না আমি হে কথা কইয়ার না, মাছর আইছলা গন্ধনি ভাল লাগে বিছনাত ।

--- আইচ্ছা বুজছি বৈতল কৈবর্ত চলত নায়, শৰ্মা হওন লাগব । আমি জানছনি নতুন কাম লইছি ।

--- কিতা ।

--- না পাটনিও নায় শৰ্মাও নায় । মেশিনম্যান, আমি অখন মেশিন চলাই ।

--- কিওর মেশিন ।

--- ছাপার মেশিন ।

--- হেঁ ।

--- নাজিরপাট্টির 'যুগশক্তি'ত কাম লইছি । খবর ছাপানির কাম ।

বৈতল যেদিন বড় মুখ করে দুৰ্গাবতীকে তার মেশিনম্যান হওয়ার গল্প বলে তার দুদিন পরে যুগশক্তি বন্ধ হয়ে যায় । আবার দুদিনের বেকারত্বের পর দুৰ্গাবতীকে দেয় নতুন খবর । বলে,

--- নতুন খবরর কাগজ আর একখান বার আইছে । তারার মেশিন চালানির মানুষ আছে । আৰ্যপাট্টির মুখো 'জুতি'র অফিস ।

--- জুতি আবার কিতা নাম । আমি দেখছি বড়বাড়িত আয় জ্যোতি ।

--- অউ এককথা, ঘাড়র নাম গরদজনা । আমার কাম দৌড়ানি । কাগজো নাম লেখি দেয় আর আমি বাড়ি বাড়ি পৌঁছাই দেই । এক এক কাগজে দুই পয়সা । তরে একদিন লই যাইমু দেখিয়া আইবে প্রেস । জালেঙ্গা থাকি আয় এক চিমটা বেটা, যে মেনেজার । ছুকরি আছে দুগু, অ আ উঠাইয়া সাজাইন । আর খটাং খটাং করিয়া মেশিনে ছাপে । আর একটা ছোটো মেশিনও আছে দেখলাম, হিখান উঠানো রাখি দেয়, রুটির চাক্কির লাখান থালো কালা রং মাখি দেয় আর কালা বেলাইন গিয়া মারে ছাপ, কাগজো লেখা বারয়, জালেঙ্গার মেনেজারের কইছি তুমরা খবর ছাপতায় তো, আমি দিমু খবর । যম জমিদারর কথা কইতে কয়, ইতা বলে মালিকর লগে মাতন লাগব । ডরালুক, মরা মানুষরেও নি অত ডরায় ।

--- ঠিক অউত্ত কইছইন । তুমি ইতা কিতা আরম্ভ করছ । ই বাড়িবাড়ি দৌড়াইয়া কয় পয়সা
পাইবায়, তিন পেট পালতায় পারবায় নি । কইলায় নু যাইবায় সবুজবরণ ।

আইরংমারা গিয়া শ্রাবণীর গান গাইবায় ।

--- অয় যাইতাম ।

বৈতল ঝাঁপ দেয় জলে । জমিদার বাড়ির ডাকাতি, জমিদার যমুনাপ্রসাদের হারিয়ে
যাওয়া, পুলিশের নজরবন্দি থেকে ছাড়া পাওয়া এসব খবর ছাপে নতুন সংবাদপত্র । বৈতল
বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয় খবর । দুর্গাবতীর ইচ্ছায় শেষপর্যন্ত জলমগ্ন শহর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় ।
ভরা বর্ষায় দিঘীর পার থেকে কলাগাছ কেটে ভোরা বানায় আবার বৈতল । দুর্গাবতী দেখে
বলে,

--- অতবড় সংসারর জিনিষপত্র নিয়া কেমনে যাইতায় ই ভেলাত ।

বৈতল বলে,

--- গাটি বান্দো একটা । মনো নাই নি পাকিস্তান থাকি কিতা লইয়া আইছলায় । একগাটি
বুকের উপরে তুমার । আমার তো কিছু নাই । অখন দুই গাটি, তুমার গাটি তুমি নেও ।
আমার গাটি আমার পুড়ি ।

বৈতল আবার বলে,

--- অখন চল, ইতা থাকউক । আইমুনে পরে । আইয়া নিমু ।

দুজনের বুকে দুই পাঁজর বেঁধে আবার চলে, নতুন রিফুউজি কলার ভেলায় চড়ে করে
যাত্রা । ষাট ইংরাজির বন্যায় ভেসে চলে আর এক অজানার উদ্দেশে । ছোট মেয়ে মরনি, ডাক
নামের মনি বাপকে প্রশ্ন করে,

--- বাবা, আমরার কুনু বাড়ি নাই নি ।

--- না, নাইগো মাই ।

--- চান্দর আছে, অতবড় মহল, আমরার নাই ।

--- আছিল সব অউ বেটি । কিন্তু এক চেংমুড়ি কানিয়ে কাড়ি নিলা সব ।

--- মা মনসা তো তুমার আই ।

--- আই না, আই না । আই অইলে অত কষ্ট দেয় না কেউ পুয়া-পুড়িৰে ।

--- আমি জানি হিন্দু হওয়ার লাগি পাকিস্তান থাকি ভাগিয়া আইছি আমরা ।

--- তুই তখন কই গো মা । তোর তো জন্মউ অইছে না । ইতা কে কইছে । মায়নি ।

--- কইছে । তুমার মামুর আল্লাও বাদ । তুমারো খেদাইছে ।

--- না গো না, মা বিষরি । কেউ কেউৰে খেদায় না । মানুষ মানুষৰ শত্ৰু নায় । খালি দুই একজন আলদৰ বাইচা থাকে । শয়তানি করে ।

--- মায় তো কয় তুমি শয়তান দেখলেউ মারো । ইবার কুন শয়তানে খেদাইল তুমারে ।

--- ইবার কুন শয়তান নায় । ইবার তুমার এক দাদুর কথা রাখিয়া ডুলিয়ার । পঞ্চখণ্ডৰ পণ্ডিতপাড়ার লাগা আছিল তান বাড়ি । তাইন কইতা, মানুষ কুন সময় এক জাগাত থাকে না, খালি জাগা ডুলায় । নতুন জাগাত গিয়া মানুষ আরো ভালা হয় । আমিও আমার সেন্টার পাশ পুড়িৰে মাস্টৰ রাখিয়া পড়াইমু অখন । দেখ, দেখ তৰ মায়ে ইউ দাদুৰে নম কৰেৰ আকাশো ।

নতুন বসতি গড়তে বৈতলের ভেলা আবার চলে দুলে দুলে ।

সমাপ্ত

বৰ্ণসংস্থাপন এবং সংশোধনঃ

সুব্রতা মজুমদার, গবেষক

আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর ।

e-mail : smazumdar07@gmail.com

উপন্যাস

সুরমা গাঙর পানি

রণবীর পুরস্কারস্থ

একুশপ্রতি

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

18:15:35 16-04-2

SURAMA GANGAR PANI
An epic saga of quest for identity through diaspora
by **RANABIR PURKAYASTHA**

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

© কমা পুরকায়স্থ

প্রচ্ছদ : প্রবীর আচার্য

একুশ শতকের পক্ষে সুমিত্রা কুণ্ডু কর্তৃক ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০ থেকে
প্রকাশিত মাইক্রোপ্রিন্ট গ্রাফিক্স কর্তৃক টাইপ সেটিং এবং গীতা প্রিন্টার্স ৫১এ
কামাপুকুর লেন হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ২৫০ টাকা

শভেন্দু ইমাম
মুস্তাক আহমাদ দীন
জফির সেতু
ফজলুল হক

বাহারউদ্দিন
হাবিবুর রাহমান চৌধুরী
বিশ্বতোষ চৌধুরী
শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার
কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দেওয়ানা বানাইল মোরে, সূজন বন্দে—

18:16:06 16-04-2

উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক, বাস্তবের
সঙ্গে কোন মিল নেই। তাও যদি জীবনের মাটি
পাশেই যায় কোথাও তবে তা নিতান্তই আকস্মিক
কিংবা অস্বাভাবিক হিরণ্ময়। প্রলম্ব জ্ঞানানোর দ্বারা।

লেখকের অন্যান্য বই

বোকা কানীরাং কথা

তৃতীয় ভূবনের রূপকথা

আসমান জমিন কথা

শিকড়ের সন্ধান

18:16:38 16-04-

মোহনা থেকে উৎসে ফিরে যাওয়া যায় না। জল কি উৎসে বইতে পারে? তবু অন্তর্গত রক্তের কল্লোলে কী যেন এক ইচ্ছা জেগে থাকে। উৎসে বড়ো মজা। সেই মায়াবী পর্দাকে ছুঁতে সাধ যায়। কোন্‌ সব-পেয়েছির সেশ সেখানে? কোন্‌ এসেছেন? দেশভাগ দেখেছেন আমার মা-বাবা, আমি দেখিনি। একটু বড়ো হয়ে শুনেছি, 'পৃথিবীর পরম্পরাহীন ভাঙা মানচিত্রের অব্যাহত ডিটমহলে থাকার নে-সুবিধা পেয়েছি—স্বাধীনতা এরে কয়। ছেলেবেলা থেকে জোতের শ্যাওলা হয়ে ভেসে বেড়িয়েছি। আমার আপন ভাবাকেও আঁকড়ে থাকার উপায় নেই ডিটমহলে। শিবেছি, বাসা বঁটা এখানে কিন্তু বাড়ি যেখানে তা পরদেশ। সিলেটের সুনামগঞ্জ কি ভূগোলে আছে কোথাও নাকি তা রয়েছে শুধু স্বপ্নে।

ভাবতে-ভাবতে বুঝতে-বুঝতে পেরিয়ে গেছে একটি জীবন। টুকরো মানুষের টুকরো জীবনকথা থেকে এতদিন যথাসাধ্য ঠেঁকে মিলে গেছে মেটামরফের নির্ভর। বরাক উপত্যকা যে দুঃখিনী কর্মালার ভূমি, দুয়ারশির সেশ—সর্ব-পেয়েছিরে উষ্মদের জমি ও আকাশ খুঁজে পাওয়ার লড়াই তৃতীয় প্রজন্মে জটিলতর হয়েছে মার। 'কী আমার পরিচয় মা?'—এই আর্ত প্রশ্নের জবাব কি আছে কোথা? ইম্যাসাইন গ্রন্থমালার গ্রন্থনা যে ন্যূনতম পরিসর দাবি করে, তা যোগদন মিলে পারে কোনো উপন্যাস শুধু।

আখ্যানের জলবায়ু রয়েছে যে-পরদেশে, আমার সেই উৎসভূমিতে শিখেছি কত নৃত্যের আগে, দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে। খুঁজে পেয়েছি আমার শিকড়মি। শ্রৌতবেলায় কোন্‌ বাদুবেলে জেগে উঠল আমার সাংস্কৃতিক জন্মের প্রথম গুহকল। শিকড়ে জলের দ্রাণ পেলাম এই প্রথম। নিজের অজান্তসারেই বৈতল নামের কোন-এক সম্ভাব্য সম্ভার ব্রূণ জন্ম নিল। সুনামগঞ্জ-সিলেট এর আলো-হাওয়া-রসে গলে মিলে মনের ভেতরে আখ্যানবীজ জেগে উঠতে থাকল ক্রমশ। যে-দেশভাগ এতদিন তথ্যময় ছিল, এবার তা মর্মবিদারক সত্য হয়ে উঠল।

কিন্তু অনুভূতিই তো যথেষ্ট নয়। সিলেটের সাংস্কৃতিক জন্মের মধ্যমণি শুভেন্দু ইমাম ও তাঁর 'বইপত্র' দুয়ে মিলে রত্নভাণ্ডার। আছে সূজন কবি মোস্তাক আহমদ দীন। তাদের সাহচর্য যেন অফুরন্ত পানীয়ের ভূসার। কিন্তু বই চাই, তথ্যের যোগদন চাই আরও। অতএব অল্পপূর্ণার ভাণ্ডার খুলে গেল। বাল্যবন্ধু তপন তপোবীর-এর সহধর্মিণী গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্য বললেন 'মাইভেঃ।' তার মানে, 'খুল' যা সিমসিম। সিলেটে এক শিল্পীর সংগৃহীত যেসব বই ও পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্য উপন্যাসের ব্যাসে রূপায়িত হয়েছে, সেইসব এত অজস্র যে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সূত্র-নির্দেশ করা গেল না। তবু লিখি সবার কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। লেখা তো শুরু হলো, উৎসাহ একা তাকনাও বন্ধুদের কাছ থেকে আসতে থাকল বলকে বলকে। ছাপবে কে? এগিয়ে এসে

কলিমপুরের দৈনিক 'নববারী প্রসঙ্গ' এর তৎপরি সম্পাদক হাবিবুর রাহমান চৌধুরী
এবং ঐ পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী। এবার তরসা যোগান দিলেন
শেইখর নাম-না জানা পাঠকেরা যারা মাছের মতো জলস্রোতে মিশে থাকেন, যারা
বৈতলের মতোই নিত্যই সাধারণ। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার।

কিছুতে কিছুতে শেষ হলো ব্যয়ান। আবার বন্ধুপত্নীর তাড়না। প্রয়োজনীয় কিছু
পরিমার্জন করে প্রচ্ছদে প্রকাশের জন্যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা। এতেও আসলই প্রদান
প্রতিবন্ধক। তাও শেষ পর্যন্ত কাটানো গেল শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য ও রেহাস্পদ সূর্য
চন্দ্রের উৎসাহে। এবং অবশ্যই একুশ শতক-এর স্বল্পতায়ী কর্ণধার অরুণ কুণ্ডুর আন্তরিক
আগ্রহে।

এই উপন্যাস আপাতদৃষ্টিতে আমি লিখেছি যদিও, আসলে লিখিয়ে নিয়েছে বৈতল-
লুনা-দুসুনা। শেষ হলো কি সুরমা গাঙের পানির মাত্রা? জলস্রোত তো গলে না।
তাইলে?

১০ সেপ্টেম্বর ২০১২
৩২০, বক্সি বীড়ি রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৪৮

হাবিবুর পুরকার

